CWK-HO 5276-10-P 628

(10)

কোনই অজ্ঞেয় থাকিবে। হক্‌স্‌লী সম্ভবতঃ এতটুকু স্বীকার করিবেন না। স্পেন্‌সর কোনও সংবাদকে তিনি অজ্ঞেয় বলিবেন কি না সন্দেহ। তবে কোনও কোনও স্থলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহা জ্ঞেয় কি অজ্ঞেয়, তাহা আমি বলিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি সম্প্রতি ইহার উত্তর জানি না। অপরে যদি জানি বলিয়া স্পর্দ্ধা করে, তাহাতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই; তবে এ পর্য্যন্ত যে কোনও দুর্ভাগ্য জীব জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সেই জ্ঞান হক্‌স্‌লীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কষপাথরে তখনই বিদীর্ণ ও বিকৃত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে স্পেন্‌সর অজ্ঞেয়বাদী; হক্‌স্‌লী অজ্ঞানবাদী বা অবিদ্যাবাদী। অজ্ঞেয়বাদ ও অজ্ঞানবাদের মধ্যে সীমানির্ণয় যেমন শক্ত, অজ্ঞানবাদ ও ভ্রান্তিবাদের মধ্যেও প্রভেদ-স্থাপন সেইরূপ কঠিন কাজ। জগৎ কি, আমি জানি না, ইহা অজ্ঞানবাদ; জগতের যে জ্ঞানটুকু আছে, তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান, বা মিথ্যাজ্ঞান, ইহা ভ্রান্তিবাদ। এই দুই বাদের মধ্যে কতটুকু প্রভেদ রহিয়াছে, তাহার বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, বিসংবাদ বাড়াইবার সম্প্রতি কোনও প্রয়োজন নাই।

তবে, উভয়ের মধ্যে যদি কোনও সীমাজ্ঞাপক রেখা টানিতে পারা যায়, সে রেখা এত সূক্ষ্ম যে, সহজে সকলের চোখে পড়িবে না, এবং যে কোনও ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে সেই রেখা লঙ্ঘন করিয়া এপার হইতে ওপারে চলিতে কোন বাধাও বা বিঘ্ন অনুভব করিবেন না। হয় ত একটা হইতে অন্যটাকে তফাৎ করাই যায় না। প্রকৃত সংবাদ জানি না বলিলেই, যে সংবাদ জানি, তাহা মিথ্যা, এই মীমাংসা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। সুতরাং অবিদ্যাবাদের ও ভ্রান্তিবাদের প্রায় সমার্থকতাই আসিয়া পড়ে।

কৌতূহলী পাঠক মহাশয় যদি জগতের জ্ঞেয়াজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে—কতকটা এইরূপ উত্তর দিব। যিনি বলেন, জগতের স্বরূপ একেবারে অজ্ঞেয়, তাঁহার মীমাংসায় আমি সন্দেহ করি। যিনি বলেন, না, জগতের স্বরূপ অজ্ঞেয় নহে, ইহা এইরূপ, তাঁহার বাক্যে অসীম আস্থা শ্রদ্ধা নাই।

গল্প আছে, কোনও মুমূর্ষু রাজার স্বাস্থ্যবর্দ্ধন প্রকৃত সংবাদ মন্ত্রিবর্গ রাজ-কারণে গোপন রাখিতেছিলেন। কোনও সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্য দূত নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সংবাদ? দূত বলিল—সংবাদ ভাল, কেহ

করে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেহ স্পষ্ট বুঝাইয়া বলেন নাই। এই—তোমার বিশ্বাস কি? উত্তর—আমি ইহাও বিশ্বাস করি না, উহাও বিশ্বাস করি না। প্রশ্ন—তবে উপায়? উত্তর—কথাটা বড় শুক্ত; আপনি সহজে প্রকাশ করিবেন না। সম্পাদক মহাশয় ত্রুটে আমীত সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু আমার উত্তরে পাঠকবর্গ সন্তুষ্ট হইবেন, ভরসা করি।

২। সংস্কার—এই পারিভাষিক শব্দটির অর্থও বড় দুঃসাধ্য। ইউরোপের পণ্ডিতেরা নানা স্থলে নানা অর্থ করিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শনে সংস্কার শব্দের আর এক স্থলে প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধদর্শনোক্ত পাঁচটি স্কন্ধের মধ্যে তৃতীয় স্কন্ধের নামও সংস্কার। এই পাঁচ স্কন্ধের বিষয়ে পরে অনেক কথা আসিবে। নিদান মধ্যে গৃহীত সংস্কার ও স্কন্ধ-মধ্যে গৃহীত সংস্কার উভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে, বোধ হয় না। সেই সংস্কার কি, তাহা বুঝাইবার জন্য গোটা কতক উদাহরণ লওয়া যাক্।

সংস্কারের সম্বন্ধে বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতের আলোচনা প্রবন্ধের শেষে বর্ত্তমান। সাধারণ নামের উল্লেখে কার্য্য নাই। কতকগুলির উল্লেখ করিলেই সংস্কার কি, তাহা কতক বুঝা যাইবে। একটা সংস্কার—স্পর্শ, contact; একটা—বেদনা, স্পর্শ হইতে উৎপন্ন অনুভূতি—sensation বা feeling; আর একটা—চেতনা perception এর কাছাকাছি। একদিন-শিশুর মধ্যে এমনি ব্যাপারগুলি,—যতগুলি যে কিছু চিৎবৃত্তি বর্ত্তমান,—elementary sensations, cognitions, volitions, emotions, সমস্তই,—সংস্কার! Elementary কথাটি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়াছি। মনে কর, সহসা আমার সম্মুখে একটা সাপ উপস্থিত। এস্থলে কি কি মানসিক ব্যাপার ঘটে? একটা দীর্ঘ, চাকচিক্যশালী, বক্রগতিশীল আকৃতি বা রূপ, সঙ্গে সঙ্গে হয় ত উচ্চনীচবেগাহত ফণা হইতে তীব্র পরিচিত সোঁ শব্দ—এই রূপ ও এই শব্দের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত সর্পস্মৃতি—সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যবিচার বা বিতর্ক—তার পর পলায়নপ্রয়াসের উদ্বোধক আশঙ্কা, অর্থাৎ একটা ভীতি, পরক্ষণেই সবেগে রক্ষপ্রদান ও পলায়ন। ইংরাজিতে বলিলে, প্রথমে রূপের ও শব্দের sensation; তার পর পরিচিত শব্দ ও শব্দব্যাখ্যাবিষয়ক বিতর্ক—এই cognitive ব্যাপার, তার পর আশঙ্কারূপ emotion ও পলায়নচেষ্টার প্রবর্ত্তক volition.

এখন এই sensation বা বেদনা হইতে emotion ও voli

বিছু মানসিক ব্যাপার, সমস্তই সংস্কারের অন্তর্গত। রূপ একটা সংস্কার। রস সংস্কার, শব্দ সংস্কার, অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতি সংস্কার; ভয়, চেষ্টা প্রভৃতিও সংস্কার। এবং এই সকল সংস্কার একত্র যোগে আমার মনঃশরীর; মনঃশরীরকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলে যে সকল টুকরা পাওয়া যায়, তাহার এক একটি এক এক সংস্কার। এই সংস্কারগুলি বাদ দিলে আমার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না। এই সংস্কারগুলি একত্র গোছাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলে, আমি পূর্ণ, জাগ্রত, নানা-উপাধি-ভূষিত মহেশ্বরোপম অহং হইয়া দাঁড়াই।

এক কথায়, রূপ, রস, গন্ধ, শীত, গ্রীষ্ম, আশা, যাতনা, সুখ, দুঃখ, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতীতি, ভয়, হর্ষ, সজ্জা, চেষ্টা, প্রয়াস প্রভৃতি সমস্তই সংস্কার। এবং এই সংস্কার সমষ্টি একত্র করিলে যাহা হয়, তাহারই নাম অহং, আমি, বা এই মানুষ।

কিন্তু ঠিক্ তাই কি? কেবল সংস্কারগুলিকে একত্র করিয়া সমষ্টি করিলেই কি গোটা মানুষ বা গোটা অহং হয়? বোধ হয়, ঠিক হয় না; আর একটার দরকার, সেটা সংস্কারের অতিরিক্ত আর একটা জিনিষ, তাহার নাম বিজ্ঞান; ইহাই পরবর্ত্তী তৃতীয় নিদান।

৩। বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের ইংরাজি নাম এক কথায় consciousness, জ্যোতিষশাস্ত্রে নাম সংবিৎ। সংবিৎ হয় ত বিজ্ঞান ছাড়াইয়া আর একটু উচ্চে উঠে। কিন্তু এ স্থলে বৃথাতর্কপরিহারের জন্য, বিজ্ঞান, সংবিৎ, consciousness একার্থসূচক ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সংস্কারসমষ্টির সহিত বিজ্ঞানকে যোগ করিলে, তবে অহং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়; নতুবা হয় না। কেবল সংস্কারসমষ্টিকে অহং বলিলে একটু ভুল হয়। কেন, দেখাইতেছি। আমার মধ্যে যে সকল রূপ রস গন্ধ, বুদ্ধি স্মৃতি প্রতীতি, শোক হর্ষ লজ্জা ভয় প্রভৃতি আছে, তাহারা যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিযুক্তাবস্থা, স্বপ্রধান হইয়া বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে আমি আমিত্ব লাভ করিতাম কি না সন্দেহ। এ সকলের অতিরিক্ত আর একটা শক্তি বা চিৎপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, যাহা এই সকলের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনা করে, সবগুলিকে একত্র টানিয়া আনে, জড়াইয়া রাখে, সকলকে যথাস্থানে বিন্যাস করে; সকলকে সাজাইয়া গোছাইয়া পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করিয়া আমাকে নির্ম্মাণ করে। অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, মাংসপেশী, শোণিত প্রভৃতি জড় বীরের উপাদান; এক অর্থে উহাদের সমষ্টি ও সমবায়ই জড় শরীর। কিন্তু ঐ সকল উপাদানকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া

পরস্পরের সুনিয়ত সম্বন্ধস্থাপন আবশ্যক। যেখানে যাহার দরকার, সেখানে তাহাকে রাখিয়া, যাহার যাহা কার্য্য, তাহার উপর তাহার ভার দিলে, তবে শরীর সুস্থ নির্ম্মিত হইবে। নাপিত দর্শন-বজ্রপ্রয়োগে আমার কেশগুলিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করে, অস্ত্রচিকিৎসক যখন তাঁহার নিয়ত ছুরিকাপ্রয়োগে আমার অঙ্গুলি কয়টিকে কাটিয়া লয়েন, তখন সে ক্লেশ আর সে অঙ্গুলি আর আমার থাকে না। তাহাদের প্রতি তখন যতই সস্নেহ লোচনে চাহিয়া দেখি না কেন, তাহারা আর আমার নয়। এমন কি, আমি স্বপ্ন বাতগ্রস্ত অবয়বকে আর সঞ্চালন করিতে পারি না, তখন সেই অবয়বের সহিতই বোধ হয় আমার পূর্ব্বসম্বন্ধ আর থাকে না। তখন সে আর আমার নহে, আমি তাহার কর্ত্তা নহি। সেইরূপ সংস্কারগুলি আমার সূক্ষ্মশরীরের আমার আত্মার উপাদান হইলেও তাহারা যতক্ষণ যথাস্থানে বিন্যস্ত ও আপন আপন কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ তাহারা আমার থাকে না। এই বিন্যাসের, সন্নিবেশের ও যথাবিহিত কার্য্যে বিনিযোগের ভার যাহার উপর তাহারই নাম বিজ্ঞান। এবং বিজ্ঞানকর্ত্তৃক যথাস্থানে সংস্থাপিত সংস্কারসমষ্টি আমি। সাপ দেখিলাম ও সাপের ছোঁ শব্দ শুনিলাম, কেবল তাহাতে চলিবে না। এই রূপের সহিত এই শব্দের সাহচর্য্য সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক; এবং পূর্ব্বেও তাদৃশ রূপ ও তাদৃশ শব্দের সহিত স্মৃতিসাহায্যে পারম্পর্য্যসম্বন্ধের স্থাপনা আবশ্যক। তবে আমি জানিব যে, আমিই একটা সাপ দেখিতেছি এবং এই সমুদয়রূপ মহা ব্যাপারের, ঘটন-ঘটনা-পটীয়ান কর্ত্তার নামই consciousness বা বিজ্ঞান।

৪। নামরূপ—এই পারিভাষিক শব্দটির একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমরা সচরাচর জগৎকে দুইটা ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখি; একটার নাম বাহ্যজগৎ অর্থাৎ আমি ছাড়া জগৎ; আর একটা অন্তর্জগৎ, বা আমার আমিময় জগৎ, আমার আত্মা। আমার জড়শরীরটা আমার অন্তঃশরীরের বাহিরে, প্রকৃতপক্ষে ইহা জড় জগতের অন্তর্গত। সুতরাং সমগ্র জগতের দুই ভাগ,—চলিত ভাষায় একটাকে মনোজগৎ একটাকে জড়জগৎ বলিলে অধিক দোষ হয় না। এই দুইটা জগৎ আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, ইহাদিগকে লইয়াই আমার কারবার; এই দুইকে ছাড়িয়া আর তৃতীয় নাই। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় বলিতে গেলেও সমগ্র জগতের দুই ভাগ; একটা 'নাম',—সূক্ষ্ম কথায় অন্তর্জগৎ, বা মনোজগৎ। একটা 'রূপ',—স্থূল কথায় বহির্জগৎ বা জড় জগৎ। নাম ও রূপ উভয় লইয়া সমগ্র প্রত্যক্ষ জগৎ,—উভয় ছাড়িয়া আর তৃতীয় বস্তুর

রিষা। যাঁহারা একমুখে বৈজ্ঞানিককে গালি দেন, পরক্ষণেই দেখিতে পাই, তাঁহারা অবিকুণ্ঠচিত্তে একটা জড় জগতের বা বাহ্যজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও সংশয়মুক্ত হইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক, কৃপার সহিত তাঁহাদিগকে বলিতে বাধ্য যে, তাঁহাদের বর্ণিত যে জড়জগতের প্রতি তাঁহারা এত ঘৃণা দেখান, সেই জড় জগৎ আদৌ অস্তিত্ববিহীন, তাহা তাঁহাদের একটা কল্পিত বিভীষিকা। তাঁহাদের বিকৃত কল্পনা একটা পিশাচমূর্ত্তির গঠন করিয়া সেই পিশাচের আতঙ্কে কাতর হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে; জ্ঞানীর চক্ষে সেই পিশাচের অস্তিত্ব নাই, তাঁহাদের নিরর্থক আতঙ্কও কেবল হাস্যরসের ও কৌতুকরসের প্রণোদক। বিজ্ঞান নিশ্চয় জানে, ক্ষিত্যাদি মহাভূত ভূতও নয়, পিশাচও নয়, উহা কেবল একটা রূপ বা appearance; বৌদ্ধদর্শনের ও হিন্দুদর্শনের গৌরব যে, ইউরোপের বিজ্ঞান এত দিনে যে-ভ্রান্তির অন্ধকার হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে কত শত বৎসর পূর্ব্বে সেই তামস তিমির নষ্ট করিয়া সম্যক্ দৃষ্টির দ্বারা দর্শন-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যিনি মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি জানেন যে, জড় জগৎ বলিয়া আদৌ একটা স্বতন্ত্র জগৎ নাই। উহাকে প্রয়োজনবিশেষে সুবিধার নিমিত্ত আমরা বাহ্যজগৎ বলিয়া বলিয়া লই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আমাদের বাহিরে নহে, উহা একটা রূপ, একটা জ্যোতি-মাত্র; উহা আমাদের অন্তঃশরীরেরই উপাদান। অন্তর্জ্জগৎ ও বাহ্যজগৎ, এই দুই ভাগে সমগ্র জগৎকে বিভক্ত করিলে, সাংসারিক ও ব্যবহারিক কর্ম্মে সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপ ভাবে বিভাগ যুক্তিসঙ্গত নহে; দর্শনশাস্ত্র ঐরূপ বিভাগ স্বীকার করিতে সম্মত হইবে না। বিজ্ঞানবিরোধী জড়বাদী যাহাকে বাহ্য জগৎ বা জড়জগৎ আখ্যা দেন, তাহা আমারই আত্মার একটা অংশ—একটা উপাদান। এখানে বেশী দুইটা জগৎ নাই, এবং সেই জগৎ আমি স্বয়ং। তোমরা রটাই বল না, আমি বিশ্বমধ্যে এক আমার ভিন্ন অন্য কিছুর ও কাহারও অস্তিত্ব দেখিতে পাই না। তোমরাও অস্তিত্বহীন, এবং তোমার কল্পিত ও অকারণে রচিত জড়জগৎ, তাহাও আমার নিকট অস্তিত্বহীন। আমি একাকী সম্রাটের মত তোমাদের কল্পিত অনন্ত মহাকাশ ও অনাদি মহাকাল ব্যাপিয়া আছি। এই 'পুদ্গল' পুরুষ একেবারে আমিই বা আমার কীদৃশ সদীর্ঘ নয়—একটা নামের ও একটা রূপের সমষ্টিমাত্র।

৫। বড়ায়তন—বড়ায়তন শব্দের অর্থ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানস্বরূপ

আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অকস্মাৎ একটি বাড়িয়া গেল কেন, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। সচরাচর ও লৌকিক ভাষায় জড় শরীর বলিলে যাহা বুঝায়, ষড়ায়তন অর্থে তাহাই বুঝিব।

৬। স্পর্শ—অর্থাৎ ষড়ায়তন বা জড় শরীরের সহিত তোমাদের জড় জগতের স্পর্শ বা সম্বন্ধ।

৭। বেদনা—বেদনা শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে; সহজ ভাষায় বেদনা অর্থে স্পর্শজাত অনুভূতি—রূপ রস গন্ধাদির অনুভূতি; অথবা আরও একটু অর্থবিস্তৃতি করিয়া তোমাদের বাহ্য জগতের অনুভূতি। ইংরাজিতে feeling বলা যাইতে পারে।

৮। তৃষ্ণা—তৃষ্ণা অর্থে কল্পিত বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জ্জগতের স্পর্শ ও সম্বন্ধ বজায় রাখিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি। ইংরাজিতে এক কথায় desire বা appetite বলা যাইতে পারে।

৯। উপাদান—বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় উপাদান অর্থে উপকরণ নহে; উপাদানের অর্থ কতকটা তৃষ্ণারই মত। স্থূল হিসাবে উপাদান বলিলে কতকটা অনুরাগ বা প্রবল আসক্তির ভাব আসে।

১০। ভব—ইংরাজিতে being, becoming, existence; বাঙ্গালায় সত্তা, অস্তিত্ব।

১১। জাতি—জন্ম, উৎপত্তি। সহজবোধ্য।

১২। জরামরণ—ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

নিদান কয়টির অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। শাস্ত্রসঙ্গত ও সর্ব্ববাদিসম্মত অর্থ দিবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। পারিভাষিক শব্দার্থ সম্বন্ধে তেমন প্রবল মতভেদ ত বর্ত্তমান নাই। কিন্তু এই নিদানশৃঙ্খলের প্রকৃত তাৎপর্য্য লইয়া যথেষ্ট বিসংবাদ চলিতে পারে। এইখানেই নানা মুনির নানা মত। এখন সেই শৃঙ্খলার গ্রন্থি আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

একটা বিষয়ে সকলের একমত। নিদানের শৃঙ্খলা বা সূত্র একটা অভিব্যক্তির প্রণালীমাত্র, ইহা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে। অভিব্যক্তি শব্দ ইংরাজি Evolution অর্থে ব্যবহার করিলাম। অভিব্যক্তি বটে, তবে কিসের অভিব্যক্তি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

অভিব্যক্তি জরামরণের। জরামরণ আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও জরামরণের

উৎপত্তি অর্থাৎ Origin of evil একটা প্রধান সমস্যা। খ্রীষ্টানেরা একটা প্রাচীন উপন্যাসের সাহায্যে এই তত্ত্বের অক্লেশে ও এক নিশ্বাসে মীমাংসা করিয়া ফেলেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন তত্ত্ব হলে মীমাংসা করিতে পারে না। বোধিদ্রুমমূলে ভগবান্ তথাগত যে মীমাংসার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমার বোধ হয়, তেমন মীমাংসা অন্য কোথাও আর নাই। জরামরণের মূল অবিদ্যা, অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, তাহা হইতে ষড়ায়তন, ইত্যাদি ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত জরামরণ উৎপন্ন। বিশ্লেষ এক প্রান্তে অবিদ্যা, অন্য প্রান্তে জরামরণ; মধ্যস্থলে অন্যান্য নিদান। এখন এই সূত্র বা শৃঙ্খল ধরিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। আচার্য্যেরা ও পণ্ডিতেরা কিরূপে অগ্রসর হয়েন, দেখা যাউক।

ব্রহ্মসূত্রের টীকাকার গোবিন্দনাথের মতে নিদানশৃঙ্খলা মনুষ্যজীবনের ইতিহাসমাত্র।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণমধ্যে মনুষ্য-জীবনের আরম্ভ। প্রথম ভ্রূণমধ্যে কতকগুলি সংস্কার, অর্থাৎ সামান্য চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয়; সেইখানেই বোধ হয় তাহার সামান্য সুখদুঃখাদি অনুভূতির সঞ্চার হয়। জীবনসঞ্চারের প্রথমবস্থাপ্রকাশের সময়েই ভ্রূণ ক্লেশ ও আরাম এই উভয়ের প্রভেদ করিতে শিখে। কেন শিখে?—ক্লেশ ও আরাম কি বাস্তবিক পৃথক্ পদার্থ; কস্মিন্ কালে এ সংসারে কতকটা কষ্ট ও কতকটা আরাম পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া বর্ত্তমান আছে কি না,—এই প্রভেদানুভূতির মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা ভ্রান্তি। সুখ দুঃখ অনিত্য, অসৎ, ব্যবহারিক পদার্থ; কেবল অজ্ঞানের বশে বা ভ্রান্তির বশে, ভ্রূণ উভয়ে প্রভেদ দেখে। ক্রমে সংস্কারগুলি কতক পরিস্ফুট হইয়া আসিলে বিজ্ঞানের সঞ্চার; অর্থাৎ পূর্ব্বে সুখ দুঃখ ছিল, কিন্তু ভ্রূণ যেন তাহা জানিত না, এখন কতকটা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে; ক্রমে তাহার নামরূপের বিকাশ। নামরূপ কতকটা যেন সূক্ষ্মশরীর গোছের, সংস্কার বিজ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ। ক্রমে ষড়ায়তন অর্থাৎ অবয়ববিশিষ্ট জড়শরীর কতকটা পূর্ণ আকার ধারণ করে, তাহাতে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য আরম্ভ হয়। তার পর সেই স্থূলশরীরের ক্রমে বাহ্যজগতের সহিত স্পর্শ ঘটে; এখনও ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে মনে করিবার প্রয়োজন নাই। মাতৃগর্ভই এখন তাহার বাহ্য জগৎ; সেই জগতের সহিত তাহার স্পর্শে তাহার বেদনা বা নানাবিধ অনু-

ভূমি কৃষিযোগ্য হইয়া উঠে। বেদনা হইতে 'তৃষ্ণা' অর্থাৎ আরাম উপভোগের ও দুঃখ-পরিহারের আকাঙ্ক্ষা; তাহা হইতে 'উপাদান' অর্থাৎ সুখলাভের ও দুঃখ-পরিহারের জন্য বিশেষ প্রযত্ন, চেষ্টা ও প্রয়াস। এই অবস্থায় উপনীত হইলে 'ভব'; এখন হইতে মনুষ্যত্ব একরকম পূর্ণতা লাভ করিল। এইখানেই বোধ করি সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া 'জাতি' অর্থাৎ লৌকিক হিসাবের মনুষ্যজন্ম লাভ করে। তাহার 'জাতি'-লাভের ফল জরামরণ।

এই ব্যাখ্যাটা নিতান্ত মন্দ শুনায় না। বুদ্ধদেব বেন এটা-কিজিওলজির তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক ফিজিওলজি বা শরীরবিদ্যা বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত শারীর তত্ত্ব স্বীকার করিবে কি না, জানি না, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এইরূপ শারীর তত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য মহাশয়ের তত দূর ভয় পাইবার আবশ্যক ছিল না। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধাচার্য্যেরা সকলে স্বীকার করেন না। মহাযানী সম্প্রদায় সকলের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। ইউরোপের ওল্ডেনবর্গ, রিস্ ডেবিডস, চাইল্ডার্স প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও সেই সকল বচন অবলম্বনে নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সম্প্রতি আমাদের কলিকাতার আকার ওয়াডেল অজন্টা গ্রামে গুহাগাত্রে বৌদ্ধগণের ভবচক্রের এক চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই ছবিতে বারটি নিদানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। ওয়াডেল সাহেব তিব্বত হইতে ভব-চক্রের ছবি আনিয়াছেন এবং তিব্বতের লামাগণের প্রদত্ত একটা ব্যাখ্যা শুনিয়া আসিয়াছেন। এই চিত্র উল্লিখিত গোবিন্দনাথ-প্রদত্ত ব্যাখ্যারই কতকটা সমর্থন করে। সেই ছবির একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেই কতকটা বুঝা যাইবে।

ভবচক্র বা সংসার-চক্রের প্রতিকৃতি একখানি চাকা; চক্রের কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ নাভিদেশে কপোত, সর্প ও শূকরের মূর্ত্তি রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রতিকৃতি-স্বরূপ অঙ্কিত। এই তিনকে কেন্দ্রে রাখিয়া সংসারচক্র ঘুরিতেছে। তাহার নেমিদেশে বারটি ঘরে দ্বাদশ নিদানের দ্বাদশটি মূর্ত্তি মনুষ্যজীবনের ইতিহাস দেখাইতেছে। প্রথম ঘরে এক ব্যক্তি অন্ধ উষ্ট্রকে চালিত করিতেছে। ইহা অবিদ্যার প্রতিকৃতি। চালক স্বয়ং কর্ম্ম। জন্মের আরম্ভে মনুষ্য পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মকর্ত্তৃক চালিত হইয়া অন্ধ উষ্ট্রীর ন্যায় অবিদ্যার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায় ও নূতন জন্মের প্রতি ধাবিত হয়। দ্বিতীয় ঘরে কুম্ভকাররূপী কর্ম্ম সংস্কার-রূপ সংস্কার বা কৃষ্টিমে মনুষ্যের অন্তঃশরীর-রূপ ঘটের নির্ম্মাণ করিতেছে। তৃতীয় ঘরে বানরমূর্ত্তি অপূর্ণ মনুষ্যে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে। চতুর্থ ঘরে

বৈদ্য রোগীর নাড়ী টিপিতেছেন, অর্থাৎ স্পন্দনশীল মনুষ্যত্ব বা 'নামরূপ' বাহ্যজগতের সহিত স্পর্শলাভের জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে। পঞ্চম ঘরে মুখোসের ভিতর হইতে দুইটা চোখ উঁকি মারিতেছে, অর্থাৎ 'ষড়ায়তন' রূপ ইন্দ্রিয়সমষ্টির ভিতর হইতে মনুষ্যত্ব বাহ্যজগতে চাহিতেছে।

এই অবস্থায় ক্ষণাবস্থা হইতে মুক্ত মনুষ্যের সহিত বাহ্য জগতের কারবার রীতিমত আরম্ভ হইল। ছয়ের ঘরে আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতী মনুষ্যের সহিত জগতের, অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের স্পর্শ সূচনা করিতেছে। এই স্পর্শের ফলে বেদনা, বা দুঃখাদি অনুভূতির আরম্ভ; সাত চিত্রে বাহির হইতে নিক্ষিপ্ত তীর চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই অনুভূতির পরিচয় দিতেছে। আটের ঘরে সুরাপানরত মনুষ্যমূর্ত্তি তৃষ্ণা বা বাসনার উৎপত্তিসূচক। মনুষ্য এখন সংসারে মজিয়াছে; সংসারের গাছ হইতে আগ্রহের সহিত ও আসক্তির সহিত ফল সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত, সেই জন্য নয় ঘরে ফলকর্ষী মনুষ্য উপাদান বা সংসারাসক্তির প্রতিমূর্ত্তি। দশম ঘরে নবোঢ়া বধূর মূর্ত্তি 'ভব' অর্থাৎ মনুষ্যের সংসারে গৃহস্থ-রূপের অস্তিত্বের পরিচায়ক। মানুষ এখন ঘরকন্না পাতিয়া গোটাদুয়েক হইয়াছে। তারপর একাদশ চিত্র নবপ্রসূত শিশুসহ জননীর মূর্ত্তি। সন্তানের জন্ম 'জাতির' অর্থ বুঝাইতেছে। সন্তানের জন্মের পর মনুষ্যের আর কোন কাজ নাই। উপসংহারে জরামরণ; দ্বাদশ ঘরে বাঁশের দোলায় উপরে শ্মশান শবমূর্ত্তি।

ভবচক্রের এই ব্যাখ্যা অতি প্রাচীন; অজন্টর গুহামধ্যের তাহার কার্য্য সকল বারশতের শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কিংবদন্তি প্রসিদ্ধি আছে যে, মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা নাগার্জ্জুন এই চিত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই ব্যাখ্যার বয়স প্রায় দুই হাজার বৎসর দাঁড়ায়। একে প্রাচীন, তাহাতে সেকালের ও একালের অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুমোদিত, কাজেই এই ব্যাখ্যার সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে পারা হয়। ব্যাখ্যার মোটের উপর দাঁড়ান এই। আমরা কথায় কথায় মানুষের দশ দশার উল্লেখ করিয়া থাকি। বৈদ্যেরা দশের উপর দুই বাড়াইয়া বলিয়া থাকেন, মানুষের দ্বাদশ দশা। প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই দ্বাদশ দশার ধারাবাহিক চিত্র। শেক্‌স্‌পীয়র মনুষ্য-জীবনকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সহিত একস্থানে তুলিত করিয়াছেন। মানুষশিশুর 'mewling and pewling in its mother's arms' এই অবস্থায় অভিনয়ের আরম্ভ এবং বার্দ্ধক্যে

"sans eyes, sans teeth" অবস্থায় অভিনয়ের যবনিকাপাত; সেই বৃত্তান্ত যাঁহারা একবার পড়িয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ কবিত্বের জন্য বুদ্ধদেবকে পৌরুষীয়ত্বের অনেক নিম্নে বসাইবেন, এবং বৌদ্ধমন্দিরমধ্যে ইংরাজ কবির মূর্ত্তি কেন বুদ্ধমূর্ত্তির স্থান গ্রহণ না করিবে, তাহার জন্য পঞ্চাশ কোটি মনুষ্যের কৈফিয়ত চাহিতে পারিবেন।

আমার বিবেচনায় প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাপারটা মনুষ্যজীবনের ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষ বটে, কিন্তু সেই ইতিহাস ও অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীর। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তিবাদকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এবোলুশন থিওরির সহিত মিশাইতে গিয়া মহাগোলে পড়েন। তাঁহাদের একদেশদর্শিতাতেই বোধ হয় মত ভ্রান্তিঘরে পরিণত হইয়াছে।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে আজকাল অভিব্যক্তিবাদের জয়জয়কার। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক নানা স্থানে সেই অভিব্যক্তিবাদের সহিত ইংরাজি-অনভিজ্ঞ পাঠকের পরিচয় ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। জাগতিক ব্যাপারমাত্রেই অভিব্যক্তিনিরূপণ বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৌরজগতের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য লাপ্লাসিয়ান প্রভৃতি বর্ত্তমান; পৃথিবীর গঠনে অভিব্যক্তি বুঝাইতে ভূবিদ্যা ব্যস্ত। জীবজগতে অভিব্যক্তির প্রণালী ডারউইন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যসমাজের অভিব্যক্তি বুঝাইতে বিজিয়লজি শাস্ত্রের একটা প্রধান অঙ্গ এথ্নোলজি বা নৃতত্ত্ববিদ্যা। ভাষার অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য স্পেন্সার সাহেব বড় বড় দুইখণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন। মনুষ্যসমাজের অভিব্যক্তি বুঝাইতে বড় বড় দার্শনিক ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক অহর্নিশি নিযুক্ত। পাণিনি হইতে মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত সমস্ত বৈয়াকরণিক পণ্ডিতেরা ভাষার অভিব্যক্তি-আবিষ্কারে নিযুক্ত। এ সমস্তই বিজ্ঞানের বিষয়; এক কথায় এই সকল অভিব্যক্তিকে বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি বা ব্যবহারিক অভিব্যক্তি নাম দিতে পারা যায়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর এক রকমের অভিব্যক্তি আছে—তাহাকে দার্শনিক অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। কেহ যদি পারমার্থিক অভিব্যক্তি বলিতে চাহেন, বলুন; সম্প্রতি নাম লইয়া বিতণ্ডার অবসর নাই। আমাদের হিন্দুদর্শনের অভিব্যক্তি এইরূপ দার্শনিক অভিব্যক্তি। সাংখ্যদর্শনের ও বেদান্তদর্শনে যে অভিব্যক্তি আছে, তাহা এই দার্শনিক অভিব্যক্তি। আমার বোধ হয়, বৌদ্ধদর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদও সেই দার্শনিক অভিব্যক্তিমূলক; মূলতঃ ইহা হিন্দুদর্শনের অভিব্যক্তি হইতে অভিন্ন। ইউরো-

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা নাই। সে সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলে নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা হইবে, হয় ত উপহাস্য হইয়া পড়িব। কিন্তু আমার যতটুকু ধারণা আছে, তাহাতে বোধ হয়, ডেকার্ট, বার্কলি, হিউম, কান্ত প্রভৃতি দার্শনিকেরা অন্তর্জগতের সহিত বাহ্যজগতের সম্বন্ধনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া এই দার্শনিক অভিব্যক্তির আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন মাত্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে অনেকটা সেই পথে অগ্রসর হইতে দেখি। একস্নার্ট ও ক্লিফোর্ড যেন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। গণিতবিৎ কার্ল পিয়ার্সনের নাম এখনও তত বিখ্যাত নহে। আমার বোধ হয়, তিনি আরও কতদূর অগ্রসর হইয়া প্রায় বৌদ্ধ বা বৈনাশিক বা বৌদ্ধ মতে পৌঁছিয়াছেন। আমার সন্দেহ হয়, বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সহিত বৌদ্ধদর্শনের তেমন প্রভেদ নাই। অদ্বৈতবাদকে একালের পণ্ডিতসমাজ বড় পছন্দ করেন না। নিরপৌরুষি-বস্তুতন্ত্রতার মূলে যাহারা একবার কুঠার অর্পণ করিতে চায়, চিরাভ্যস্ত চিন্তাপ্রণালীকে যাহারা একবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চায়, তাহার সহিত সম্প্রীতিস্থাপন বড় সহজ কথা নহে। প্রত্নেরও অনেক পণ্ডিত ও সম্প্রদায়প্রবর্ত্তিকা শঙ্করাচার্য্যের শুষ্কাদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বেদান্তের মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ও অসৎ শাস্ত্র বলিয়াই নিন্দিত হইয়া থাকে। এ স্থলে সে কথায় বিতণ্ডায় প্রবেশ করিব না। প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ আমার নিকট যেরূপ বোধ হয়, তাহা বিনয়ের সহিত ও আশঙ্কার সহিত তাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমরা লৌকিক বা ব্যবহারিক হিসাবে সমগ্র জগৎকে অন্তর্জগৎ বা মনোজগৎ ও বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎ, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। জড়জগৎ দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া আমাদের পুরোভাগে বিস্তৃত ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রচলিত বিশ্বাস। অন্তর্জগৎ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া তাহার সহিত বারবার ও দেনা লেনা করে। আমার জীবনকাল ব্যাপিয়া এই অন্তর্জগতের সহিত জড় জগতের কারবার ও আদানপ্রদান চলে। বাহ্যজগৎ একটা প্রতীয়মান রূপ লইয়া আমার অন্তর্জগতের সম্মুখে উপস্থিত হয়। জড় পদার্থের প্রকৃত রূপ কি, তাহা জানি না; কিন্তু বস্তুতঃ জড় প্রকাশের যে রূপ জানিতে পারিতে পারি, সেই রূপেই জড় আমার নিকট প্রতিভাত। জড় বলিয়া আমার আত্মা হইতে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট একটা পদার্থ আছে; সেই স্বতন্ত্র প্রতীয়মান স্বরূপ জড় জগৎ। আবার আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ, আত্মার স্বরূপ

পরিচয় বা সম্পর্ক থাকিত না; সকলের সমষ্টীভূত মনুষ্যাত্মা বা নামরূপই অস্তিত্ব হীন হইত।

মনুষ্যাত্মার বা নামরূপের একাংশ জড়জগৎ; কতকগুলি রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের, অর্থাৎ কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টির নাম জড়জগৎ। জড়জগতের অন্য স্বাধীন অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। কিন্তু এই রূপরসগন্ধাদির সহিত আবার সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধাদি অন্যান্য সংস্কারের কতকগুলি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অগ্নির স্পর্শে আমাদের বেদনা ও জ্বালা বোধ হয়; সূর্য্যালোকে আমাদের চৈতন্যসঞ্চার ও স্ফূর্ত্তি হয়; বাঘ দেখিলে আমাদের আতঙ্ক ও পলায়নেচ্ছা ঘটে; সঙ্গীতশ্রবণে আমাদের আনন্দ হয়। রূপশব্দস্পর্শাদির সহিত এই সমস্ত চৈতন্য স্ফূর্ত্তি আতঙ্ক আনন্দ প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এই নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের স্থাপনকর্ত্তা বিজ্ঞান; অথবা যখন এই সম্বন্ধ স্থাপিত দেখি, তখনই বলি, বিজ্ঞানের আবির্ভাব ও বিকাশ হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকিলে বিজ্ঞানেরও অস্তিত্ব থাকিত না। আত্মার একাংশের, অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অন্তর্জগতের সহিত অপরাংশের, অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় বাহ্য জড় জগতের এই সম্বন্ধ না থাকিলে, বিজ্ঞান থাকিত না। আবার সেই বাহ্যজগতে বা রূপ রস গন্ধাদির মধ্যেও নানাবিধ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে, সূর্য্য চন্দ্রের সহিত আবার পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে; পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্রাদির সহিত আবার জীব জন্তুর মনুষ্যদেহের সম্বন্ধ আছে। ফুলের রূপ ও গন্ধ ও স্পর্শ একত্রসম্বদ্ধ হইয়া ফুল আখ্যা পায়; অগ্নির স্পর্শ ও রূপ একত্রসম্বদ্ধ হইয়া অগ্নি আখ্যা পায়; অম্লজান ও উদজান নির্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া জল আখ্যা পায়; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল সম্বন্ধের স্থাপয়িতা বিজ্ঞানের কাজ। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলেন, যে সকল নিয়মের বলে জড় জগতের কার্য্য চলিতেছে, সেই সকল নিয়ম বিজ্ঞান কর্ত্তৃকই স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল অনন্তসংখ্য রূপ রস গন্ধ একত্র সঙ্কলিত হইয়া জড় জগতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহারই নাম প্রাকৃতিক নিয়ম। এই সম্বন্ধগুলি বর্ত্তমান না থাকিলে প্রাকৃতিক নিয়মও থাকিত না, জড়জগতের অস্তিত্বও অসম্ভব হইত, এবং বিজ্ঞানেরও অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করা যাইত না। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা নহে, বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মের স্রষ্টা ও স্থাপয়িতা। মনে রাখিবেন, বিজ্ঞান অর্থে এখানে science নহে; বিজ্ঞান অর্থে এখানে একটা চিত্তবৃত্তি বা

সংস্কার, সংস্কারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সংস্কার; ইহাকে ইংরাজি প্রতিশব্দ consciousness ভিন্ন আর কিছু সম্প্রতি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

কিন্তু প্রশ্ন এই, বিজ্ঞান এই সম্বন্ধ স্থাপন করে কিরূপে? এই সম্বন্ধ স্থাপন করে কেন? এই সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে মনুষ্যাত্মার অস্তিত্ব থাকিত না; এবং জগতে মনুষ্যাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, সুতরাং জগতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া বসিত হইত, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু এই সম্বন্ধস্থাপনের কারণই বা কি? কিরূপেই বা এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গিয়া মনুষ্য পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসে; কখনও বা ঈশ্বরাদি বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া প্রতারিত হয়। বিজ্ঞান সংস্কারগুলিকে সজ্জিত করিয়া নামরূপের নির্ম্মাণ করিল কেন? কাষ্ঠখণ্ডগুলি সজ্জিত হইয়া রথচক্রে পরিণত হইল কিরূপে? বৌদ্ধদর্শনের উত্তর, এই ব্যাপারের মূলে অবিদ্যা। এই বাক্যের স্পষ্ট অর্থ কি, ঠিক্ বলিতে সাহস করিতেছি না; অবিদ্যা অর্থে হয় অজ্ঞান বা জ্ঞানাভাব; অথবা ভ্রান্ত জ্ঞান। প্রথম অর্থ যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধদর্শন বলেন হয়, তাহা জানি না, উহা খাঁটি আগ্নষ্টিকের কথা। দ্বিতীয় অর্থ যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধদর্শন বলেন, উহা একটা ভ্রান্তিমাত্র। সংস্কারগুলি সজ্জিত আছে, তুমি দেখিতেছ; সজ্জিত সংস্কারসমূহ বিজ্ঞানলোকে নামরূপের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও বোধ হইতেছে; কিন্তু সবই মিথ্যা; সবই অলীক কল্পনা। এই অর্থ ঠিক্ হইলে বৌদ্ধদর্শন বৈদান্তিক মায়াবাদ। যাহাই হউক, উপরে বলিয়াছি, অজ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞান, উভয়ের মধ্যে সীমানির্দ্দেশ দুরূহ। মায়াবাদ ও শূন্যবাদ ও অবিদ্যাবাদ, প্রায় একই স্থানে অবস্থিত।

এখন সূত্রটী কিনারায় পাওয়া গেল — মূলে অবিদ্যা; জ্ঞানাভাব বা ভ্রম। অবিদ্যারূঢ় সংস্কারগুলি বিজ্ঞান কর্ত্তৃক সজ্জিত ও যথাবিন্যস্ত হইয়া নামরূপের অর্থাৎ আত্মার বা জগতের সৃষ্টি করে। আত্মা হাড়িয়া ভিতরে জগৎ নাই; জগৎ ছাড়িয়া ভিতরে আত্মা নাই। নামরূপের বা জগতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ষড়ায়তন অর্থাৎ আত্মার শরীর অন্তর্জ্জগৎ, ব্যাবহারীর বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎ হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহারা কি বাস্তবিকই স্বতন্ত্র? না, এই স্বাতন্ত্র্যবোধের নাম বিজ্ঞান; এই স্বাতন্ত্র্যবোধের হেতু অবিদ্যা, অজ্ঞান অথবা ভ্রান্তি। এখন বিজ্ঞানের সম্বন্ধস্থাপনা কার্য্য ক্রমেই চলিতে থাকে; অন্তর্জ্জগতের সহিত স্বাধীনরূপে প্রতীয়মান বাহ্যজগতের আদানপ্রদান ক্রমেই চলিতে থাকে; বিবিধ প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কারের সহিত মনুষ্যের কীর্ত্তি ও বিলাস লাভ করে।

এই ব্যাপারটা 'স্পর্শ'। স্পর্শ বা বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের সহিত আদান প্রদানে যোগনা, অর্থাৎ বিবিধ অনুভূতিরূপ সংস্কারের নূতন নূতন বিকাশ; জগতে রূপরসগন্ধাদির নূতন নূতন সৃষ্টি ও আবির্ভাব। তাহার ফলে 'তৃষ্ণার' উদ্গমঃ বাহ্যজগতের সহিত কায়বাক্ মনঃ রাখিবার, আদান প্রদান চালাইবার আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব। তাহা হইতে 'উপাদান'—জগতের সহিত আসক্তিস্থাপন। এই সমস্ত ব্যাপারকে ইংরাজিতে Differentiation বলা যাইতে পারে। এখনো বাহ্যজগৎ অন্তর্জগৎ হইতে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে, উভয়ের মধ্যে দূরত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, উভয়ের মধ্যে আসক্তি স্থাপিত হইয়াছে। এখন মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও বলিতে পারিতাম না যে, মনুষ্যত্ব পূর্ণ। এখন বলিতে পারিতেছি, মনুষ্যত্ব পূর্ণ; এই পূর্ণতাপ্রাপ্তির নাম 'ভব'। যেখানে 'ভব', সেইখানেই 'জাতি'—মনুষ্যজন্ম। মনুষ্যজন্মের অপর নাম ভগবান্ সিদ্ধার্থের মতে জরামরণ। জন্মমরণের সহচারী শোক পরিদেবন দুঃখ দৌর্ম্মনস্য।

এই শেষ কথাটা একটু বিচার্য্য। বৌদ্ধদর্শন ও আধুনিক হিন্দুদর্শন এক-বাক্যে মানবজীবন দুঃখময় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এবং সেই দুঃখ দূরীকরণ পরিত্রাণকেই পরমপুরুষার্থ জানিয়া, তাহার উপায় অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এইখানেই একদেশদর্শিতা। বৌদ্ধদর্শন বহির্ভূত ও হিন্দুসম্প্রদায় সকলের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সহিত সনাতন বেদমূলক ব্রাহ্মণরক্ষিত আর্য্যধর্ম্মের এইখানে প্রভেদ। এবং কেবল এই প্রভেদের জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুগণের বিবিধ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সমাজদ্রোহে পরিণত হইয়াছে। যে ধর্ম্মে মনুষ্যজীবনের কেবল আঁধারের ভাগটাই দেখে, আলোর ভাগ দেখে না; কোনরূপে জীবনের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভই পরমপুরুষার্থ বলিয়া উপদেশ দেয়; তাহা সমাজকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; তাহা ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম। সৌভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজ বুদ্ধদেব ও তাঁহার পথানুবর্ত্তী সংস্কারকগণের প্রবর্ত্তিত সাম্প্রদায়িক অধর্ম্মকে সম্যক্ প্রশ্রয় দেয় নাই; তাই সহস্র আচারক ও সংস্কারকের হস্তে ভগ্ন খণ্ডিত বিদীর্ণ ও বিকৃত হইয়াও এই পরাধীন অবনতিত হিন্দু জাতি আপনার জাতীয় অস্তিত্ব অব্যাহত রাখিয়া মনুর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

একনিষ্ঠ বিবাহ।

এক্ষণে যে সকল জাতি পৃথিবীতে সভ্যতম বলিয়া পরিচিত, তাহারা সকলেই একনিষ্ঠ-বিবাহ-পরায়ণ, অর্থাৎ এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দারান্তর গ্রহণ করে না, বা সামাজিক বিধানানুসারে করিতে পায় না। যে সকল সভ্য জাতির সামাজিক নিয়ম বা শাস্ত্রবিধান একাধিকস্ত্রীগ্রহণের প্রতিকূল নহে, তাহারাও প্রায়শঃ একাধিক পত্নী গ্রহণ করে না। একনিষ্ঠ-বিবাহপ্রণালীই এক্ষণে সমুদায় সভ্য-সমাজ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও অবলম্বিত।

সভ্য সমাজ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হউক, কিন্তু একনিষ্ঠ বিবাহপ্রণালী সভ্যতার পরিচায়ক নহে। মানুষ সভ্য হইয়াছে বলিয়া যে আধ্যাত্মিকতার প্রাচুর্য্যবশতঃ একপত্নীমূলক বিবাহপদ্ধতির অবলম্বন করিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। বরং দেখা যায় যে, যে সকল জাতি নিতান্ত অসভ্য, যাহারা মনুষ্যজীবনের প্রাথমিক অবস্থায় অবস্থিত, তাহারা প্রায়শঃ একনিষ্ঠ-বিবাহ-পরায়ণ। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। "বহুবিবাহ" প্রবন্ধে প্রসঙ্গাধীন কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থলে আরও কতকগুলি দিতেছি।

সিংহল দ্বীপে অরণ্যবাসী 'বেদ্দা' জাতি এত অসভ্য, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এত হীন যে, ইহাদের ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দ পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু ইহারা কখনও একাধিক পত্নী গ্রহণ করে না। শুধু তাহাই নহে; ব্যভিচার ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের কার্ নিকোবার দ্বীপবাসীরা একপত্নী-পরায়ণ, এবং ব্যভিচার ইহাদের মধ্যে মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত। সাঁওতালদিগের মধ্যে বহুবিবাহ স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ নহে বটে, কিন্তু একাধিকপত্নী গ্রহণ করিলে সমাজে এতটাই নিন্দার্হ ও অপদস্থ হইতে হয় যে, প্রায় কেহই তাহা করে না। নীলগিরির বাদাগা জাতি, উত্তর আসামের নাগা জাতি, কিসান জাতি, ব্রহ্মের কারেন্ জাতি, ইণ্ডোচীন, মলয় উপদ্বীপ এবং ভারতসাগরের দ্বীপপুঞ্জে অনেক জাতির মধ্যে একাধিকস্ত্রীগ্রহণ হয় বিধিনিষিদ্ধ, না হয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইণ্ডোরোটী জাতি একপত্নীপরায়ণ ত বটেই, উপরন্তু ইহাদের সমাজে ব্যভিচারবিষয়ে সমাজশাসন এতই কঠোর যে, ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে গৃহ এবং সমাজ হইতে জন্মের মতন বিদূরিত হইতে হয়। মার্কেসাস দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন দ্বীপে একনিষ্ঠ পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন বিবাহ-

প্রথা প্রচলিত নাই। পাপুয়ানদিগের মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, এবং ব্যভিচার ও উপপত্নীরক্ষা একেবারেই নাই। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় অসভ্য মনুষ্যের মধ্যেও এমন দুই একটি সম্প্রদায় আছে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে একপত্নীপরায়ণ। আমেরিকার ও আফ্রিকার অনেকানেক অসভ্য জাতির সম্বন্ধেও এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়।

এই স্থলে একটি রহস্যজনক ব্যাপারের উল্লেখ করিতে হইতেছে। দুই একটি এমনও অসভ্য জাতি দেখা যায়, যাহারা পূর্ব্বে একনিষ্ঠবিবাহপরায়ণ ছিল, কিন্তু উচ্চতর সভ্যতার সংস্রবে আসিয়া ক্রমশঃ পরিমাণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। মিনাহাসা প্রদেশের আলফুরা জাতি পূর্ব্বে একনিষ্ঠ-বিবাহপরায়ণ ছিল। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ কিয়ৎপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ডাক্তার হিম্মন্ সাহেব বলেন যে, মুসলমানের সংস্রবে আসিয়া ইহারা আপনাদের পূর্ব্বতন ও উচ্চতর যৌন নীতি হইতে স্খলিত হইয়া এই-রূপে বিলাসবাসনার বশবর্ত্তী হইতেছে। কম্ সাহেব বলেন যে, রিয়িয়ো জাতির মধ্যে একাধিকপত্নীগ্রহণ সমাজনিয়মে একেবারেই নিষিদ্ধ, কিন্তু ইয়োরোপীয়-দিগের সংস্রবে আসিয়া ইহারা এক্ষণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। বিবাহবিষয়ে না হউক, উচ্চতর সভ্যতার সংস্রবে অন্য বিষয়ে এইরূপ নীতি-ভ্রংশের দুই একটা দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও দেখা যায়। সাঁওতালেরা সত্যবাদি-তার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ; ইয়োরোপীয় পাদ্রীদিগের সংস্রবে আসিয়া ইহারা এক্ষণে মিথ্যা কথা বলিতে শিখিয়াছে।

সে যাহা হউক, উপরিউদ্ধৃত দৃষ্টান্তনিচয় হইতে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, একনিষ্ঠ বিবাহ সভ্যতার ফল বা পরিচায়ক নহে। বাস্তবিক কোন্ সমাজে কিরূপ বিবাহপদ্ধতি অবলম্বিত হইবে, তাহার প্রকৃত নিয়ামক, সামাজিক, আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা—সভ্যতা বা নীতির উৎকর্ষাপকর্ষ নহে। যে সমাজের অবস্থা ও প্রয়োজনাধীন যে বিবাহপদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, সে সমাজ সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া থাকে, এবং অবলম্বন করিতে বাধ্য না করিলে রক্ষা নাই। নীতি বা আদর্শের মুখ চাহিয়া প্রয়োজনকে উপেক্ষা করার অবশ্যম্ভাবী ফল—ধ্বংস।

নিতান্ত অসভ্যদিগের একনিষ্ঠ-বিবাহ-পরায়ণ হইবারই কথা। যে অবস্থায় মানুষকে মৎস্য ও পশুশিকার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, সে অবস্থায় বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভরণপোষণোপযোগী আহারের সংস্থান করা

কাহারও পক্ষে সহজ নহে, এবং অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। কৃষিকার্য্য উদ্ভাবিত হইলে এই অন্তরায় অনেকটা নিরাকৃত হয় বটে, কিন্তু অসভ্য সমাজে কৃষিকার্য্য প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া, তখন স্ত্রীলোকেরও একটা মূল্য থাকে। যে অবস্থায় স্ত্রীলোক জীবিকা অর্জ্জনের সাহায্য করে না, তখন যেমন ইচ্ছা করিলেই বা চাহিলেই স্ত্রী পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকের অর্জ্জনের পথ উদ্ভাবিত হইলে তখন আর তেমন পাওয়া যাইতে পারে না। তখন শারীরিক পরিশ্রম বা উপহারের বিনিময়ে স্ত্রী লাভ করিতে হয়। বহুস্ত্রীগ্রহণের পক্ষে আহার্য্য-সংস্থানাত্মক অন্তরায় তিরোহিত হইলে, মূল্যসংস্থানরূপ আর একটা অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষিকার্য্য প্রচলিত হইলেও এই কারণে অধিকাংশ স্থলেই পুরুষকে একটিমাত্র স্ত্রী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

অসভ্য সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা বার-পর-নাই হীন—তাহারা সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং সম্পত্তিরূপেই ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই পুরুষের অপেক্ষা দুর্ব্বল, সুতরাং সমাজের যেরূপ অবস্থায় মনুষ্যের অধিকার কেবল শক্তিগত, সে অবস্থায় দুর্ব্বল স্ত্রীজাতিকে যে প্রবল পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন হইতে হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। অনেক অসভ্য সমাজে স্ত্রীলোকের মৃত্যু ও জীবন পর্য্যন্ত পুরুষের ইচ্ছাধীন থাকে। এরূপ অবস্থায় পুরুষেরা যে একটিমাত্র পত্নী লইয়া সন্তুষ্ট হয়, সে কেবল প্রয়োজনের দায়ে। কৃষিকার্য্য এবং সম্পত্তি অর্জ্জনের অন্যান্য উপায় প্রবর্ত্তিত হইলে, এই প্রয়োজনের দায় হইতে মানুষ অনেকটা অব্যাহতি পায়। এবং তখন তাহারা আর একনিষ্ঠ-বিবাহপরায়ণ থাকে না—প্রবৃত্তি ও সাধ্যানুসারে যাহার যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করে। কিন্তু বহু স্ত্রী গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা ও সম্পত্তি অধিকাংশ লোকের থাকা অসম্ভব। সমাজবিশেষে বহুপরিজনপ্রতিপালনের ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই থাকিতে পারে; সেই জন্য সচরাচরই দেখা যায় যে, যে সকল সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল সমাজেও যাহারা সঙ্গতিসম্পন্ন, ক্ষমতাশালী, পদস্থ বা উচ্চবংশসম্ভূত, কেবল তাহারাই বহু স্ত্রী গ্রহণ করে—জনসাধারণ বহুবিবাহ করেও না, করিতে পারেও না।—পারে না বলিয়াই করে না। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আমেরিকা ভূখণ্ডে গোমারাণী চিরিগোয়ানা প্রভৃতি জাতি এবং কালিডোনিয়ার ও কালিফর্ণিয়ার কতকগুলি জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, সমাজনিয়মানুসারে কেবল সর্দারেরাই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে—জনসাধারণের এ অধিকার নাই। প্রাচীন পেরুতে

দিকেই প্রভাবের গতি। এরূপ অবস্থায় সমাজের কতকগুলি লোক যদি বহুবিবাহ করে, তাহার অনিবার্য্য ফল এই যে, সেই সমাজের আর অনেকগুলি লোককে পত্নীলাভে একেবারে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহাদের বিলাসপ্রিয়তা-নিবন্ধন জনসাধারণের স্ত্রীলাভের ব্যাঘাত ঘটে, জনসাধারণ যে তাহাদের এবং তাহাদের অবলম্বিত প্রথার প্রতিকূল হইবে, ইহা স্বাভাবিক। জনসাধারণ যে প্রথার বিরোধী, সে প্রথা যে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইবে, এবং কালে লোপ পাইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। পার্ব্বত্য তোরাক জাতি সাধারণতঃ একনিষ্ঠবিবাহ-পরায়ণ হইলেও, সামাজিকবিধানানুসারে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নহে; অথচ তাহাদের কোন অধিনায়ক একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিলে সমাজমধ্যে তাহার প্রভাব ও প্রভুত্ব একেবারে লোপ পায়। এই কারণে ক্ষমতাশালী সম্পন্ন, ও উচ্চবংশসম্ভূত ব্যক্তিদিগকেও ক্রমে একপত্নীমূলক বিবাহই অবলম্বন করিতে হয়।

কিন্তুদ্ভূত সমাজে যে সকল কারণে পুরুষ বহু স্ত্রী গ্রহণ করে, সমাজ সমধিক উন্নত হইলে, সেই সকল কারণের কতকগুলি তিরোহিত হয়; আর কতকগুলি যদিও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তন্নিবন্ধন বহুবিবাহের আর প্রয়োজন হয় না। সুসভ্য সমাজে বহু স্ত্রী শক্তি বা সম্পত্তির পরিচায়ক নহে, পদমর্য্যাদা বা বলশক্তি-অর্জ্জনের উপায়ীভূতও নহে। আভ্যন্তরিক কলহ বিবাদে বা বহিঃশত্রুর আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য সুসভ্য মানবকে আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্বের উপর নির্ভর করিতে হয় না—সে ভার সমাজ বা রাজশক্তিই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর, স্বপ্রযৌবনের আকর্ষণ, ইন্দ্রিয়লালসা, নূতনপ্রিয়তা প্রভৃতি যে সকল কারণে অসভ্যেরা বহুবিবাহ করে, সুসভ্য সমাজে তজ্জন্য বহুবিবাহের আবশ্যক হয় না—একমাত্র পত্নী গ্রহণ করিয়াও এই সকল অসংযত বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় সুসভ্য সমাজে থাকে। এই সকল কারণে সুসভ্য মানব একনিষ্ঠবিবাহপরায়ণ হয়। জীবনসংগ্রামের কঠোরতাও একটা কারণ।

সকল দিক বিবেচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ একমাত্র স্ত্রী গ্রহণ করে। সভ্যতার পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, সমাজের শক্তিশালী, সম্পত্তিসম্পন্ন ও পদস্থ ব্যক্তিগণ বহুবিবাহ-পরায়ণ হয়—জনসাধারণকে বাধ্য হইয়াই একটিমাত্র স্ত্রী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সভ্যতার উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইলে মানব আবার সেই প্রাথমিক একপত্নীমূলক বিবাহপ্রণালী অবলম্বন করে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

মহারাজ রামকৃষ্ণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজ্যাভিষেক।

রাণী ভবানীর পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি রামকান্তরী তারা ও রাজকার্য্য তাঁহার নিকটাত্মীয় হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবার আশা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ অকালে কালকবলে নিপতিত হওয়ায় সে আশা সহজেই বিনষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর রাণী ভবানী অনন্যোপায় হইয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ নামে বঙ্গদেশে বৈরাগ্যের অবতার বলিয়া পরিচিত।

রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও কিছু দিন পর্য্যন্ত রাণী ভবানীর হস্তেই রাজসাহীর রাজ্যভার ন্যস্ত ছিল; তদুপলক্ষে মাতার সহিত পুত্রের কিয়ৎপরিমাণে মনোমালিন্যেরও সূত্রপাত হইয়াছিল। যুবক রামকৃষ্ণ বয়স্তে রাজ্যকার্য্যে পরিচালন করিবার জন্য নানারূপে প্রবোধিত হইলেও, রাণী ভবানী সহসা রাজ্যভার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন নাজামী অনিষ্টাচরণের পক্ষে যাহা সুযোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; মুসলমানের শাসনক্ষমতা তিরোহিত হইয়া কোম্পানী বাহাদুরের নূতন শাসনকৌশল প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। তৎকালে রাজসাহীর ন্যায় নিতান্ত জনপদের শাসনভার এক জন অপরিণতবয়স্ক বালকের হস্তে সমর্পিত হইলে, বুদ্ধিমতী রাণী ভবানী স্বহস্তে শাসনক্ষমতা রাখিয়া, রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংসের সময় হইতে তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল। পদমর্য্যাদা ও শাসনক্ষমতা উত্তরোত্তর বিলুপ্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া রাণী ভবানী গঙ্গাবাস আশ্রয় করিলেন;—তৎসূত্রে রাজসাহীর রাজমুকুট মহারাজ রামকৃষ্ণের মস্তকগত হইল।

রাজসাহীর রাজবংশাবলীর ইতিহাসলেখক স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন;—"মহারাণী ভবানীর স্বর্গারোহণের পর রামকান্তের দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজসাহীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হন।" কথা বাহুল্য, ইহার একবর্ণও সত্য নহে। তবে মিত্র মহাশয়ের পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লিখিত

* Maharaja Ramkrishna, the adopted son of Ramkanta, succeeded his mother the Maharanee on her death.—*The Rajas of Rajshahye.*

বলিয়া ইংরাজদিগের নিকট এইরূপ অনেক অলীক কাহিনী ইতিহাসমানে পরিচিত হইয়াছে।

সেকালের লোকের নিকট রামকৃষ্ণ "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ বাহাদুর" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাদশাহ শাহ আলমের সনন্দবলে ক্লিনি এই গৌরবান্বিত সুদীর্ঘ শব্দগর্ভ রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীপতি মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ বাহাদুরের রাজ্যাভিনয়সময়েই নাটোর রাজবংশের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়।

যে রাজ্যনাশকাহিনী বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের ইংরাজ লেখকগণ তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মহারাজ রামকৃষ্ণের বিষয়-বৈরাগ্যকেই একমাত্র কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাদের লিখিত কাহিনী কণ্ঠস্থ করিয়া কৃতবিদ্য স্বদেশবাসিগণও তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। নাটোর রাজদপ্তরে এবং কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডে এখনও যে সকল কাগজপত্র পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করা যায় না।

রামকৃষ্ণের ইতিহাস প্রাচীন জমিদারবংশের ধ্বংসকাহিনীর কুরুক্ষেত্রক্রন্দনে পরিপূর্ণ। মোগলগৌরবরবি মহাত্মা আকবরশাহের শাসনসময়ে বাঙ্গালী জমিদারদলের যেরূপ পদমর্য্যাদা ও শাসনক্ষমতা বর্ত্তমান ছিল, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজেরা যখন দেওয়ানী সনন্দ লাভ করেন, তখন জমিদারদল পদগৌরবে ও শাসনক্ষমতায় সর্ব্বত্র গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। * মহারাজ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক জমিদারদিগের সময়ে সেই পদগৌরব ধূলিপটলের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। সেকালের জমিদারগণ কি কৌশলে একালের উপাধিব্যাধিপীড়িত ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইয়াছিলেন, মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী কিয়ৎপরিমাণে তাহার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে সক্ষম।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনসময়েই বাঙ্গালী জমিদারদিগের শাসনক্ষমতা তিরোহিত হইতে আরম্ভ হয়। মোগলরাজ্যে জমিদারগণ কেবলমাত্র করসংগ্রহের

* The Zamindars of Bengal were opulent & numerous in the reign of Akber, and they existed when Jafar Khan was appointed to the administration under him and his successors their respective territorial Jurisdiction appeared to have been augmented, and when the English acquired the Diwani, the principal Zamindars exhibited the appearance of opulence and dignity.—*The Fifth Report.*

যন্ত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন না; দেশের প্রকৃত শাসনভার তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তজ্জন্য মোগল রাজসরকারে তাঁহাদের পদগৌরব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে করসংগ্রহের যন্ত্রমাত্রই মনে করিয়াছিলেন; এবং এক যন্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য যন্ত্র সংস্থাপিত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাতে অনেক প্রাচীন জমিদারবংশের ভূসম্পত্তি আধুনিক ধনশালী বিষয়বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণের করতলগত হইয়াছিল; কোন কোন স্থলে রাজ্যরক্ষার্থ পুরাতন জমিদার হেষ্টিংসের কথামত অধিক রাজকর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, ক্রমক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

রাণী ভবানী রাজ্যচ্যুতির গতিরোধ করিবার আশায় হেষ্টিংসের প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। কোম্পানী বাহাদুরের ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ করিতে গিয়া রাজকোষ শূন্য হইল, কিন্তু হেষ্টিংসের প্রবর্ত্তিত রাজস্বনীতি উত্তরোত্তর অধিকতর রাজকর প্রত্যাশা করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া লাভের লোভে অনেক লোকে রাজস্বহীন রাজ্য ইজারা লইবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতে লাগিল, এবং অবশেষে কোন কোন স্থলে তাহাদের প্রস্তাব হেষ্টিংসের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল।

ইহার জন্য রাজসাহী রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজাবিদ্রোহের সূত্রপাত হইল। কোম্পানী বাহাদুরের বীরবাহু তখন ফৌজ পাঠাইয়া বিদ্রোহদমনের চেষ্টা করিতে গিয়া গ্রামে গ্রামে হাহাকার উঠাইতে লাগিল; নন্দলাল রায় নামক এক ব্যক্তি পরগণা আমরুল ইজারা লইয়াছিল, তাহার প্রার্থনাক্রমে লাটোরে লেপ্টেনাণ্ট কিনলকের অধীনে কোম্পানীর ফৌজ প্রেরিত হইল।*

জমিদারগণ নানা অজুহাতে খাজনা আদায় করিতেন; তাহা ক্রমশঃ রহিত হইয়া তাঁহাদের আয়ের পথ সংকীর্ণ হইতে লাগিল। ১১৮৯ সালের বৈশাখ হইতে নূতন "ফৌজদারী রেগুলেশন" প্রবর্ত্তিত হইয়া জমিদারদলের শাসন-ক্ষমতার মূলেও কুঠারাঘাত করিল।†

---

* Letter to Lieutenant Kinloch, commanding in Nattore, respecting disturbances of the rayats in Pargana Amrul.—

Bengal Mss Records. Vol. I. 87.

† Circular letter to Collectors, informing them that the Fouzdaree Regulation is to take effect from the 1st Baisak 1189.—

Bengal Mss Records. Vol. I. 44.

এই সময়ে রাজসাহী প্রদেশে কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষে ইভলিন সাহেব রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার সহিত রাণী ভবানীর কলহের সূত্রপাত হইল। নূতন ইজারদারদিগের সহিত প্রজাবর্গের অকৌশল উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তিনি রাণীকেই তাহার জন্য অপরাধিনী করিলেন, এবং নূতন শাসন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য পাটনা পাঠাইতে লিখিলেন।* রাজসাহী রাজ্যে পাটনের শাসন শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হইল। ইহার ফল প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল না। ইভলিন্ সাহেব বুঝিলেন যে, প্রজাপীড়নমাত্রই সার হইল, রাজকর সংগৃহীত হইল না, কোম্পানী বাহাদুরের লাভ হইল না; ইজারদারের নিকট অনেক টাকা বাকী পড়িতে লাগিল।†

ইভলিন্ সাহেব যে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিলেন, তাহার ফলে রাজসাহীতে কোম্পানীর খাস শাসন ও করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল।‡

রাজসাহী রাজ্যে কোম্পানীর খাস তহশিল প্রবর্ত্তিত হইবার সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে অনেক অর্থলোলুপ লোকে ইজারা লইবার জন্য লালায়িত হইল। তন্মধ্যে বলরাম শর্ম্মা, জয়নারায়ণ দাস, কমলাকান্ত দাস, রুদ্রনারায়ণ শর্ম্মা এবং রামকান্ত শর্ম্মা নামক পাঁচ ব্যক্তি একত্র রাজসাহী ইজারা লইবার প্রার্থনা করায়, তাহাদের প্রার্থনাই গ্রাহ্য হইল। ইহারা আশানুরূপ অর্থশোষণ করিতে পারিল না; অনাবৃষ্টিবশতঃ প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইল না; লোকে অবশ্যদেয় রাজকর প্রদান করিতেও ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল। ইজারদারগণ হাহাকার করিতে লাগিল। কোম্পানী বাহাদুর তাহাদের করুণক্রন্দনে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, অনাবৃষ্টি জন্য কোনরূপ অনুগ্রহপ্রদর্শনের ব্যবস্থাও করিলেন না।

---

* Letter to Governor General enclosing extract of a letter from Mr. Evelyn when at Rajshahye, respecting the obstructions thrown in the way of the collections by the Zamindar and her officers, and representing the necessity of having a military force, under the command of a European officer, stationed in that province.—*June 18, 1783.*

† Letter from Mr. Evelyn, reporting the existence of heavy balances in Rajshahye, although the cultivators complain of undue exactions, and proposing to make an enquiry into the collections realised by the Amin.—*March 3, 1783. Approved.*

‡ Letter to Mr. John Evelyn directing him to conclude a kha's settlement for Rajshahye for 1190.—*April 14, 1783.*

অনাবৃষ্টির পর শস্যনাশ এবং শস্যনাশের পর অনটন সমুপস্থিত হইল। তখন রাজসাহীর কালেক্টারও নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি লিখিলেন যে, এ সময়ে রাজকরসংগ্রহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, প্রজার উপর উৎপীড়ন করায় প্রশ্রয় দিতে হইবে।*

রাণী ভবানী এই সকল দুঃখকষ্টের মধ্যে স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুজারকার জন্য স্বয়ং ইজারাগ্রহণার্থ আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। ১১৯১ সালের জন্য ২৪ লক্ষ ও তৎপর বৎসরে ২৫,০০০ অতিরিক্ত জমা স্বীকার করিয়া, রাণী ভবানী চারি বৎসরের ইজারা লইতে চাহিলেন।†

রাণী ভবানী প্রথার কাতর ক্রন্দনে অধীর হইয়া যেরূপ অগ্নিমূল্যে স্বরাজ্যের ইজারা সনন্দ গ্রহণ করিলেন, তাহা কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষে মঙ্গলাবহ হইলেও, রাণীর পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইল না। এই বন্দোবস্তে কোম্পানীর ২৩৭৬০৲ বার্ষিক অতিরিক্ত লাভ হইল বটে, কিন্তু প্রজার নিকট এত টাকা আদায় করিবার উপায় রহিল না!‡

একে অনাবৃষ্টি, তাহাতে পদচ্যুত ইজারদারগণ ও কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রাণী ভবানীর কার্য্যে পদে পদে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। তাঁহারা জানিত, রাণী অকৃতকার্য্য হইয়া ইজারা ত্যাগ করিলে, তাহারাই স্বনামী বেনামী ইজারদার হইয়া লভ্যাংশ করিতে সক্ষম হইবে। রাণী ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলেন।‡

রাণী ভবানীর শাসনকৌশল বিফল হইল। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও রাজকর পরিশোধ করিতে পারিলেন না। তখন কোম্পানী বাহাদুর তর্জ্জন

---

* Letter from Collector of Rajshahye stating that the crop has seriously failed, and recommending the suspension of the ensuing Kist to prevent the former from oppressing the rayats.—*March 22, 1784.*

† Petition from vakil of Rajshahye, enclosing a proposal from the Rani to form her District for four years, paying 24 lakhs of rupees for the Bengal year 1191, and an annual progressive increase of Rs. 25000 for the three succeeding years.—*April 25, 1784.*

‡ Letter to Governor General and Council, stating that the proposed new settlement of Rajshahye will afford an advantage to Government of Rs 237600.

‡ Petition from Rani Bhabani stating the opposition & interruption she experiences from the officers of the Diwani and the Fouzdari Adawlat.—*August 28, 1784.*

গর্জ্জন করিতে ত্রুটি করিলেন না। রাজসাহীর কালেক্টার লিখিলেন যে, রাণীর পক্ষে রাজকর পরিশোধ করা অসম্ভব। *

অতঃপর রাণী ভবানী নানারূপ কাকুতি মিনতি করিয়াও মকদ্দমা করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। রাজসাহীর রাজ্যনাশের পূর্ব্বসূচনা উপলব্ধি করিয়া, তিনি রাজভার পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ দশ সহস্র মুদ্রা "পেশকশ" প্রদান করিয়া রাজ্যসংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। †

মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজসাহীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু রাজসাহীর জমিদারের সম্পূর্ণ ধনবল, পদগৌরব ও শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন না! মন্বন্তরের সময়ে রাণী ভবানী অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্নজল বিতরণ করিয়া ব্রাহ্মণোদ্ধের পূর্ব্বসঞ্চিত অপার ধনরাশি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; রাজসাহী রাজ্যে ইজারাদার নিযুক্ত হইয়া পৈতৃক পদগৌরব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া জমিদারের শাসনক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছিল। সুতরাং রামকৃষ্ণের রাজোপাধি যতই সুদীর্ঘ হউক, তাঁহার রাজ্যাভিষেকসময়ে তাঁহার ধনবল, পদগৌরব ও শাসনক্ষমতা তদনুরূপ সৌভাগ্যবর্দ্ধন করিতে পারিল না!

বিজ্ঞানেশ্বর ভট্ট।

বিজ্ঞানেশ্বর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম-ভারতে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ ভট্ট। তিনি 'পরমহংস' ও 'পরিব্রাজক' বলিয়া স্বরচিত 'মিতাক্ষরা'র শেষে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। § মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মিতাক্ষরার অনুগ্রহণ করেন। তিনি তিন অধ্যায়ে যে স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, 'মিতাক্ষরা'

* Letter from the Collector of Rajshahye, stating his opinion that it is impossible for the Rani to comply with the requisition of the Committee.

† Letter from the Governor General in Council directing Raja Ramkrishna to be invested with the Zamindari of Rajshahye and a demand upon him for Sikka Rupees 10,000 as a fee of investiture (Peshkash).—*Aug. 20, 1788.*

§ "শ্রীপদ্মনাভভট্টোপাধ্যায়ান্তেবাসি-শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজক-বিজ্ঞানেশ্বরভট্টাচার্য্য-কৃতৌ যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধে মিতাক্ষরায়াং সমাপ্তঃ।"

তাহারই ভাষ্যরূপে লিখিত হয়। ৩৯৯ লক্ষ্মণাব্দের (১৪০৬ খৃঃ) লিখিত মিতাক্ষরার এক প্রতিলিপি (V. 302) পাওয়া গিয়াছে। যতী বিজ্ঞানেশ্বর ভারদ্বাজ-গোত্রে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি বিশ্বরূপের শিষ্য। বিশ্বরূপ আচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির যে টীকা ও বিস্তীর্ণ ভাষ্য রচনা করেন, বিজ্ঞানেশ্বর তাহাই সংক্ষিপ্ত করিয়া সরল ও সুবোধ্য ভাষায় 'মিতাক্ষরায়' লিপিবদ্ধ করেন। ডাক্তার ওপার্ট কোচিনের মহারাজার পুস্তকাগারে বিশ্বরূপের রচিত এক খণ্ড ভাষ্য দর্শন করেন।* বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মিতাক্ষরার দায়বিভাগতত্ত্ব পরিগৃহীত হইয়াছে। সমুদয় ভারতবর্ষ একমতাবলম্বী হইয়া মিতাক্ষরার দায়বিভাগ গ্রহণ করিয়া, বিজ্ঞানেশ্বরের প্রাধান্য ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ডাক্তার জলির মতে 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি' খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থ। ইহার প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায় গরুড়পুরাণে অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় 'অগ্নিপুরাণের' একাংশে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বরূপ আচার্য্য বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকার। বিজ্ঞানেশ্বরের পর শিলাহারবংশীয় রাজা অপরার্কাদিত্য (অপরাজ) দেব ও দেববোধ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরার' ন্যায় কোনও ভাষ্য সমাদৃত হয় নাই। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে 'মিতাক্ষরা' কলিকাতায় প্রথমতঃ মুদ্রিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বোম্বে নগরে মিতাক্ষরার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞানেশ্বর স্বপ্রণীত 'মিতাক্ষরা'য় অপরার্ক, মেধাতিথি ভট্ট, বিশ্বেশ্বর, মৈথিল শ্রীকার, বিশ্বরূপ ও ধারেশ্বর ভোজরাজদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি আপস্তম্বসূত্র মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ডাক্তার জলির মতে, আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্র পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী এই ধর্ম্মসূত্র-রচনার অধস্তনকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌতমের ধর্ম্মসূত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গৌতমের পর বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্র প্রণীত হয়। বৌধায়নসূত্রের পর আপস্তম্বসূত্র দক্ষিণাপথে রচিত হয়।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর মতে বিজ্ঞানেশ্বরের উল্লিখিত শ্রীকার মিথিলায় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আরম্ভে প্রাদুর্ভূত হন। এই মৈথিল শ্রীকার মেধাতিথির পরবর্ত্তী। বিশ্বরূপ, বিজ্ঞানেশ্বর ও ধারেশ্বর ভোজদেব, শ্রীকারের পরবর্ত্তী

* Dr. Oppert's "Catalogue of Sanskrit Mss." no. 3010.

স্মৃতিগ্রন্থপ্রণেতা। ব্যবস্থা ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের নবদ্বীপ হইতে মিথিলা অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করে। যাজ্ঞবল্ক্যের পরবর্ত্তী ও শ্রীহারের পূর্ব্ববর্ত্তী মৈথিল স্মার্ত্তদিগের নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। মিথিলা স্মৃতি শাস্ত্রের আদিম অনুশীলনস্থল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মেধাতিথির দ্বারা দ্রাবিড়ে স্মৃতি-চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া, মহারাষ্ট্র ও বারাণসীতে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশীলন প্রবর্ত্তিত করেন। জীমূতবাহন দ্বারা বঙ্গদেশে স্মৃতির চর্চ্চা আরব্ধ হয়। জীমূতবাহন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শূলপাণি ও কুল্লুক ভট্টের পূর্ব্বতন গ্রন্থকার। জীমূতবাহন স্বরচিত 'দায়ভাগে' ভোজরাজ দেব ও গোবিন্দরাজের প্রণীত 'মনুভাষ্য' উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভোজদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ধারা নগরে রাজত্ব করিতেন। গোবিন্দরাজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 'মনুভাষ্যে'র রচনা করেন।

'মিতাক্ষরা'র ভাষ্য 'সুবোধিনী' খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্বেশ্বর ভট্টের দ্বারা রচিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে নন্দপণ্ডিত দ্বারা মিতাক্ষরার টীকা রচিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বালকৃষ্ণ (বালম) ভট্ট ও তাঁহার মাতা লক্ষ্মীদেবী নন্দপণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ পূর্ব্বক 'মিতাক্ষরা'র তৃতীয় টীকার রচনা করেন। বারাণসীতে লক্ষ্মীদেবীর মিতাক্ষরা-ভাষ্য বিশেষ-ভাবে আদৃত হইয়াছে।

বিজ্ঞানেশ্বর ভট্ট কল্যাণ নগরের চালুক্যবংশীয় মহারাজ ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্যের সভায় বর্ত্তমান থাকিয়া, 'মিতাক্ষরা'র রচনা করেন। নিজামরাজ্যের রাজধানীর হাইদরাবাদের শত মাইল উত্তর-পশ্চিমে কল্যাণ নগর অবস্থিত ছিল। কাশ্মীরী পণ্ডিত বিহ্লণ দেব এই প্রবল পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের জীবনী 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' নামক পঞ্চদশ ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। ১০৭৬ হইতে ১১২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেন। স্বরচিত 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থের শেষভাগে তিনটি শ্লোকে বিজ্ঞানেশ্বর আপনার আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য (বিক্রমার্ক) নৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ৮৯৫ শকাব্দে (৯৭৩ খৃষ্টাব্দে) রাষ্ট্রকূটবংশীয় শেষ নরপতি কক্কলকে (কর্ক দ্বিতীয়=অমোঘবর্ষ চতুর্থ) পরাজিত করিয়া, মহারাজ তৈলপ চালুক্যবংশের আধিপত্য দক্ষিণাপথে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্য এই তৈলপরাজের অধস্তন চতুর্থতন বংশধর। তিনি চালুক্যবংশের সর্ব্বপ্রধান

অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার প্রথম গীতিকাব্যে নর্ম্মদর্শিনী ভাষায় এই মানবের পশুত্ব, দেবত্ব বিবৃত করিয়াছেন।—

"হের, এ প্রণবে, নতি,
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড-প্রতি;
দূর বিষ্ণুলোক হ'তে
আশীর্ব্বাদ আসে স্রোতে,
মম ঋত স্তব-পুষ্প করে শিরোপর।
ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর।
কিছু তুচ্ছ নাহি তার,
সে যে দেব-সমবতার—
কল্পনার কুতূহলী,
দর্শনে বিজ্ঞানে বলী,
অদৃষ্টের নিয়ামক, সৃষ্টি-সংস্কারী,
বিশ্ব-প্রভু, গদা-পদ্মধারী।"

ইহা মনুষ্যের দেবভাবের পরিচায়ক। তাহার পশুভাবের পরিচয় এইরূপ—

"সেই উন্মাদনা-স্রোত
আজো প্রাণে ওতপ্রোত;
আজো তৃপ্তি অবসরে
সে অতৃপ্তি হাহা করে;
সেই চিত্তে অপ্রসাদ, দীনদিনে ধিক্কার;
সর্ব্বনাশী স্বার্থ-দুরাচার।
আজো সেই পশু-মর্ত্যে
ভ্রমি লক্ষ্যহীন কর্ম্মে;
আত্ম-স্থাপনার ছলে
বিশ্ব দিই রসাতলে;
কামে ক্রোধে লোভে মূঢ় সৃষ্টি শতচূর্ণ;
হাহা, নর সামান্য অসুর।"

এই দেবত্ব ও পশুত্বের রাসায়নিক সংযোগে মনুষ্য। এ সংযোগে দেবভাব ও পশুভাব মিলিয়া মিশিয়া এক অভিনব অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই পদার্থ মানুষ।

মানব-তত্ত্ববিৎ সেক্সপীয়র হ্যামলেটের মুখে মনুষ্যের দেবভাব এইরূপে প্রকটিত করিয়াছেন—

"What a piece of work is a man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals!"

"মানব কি অদ্ভুত রচনা! বিবেকে কি মহান্! শক্তিতে কি অসীম! আচারে ও চেষ্টায় কি বিস্ময়কর! কার্য্যকুশলতায় দেবতুল্য! বুদ্ধিবৃত্তিতে ঈশ্বরতুল্য! মানব জগতের সুষমা, জীবসৃষ্টির গৌরব!"

সেই হ্যামলেটের মুখেই আমরা অন্যত্র শুনিতে পাই—

"Get thee to a nunnery: why wouldst thou be a breeder of sinners? I am myself indifferent honest; but yet I could accuse me of such things, that it were better my mother had not borne me. * * * What should such fellows as I do crawling between earth and heaven. We are arrant knaves, all; believe none of us."

হ্যামলেট ভূতপূর্ব্ব প্রণয়িনী ওফিলিয়াকে বলিতেছেন—

"যোগিনী হইয়া জীবন যাপন কর। কেন পাপিষ্ঠের জননী হইবে বল? দেখ, আমি যে খুব মন্দ লোক, তাহা নহি। তবু আপনাকে আপনি এত বিষয়ে অপরাধী জানি, তাহাতে মনে হয় যে, আমার মাতা আমাকে ভূমে ধারণ না করিলেই ভাল ছিল। আমার মত পাপিষ্ঠেরা ধরাধামে বিচরণ করিলে কি ফল বল? আমরা সকলেই ঘোরতর পাষণ্ড। আমাদের কাহাকেও প্রত্যয় করিও না।"

ইহা মানুষের পশুভাবের পরিচয়। আর সেক্সপীয়র প্রথমোক্ত শিরদের মুখে অথবা মিষ্যাণ্ডনগাস্ত টাইমনের রসনা হইতে যে অভিশাপ-বহ্নির প্রচণ্ড গৈরিক স্রাব উচ্ছ্বসিত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, মানবের পশুক কতটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।—

All the stored vengeances of heaven fall
On her ingrateful top! Strike her young bones,
You taking airs, with lameness!
You nimble lightnings, dart your blinding flames
Into her scornful eyes! Infect her beauty,
You fen-suck'd fogs, drawn by the powerful sun,
To fall and blast her pride!

Lear Act II, Sc IV.

ঈশ্বরের চিরসঞ্চিত প্রতিহিংসা তাহার কৃতঘ্ন দেহে বর্ষিত হউক। জগদ্বন্ধু-বাবু তাহার নবীন দেহে পঙ্কুতার সঞ্চার করুক! উত্তপ্তানী বিচারাগ্নি তাহার ঘৃণাবাহক নেত্রে অন্ধতা আনয়ন করুক। প্রখরকিরণপাতে পঙ্কুপদে তাহার ঔদ্ধত্য বিলুপ্ত হইয়া যাউক! যেন তাহার গর্ব্ব চিরদিনের জন্য খর্ব্ব হয়!

Piety, and fear,
Religion to the gods, peace, justice, truth,
Decline to your confounding contraries,
And let confusion live! Plagues, incident to men,
Your potent and infectious fevers heap
On Athens, ripe for stroke!

Lust and liberty—
Creep in to the minds and marrows of our youth,
That 'gainst the stream of virtue they may strive,
And drown themselves in riot! Itches, blains,
Sow all the Athenian bosoms; and their crop
Be general leprosy! Breath infect breath,
That their society, as their friendship, may
Be merely poison.

Timon of Athens. Act IV. Sc I.

'ভক্তি ভয় ধর্ম্ম শান্তি ন্যায় সত্য—সকলই যেন (এথেন্স্ নগরীতে) স্ব স্ব ধ্বংসকারী বৈপরীত্যে পর্য্যবসিত হইয়া গণ্ডগোলের একাধিপত্য আনয়ন করে। যেন মহামারী প্রবল সংক্রামক জ্বরে ধ্বংসপ্রবণ এথেন্স্ নগরীকে বিপর্য্যস্ত করে। যুবক যুবতীর মজ্জায় ও মনে যেন কাম ও যথেচ্ছাচার প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মহীন উচ্ছৃঙ্খলতার বিষম আবর্ত্তে নিমজ্জিত করে। যেন এথেন্সবাসীদিগের দেহ সর্ব্বব্যাপক কুষ্ঠরোগে নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। আর যেন প্রত্যেকের নিশ্বাস দোষযুক্ত হইয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে নিরন্তর বিষ বমন করিতে থাকে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'নবজীবনে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'অন্তর্যামী মানব' এই নামক একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে মানুষের প্রভুভাব বা পশুত্ব শক্তি দেবতার সহিত প্রতিপাদিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে মনুষ্য জন্তু নানাবিধ। পশু পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি নানারূপ মনুষ্য জন্তু আছে। অক্ষয় বাবু তিনটিমাত্র উদাহরণ দিয়া বিভিন্ন পাঠক পাঠিকাকে জু-বাগানে গিয়া ইতরের সহিত আমাদের বিরাইসী ফোড় মিটাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সৌখীন ব্যক্তিরা শুকপক্ষিধর্ম্মী; ভোষা-

মোহকারীরা বিড়ালধর্ম্মী, এবং খলস্বভাব মনুষ্যেরা সর্পধর্ম্মী। ইহা ছাড়া তাঁহার মতে ব্লাক পেচক কুক্কুট প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষিধর্ম্মী মানব আছে। ছাগ মেষ শূন শূকর শার্দ্দূল প্রভৃতি পশুজাতীয় মানবেরও অভাব নাই। এবং গোধা গিরগিটে ইন্দুর ছুছুন্দরী প্রভৃতি নানারূপ সরীসৃপধর্ম্মী মানবও খুঁজিলেই পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অক্ষয় বাবুর চিত্রটি পূর্ণাবয়ব করিবার জন্য দেবধর্ম্মী মানব নামে আর একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে মনুষ্যের দেবভাব বা দেবত্ব অতীব সহৃদয়তার সহিত প্রকটিত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথ বাবু দেখাইয়াছিলেন যে, জন্তুধর্ম্মী মানবের ন্যায় দেবধর্ম্মী মানবও নানা শ্রেণীর ও নানা প্রকৃতির। জন্তুপ্রকৃতিও যেমন বহুবিধ, দেবপ্রকৃতিও তেমনি বহুবিধ। উদাহরণস্বরূপ তিনি অন্নপূর্ণাধর্ম্মী, দিক্‌পালধর্ম্মী ও নারায়ণধর্ম্মী মনুষ্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই বর্ণনাগুলি পড়িলে সাধারণ মনুষ্যের মধ্যেও কতটা দেবভাব প্রচ্ছন্ন আছে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

এই তত্ত্বটি বিবৃত করিবার জন্য প্রাচীনেরা একটি গল্প বলিয়া থাকেন। গল্পটি গল্প হইলেও বড় শিক্ষাপ্রদ। এক দীন দুঃখী ব্রাহ্মণ উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া জঠরজ্বালার অসহ্যতাড়নায় সারাদিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু কোথাও কিছু মিলিল না দেখিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল, এবং মনোবেদনায় অধীর হইয়া সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাপুরুষকে অনেক গালি পাড়িতে লাগিল। বিধাতাপুরুষ আত্মদোষস্খালনে উৎসুক হইয়া, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন, এবং কথায় কথায় ব্রাহ্মণের ভিক্ষাটনের কথা উঠিলে বলিলেন, 'বাপু! বৃথা কেন ক্ষোভ কর। মানুষেই ত ভিক্ষা দেয়। তুমি ত মনুষ্যের কাছে ভিক্ষার জন্য যাও নাই। তোমার ভিক্ষা মিলিবে কেন?' ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'সে কি ঠাকুর! মানুষের কাছে যাই নাই ত কি পশুর কাছে গিয়াছিলাম না কি?' বিধাতাপুরুষ বলিলেন 'তা বটে কি!' বলিয়া একখানি চসমা ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'এই চসমা চক্ষে দিয়া চাহিয়া দেখ দিকি?' ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিল, বাস্তবিকই মানবদেহধারিমাত্রই মনুষ্য নহে। দেখিল যে, চর্ম্মচক্ষে যাহাদের মানুষ দেখিয়াছিল, তাহারা এক একটি জন্তুই বটে! কেহ ব্যাঘ্র, কেহ ভল্লুক, কেহ সর্প, কেহ মূষিক, কেহ শুক,

কেহ বাজপাখী, ইত্যাদি। কদাচিৎ দুই এক জন প্রকৃত মনুষ্য আছে। তখন তাহার চিত্তক্ষোভ দূর হইল। সে বিধাতাপুরুষের গুণবাদ করিতে লাগিল। অক্ষয় বাবুর উপরি-উক্ত প্রবন্ধের মত এই পয়ারটিতেও মতের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধৃত হইয়াছে। মানুষ কেবল পশু নহে; মানুষ দেবতার মটে। মানুষ পশুত্ব দেবত্বের রাসায়নিক সংযোগ। মানুষ রহস্যময় অজ্ঞাতকুলশীল পদার্থ। ইহাই মনুষ্যের স্বরূপ। মানব দেবত্ব ও পশুত্বের অদ্ভুত সমন্বয়। আর মানবতা—সেই অদ্ভুত মানবের বিশাল সমগ্রতা; মানব-প্রকৃতি সপ্তস্বরের প্রকাণ্ড সমষ্টি। কবিত্বসম্পন্ন গ্রামদেটও মানুষ, ইংকালপন্থ উদরসর্ব্বস্ব ক্লডও মানুষ। অকাল্পনিকী ইয়াগোও মানুষ, আর-বৃদ্ধ লিয়রের প্রভুভক্ত সেবক কেন্টও মানুষ। দানবী রিগনও মানুষ, অসুরী দেবী ডেসডিমোনাও মানুষ। বিলাসিনী ক্লিওপেট্রাও মানুষ, আর পতিদেবতা ইমোজেনও মানুষ। উচ্চতম দেবভাব ও নীচতম পশুভাব, এই উভয়ের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধান! কি ব্যাপক ব্যবচ্ছেদ! কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? কে তাহা যাচাই আরম্ভ করিতে পারে? কে ফলাফল আরম্ভ করিতে পারে? যদি কেহ কখন পারিয়া থাকে, তবে সে সেক্‌সপীয়র। তিনি পারিয়াছেন, কারণ তিনি অসামান্য; তাঁহার কল্পনাশক্তি অমানুষী ছিল। সেই জন্য তিনি মানবতার কবি। মানবতার বিরাট চিত্র তাঁহারই কল্পনা-দর্পণে যথাযথ প্রতিভাত হইয়াছিল।

এ কথার অর্থ কি, আমরা বারান্তরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মঙ্গল গ্রহের জীব।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্পকাল মধ্যে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। দূরবীক্ষণ দ্বারা মঙ্গল গ্রহটি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহার স্থানে স্থানে এরূপ কাল কলঙ্কচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং মেরুদ্বয়ের প্রান্তদেশে উজ্জ্বল শ্বেত আলোক দৃষ্টিগোচর হয়। বৃহৎ দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে আরও অনেক ব্যাপার সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষ অভিনিবেশসহকারে পরীক্ষা করিলে, বহুসংখ্যক সরল রেখা দ্বারা মঙ্গল-গ্রহটি

নানা আকারের ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মঙ্গলের এই অদ্ভুত প্রাকৃতিকদৃশ্য ও আকারাদি বিষয়ে অনেক জ্যোতির্বিদ্ অনেক কথা বলিতেছেন;—মঙ্গলের আধুনিক অবস্থা ও জীববাসোপযোগিতা সম্বন্ধে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের নানা অনুমান, ইতিমধ্যেই প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে জীববাসোপযোগী অনেক পদার্থ মঙ্গল গ্রহে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন;—পূর্ব্বে যে মঙ্গলগোলকস্থ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন গুলির কথা বলা হইয়াছে,—ইহাঁদের মতে,—তাহা নীলবর্ণ জলরাশি ও মেরুদেশস্থ সুবিস্তৃত তুষারস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। গ্রহগোলকব্যাপ্ত উল্লিখিত সরল রেখাগুলির উৎপত্তিতত্ত্বও কয়েক জন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন। ইহারা বলেন,—উক্ত সরল রেখাগুলি প্রাকৃতিক কারণে কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না; সুবিস্তৃত সরলরেখাযোগে এই প্রকার নানাবিধ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের অঙ্কন, প্রকৃতির কোন কার্য্যেই কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এগুলি নিশ্চয়ই কোনও বিশেষবুদ্ধিসম্পন্ন মঙ্গলবাসী জীবের কীর্ত্তি। মঙ্গলে পৃথিবীর ন্যায় ঝড় বৃষ্টি ও মেঘাদির আধিক্য নাই; সেই জন্য তথায় শস্যাদি উৎপাদনের ও জীবহিতির নিমিত্ত কৃত্রিম নদী ও খাল ইত্যাদির বিশেষ আবশ্যক; ইহাঁদের মতে, মঙ্গলপৃষ্ঠব্যাপ্ত রেখাগুলি, মঙ্গলবাসিগণের নির্ম্মিত সুবিস্তৃত কৃত্রিম নদী ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

জীবের অস্তিত্বজ্ঞাপক এই প্রকার বিবিধ চিহ্নের আবিষ্কার করিয়া, মঙ্গল গ্রহ উৎকৃষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের বাসস্থান বলিয়া প্রায় সকলেই অনুমান করিতেছেন। মঙ্গলের তাপপরিমাণ প্রায় পৃথিবীর তাপের অনুরূপ; ইহার মেরুদ্বয়ে যে তুষাররাশি সঞ্চিত থাকে, এই তাপতাপে তাহা জলীভূত হইয়া, পরে উক্ত কৃত্রিম নদী ও সমুদ্রাদি দ্বারা সমগ্র গ্রহপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। মাঙ্গলিক আকাশে বায়ু ইত্যাদিরও অস্তিত্ব আছে, স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা পার্থিব বায়ুর ন্যায় ঘন নয়, কাযেই তদ্দ্বারা আকাশের বা ঋতুর কোন বৈচিত্র্যই সাধিত হয় না। মঙ্গলে একঘেয়ে চিরবসন্ত সর্ব্বদাই বিদ্যমান। ঘনত্ব হিসাবে পদার্থের ন্যায় মঙ্গলে বড় ভ্রম;—গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক লক্ষ মণ-ভার-বিশিষ্ট কোনও পার্থিব পদার্থ মঙ্গলে লইয়া গেলে, তাহার ভার তথায় কেবল ৩৭৬ মণ মাত্র হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, মঙ্গলের আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও ঘনত্বের অল্পতাই এই ভারবৈষম্যের কারণ। কেবল কৃত্রিম খাল প্রভৃতি দেখিয়া মাঙ্গলিক জীবের

অধিবাসী প্রথমতঃ অনেকে গ্রাহ্য করেন নাই। এখন মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা সকলও জীবস্থিতির সম্পূর্ণ অনুকূল দেখিয়া, মঙ্গল গ্রহে জীবাবাসের সম্ভাব্যতা অধুনা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

জ্যোতির্বিদ্‌গণ এই প্রকারে মাঙ্গলিক জীবের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাহাদের আকার, বুদ্ধি ও পৌরুষাদি সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য কয়েক জন পণ্ডিত যত্নে রহিয়াছেন। মঙ্গলবাসিগণ যে মনুষ্য অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী জীব, তাহা মঙ্গলপৃষ্ঠস্থ বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম নদী ও খাল ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের আকৃতি ও পৌরুষাদি সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। পণ্ডিতগণের এই উদ্ভট প্রয়াস কত দূর সাফল্য লাভ করিবে, পাঠক-পাঠিকাগণ বিবেচনা করুন।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নানা ভ্রান্তি ব্যতিরেকে, বহু গবেষণা ও গণনায় যাহার আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, আজ কাল ঔপন্যাসিকগণ কেবল কল্পনার সাহায্যে তৎসম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রচার করিতেছেন। এই বৈজ্ঞানিক ঔপন্যাসিকগণ, প্রায়ই প্রাকৃতিক শক্তি ও তাহার কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, উক্ত শক্তিজাত অলৌকিক ও অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যপরম্পরার কল্পনা করিয়া প্রকৃতির অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি 'বর্ডারল্যাণ্ড' নামক একখানি ইংরাজি সাময়িকপত্রে, মঙ্গলবাসিগণের একটি কল্পিত ইতিহাস প্রকটিত হইয়াছে।

'বর্ডারল্যাণ্ডে'র ঔপন্যাসিক লেখক বলেন,—মঙ্গলবাসিগণ বৃহৎমস্তিষ্কশালী জীব; ইহাদের মস্তিষ্কের পরিধি কিছুতেই চারি ফিটের কম নয়; এই প্রকার মস্তিষ্ক ব্যতীত সমগ্র মঙ্গলপৃষ্ঠে সুদৃঢ়ভাবের ন্যায় দীর্ঘ কোটি কোটি লাঙ্গুল কল্পনা কিছুতেই সুসাধ্য হইত না। ইহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত, এবং শ্বাসকার্য্যটি বৃহৎ চক্ষুযুগলের নিম্নস্থ দুইটি অনতিদীর্ঘ চঞ্চু দ্বারা সম্পন্ন হয়। পার্থিব প্রাণীদিগের ন্যায় ইহাদের উদর নাই, এবং পাকক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। কাযেই ভোজন ব্যাপারটার সহিত মঙ্গলবাসিগণ সম্পূর্ণ অপরিচিত,—আহারের কার্য্যটা নিকৃষ্ট জীবধর্ম্মজাত শোণিত দ্বারা ধমনীতে অবিষ্ট করাইয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষভেদ নাই। এজন্য মঙ্গল পোষ্টাফিসের,—সন্তানবিতরণ কার্য্য উদ্ভিদাদির ন্যায় সম্পন্ন হয়। লেখক বলেন,—মাঙ্গলিক জীবের পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বগুলি কেবল

উপন্যাস-সুলভ কল্পনাবিজৃম্ভিত নয়,—অভিব্যক্তিসম্বন্ধীয় প্রচলিত মতবাদ সত্য হইলে, মঙ্গলের এই ঘটনার বিবরণ সমস্ত ভাবিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। লেখক মঙ্গলবাসিগণকে অসাধারণ পেশিসম্পন্ন ও বৈজ্ঞানিক জীবরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কি কৌশলে অন্ধ জড়শক্তিকে দৈনন্দিন কার্য্যের উপযোগী করিতে হয়, সে বিষয়ে ইহারা যে কতদূর সিদ্ধহস্ত, তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। একটি উপগ্রহ মঙ্গলপৃষ্ঠের অতি নিকট দিয়া, দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে; এই উপগ্রহের গতিতে, ভ্রমণপথের ঠিক্ নিম্নদেশ সর্ব্বদাই মহাঝটিকাসঙ্কুল হইয়া পড়ে,—কোনও মঙ্গলিক জীবই এই প্রাকৃতিক উৎপাতে উক্ত স্থানে বাস করিতে পারে না। কিন্তু তদ্দ্বারা মঙ্গলবাসিগণের একটা বিশেষ উপকার সাধিত হয়;—গ্রহ ও উপগ্রহের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত ইহাদের মধ্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা সুব্যবস্থিত যন্ত্রদ্বারা সংযত হইয়া, সমগ্র অধিবাসিবর্গের ব্যবহার্য্য তাপ ও আলোকের অভাব পূরণ করে। পৃথিবী হইতে মঙ্গলের যে লোহিতাভ জ্যোতিঃ দেখা যায়, তাহা কেবল গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যে অবিরাম বিদ্যুতের অজানপ্রদানজাত আলোক হইতে উৎপন্ন।

দুই ভাই।

১

সঙ্কীর্ণ গলির উপর একটি বাড়ী; তাহারই দ্বিতলস্থ একটি যন্ত্রাঘাতন কক্ষে একজন মুমূর্ষু মৃত্যু-শয্যায় শয়ান। বার্দ্ধক্যের কঠোর করস্পর্শ এখনও যুবকের নিগতপ্রায়যৌবনলাবণ্য আননে একটি রেখাও অঙ্কিত করিতে পারে নাই; রোগক্লেশ এখনও সে পাণ্ডুর আননের শেষ রক্তপিচ্ছ মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই; বিংশতিবর্ষীয় পুত্র বিপিন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জননীর পাণ্ডুর মুখ পানে চাহিয়া আছে।

অস্তোন্মুখ তপনের লোহিতাভ কিরণজাল পশ্চিমের মুক্ত বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া শয্যার পদদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। একটা অজ্ঞাত বিহ্বলতা বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া একখানা মধুর মুখমণ্ডল আঁকিয়া, তাহার পর উড়িয়া গেল—তাই সে ভাবিল, এ মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে তাহার কাজ-গীতি শোভন হইবে না। মনে হইল

জননী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "বিপিন, একবার নলিন আর শেফালিকাকে ডাক।"

বিপিন দুই জনকে ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া পার্শ্বের কক্ষ হইতে একটি মলিনবর্ণ দশমবর্ষীয় বালক ও একটি কনকচম্পকদামগৌরী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; যেন রজনী ও উষা একত্র আসিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া উভয়েরই চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে। নলিন রমণীর পুত্র; শেফালিকা তাঁহার কোনও আত্মীয়ার কন্যা, শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা। রমণীর স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার পত্নী বিচার বা বিবেচনার অপেক্ষা না করিয়া স্বামীর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, স্বামীকে ছাড়িয়া স্ত্রীর কোনও ধর্ম্ম নাই।

দুর্ব্বল হস্তে বালকের ও বালিকার হস্ত ধরিয়া রমণী বিপিনের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বুক এতক্ষণ কষ্টে ভাব সংবরণ করিয়াছিল—এবার কাঁদিয়া ফেলিল। আপনার হস্তে তপ্ত অশ্রুর স্পর্শানুভবমাত্র রমণী বলিলেন, "ছিঃ! দাদা বিপিন, তুই এমন অধীর হইলে উহাদের কে দেখিবে? তোর পিতার মৃত্যুর পর হইতে এতদিন তোদের মানুষ করিয়াছি; সংসারের দুঃখ কষ্ট এত দিনের জন্য তোদের জানিতে দিই নাই; ভাবিতাম—তোরা ছেলেমানুষ, তোদের কোনও কষ্ট সহিবে না। আজ তুই বড় হইয়াছিস, আজ ইহাদিগের ভার তোর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতেছি—আমি ত সুখেই মরিতেছি! আমার জন্য কান্না কেন বাবা? ইহাদের সকল ভার তোর উপর রহিল।"

জননী পুত্রকে কাঁদিতে বারণ করিলেন বটে, কিন্তু অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

সেই দিন দ্বিপ্রহরে রমণীর ক্ষীণজ্যোতিঃ জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

বিপিন ভাবিল—মা যখন নলিনের ও শেফালিকার ভার আমার উপর দিয়া গিয়াছেন, তখন আমি সাধ্যমতে তাহাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

২

যে দিন বিপিনের হস্তে নলিনের ও শেফালিকার ভার অর্পণ করিয়া রমণী জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার পর দশ বৎসর বহিয়া গিয়াছে। অনন্ত কালের তুলনায় দশটি বৎসর নগণ্য সেকেণ্ড এক কণা বলিলেও হয়; কিন্তু এই কণা পরিমাণ কালে সেই যুবকের ও সেই বালক বালিকার কত পরিবর্ত্তন হইয়া

গিয়াছে! বিপিন এখন যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত। জানি না, কি গোপন বাসনায়, কি নীরব চিন্তায়, কি কঠোর মনঃকষ্টে, তাহার উৎফুল্ল যৌবন-শ্রী-সম্পন্ন আননে অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্ন প্রস্ফুট হইয়াছে! যৌবনের উৎসাহ বা উদ্যম, আকুলতা বা আবেগ, কিছুই তাহার নাই। জগতে কে অপরের হৃদয়ের গোপন বেদনা জানিতে পারে? নলিন এখন আর বালক নহে, প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। শেফালিকাও এখন আর সে বালিকা নাই—যৌবনের ঐন্দ্রজালিক করস্পর্শে তাহার দেহে মলয়পবনস্পর্শে কাননে বিকশিত কুসুমের শোভার মত অসামান্য রূপরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চাঞ্চল্য এখন গাম্ভীর্য্যে নিমগ্ন হইয়াছে। নলিন এখন এক বড় বণিকের হৌসে খাজাঞ্চি অর্থাৎ "ক্যাশিয়ার"।

আজ বৈশাখের সন্ধ্যায় আপনার কক্ষে বসিয়া বিপিন কি ভাবিতেছে। সম্মুখে টেবিল কয়খানা পুস্তক ছড়ান রহিয়াছে; একটা বড় ল্যাম্প কক্ষে উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিতেছে। রাজপথে কোনও পথিকের উচ্চহাস্য বা কোনও শকটের গমনশব্দ শ্রুত হইতেছে; কিন্তু সে সকলে বিপিনের মনোযোগ ছিল না, সে তন্ময়চিত্তে কি ভাবিতেছিল।

কিছু ক্ষণ ভাবনার পর বিপিন আপনা-আপনি বলিল, "আর বিলম্ব করি কেন? নলিনের তাঁর মা আমার হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। যতদিন সে অল্পবয়স্ক ছিল, ততদিন আপনার সুখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাহার সুখবিধানে চেষ্টিত হইয়াছি। আজ আর সে বালক নহে। এখন সে বড় হইয়াছে,—সে গচ্ছিত ধনের চিন্তায় এতদিন ব্যস্ত ছিলাম, সে চিন্তার কারণ এখন আর নাই। তবে আর কেন আপনার সুখের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকি? জগতে সুখলাভের চেষ্টা সকলেই করিয়া থাকে; আমি কেন করিব না? আজ নলিনকে এ কথা বলিব।"

বিপিন এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় কক্ষদ্বার হইতে কে ডাকিল, "দাদা!"

বিপিন বলিল, "কে, নলিন? এস, ভাই, ভিতরে এস।"

নলিন কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল; বসিয়া বলিল, "দাদা একটা আবশ্যক কথা বলিতে আসিয়াছি।"

বিপিন বলিল, "আমিও তোমাকে একটা দরকারী কথা বলিব। তুমি কি বলিবে, বল।"

নলিন বলিল, "আমি শেফালিকাকে বিবাহ করিব।"

বিপিন চমকিয়া উঠিল। তাহার নয়নদ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত-

মধ্যে সে আত্মসংবরণ করিল। নতদৃষ্টি নলিন তাহার মুখের বেদনাব্যঞ্জক ভাব লক্ষ্য করিতে পারিল না। আত্মসংবরণ করিয়া বিপিন বলিল, "আচ্ছা।"

কিছু ক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বিপিন বলিল, "তুমি শেফালিকার মত লইয়াছ?"

নলিন বলিল, "হাঁ।"

তাহার পর দুই জনে আবার চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নলিন উঠিয়া যাইতেছিল, দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, তুমি কি বলিবে বলিতেছিলে?"

—বিপিন বলিল, "আজ থাক। আর একদিন বলিব।"

নলিন আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে এ বিবাহে দাদার সম্মতি-সংবাদ শেফালিকাকে বলিতে গেল।

৩

নলিন চলিয়া গেলে বিপিন উঠিয়া কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর চেয়ারে বসিয়া দুই করে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দন কি যাতনাময়,—কি মনোবেদনাব্যঞ্জক, তাহা কে বলিবে? মর্ম্মব্যথাপীড়িত হৃদয় হইতে অব্যক্ত বেদনা বহিয়া সে অশ্রুরাশি নয়নে ফুটিতে লাগিল।

কিছু ক্ষণ কাঁদিয়া বিপিন ভাবিতে লাগিল, এত দিন আপনার সকল সুখ তুচ্ছ করিয়া যাহার সুখবিধানে চেষ্টিত হইয়াছি, আজ কি আত্মসুখান্বেষায় তাহাকে চিরজীবনের জন্য অসুখী করিব? মৃত্যু-শয্যায় মা আমার হাতে নলিনকে ও শেফালিকাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আজ আমি আপনার সুখের জন্য তাহাদিকে অসুখী করিব? জীবন কুসুমের মত ক্ষণস্থায়ী—তাহা প্রভাতে ফুটিয়াছে, সন্ধ্যায় শুকাইয়া যাইবে। এই অস্থায়ী জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য কেন তাহাদের সুখ নষ্ট করিব? আমি তাহাদের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইবার আশা করি, তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাই আমার কর্ত্তব্য। নলিন শেফালিকাকে বিবাহ করিয়া সুখী হউক—আমি তাহার সুখের অন্তরায় হইব না। মা আমার আমাদের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, আর আমি তাঁহার কথায় একটা সুখ-আশা বিসর্জ্জন করিতে পারিব না? নলিনের ভার আমার উপর; তাহার সুখের জন্য, যত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব।

বিপিন চক্ষু মুছিয়া স্থির হইয়া। হৃদয়ে কোনও মহৎ সঙ্কল্প উপস্থিত হইলে

বলের অভাব হয় না; তখন বল আপনি আইসে। সঙ্কল্প স্থির হইলে পর বিপিনের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তপনোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত অপসৃত হইয়া গেল।

বিপিন আপনি উদ্যোগ করিয়া শেফালিকার সহিত নলিনের বিবাহ দিল; কিন্তু হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রান্তে কোথায় যে কেমন একটু বেদনা তীক্ষ্ণকুশাঙ্কুরের মত বিদ্ধ হইতেছিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে পারিল না।

৩

দিন যেমন যায়, তেমনই যাইতে লাগিল। বিবাহের পর প্রথম দিন কতক নলিনের মনে যে অপরিমিত আনন্দোচ্ছ্বাস আসিয়াছিল, বন্যার জলের মত তাহা শীঘ্রই সরিয়া গেল। তখন দাম্পত্য জীবনের দৈনন্দিন মান অভিমান, আদর সোহাগ, ভ্রূকুটি চুম্বন, যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইতে লাগিল। আনন্দের প্রথম প্লাবন দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। তবুও যেন নলিনের ও শেফালিকার হৃদয়ে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটু পরিবর্ত্তন আসিল,—সেটা একান্তই স্বাভাবিক; কেন না, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একাংশ ত্যাগ করিয়া আর এক অংশে প্রবেশ করিতে হয়;—দুই অংশে প্রভেদ প্রভূত। বিবাহিত জীবনে একটা দায়িত্ববোধ, একটা গাম্ভীর্য্য আইসে, যাহা অবিবাহিত জীবনে আসিতে পারে না।

বিপিনের পূর্ব্বে যেমন দিন কাটিতেছিল, এখনও তেমনই কাটিতে লাগিল। কেবল তাহার দেহে অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্ন সকল ক্রমেই পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতে লাগিল,—উন্নত কপালে চিন্তারেখা দৃষ্ট হইল, কেশজাল শ্বেত হইয়া উঠিল, মনের স্ফূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। নলিন এক এক দিন জিজ্ঞাসা করিত, "দাদা, তোমার কি কোনও অসুখ হইয়াছে?" বিপিন বলিত, "না।" নলিন বলিত, "তবে দিন দিন এমন হইয়া যাইতেছ কেন?" বিপিন হাসিয়া বলিত, "ও কিছুই নহে। আমি মরিবার পূর্ব্বে তুই জানিতে পারিবি, সে জন্য অত ভাবিয়া কাজ নাই।"

শেষ নলিন জেদ করিয়া দাদাকে দেশভ্রমণে রাজি করিল। আপনি সঙ্গে গিয়া, টিকিট করিয়া, সে দাদাকে কলিকাতায়ী ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিল। সেই দিন গৃহে ফিরিয়া নলিন শেফালিকাকে বলিল, "দাদার নিশ্চয়ই কোনও অসুখ করিয়াছে; কিন্তু তিনি যে তাহার অসুখের কথা, কি অন্য কোন কথা আমার কাছে গোপন করেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। সে কথা

ছাড়িলে আমার বড় কষ্ট হয়।" বলিতে বলিতে নলিনের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। শেফালিকা বলিল, "এখন তিনি যাইলেই ভাল। তিনি নিশ্চয়ই যাইয়া আসিবেন।"

নিয়মিত সময়ে বিপিন গৃহে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু এই ভ্রমণে তাহার দেহের বা মনের কোনও প্রকার উন্নতিই পরিলক্ষিত হইল না।

গৃহে আসিয়া বিপিনের যেন আরও কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত। ইতিপূর্ব্বে অভ্যাসহেতু দৈনন্দিন জীবনে তত অভাব অনুভূত হইত না—এবার সে অভ্যাস পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, তাই অভাব তীব্র বলিয়া বোধ হইত। দেশভ্রমণে বিপিনের বরং এই অপকারই হইয়াছিল—উপকার কিছুমাত্র হয় নাই। যে যাতনা জুড়াইবার নহে, তাহা কি দেশভ্রমণে জুড়ায়? কল্পনা যে ক্ষত যাতনাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে, সে যাতনা অভিনব দৃশ্যের মধ্যে গেলে দূর হইতে পারে সত্য; কিন্তু প্রাণের অকৃত্ত যাতনা কিছুতেই জুড়ায় না—হৃদয়ের ক্ষত কিছুতেই মিলায় না।

গৃহে নিতান্তই ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয় দেখিয়া, বিপিন একদিন নলিনকে বলিল, "নলিন, তোর আফিসের কাজ আমাকে শিখাইতে পারিস?" নলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" বিপিন উত্তর দিল, "কখন কি আবশ্যক হয় কে জানে, —শিখিয়া রাখায় হানি কি?" নলিন বলিল, "তাহা কিছুতেই হইবে না; যত দিন আমি উপার্জ্জন করিতে পারিব, তত দিন কিছুতেই তোমাকে চাকরী করিতে দিব না।" বিপিন হাসিয়া বলিল, "পাগল, আমি কি এখনই চাকরী করিতে যাইতেছি? বাড়ীতে কোন কাজ নাই,—বড় একা একা বোধ হয়, তাই তোর আফিসে যাইয়া বসিব।"

নলিন দাদাকে আফিসে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। বিপিন আফিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীরই মত প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে আফিসে যাইত; আর নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে গৃহে ফিরিত না। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ উপস্থিত হইল। আফিসের কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহ যে আফিসের আয় ব্যয়ের হিসাবাদি দেখিয়া যাইবে, ইহা কর্ত্তাদের অভিপ্রেত ছিল না। কাজেই লাভাংশে খতিপত্রে হাত দিতে দেওয়ার জন্য নলিন তিরস্কৃত হইল। সে কথা শুনিয়া বিপিন পর দিবস হইতে আফিসে যাওয়া রহিত করিল।

এক দিন আফিসে যাইবার অভ্যাসের পর বিপিন দেখিল—গৃহের নিঃসঙ্গতা

নিতান্তই অসহনীয়। বিপিন নলিনকে কিছু না বলিয়া একটা চাকরী যোগাড় করিল; কিন্তু সে সন্ধান পাইয়া শেফালিকা ও নলিন এত দুঃখ করিল ও এমন প্রতিবাদ করিল যে, স্নেহশীল বিপিনের আর চাকরী করা হইল না। নলিন বলিল, "দাদা, তুমি আমার গৃহের দেবদূত—যে গৃহ-দেবতাকে পরিশ্রম করায়, তাহার মঙ্গল নাই। আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তুমি কিছুতেই চাকরী করিতে পাইবে না।" শেফালিকা বলিল, "কি দুঃখে তুমি হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতে যাইবে? তোমার কিসের অভাব? তোমরা একজনও বাড়ী থাকিবে না,—আর আমি কি একা এই বাড়ীতে থাকিতে পারি? তুমি কিছুতেই চাকরী করিতে পাইবে না।"

নলিনের ও শেফালিকার স্নেহ দেখিয়া বিপিনের চক্ষে জল আসিল। বিপিনের আর চাকরী করা হইল না।

বিপিন উপন্যাস পাঠ করিয়া হৃদয়ের যাতনা ভুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গম্ভীরপ্রকৃতি বেদনাক্লিষ্ট বিপিনের উপন্যাস ভালই লাগিত না। কিছুতেই কিছু ভাল লাগে না দেখিয়া বিপিন শেষে দর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মনের অবস্থা ভাল না থাকিলে কিছুই ভাল লাগে না। অল্পদিনের মধ্যেই বিপিন আবার অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিল। নিতান্ত মর্ম্মব্যথায় প্রপীড়িত হইলে বিপিন কেবল একএকবার সেই ভক্তিভরা গানটি স্মরণ করিত,—

"থাক নাথ, থাক মোর সাথে সাথে অনুক্ষণ।
আসিছে সন্ধ্যার ছায়া বিস্তারি করাল কায়া,
ছিল যারা, তেয়াগিয়া করিয়াছে পলায়ন;
দুখ-আশা রাশি রাশি সকলি যেতেছে ভাসি'
অনাথের নাথ, তুমি কাছে থেক অনুক্ষণ।"

এমনই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

৬

ইহার পর বিপিনের আর বড় অধিক দিন কর্ম্মের অভাব রহিল না। শেফালিকার যখন একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হইল, তখন বিপিনের নিকট যেন এক নূতন জগতের দ্বার মুক্ত হইল। বিপিনের হৃদয়ের ঘনান্ধকারের মধ্যে সেই শিশু যেন ভাস্বর শুকতারার মত ফুটিয়া উঠিল। শিশু বুঝি আপনার সঙ্গে স্বর্গের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লইয়া আসে, তাই এই চিরদুঃখময় জগতেও সে সকলের হৃদয়ে আনন্দ দান করিয়া থাকে। শিশুর ক্ষুদ্র দুইখানি বাহুর বন্ধনের

নিকট জগতের আর সকল বন্ধন হীনবল বলিয়া বোধ হয়;—নিষ্ঠুর অন্তরে অমল হাসির সম্মুখে জগতের কত কর্ত্তব্য ভাসিয়া যায়;—হৃদয়ের কঠোর বৈরাগ্য বিপ্লুত হইয়া যায়।

নলিনের পুত্র বিপিনের হৃদয়ে নূতন আনন্দ দান করিল। স্নেহ শিশুকে লইয়া বিপিনের সময় কাটিত। শিশুও বিপিনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, বিপিনও শিশুকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। প্রৌঢ় জ্যেষ্ঠতাত ও শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে মনের মিলের যে কি কারণ ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। তবে এক জনকে ছাড়িয়া থাকিতে অপরের কষ্ট হইত। কার্য্যবশতঃ কোথাও গেলে গৃহে ফিরিয়া যতক্ষণ শিশুকে দেখিতে না পাইত, ততক্ষণ বিপিন সুস্থির হইতে পারিত না; শিশুও কিছুক্ষণ জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিতে না পাইলে কাঁদিয়া বাড়ীর সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলিত।

দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, ভালবাসা বিরক্তি লইয়া, দেখিতে দেখিতে দুইটি বৎসর চলিয়া গেল। নলিনের পুত্র সুকুমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্যেঠামহাশয়ের সমগ্র হৃদয়খানি দখল করিয়া লইল।

পৌষের অপরাহ্ণে। ঘুমাচ্ছন্ন পশ্চিম গগনে স্বভাবতঃ অনুজ্জ্বল কর-হীনতার তপন হেলিয়া পড়িয়াছে—তাহার ম্লানকরপ্রভার গৃহ-চূড়া সকল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার কক্ষে রাতায়নসম্মুখে বসিয়া বিপিন পথের দিকে চাহিয়া আছে; আর তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া নলিনের দুই বৎসরবয়স্ক পুত্র সুকুমার অস্ফুট কথায় কত-কি বলিয়া যাইতেছে। বিপিনের গৃহের সম্মুখে একটা ছায়া বাগ হইতে কৃষ্ণ, ধূসর, লোহিতাভকৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণের পরম কোট পরিধান করিয়া একদল ছাত্র বেড়াইতে বাহির হইল। তাহাদিগের যুবকজনসুলভ উচ্চহাস্যে সে গলি শব্দমুখর হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে এক জন পকেট হইতে একটা চুরুট বাহির করিতে না করিতে পাঁচ সাত জনে সেটা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে আরম্ভ করিল,—ফলে সেটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন সকলেই একবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল—এ একটা ভারি মজা।

বিপিন যুবকদিগের কার্য্য লক্ষ্য করিতেছে, এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে নলিন দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

বিকৃতকণ্ঠে নলিন ডাকিল, "দাদা!"

বিপিন চমকিয়া উঠিল,—বলিল, "কি ভাই?"

নলিন বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আফিসের হিসাবপত্র আমার হাতে থাকে। আমি মধ্যে মধ্যে ফেক জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইতাম। সেই টাকা আমি 'স্পেকুলেশনে' ব্যয় করিতাম। কোনটায় জিতিয়াছি, কোনটায় হারিয়াছি। মোটের উপর হিসাব মত টাকা আবার ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিতাম। এবার আমি যাহাতে টাকা দিয়াছি, তাহাতেই হারিয়াছি। জিতিবার আশায় ক্রমাগতই টাকা বাহির করিয়াছি; কিন্তু একবারও দিতে পারি নাই।"

নলিন একটু চুপ করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আফিসের কর্ত্তারা এবার সব জানিতে পারিয়াছে। এখনই আমাকে ধরিতে আসিবে।"

ভ্রাতার কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিপিন যেন বজ্রাহতের মত হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "কত টাকা লইয়াছ?"

নলিন উত্তর করিল, "ত্রিশ হাজার।"

বিপিন বলিল, "এত টাকা তোমারও নাই, আমারও নাই।—এখন উপায়?"

নলিনের দৃষ্টি তাহার শিশুর উপর পড়িল। বেদনা-ব্যথিত স্বরে সে বলিল, "তবে কি আমার উদ্ধারের কোনও উপায় নাই?"

সংসার-সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহার ভাগ্যে এখনও সুধা ভিন্ন গরল উঠে নাই, সে কি সহজে সংসার ত্যাগ করিতে চাহে?

সহসা বিপিনের মনে হইল, সে নলিনকে লিখিতে শিখাইয়াছিল—উভয়ের হস্তাক্ষর একরূপ। সে একটা কি স্থির করিল। তাহার পর সে নলিনকে বলিল, "আমি তোমাকে উদ্ধার করিব; কিন্তু শপথ কর—আমি যাহা বলিব, তাহাই করিবে?"

অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথে বাত্যাবিতাড়িত বারিধিবক্ষে ভগ্নপোত নাবিক সহসা তরঙ্গে তীরে উপনীত হইলে যেমন আনন্দিত হয়, নলিন তেমনই আনন্দিত হইল। সে বলিল, "তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।"

বিপিন বলিল, "তবে আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর,—আমি যাহা বলিব, তুমি তাহার প্রতিবাদ করিবে না। বল,—আমি যাহা বলিব, তুমি তাহাই স্বীকার করিবে।"

নলিন স্বীকৃত হইল।

সেই সময় সোপানশ্রেণীতে দ্রুতপদশব্দ শ্রুত হইল। বিপিন বলিল, "ওই তাহারা আসিতেছে! আমি কি গৃহের পশ্চাতের দ্বারপথে পলাইব?"

বিপিন বলিল, "তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। চুপ করিয়া বসিয়া থাক। যাহা করিতে হয়, আমি করিব।"

পরমুহূর্ত্তেই পুলিশের ইন্‌সপেক্টার ও আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

৮

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী নলিনকে দেখাইয়া পুলিসের ইন্‌সপেক্টারকে বলিলেন, "এই ব্যক্তিই অপরাধী।"

ইন্‌সপেক্টার নলিনকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন। বিপিন বলিল, "কি অপরাধে উহাকে গ্রেপ্তার করিতেছেন?"

আফিসের কর্ম্মচারী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ও আমাদের আফিস হইতে ত্রিশ হাজার টাকা চুরী করিয়াছে।"

স্থিরভাবে বিপিন বলিল, "চুরী ও করে নাই—আমি করিয়াছি।"

শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

বিপিন বলিতে লাগিল, "আপনি জানেন, আমি দিনকতক আপনার আফিসে যাইতাম। সে জন্য আপনি নলিনকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সেই সময় আমি আফিসের সব দেখিয়া আসি। আমি চেক জাল করিয়া চুরী করিয়াছি। নলিন নির্দ্দোষ।"

আফিসের কর্ম্মচারী বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম—তোমার ভ্রাতা এতদিন কাজ করিয়া এখন সহসা এ দুষ্কর্ম করিল কেন? তুমি নিজমুখে দোষ স্বীকার করিতেছ?—জান, আমি অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট?"

স্থির হইয়া বিপিন বলিল, "আমি দেখি।"

ইন্‌সপেক্টার বিপিনকে গ্রেপ্তার করিলেন। বিপিন তাঁহার নিকট হইতে দুই মিনিট সময় লইয়া একখানা পত্র লিখিল—লিখিয়া সে পত্রখানা নলিনকে দিয়া বলিল, "আমি চলিয়া গেলে এই পত্রখানা পড়িয়া দেখিও। পড়িলে সব বুঝিতে পারিবে।"

তাহার পর আফিসের কর্ম্মচারী ও ইন্‌সপেক্টারের সঙ্গে বিপিন থানায় চলিয়া গেল। যেখানে সুকুমার দাঁড়াইয়াছিল, সে আর সে দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

* * * *

বিপিন যাইতে না যাইতে নলিন তাহার পত্রখানি খুলিয়া পড়িল,—

"ভাই নলিন,

"যে দিন তুমি আমার নিকট শেফালিকাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে—সে দিন আমি তোমাকে একটা আবশ্যক কথা বলিতে যাইতেছিলাম; আমি শেফালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা তোমাকে জানাইব, ভাবিতেছিলাম। তুমি প্রস্তাব করিলে আমি ভাবিলাম—মা মরিবার সময় তোমাকে আমার হাতে দিয়া গিয়াছিলেন, আমি তোমার সুখের অন্তরায় হইব না।

"সে দিন মার কথা স্মরণ করিয়া তোমার বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলাম। আর আজ শেফালিকার কথা ভাবিয়া তোমাকে বাঁচাইলাম। আমি জানি, তুমি দণ্ড পাইলে শেফালিকার সকল সুখ নষ্ট হইবে।

"এ কথা শেফালিকাকে বলিও না। শুনিলে সে কষ্ট পাইবে। তদ্ভিন্ন এ কথা শুনিলে যদি তোমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধাভক্তি দূর হইয়া যায়, তবে তোমাদের উভয়েরই জীবন নরকযন্ত্রণাময় হইয়া উঠিবে। ভাই আমার শেষ অনুরোধ,—শেফালিকা যেন এ কথা শুনিতে না পায়। সে আমাকেই দোষী বলিয়া জানুক।

"এক জনকে ছাড়িয়া যাইতে আমার কষ্ট হইতেছে—সে সুকুমার। আমার হইয়া তাহাকে একটি স্নেহ-চুম্বন দিও। শিশু সহজেই আমাকে ভুলিয়া যাইবে।—

"তোমার চিরশুভার্থী ভ্রাতা বিপিন।"

পত্র পাঠ করিয়া নলিন স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সহসা শিশুর ক্রন্দনে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সুকুমার তখন 'জেঠার কাছে যাবো' বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"গঙ্গা, গঙ্গা, কতখানি জল ?"

বাল্যকালে "গঙ্গাফড়িঙ" ধরিয়া কতবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—"গঙ্গা, গঙ্গা, কতখানি জল ?" পক্ষস একটি পদ উত্তোলন করিয়া জলের গভীরতা জানাইয়াছে সে সময় তাহাতেই কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি; গঙ্গাফড়িঙ মারিতে নাই, উহা দেবতা বলিয়া ঠাকুরমার নিকট যখন শুনিতাম, তাহার যাথার্থ্য সেই পক্ষস পদ-সঞ্চালনে উপলব্ধি করিয়াছি। বলা বাহুল্য, বয়োবৃদ্ধির সহিত এ বিশ্বাস তিরোহিত হইল; ক্রমে বাল্যের গঙ্গাফড়িঙকেও ভুলিলাম।

বহু দিন পরে, গান্যোর সেই পতঙ্গকে আবার মনে পড়িল; তখন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুরমার কথা কি সত্য?—গন্ধকাঠি কি দেবতা?" এই প্রকার সন্দেহের বিশেষ কারণ ছিল। উহা যদি দেবতা কিম্বা দেবতার নিকটবর্ত্তী কিছু না হইবে, তাহা হইলে, কেবল আমাদের দেশে নয়,

অনেক দেশে উহাকে সেণ্ট, প্রচারক, ঋষি ইত্যাদি শ্রদ্ধাময় নামে অভিহিত করিবে কেন? পারমান কহিয়াছেন যে, এই জাতীয় এক পতঙ্গকে হটেণ্টটগণ পূজা করিয়া থাকে। পরিব্রাজক কেলড (Caillaud.) বলেন যে, আফ্রিকার কোন

কোন স্থানেও গঙ্গাফড়িং পূজা পাইয়া থাকে। য়ুরোপের অনেক ভাষায় ইহাকে ম্যান্টিস্ mantis, এবং এই জাতীয় পতঙ্গকুলকে Mantidæ কহে। এই কথা যে গ্রীক ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহার অর্থ ভবিষ্যৎবক্তা। হটেণ্টট্‌গণের ধারণা যে, এই পতঙ্গ যাঁহার গাত্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপবেশন করিবে, তিনি ঈশ্বরায়-গৃহীত। পল্লীবাসী ফরাসীগণের বিশ্বাস এই যে, এই পতঙ্গ পথিকগণকে পথপ্রদর্শন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর জীবতত্ত্ববিৎ মফে (Mouffet) লিখিয়া গিয়াছেন, "পথহারা শিশু ইহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা একটি পদ প্রসারণ করিয়া পথ দেখাইয়া দেয়, এবং তাহাতে কখন ভুল করে না।" কেন এক পতঙ্গের প্রতি ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও এসিয়া—সমগ্র ভূখণ্ডে এত শ্রদ্ধার ভাব উদিত হইল? তবে কি ঠাকুরমার কথা সত্য? মনের সন্দেহ অধিক দিবস রহিল না। গঙ্গাফড়িং! অনেক দিন ধরিয়া তুমি সারা সংসারকে প্রবঞ্চনা করিয়া মানবের শ্রদ্ধা ও ভক্তি উপভোগ করিয়াছ; এখন আর নয়, বিড়াল-তপস্বী, তুমি এত দিনে ধরা পড়িয়াছ। যাহাদিগকে মহাপুরুষ ইত্যাদি জ্ঞানে সমগ্র জগৎ এখন মান্য করিতেছে, কে জানে, তাহারাও আবার কালে তোমার মত ধরা পড়িবে না?

গঙ্গাফড়িঙকে দেখিলে মনে হয়, এমন সৎ ও সাধু পতঙ্গ বুঝি আর নাই—ফলপত্রবিদ্বেষকারী, তরুত্বগ্‌ভেদী, অশেষ অনিষ্টের আস্পদ, পতঙ্গরূপী দৈত্যকুলে বুঝি বা প্রহ্লাদ! ইহা আপনার সম্মুখস্থ পা দুইখানি উত্তোলন করিয়া এমনই ধীর স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকে যে, দেখিলেই মনে হয়, যেন ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী একাগ্রচিত্তে পরম পুরুষের ধ্যান করিতেছে। কিন্তু খাদ্য সমীপবর্ত্তী হইলে হয়। সন্ন্যাসী নিমেষে তাহার সংহার সাধন করিয়া আপন উদরপূর্ত্তি করিবে। পেটের জন্য এতই প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করিতে হয়! গঙ্গাফড়িঙের সম্মুখস্থ পদদ্বয়ে কেমন করাতের দাঁতের মত দাঁত; ইহার দ্বারা উহারা এক আঘাতে বিপক্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। যাঁহারা ইহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইহাদিগের ন্যায় কলহপ্রিয়, নৃশংস, হত্যাকারী পতঙ্গ বিরল। আপনার জাতিকে পর্য্যন্ত ইহারা ভক্ষণ করে। চীনদেশে ইহাদিগের বিদ্যা বহুকাল হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। চীনবালক-গণ বংশ-পিঞ্জরে দুই গঙ্গাফড়িঙ রাখিয়া, তাহাদিগের পরস্পরের যুদ্ধ দর্শন করিয়া থাকে; যে পর্য্যন্ত একটি যোদ্ধা না মরে, সে পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের অবসান হয় না। বিজেতার মৃতদেহ আহার করিয়া জেতা আপনার সমরশ্রম

সাধারণ বায়ুতে উত্তপ্ত করিয়া কঠিন তাহা সম্ভবপর করিলে, পদার্থমাত্রই এক একটি নির্দিষ্টপরিমাণ তাপে তরলীভূত হইতে আরম্ভ করে; আবার এই প্রকারে তরল পদার্থ বাষ্পীভূত করিতে হইলে, তাহাতেও একটি নির্দিষ্টপরিমাণ তাপসঞ্চালনের প্রয়োজন হয়।—বিশুদ্ধ জল, ১০০ ডিগ্রী পরিমিত উত্তপ্ত হইলেই বাষ্পীভূত হইতে থাকে; আবার যখন ইহার শীতলতা তাপমান যন্ত্রের শূন্য-পরিমিত হয়, তখন কঠিন হইয়া বরফে পরিণত হইয়া থাকে। জলের ন্যায় পদার্থমাত্রেরই উক্তপ্রকার এক একটি নির্দিষ্ট তাপপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, জলজাত বাষ্পে মূলের ভিন্ন ২৪০ ডিগ্রী (—২৪০°)-পরিমিত তাপ থাকিলেও, তাহা বাষ্পাকারে থাকিয়া যায়;—সুতরাং উক্ত বাষ্প কল শীতল করিলে বায়বীভূত হইবে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ অনুমান করুন। তরল জলজানে একটি বায়ুপূর্ণ কাচগোলক আংশিক নিমজ্জিত রাখিলে, গোলক বায়ু তৎক্ষণাৎ কঠিন হইয়া যায়। ঐ পদার্থ দ্বারা তরল জলজানের শৈত্য-পরিমাণ আরও সুসম্বদ্ধ হয়। ডিয়ারের আবিষ্কারের পূর্ব্বে, তরল জলজানের গুণাদি সম্বন্ধে যে বায়বীয়গণ অনেক কথা বলেন, অনুমানবলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—পূর্ব্ব-অনুমিত সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষাসিদ্ধ ফলের অনুযায়ী হয় কি না, এখন পণ্ডিতগণ তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন। তরলাবস্থায় জলজানের গুরুত্ব জলের গুরুত্বের ১৪ ভাগের প্রায় এক ভাগ পরিমিত।

জলজান বাষ্প আকাশে মুক্তাবস্থায় প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, এবং আজকাল যে উপায়ে উক্ত বাষ্প প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাও অতীব ব্যয়সাধ্য। সুতরাং তরল বায়ু যে প্রকার নানা কার্য্যে ব্যবহার করিবার উদ্যোগ হইতেছে, দুষ্প্রাপ্যবশতঃ সম্ভবতঃ জলজান দ্বারা সে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহার অসাধারণ শীতলতার সাহায্যে রসায়ন শাস্ত্রের এক মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ, হেলিয়ম্ (Helium) নামক একটি নবাবিষ্কৃত বায়বীয় পদার্থকে এতদিন কোনও উপায়েই তরলীভূত করিতে পারেন নাই,—শুনা যাইতেছে, তরল জলজানের সাহায্যে অদ্য হেলিয়ম্ বায়বীয় তরলীভূত হইয়াছে, এবং ইহার অনেক অজ্ঞাত ধর্ম্মও আবিষ্কৃত হইতেছে।

চিত্রবহ যন্ত্র।

আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিস প্রদর্শনীতে যে সকল নূতন যন্ত্র প্রদর্শিত হইবে, ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক-সমাজে তাহাদের কার্য্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। হার্ব্ব বেলিনি নামক একজন যন্ত্রশিল্পী, টেলিলেক্ট্রোস্কোপ (Telelectroscope) নামক এক আশ্চর্য্য যন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিবেন। এই যন্ত্রের দ্বারা যে কোনও স্থানের দৃশ্য অবিকল যে কোনও স্থানে প্রেরণ করিতে পারা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রেরিত ছবির বর্ণ ও আকারাদি ঠিক আদর্শ চিত্রের অনুরূপ হয়।

যন্ত্রনির্ম্মাতা বলেন,—এই যন্ত্র দ্বারা সচল পদার্থের ছবি সহস্রক্রোশদূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করিলেও, সেই দূরবর্ত্তী স্থানেও, পদার্থটির প্রকৃতপ্রতিবিম্বিত ও তরঙ্গযুক্ত প্রতিকৃতি তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইবে। এই আবিষ্কার যদি সত্য হইলে, আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের বহুকালের সাধনা চরিতার্থ হইবে।

ইতিমধ্যে যন্ত্রটির প্রক্রিয়াপদ্ধতির একটু মূল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ম্মাতা বলেন,—যে ছবিটি দূরস্থানে পাঠাইতে হইবে; তাহা প্রথমতঃ দুইখানি দর্পণের সাহায্যে কতকগুলি বিন্দুতে বিভক্ত করিতে হয়; পরে ছবির অংশীভূত পূর্ব্বোক্ত বিন্দু সকল আর একখানি দর্পণ দ্বারা প্রতিফলিত করিয়া, এবং পরে সেই প্রতিফলিত আলোক বিন্দু

বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিণত করিয়া, চিত্রবক্ষে সম্পন্ন হয়। সুন্দর উপায়ে ও সুলভে এই বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা আছে। আলোকপাত হইবামাত্র সেলিনিয়ম নামক পদার্থে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই প্রবাহের পরিমাণ আলোকমাত্রেই সমান থাকে না। বর্ণচ্ছত্রস্থ লোহিতাদি আলোক যথাক্রমে সেলিনিয়মে পতিত হইলে, প্রত্যেক জাতীয় বর্ণে এক একটি নির্দ্দিষ্টপরিমাণ প্রবাহ উৎপন্ন হয়। সেলিনিয়ম ফোরে (Cell) (টেলিগ্রাফের স্থায় যাহার তার আবদ্ধ থাকে), নানাবর্ণের আলোকরশ্মি উল্লিখিত বর্ণপট হইতে প্রতিচ্ছলিত হইয়া সেলিনিয়মে পড়িলেই বর্ণানুসারে অসমান বৈদ্যুতিকপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বহুদূরবর্ত্তী স্থানে নীত হইয়া থাকে। এই প্রকারের বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, তথায় ঐরূপ প্রবাহের উৎপাদক আদিম বর্ণগুলির পুনর্বিকাশ করিবার সুব্যবস্থা আছে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, লৌহদণ্ডের উপরিভাগে তার জড়াইয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করিলে, লৌহদণ্ডটি চৌম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, এবং প্রবাহের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিলে, শক্তির পরিমাণও বর্দ্ধিত হইতে থাকে; কিন্তু প্রবাহ বন্ধ করিলে লৌহদণ্ডে আর চৌম্বক শক্তি থাকে না। চিত্রবহ যন্ত্রের তারের প্রান্তদেশ ঐরূপ এক লৌহদণ্ডে সংযুক্ত থাকে, এবং ইহার সম্মুখে একখণ্ড ত্রিকোণ কাচ ও তাহার পশ্চাতে একটি অত্যুজ্জ্বল আলোক সজ্জিত রাখা হয়। প্রেরিত বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ অনুসারে অল্প বা অধিক পরিমাণে চুম্বকশক্তি প্রাপ্ত হইলে, এই লৌহদণ্ড সম্মুখস্থ লম্বমান কাচখণ্ডকে চুম্বকশক্তির অনুপাতে আন্দোলিত করে। এই আন্দোলনের পরিমাণ অনুসারে পশ্চাদ্বর্ত্তী আলোকে বিশ্লিষ্ট হইলে বিশেষ বিশেষ আলোকের উৎপত্তি হয়। আন্দোলনের মাত্রা প্রবাহের মাত্রার উপর নির্ভর করে; আবার প্রবাহের পরিমাণ ভিন্নভিন্ন অপরপ্রান্তস্থ দৃশ্য বা চিত্রের বর্ণানুসারে নিয়োজিত হয়। সুতরাং যে সকল বর্ণে প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছিল, এই প্রক্রিয়া দ্বারা আবার সেই সেই বর্ণের বিকাশ হয়। এই প্রকারে আদর্শ পদার্থের অংশভূত বিন্দুর অনুরূপ বিবিধ বর্ণের বিন্দু উৎপন্ন হইলে অপর দুইখানি দর্পণের সাহায্যে ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থটির নিখুঁৎ ছবি অঙ্কিত হইয়া থাকে।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

জীবনচরিত।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবিপ্লবকালে যে সকল মনস্বিনী ভারতমহিলা আপনাদিগের দূরদর্শিতা, ধৈর্য্য, বাহুবীর্য্যপটুতা ও রাজনীতিক চাতুর্য্যগুণে অনন্য শত্রুর হস্ত হইতে স্বাধীনতা ও প্রজাগণের সংরক্ষণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যবর্দ্ধন করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ধারাধিপতি আনন্দরাও পওয়ারের (প্রমারের) বিধবা স্ত্রী বীরাঙ্গনা মীনা বাই তাঁহাদিগের অন্যতম। "সালিক মনোরঞ্জন" নামক মহারাষ্ট্রীয় মাসিকপত্রের জানুয়ারী মাসের সংখ্যায় এই রমণীরত্নের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার মর্ম্ম পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি।

মীনা বাই।

মুসলমান আক্রমণের প্রবল তরঙ্গমালা রাজপুতভূমির উপর পুনঃ পুনঃ আপতিত হইয়া, তত্রত্য হিন্দুধর্ম্মকে ও তদবলম্বিগণকে জর্জ্জরিত করিলে, সেওয়াড় ও মারওয়াড় প্রভৃতি প্রদেশের বহুসংখ্যক রাজপুত পরিবার স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরির শিখরশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া মহারাষ্ট্র দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের 'পওয়ার'-(প্রমার)-উপাধিধারী ক্ষত্রিয়পরিবার পূর্ব্বকথিত কারণে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়কুলাবতংস ছত্রপতি মহারাজ শিবাজী ভোঁসলের চেষ্টায় মহারাষ্ট্রে স্বরাজ্য স্থাপিত হইলে, ভোঁসলে বংশের সহিত পওয়ার, গোরপড়ে, ঘাটাড়ে ও কদম প্রভৃতি মারাঠা ক্ষত্রিয়পরিবারসমূহ ক্রমে ক্রমে দেশ-বিজয় ও কদমসংস্থাপনাদি কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শিবাজীর পৌত্র মহারাজ শাহুর রাজত্বকালে, মালব ও গুজরাট প্রদেশে মহারাষ্ট্রগণের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী প্রভৃতি সত্ব স্থাপন পূর্ব্বক করদান করিবার ভার, 'উদাজী পওয়ার' (উদয়জী প্রমার) নামক এক সম্ভ্রান্ত মারাঠা ক্ষত্রিয় সর্দ্দারের প্রতি অর্পিত ও তাঁহাকে ঐ অঞ্চলস্থিত 'ধার' (বিদ্যোৎসাহী কবিবৎসল ভোজরাজের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ধারা নগরী) নামক প্রদেশের জাইগির প্রদত্ত হইয়াছিল। মীনা বাই উদাজী পওয়ার কর্ত্তৃক স্থাপিত রাজবংশের কুলবধূ।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর ৭ম দশকে উদাজীর বংশধর কোওাজী পওয়ার ধার নগরীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক মালব প্রদেশে মারাঠাগণের সত্বরক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র অল্পবয়স্ক আনন্দ রাও। আনন্দ রাও, গোবিন্দ রাও গায়কওয়াড়ের (গুই-কুমারের) শ্যালককন্যা মীনা বাইয়ের পরিণয় হয়। শৈশবেই আনন্দ রাওয়ের পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, তিনি মাতামহালয়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি যখন স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন দেওয়ান রঘুনাথ উপেক্ষারের হস্ত হইতে গৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার পূর্ব্বক সমস্ত রাজ্যসূত্র নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সিন্ধে (সিন্ধিয়া), হোলকর ও অপর ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের উপর্য্যুপরি আক্রমণে ধার প্রদেশ দুরবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। রাজ্যের এইরূপ দুর্দ্দশা ও অবস্থা দর্শনে অতিমাত্র চিন্তাক্রান্ত হইয়া আনন্দ রাও অচিরকালমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

ধার রাজ্য যখন এক দিকে এইরূপ বহিঃশত্রুর আক্রমণে ও লুণ্ঠনাদিতে জর্জ্জরিত ও বিপর্য্যস্ত ও অপর দিকে দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের অরাজকতা ও অব্যবস্থায় অরাজকপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আনন্দ রাও পওয়ার তৎপ্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া দুশ্চিন্তানলে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তখন মীনার বয়স সপ্তদশ বৎসর মাত্র। আনন্দ রাও সত্য সত্যই মীনাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া গিয়াছিলেন। ধার রাজ্যে মীনার হিতকারী কেহ ছিল না। রাজ্য ও রাজপুরী সেই শোকতপ্তা অনাথা বালবিধবার পক্ষে শত্রুময় হইয়া উঠিয়াছিল। মুরারি রাও নামক আনন্দ রাওয়ের এক নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় ধার রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্বের জন্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া, মীনার জীবনও সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। অধিকন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বামীর পরলোকগমনকালে মীনা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কাজেই পলায়ন ভিন্ন সে সময়ে অবলার আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না। মীনা বাই এক জন বিশ্বাসী রাজনিষ্ঠ দুর্গাধ্যক্ষের হস্তে ধার রাজ্য রক্ষার ভারার্পণ করিয়া, স্বয়ং নির্বিঘ্নে প্রসূত হইবার জন্য, ওজরাটের অন্তর্গত 'নণ্ড' গ্রামে গমন করিলেন। তথায় অতি অল্প দিবসের মধ্যে

বংশপরিচয়।

বিধবার বিপত্তি।

পুত্রমুখ দর্শন করিয়া তিনি পূর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইলেন। ক্রমে শিশু পুত্র রামচন্দ্রকে বাবের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার আশা ও বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইল। এমন সময় মীনা তাঁহার বিশ্বস্ত দুর্গাধ্যক্ষের নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল, 'আপনি বার নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দুর্গাশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান ও স্বপক্ষ পরিপুষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করুন।' এই পত্র পাইয়া মীনার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া দশ বার জন অনুচর সহ বার নগরোপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। হায় মীনা! কোথায় দুর্গাধ্যক্ষের সাহায্যে পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজমাতার ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে—ভাবিয়াছিল, না, বিধিবিড়ম্বনায় বিশ্বাসভ্রষ্ট কর্ম্মচারীর কপটজালে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে চলিল।

ষড়যন্ত্র।

মীনার রাজ্য-পরিত্যাগের পর মুবার (মুনারি) রাও দিন দিন অধিকতর প্রবল হইতেছিল। সে বার রাজ্যের অধিকাংশ কর্ম্মচারীকে উৎকোচ প্রদান করিয়া বা উপাধান্তর প্রয়োগে বশীভূত করিয়াছিল। মীনার পুত্রোৎপত্তির সংবাদশ্রবণে সে অধিকতর ক্রুদ্ধ ও চিন্তিত হইয়াছিল। মীনা বাই ও তাঁহার শিশু সন্তানকে হস্তগত করিবার জন্য, পালিচ গ্রামে মীনার বিশ্বস্ত দুর্গাধ্যক্ষকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে সচেষ্ট হইল। দুর্গাধ্যক্ষ উৎকোচাদির প্রলোভন সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া অনাথা বিধবার সর্ব্বনাশসাধনে স্বীকৃত হয়।

অনুরোধ।

মীনা এই সকল চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে না পারিয়া বিশ্বস্তচিত্তে নগরে প্রবেশ করিলে, দুর্গাধ্যক্ষ তাঁহাকে বুঝাইলেন, সে দিন দুর্গে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না। কাজেই সরলা বালা সে দিন দুর্গাধ্যক্ষের নির্দ্দিষ্ট এক গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন দুর্গমধ্যে প্রবেশে সম্মত হইলেন। অতঃপর মুবার রাও সসৈন্যে মীনার গৃহ আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল যে, 'আমার শরণাপন্ন হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত না হইলে, আমরা এই গৃহে অগ্নিসংযোগ করিব।' অকস্মাৎ এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া অবরুদ্ধা মৃগীর ন্যায় সেই অসহায়া বালার মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা বাহুল্য। কিন্তু মীনা সেই বিপদে অভিভূত না হইয়া ধৈর্য্যসহকারে স্বীয় উদ্ধারের, শিশু-পুত্রের আনন্দ রাওয়ের বংশরক্ষার উপায়-উদ্ভাবনে অবহিত হইলেন। নিস্তব্ধরাত্রে কোনও অজ্ঞাত উপায়ে তিনি একটি দরিদ্রা কৃষকরমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার পুত্রের সহিত স্বীয় পুত্রের পরিবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার উপদেশক্রমে সেই কৃষকরমণী স্বীয় পুত্রটিকে তাঁহার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া, শিশু রামচন্দ্রকে গ্রহণপূর্ব্বক নিশীথ অন্ধকার ভেদ করিয়া, শত্রুসৈন্যের অলক্ষিতভাবে দুর্গাধ্যক্ষের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করিল, এবং তাঁহাকে বলিল, 'মীনা বাই আপনার প্রতি বিশ্বাস করিয়া এই শিশুকে—রাজ্যের প্রকৃত ও ধর্ম্মসঙ্গত উত্তরাধিকারীর রক্ষার ভার সর্ব্বতোভাবে আপনার উপর প্রদান করিয়াছে। অতএব আপনি ইহাকে গ্রহণপূর্ব্বক ইহার রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন; ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা।' দুর্গাধ্যক্ষের হৃদয় মীনার এইরূপ স্ত্রীসুলভ বিশ্বাসপরায়ণতাদর্শনে বিগলিত হইয়া গেল। তিনি বালককে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মীনা এই সংবাদশ্রবণে তুষ্টা হইয়া মুবার রাওকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি আত্মসমর্পণ করিব না; তুমি ইচ্ছা করিলে গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে পার।' তাঁহার বন্ধুবর্গেরা তাঁহাকে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, না, আমি যেখানে আছি, সেইখানেই থাকিব, পলায়ন করিব না। এখন যদি এই গৃহে অগ্নি-

অবরোধ।

মুক্তির উপায়।

[illegible] হইতে নামাইতে [illegible] করিয়া, স্বামীর চিতাশয্যায় শুয়াইতে লইয়া। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাগডেন্ বার্গের [illegible] যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এ দিকে রাজপুতের তুর্কপ্রবেশের কথা প্রচার হইয়া মুরাদ ও মীনাকে পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যদের তুর্কিতাজের জন্য ব্যস্ত করিল। কাজেই, মীনার উত্তর দিকারীকে [illegible]

মৃত্যুযোগ।

বেরূপ তাহার প্রথম উদ্যোগ হইয়াছিল। ধীর [illegible] বাহা বৃদ্ধি লাভ করিয়া, আপনার বল পুষ্টিসাধনে [illegible] হইলেন। তিনি [illegible] বিশ্বাসের ও মুরাদ রাখিতে। তুর্কিবাসে, বিষয় বর্ণনা করিয়া, নিকটবর্ত্তী [illegible] দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষিদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সেনাসমূহে, [illegible] সহাধীন প্রতিহত হইয়া, দেখিল যুদ্ধবিগ্রহে যে [illegible] হইতেছিল, তাহাতে কোনও নরপতিই মীনার সাহায্যার্থ সৈন্যপ্রেরণ করিতে পারিলেন না। কেবল নরোদার [illegible] মীনার [illegible] বলিয়া তাঁহাকে এই নিদারুণকালে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, [illegible] নাম্বক [illegible] এক [illegible] মহারাষ্ট্রীয় [illegible] মীনা [illegible] বিনিত হইলেন। তাঁহারা [illegible] মীনা [illegible] করিতে [illegible] করিলেন। মুরাদের [illegible] পরাজিত হইলেও, সে প্রথমে [illegible] পরাজিত হইল না। কিন্তু মীনার [illegible]

জয়লাভ।

কালব্যাপী [illegible] ক্লান্ত, [illegible] তাহাকে [illegible] হইয়া যান [illegible]। [illegible] পলায়ন করিতে হইল। ইহার [illegible] পরেই [illegible] যুদ্ধের [illegible] হওয়ায়, মীনা [illegible] নিকেতে হইলেন।

[illegible] বিজিত ও [illegible] দেখিয়া, মীনা [illegible] তাঁহাকে [illegible] মন্ত্রীর [illegible] করিলেন। মীনা [illegible] [illegible] গ্রহণ করায়, [illegible] বিজ্ঞোহানল [illegible] হইয়া, সর্ব্বত্র শান্তি [illegible] ও [illegible] হইল। কিন্তু বিধাতা মীনার [illegible]

পরাজয়।

[illegible] দেন নাই। এই কঠোর [illegible] [illegible] কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্যই বোধ হয় বিধাতা তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [illegible] মীনার [illegible] জীবনের এক [illegible] হইতে না হইতে আর এক [illegible] পূর্ব্ব [illegible] আবির্ভাব হইল। [illegible] শান্তি স্থাপিত হইল, তাঁহার [illegible] যে [illegible] উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সহসা তাঁহার [illegible] পুত্র রামচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুতে [illegible] [illegible]। তিনি বাল্যশোকে [illegible] হইয়া রাজকার্য্যে [illegible] করিতে [illegible]।

এই সময়ে মধ্য [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল। [illegible] [illegible] [illegible]

রাজা সেঙ্কের পুনঃপুনঃ আক্রমণে জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। পেণ্ডারী (পিণ্ডারী) সর্দ্দার করীম খাঁ তার প্রদেশের একাংশ গ্রাস করিল, কিন্তু সরকারও সে সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। মীনা রাজ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও পরের অত্যাচার হইতে প্রজা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। নিকটবর্ত্তী প্রায় সকল পরাক্রান্ত ভূপতিই বলপ্রকাশে তাঁহার নিকট হইতে কর আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অতএব মীনা রাজের সমস্ত সঞ্চিত ধন নষ্ট হইয়া তিনি ঋণজালে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। দিন দিন দেশের অবস্থা যেরূপ অশান্তিকর ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে রণমূর্ত্তিধারণ ভিন্ন মীনা রাজ রাজ্যরক্ষার কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। তিনি সৈন্যসংখ্যার বৃদ্ধি করিয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ লুণ্ঠন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অষ্ট সহস্র সৈন্য সহ বাপু রঘুনাথ বহিঃশত্রুর আক্রমণনিবারণপূর্ব্বক পুরদেশলুণ্ঠনের জন্য প্রেরিত হইলেন। মীনা রাজ দুর্গে অবস্থানপূর্ব্বক শাসনব্যবস্থা প্রর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

উপায়।

এই বলাবলম্বিত উপায়ের ফলে, মীনার ধনাগম হইতে লাগিল। সৈন্যরক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ ও পিণ্ডারী, কোলকর ও পেণ্ডারী প্রভৃতিকে করপ্রদানকার্য্যে সেই অর্থ ব্যয়িত করিয়া, তিনি ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় অন্যান্য নরপতিগণের নিকট তাঁহার সম্মানবৃদ্ধি ও দস্যুদিগের উপদ্রব নিবারিত হইয়া রাজ্যে বহুপরিমাণ শান্তি স্থাপিত হইল। কয়েক বৎসর পরে মধ্য-ভারতে ইংরাজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হওয়ায়, পেণ্ডারীদিগের দমন হইল, এবং অন্যান্য ভূপতিগণ তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া, পূর্ব্ব উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগে বাধ্য হইলেন; মীনা রাজও ইংরাজদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া, তাঁহাদিগের সাহায্যে গতবৈভব ও হৃতচ্যুত প্রদেশসমূহ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। মীনার ব্যবস্থাগুণে অদ্যাপি তাঁর রাজ্য তাঁহার বংশধরগণের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয় নাই।

রাজ্যে শান্তি।

অবোধ।

১

কে জানে এ কি এ দশা? নিশিদিন অনিবার
আঁখি-ফাটা আঁখিজল, বুক-ফাটা হাহাকার।
প্রেম নাই, প্রীতি নাই, শুধু শুক্ক ধূলিখেলা,
নিরাশ জীবন-পথে নিরাশ স্বপন-মেলা।
নূতন যৌবন-বনে প্রেমের কুসুম ফুটে,
মধুর মিলন-রসে অমিয়-লহরী ছুটে,
চোখে শুধু ভাসে হাসি, কানে শুধু বাজে গান,
নাসায় সুরভি শ্বাস, পুলকে আকুল প্রাণ,—
তা নহে, তা নহে, এ কি!—নিশিদিন অনিবার
আঁখি-ফাটা আঁখিজল, বুক-ফাটা হাহাকার।

নিয়ত জ্ঞানের দ্বারে প'ড়ে হিন্দু-অচেতন,
স্বপনেরে সত্য ভাবি' বিহ্বল পাগল মন ;
কঠোর সমস্যা ল'য়ে দিন রাত কেটে যায়,
'বিজ্ঞান'-পিপাসু-প্রাণ ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিতে চায় ;
কল্পনারে সাথী করি উঠি ক্রত মনোরথে
ব্যাকুল বাসনারাশি ছুটিবারে মেঘপথে।
পূর্ণিমাকিরণে বসি' নির্নিমেষ দু' নয়ানে
চাহিয়া থাকিতে শুধু দূর ছায়াপথ পানে।
হাতে ল'য়ে গ্রহরাশি গণিতে অঙ্গুলী যায়,
গাঁথিতে তারার মালা ফুলের কলিকা প্রায়।
হারুণ দর্শন ল'য়ে নিশীথের আসরণ,
জগতের তত্ত্ব লাগি-দেবলোকে বিচরণ ;
অসীমের দ্বারদেশে প্রার্থনায় বজ্রনাদ,
হৃদয়ে নিরাশা শেষে কল্পনায় অবসাদ!—
জ্ঞানের ভিখারী আমি একপে কাটানু কাল,
আপনাতে জড়াইনু আপনারি ইন্দ্রজাল!

কঠোর শাস্ত্রের পথে কুয়াসা-আঁধার-আলো,
হৃদয় নেয়া তাও তোর, তাও তোর হিম ভালো।
মিছে তুই ফিরে এলি তুচ্ছ এ সংসার-ধামে,
প্রেমের মরমে হায়, ডাকিলি প্রেমের নামে।
জীবন-নিদাঘে তোর শুধায়ে ফুটালি ফুল,
মরমের পাশ দিয়ে আশা-নদী কুলুকুল!
রোপিলি প্রণয়-তরু, বসিলি বিজন তীরে,
একটিও পাখী এসে গান গাহিল না তায়।
ছুটাইলি পরিমল, পরিশি প্রভাতী নীল ;
বৃথায় আগ্রহ তোর ফুটিল না অনিমাল।
কে জানে ধরিতে কারে বাড়াইলি আলিঙ্গন,
উপহাসি শুধু তোরে ব'হে গেল সমীরণ।

ভালবাসা অন্বেষণে নিয়ে এলি হাহাকার,
আপনারে বিসর্জিয়ে কি ল'য়ে ফিরিবি আর?

এখনো এখনো তুই ভেবে দেখ্ দেখ্ মন,—
এখনো বৈরাগ্য তোরে দিতে চাহে আলিঙ্গন।
সার্বভৌম এ জগৎ,—এ জগতে প্রেম নাই;
সংসার শ্মশানে তার পড়ে শুধু আছে ছাই।
ভস্মে মূলরজ ভাবি লেপিয়া মরম-তল,
প্রক্ষালিতে পরিধানে দিতে হয় অশ্রুজল।
কবির হৃদয় তোর, তুই চাস কাব্যখানি,—
জীবন-নন্দনবনে মন্দার কুসুমরাশি,—
তুই চাস ছুটিবারে স্বর্গের আলোক পানে,
সে তোরে টানিয়া আনে বুভুক্ষার মাঝখানে।
একমাত্র চুম্বনেতে বরষ কাটাবি হায়!
নিষ্ঠুর অরুচিবশে সে তোরে ফেলিয়া যায়।
একটু অধিক হ'লে হৃদয়ে সে বাসে লাজ—
প্রাণে যেন ফুটে শেল, শিরে যেন পড়ে বাজ!
হায় রে! দুর্লভ প্রেম, দুর্লভ সে ভালবাসা,
কোথা কোন্ দেশে গিয়ে মিটিবে এ দীর্ঘ আশা?

তাই বলি, এইবার ফিরে চল্, চল্ মন;
আজও ওই ডাকে তোর পুরাতন সখাগণ।
সৃষ্টির হৃদয় ছেঁকে মুছে ফেল্ ফুলরাশ,
বিকশিত বালিকার শশিমুখে কচি হাস।
ক্ষুদ্রেরে তাড়ায়ে দিয়ে মহানেরে কোলে ধর;
অন্ধকারে ঢেকে ফেল্ প্রেমের বাসর-ঘর।
যাহার চরণ-তলে সর্বস্ব ঢালিয়া দিলি,
যাহার সুখের লাগি নিজেরেও বিকাইলি,
সে তোর প্রলাপবাণী শুনিতে না চাহে আর,
বহিতে পারে না তোর দুরন্ত প্রেমের ভার;
তাই বলি, আর কেন? চেয়ে যদি দেখিল না,
বুক-ভরা ভালবাসা বুঝিল না বুঝিল না।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ক্রিশ্চিনা রসেটির কবিতা।

আমাদিগের বঙ্গভাষায় মহিলা কবিদিগের কোনও বিশেষ নাম নাই; কিন্তু বহু মহিলা-কবির মধুর সঙ্গীতে বাঙ্গলা কবিতাকুঞ্জ মুখরিত। ইহা আমাদিগের অল্প আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা নহে যে, বঙ্গসাহিত্যের এই গঠনযুগেই মহিলা লেখকগণ পুরুষ লেখকদিগের সহিত সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। অল্প দিন হইল, ইংরাজ মহিলা-কবি ক্রিশ্চিনা রসেটির মৃত্যু হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পুস্তক হইতে মহিলা-কবি সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

ক্রিশ্চিনা রসেটি যে অসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বরী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ক্রিশ্চিনার পিতামাতা ইটালীয় লোক হইলেও, লণ্ডনের জনকোলাহলময় বক্ষে ক্রিশ্চিনার জন্ম ও লণ্ডনই তাঁহার বাসস্থান। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কবিতার ভাব ও মাধুরী খাঁটি ইংরাজী। কাজেই তাঁহাকে ইংরাজ কবি বলা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। ক্রিশ্চিনার পিতা গ্রেব্রিয়েল বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেই সংগ্রাম-শঙ্কিল স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করেন। সেখানে ইটালীয় ভাষার অধ্যাপনা করিয়া তাঁহার কিছু আয় হইত, তাহাতেই সংসার চলিত। ক্রিশ্চিনার ভ্রাতা ডাণ্টে গ্রেব্রিয়েল রসেটির নাম এখন ইংরাজী সাহিত্যে সুপরিচিত; তবে কবিতা রচনা করিয়া ও চিত্র অঙ্কিত করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে ডাণ্টে গেব্রিয়েলের বহুদিন লাগিয়াছিল। ক্রিশ্চিনা স্বয়ং গৃহকর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। জননীর প্রতি তাঁহার অচল অনুরাগ ছিল। ধূলিধূসরিত সৌধাবলী লণ্ডন মহানগরের জনতাপীড়িত বক্ষে ক্রিশ্চিনার কোলাহলহীন জীবন যাপিত হইয়াছিল। এক জন এ কথাও বলেন যে, ভ্রাতা ডাণ্টে গেব্রিয়েলের চিত্রে মহিলার আননে যে বিষাদময় ভাব চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, ভগিনী ক্রিশ্চিনার বহুলমুহে-মিকাচ্ছন্ন, কোমল, বিষাদভারাক্রান্ত দৃষ্টিই তাহার আদর্শ।

পরিচয়।

লেখক বলিয়াছেন যে, ক্রিশ্চিনাকে প্রথমবার দেখিয়া তাঁহার মনে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহা ভুলিবার নহে। তাঁহাকে দেখিলে একটু দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত; তাঁহার ভ্রূযুগলে যে গাম্ভীর্য্য প্রকটিত হইত, তাঁহার কোনও আলেখ্যেই তাহা সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হয় না। তাঁহাকে দেখিলেই প্রতিভাশালিনী বলিয়াই বোধ হইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর বড় মধুর, বড় মোহন; কিন্তু তাঁহার আর একটা বিশেষত্ব ছিল, সেটা তাঁহার "Clear cut method of syllebification." তাহা বোধ হয় তাঁহার বিদেশীয় বংশের ফল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, তাঁহার উচ্চারণে, তাঁহার ভাবায় বা তাঁহার ভাবে তিনি খাঁটি ইংরাজ হইলেও, ক্রিশ্চিনার এমন একটা কিছু ছিল, যাহাতে মীমাংসেই বুঝা যাইত যে, তিনি বিদেশিনী। কিসে যে তাহা প্রকাশ পাইত, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলা অসম্ভব। তাঁহার কথা শুনিলে কাহারও কাহারও মনে হইত,—যেন ইংরাজী ভাষার বিশেষরূপ অভিজ্ঞ, বহুবর্ষাবধি সেই ভাষার প্রয়োগকুশল কোনও বিদেশীয় কথা কহিতে-

আকৃতি প্রকৃতি।

হেন। যে সকল বিবিধ ব্যাপারের সংমিশ্রণে, ক্রিশ্চিনার জটিল চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আহার বিদগ্ধতা যে অন্যতম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কবিতা-রচনা।

কবিতা-রচনার যশ অধিকাংশ কবির পক্ষেই দুর্লভ, বহু সাধনার ফল। কীর্টসের জীবিতাবস্থায় তাঁহার ভাগ্যে যশোলাভ হয় নাই; যশোলাভ করিতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কতদিন গিয়াছিল। ক্রিশ্চিনা রসেটির ভাগ্যেও সহজে যশোলাভ হয় নাই। বহুদিন ভাগ্যবিপর্যয়ের পর, পাঠকের অবহেলার অন্ধকার ভেদ করিয়া তবে যশের আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বহুদিন ক্রিশ্চিনা একটী বিদ্যালয়ের কার্য্যে জননীর সহকারিতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভগিনী ইটালীয় ভাষার অধ্যাপনা করিতেন। তখন কি, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দেও দুহিতারাণীর পৌত্র ডিউক্‌ অব্‌ ক্লারেন্সের মৃত্যুউপলক্ষে কোনও পত্রের জন্য একটী কবিতা রচনা করিয়া ক্রিশ্চিনা তিন গিনি মাত্র পাইয়াছিলেন, এবং তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিলেন। অথচ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতেই তিনি অতি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার অষ্টাদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে রচিত একটী ক্ষুদ্র গীতিকবিতার অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—

আমি যবে মরি যাব প্রিয়, আমি কিছু বুঝিব না সখা,
গাহিও না বিষাদের গীতি; ছায়া আসে, বাধিবারা ঝরে,
রোপিও না কাউ মোর শিরে, আমি আর শুনিব না সখা,
রচিও না গোলাপের বীথি। পাখী গাহে সুমধুর স্বরে।

তুষারাক্তি লাগিবে সেথায় চিরব্যাপ্ত সান্ধ্য অন্ধকারে
ধারাসিক্ত,—শোভিত শিশিরে। নেহারিব কত স্বপ্নকল,—
পার মোরে ভুলে যেও সখা, হয় ত—এ সব মনে করে,
পাব বেশ হৃদয়-মন্দিরে। হয় ত বা ভুলিব সকল।

পাঠকসমাজে ক্রিশ্চিনার কবিতার আদর সত্ত্বেও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কবিতা লিখিয়া বৎসরে তিনি চার বা পাঁচ শত টাকা মাত্র পাইতেন; ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার আয় বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এক জন অ্যাংগ্লো চিত্রকর তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন; ক্রিশ্চিনাও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু চিত্রকর রোমানক্যাথলিক-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া, ক্রিশ্চিনা এ বিবাহে সম্মত হন নাই।

অন্যান্য কথা।

ক্রিশ্চিনা রসেটির প্রতিভা সম্বন্ধে নানা সমালোচক নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন: মিষ্টার থিয়াটস্‌ ডানটন্‌ তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছেন। মিষ্টার অ্যাণ্ড্রু ল্যাং বলেন যে, তাঁহার কবিতায় চেষ্টার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার মিষ্টার সাইমন্‌স বলেন যে, ক্রিশ্চিনা রসেটির কবিতা আপনার মাধুরীর কথা আপনি অবগত নহে। এখানে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সকল রচনা সম্বন্ধেই সমালোচকদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হওয়া অসম্ভব নহে।

ভ্রাতার কথা।

ভ্রাতা উইলিয়ম রসেটি ভগিনী ক্রিশ্চিনার রচনা সম্বন্ধে বলেন যে, তাহাতে চেষ্টা ছিল না, তাহা নির্ঝরের বারিধারার মত আপনা-আপনি প্রবাহিত হইত। ভ্রাতার মতে, রচনার পূর্ব্বে ভগিনী কখনও রচনার বিষয় লইয়া বিশেষ চিন্তা করেন নাই; আবার নিয়ম মত চেষ্টা করিয়া রচনাও তিনি করেন নাই। যখন মনে কোন ভাব সমুদিত হইত, তখন ক্রিশ্চিনার রচনা আপনি আসিত। তিনি

প্রথমে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি লিখিয়া যাইতেন, এবং প্রথম বার রচনার পর বিবেচনা করিয়া সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার মত এই ছিল যে, কবিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে স্বাভাবিক ভাবমাধুরীর সঙ্গে সঙ্গে রচনামাধুরীও অত্যাবশ্যক। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভ্রাতা ও ভগিনী প্রায় এক গৃহে বাস করিতেন; অথচ ভ্রাতা এক দিনও ভগিনীকে রচনাকার্য্যে ব্যাপৃতা দেখিতে পান নাই। ক্রিশ্চিনা রচনা-সম্বন্ধে কাহারও উপদেশ বা পরামর্শ লইতেন না। তবে ভগিনীর প্রকাশিত রচনা লইয়া ভ্রাতা ডান্টে গেব্রিয়েল দোষ গুণ বাছিয়া ভগিনীকে তাঁহার কবিতা সমালোচনা করিয়া শুনাইতেন।

আমরা ক্রিশ্চিনার যে কবিতাটির অনুবাদ প্রদান করিয়াছি, তাহার মধ্যে বিষাদের একটা অন্তঃসলিল প্রবাহ পরিলক্ষিত হইবে। বাস্তবিক তাঁহার এতাধিক সুমধুর কবিতায় মৃত্যুর প্রতি এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কবিতার একাংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

জীবন মধুর নহে, সে দিন মধুর হবে
যেই দিন আসিবে মরণ;
বুঝিবে না ফুটে ফুল, উড়ে যায় পাখীকুল,
প্রজাপতি ছুটে অগণন।
বুঝিবে না বায়ু আর এ মোহের চারিধার
আসিয়া উঠিছে তুলারাশি।
আর শুনিবে না কবে, থাকিয়া মধুর রবে
চাতক যেতেছে মেঘে ভাসি
চঞ্চল বসন্ত বায়ু, খেলিবে না অলিবালি,
দেখিবে না শস্যক্ষেত্র আর।
আর বুঝিবে না প্রাণ, মোদের অস্তিত্ব জ্ঞান,
কে এখন করে অধিকার।

মৃত্যুর বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ক্রিশ্চিনার শরীর বড় অসুস্থ ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে আয়োগ্যলাভ্যা বিদূষিত হইয়া গিয়াছিল। অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত ক্রিশ্চিনা রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন; এত যন্ত্রণাতেও তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্য বিনষ্ট হয় নাই।

সমাজনীতি।

জাপানী মহিলা।

আজকাল জাপান-ভ্রমণ বড় সখের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। য়ুরোপ-ভ্রমণ এখন চর্ব্বিতচর্ব্বণ-আমেরিকার কথের ভিড়ে প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে—কাজেই ভ্রমণকারীকে হয় আফ্রিকায়, নয় ত এসিয়ায় আসিতে হয়। আফ্রিকার যে নিবিড় কালিমাচ্ছন্নতার ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোক আজ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই সঙ্কটসঙ্কুল প্রদেশে ভ্রমণ সকলের পক্ষে সহজ নহে, কারণ, সকলেই লিভিংষ্টোন বা ষ্ট্যানলি নহে। তবেই রহিল কেবল এসিয়া। এসিয়ায় চীন ও জাপানই অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত; কিন্তু চীনে ভ্রমণের সুবিধা অতি অল্প; জাপানে সুবিধা অত্যন্ত অধিক: তাই আজ জাপান যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের সৃষ্ট মায়াপুরীর মত সহসা আপনার শতসৌধকুসোভিত বসুমতী শির উত্তোলিত করিয়াছে। কাজেই আজকাল জাপান-ভ্রমণ বড় সখের হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি 'লেডি' নামক পত্রে কোনও লেখক জাপানী মহিলাদিগের যে বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

কবি সার এডুইন আর্ণল্ড কেবল আপনার রচনায় জাপানী মহিলাদিগের প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। পরন্তু বৃদ্ধ বয়সে এক জাপানী যুবতীকে বিবাহ করিয়া, তাঁহার জাপানী প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমেরিকার কোনও গ্রন্থকার লোটি তাহাদিগের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। বোধ করি, উভয়েই ভ্রান্ত। জাপানী মহিলাগণ বড় হৃদয়গ্রহণ; তাহারা অদৃষ্ট পুত্তলিকামাত্র নহে। তাহাদের বেশ নয়নবিনোদন, তাহাদের ব্যবহার বড় মধুর, তাহাদের আমোদ আহ্লাদ শিশুসুলভ। কিন্তু তাহাদের চরিত্রে যে গভীরতা আছে, তাহাই সহসা বিদেশীর চক্ষে পড়ে না। গৃহকর্ম্মে জাপানী রমণীর বিশেষ দৃষ্টি; বড় ঘরের গৃহিণী ভৃত্যদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, দরিদ্রপত্নী স্বামীর আহ্লাদের পূর্ব্বে গৃহকার্য্য সুসম্পন্ন করেন। জাপানী রমণীকে দেখিলে সদাকার্য্যরত মধুমক্ষিকা ও মোহনদর্পণ প্রজাপতির কথা মনে পড়ে। বড় ঘরের গৃহিণীরা পরস্পরের গৃহে সম্মিলিত হইয়া, পোষাকের কথায়, সাহিত্যের কথায় ও সে দিন গৃহপ্রাঙ্গণে যে সকল চিত্র বিলম্বিত থাকে, সে সকলের কথায় সময় অতিবাহিত করেন; সঙ্গে সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র পেয়ালায় চা-পান ও ক্ষুদ্র পাইপে ধূমপান চলে।

দৈনন্দিন জীবন।

জাপানী মহিলারা সময় সময় আত্মীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আপনার নূতন পোষাক দেখাইয়া থাকেন। অমুকেশের মহিলাগণ নিমন্ত্রণগৃহে অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া গর্ব্বানুভব করেন। ইতিপূর্ব্বে জাপানী মহিলারা দেশীয় বেশ ত্যাগ করিয়া য়ুরোপীয় বেশ পরিধান করিতেছিলেন। এখন সে স্রোত ফিরিয়াছে ভালই হইয়াছে; কারণ দেশীয় বর্ণবৈচিত্র্যসঙ্কুল বেশ পরিধান করিলে, দেশীয় প্রথায় কেশবিন্যাস করিলে ও দেশীয় মোজা ও জুতা পরিলে যে যুবতীকে সুন্দরী দেখায়, বিদেশীয় বেশে তাঁহাকে নিতান্ত কুরূপা বলিয়া বোধ হয়। সাম্রাজ্ঞীর সহচরীগণ আজও য়ুরোপীয় বেশের ভক্ত। যে জাপানী মহিলা দেশীয় বেশ বাছাই সম্বন্ধে অত্যন্ত সুরুচির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, বিদেশীয় বেশ সম্বন্ধে তাঁহার রুচিরও নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না। য়ুরোপীয় বেশে জাপানী রমণী যে প্রকার বর্ণবৈষম্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে নয়ন ক্লিষ্ট হইয়া উঠে, আর বিদেশীয় বেশের ব্যবহারে লাঞ্ছনার ত সীমা নাই।

বেশবৈচিত্র্য।

এখন একাধিক রাজিকাবিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচার হইলে জাপানী মহিলাদিগের সহিত বিদেশিনীদিগের অধিক পরিচয় হইবে, এবং হয়ত সময়ে উচ্চশ্রেণীর মহিলাগণ অধিক স্বাধীনতা পাইবেন। সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মহিলাগণ অবাধ মুক্ত স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিয়া থাকে। সন্ধ্যাসময়ে বস্ত্র দেখিতে, দোকানে দ্রব্যাদি কিনিতে, মন্দিরে উৎসব দেখিতে ও নগরের বা গ্রামের নানা স্থানে নানা দৃশ্য ও তামাসা দেখিতে তাহারা সর্ব্বদাই যাইয়া থাকে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মহিলাদিগের স্বাধীনতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ; তাঁহারা বান্ধবীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনেন ও বান্ধবীদিগের গৃহে গমন করেন, এই পর্য্যন্ত।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা।

জাপানে সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাদিগের সর্ব্বপ্রধান বিপদ শ্বাশুড়ী। য়ুরোপীয় মহিলাগণও শ্বাশুড়ীর অত্যাচার ভোগ করেন বলিয়া বোধ হয়েন; কিন্তু জাপানী শ্বাশুড়ী যে কিরূপ বস্তু, তাহা তাঁহারা কখনো জানেন না। বিবাহের দিন হইতেই পুত্রবধূ শ্বাশুড়ীর সকল আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য, বলা বাহুল্য শ্বাশুড়ী আপনার অতিরিক্ত কর্ত্তৃত্বের অপব্যবহার করিয়া

প্রায়ই পুত্রবধূকে যাতনা দিয়া থাকেন। যদি কোন য়ুরোপীয়া মহিলা কোনও জাপানী পুরুষকে বিবাহ করেন, তবে তাঁহার প্রধান বিপদ শাশুড়ী। কাজেই য়ুরোপীয়া মহিলার পক্ষে জাপানী জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাণিগ্রহণ বুদ্ধির কার্য্য নহে; জ্যেষ্ঠ পুত্র জননীর সহিত এক বাটীতে বাস করিতে বাধ্য—কুলিটগণের সম্বন্ধে তেমন কোন বাধ্যবাধি নিয়ম নাই। তবে সুখের বিষয়, এরূপ বিবাহ বড় অধিক হয় না। এক জন ইংরাজ মহিলা এক জন য়ুরোপ-প্রবাসী জাপানীকে বিবাহ করেন। যত দিন দম্পতী য়ুরোপে ছিলেন, তত দিন কোনও গোলযোগই ছিল না। কিন্তু দেশে ফিরিতে না ফিরিতেই শাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিন কতক শাশুড়ীর অত্যাচার সহ করিয়া পত্নী পতিকে জানাইলেন যে, আর সহ্য করা অসম্ভব। তখন পতি-পত্নী পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, শাশুড়ীকে বুঝাইতে হইবে যে, ইংরাজ পুত্রবধূ দাসীমাত্র নহে। এই মতলব স্থির হইবার পর এক দিন ব্রেকফাষ্টের সময়েই পুত্রবধূ স্বামীকে হুকুম করিলেন, "আমার বুট জুতা খুলিয়া দাও এবং চট্ জুতা পরাইয়া দাও।" স্বামী তৎক্ষণাৎ পত্নীর আজ্ঞা পালন করিলেন। জননী বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে চাহিয়া রহিলেন; কারণ, স্ত্রী যে স্বামীকে হুকুম করিতে পারে, এ বিশ্বাস জাপানী মহিলার নাই। স্বামী জুতা লইয়া ভোজন হইতে না হইতেই স্ত্রী স্বামীকে আপনার পাল আনিতে পাঠাইলেন। স্বামী তখনই হুকুম তামিল করিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "পাল পরাইয়া দাও।" স্বামী তাহাই করিলেন, শাশুড়ীর ক্রোধের আর সীমা রহিল না। "যো দিন গিন্নী"র জন্য তাঁহার খেদও যথেষ্ট হইল, সন্দেহ নাই। যে পুত্র স্ত্রীর দাসমাত্র, সে পুত্রের সহিত তিনি আর কোন কথা কহিবেন না বলিয়া জননী পুত্রের গৃহ ত্যাগ করিলেন, দম্পতীও উদ্ধার পাইলেন।

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া কেহ এরূপ না ভাবেন যে, জাপানে পত্নীর প্রভাব নাই। সমাজের সকল স্তরেই জাপানী পত্নী স্বামীর ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া, সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-পরায়ণ হইয়া, নানা মধুর ভোজন গুণে স্বামীর উপর যে প্রভাব সংস্থাপন করেন, সে প্রভাব পতি-পত্নীর সমঅধিকারপ্রার্থিনী প্রতীচ্য পত্নীর প্রভাব অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নহে। জাপানী মহিলা এখনও বেশ ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে আপনার প্রাচ্য কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়া প্রতীচ্য আদর্শে আপনাকে গঠিত করেন নাই।

পত্নীর প্রভাব।

ইতিহাস।

সিপাহী-বিদ্রোহ।

সিপাহী বিদ্রোহের কথা এখনও নিত্য নূতন। সিপাহী বিদ্রোহের একটা বিশেষত্ব এই যে, বিদ্রোহকালে এক এক সম্প্রতি অল্পসংখ্যক ইংরাজ বহু ভারতবাসী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অসীম বীরত্ব বা অসাধারণ কৌশলে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; কেহ বা একক বহু শত্রু বিনাশ করিয়াছিলেন। এজন্য বা অল্পসংখ্যকের কীর্ত্তির নিকট বহু সংখ্যকের যুদ্ধের বীর-কাহিনী তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। সৈন্যাধ্যক্ষ সার হিউ গাফ্ বিদ্রোহকালে এ দেশে সৈন্যদলে কার্য্য করিতেন না—বিদ্রোহবহ্নিতে তিনি দগ্ধ হয়েন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাকে সেই বিদ্রোহজনিত অনলশিখার উত্তাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি যে পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে সিপাহী বিদ্রোহের কথা আছে।

সার হিউ গাফের অনেক কথা ইংলণ্ডের অন্যান্য পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু ঐতিহাসিকের ঘটনায় ও ঘটনাক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের কল্পনায় কিছু প্রভেদ থাকি-

নেই। সার হিউ বিদ্রোহকালে Victoria Cross লাভ করেন। তাঁহার রচনায় সৈনিকোচিত সংযম দৃষ্ট হয়। মিরাটেই প্রথম অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, মিরাটেই অনল ভীষণতম হইয়াছিল,—বিদ্রোহের চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সার হিউ মিরাটে ছিলেন।—সিপাহী বিদ্রোহ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। মিরাট অতি রম্যস্থান, সেখানে শিকার বা আমোদ কিছুরই অভাব ছিল না, তদ্ভিন্ন সেনাদল বিশেষ সামাজিক ছিল। আনন্দ-উৎসবের মধ্যে বিদ্রোহের মত একটা আকস্মিক বিপৎপাতের চিন্তা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। তখন পঞ্জাবে স্থির শান্তি বিরাজ করিতেছে, সীমান্ত প্রদেশেও সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। কাজেই কাহারও মনে কোনও আশঙ্কাই ছিল না।

ঝটিকার পূর্ব্বে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বসন্তকাল পর্য্যন্ত কোনও গোলই ছিল না,—তখন হইতে চর্ব্বি-সংবাদ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। পুরাতন Brown Bess বন্দুকের পরিবর্ত্তে নূতন বন্দুক ব্যবহারের প্রবর্ত্তনেই যত বিপদ উপস্থিত হইল। প্রথমে দুই এক খানা গৃহদাহ, দুই একটা সেনাদলের বিদ্রোহদান ইত্যাদি হইয়া গেল; সকলে ভাবিল, মেঘ কাটিয়া গেল। এই সময় সার হিউ কানপুর ও লক্ষ্ণৌ বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন। তখন কয় খানি গৃহদাহ হইয়া গিয়াছে; অধীনস্থগণ তখনও অসন্তুষ্ট ও কর্ত্তৃপুরুষদিগের আজ্ঞাপালনবিমুখ—এ সকল সত্ত্বেও ইংরাজ কোনও বিপদের আশঙ্কা করেন নাই। আপনার অসীম ক্ষমতায় ইংরাজের এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আপনার ক্ষমতায় এরূপ অল্প বিশ্বাস না থাকিলে, হয় ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ রক্তাপ্লুত দৃশ্য অঙ্কিত হইত না। সার হিউ নানা সাহেবকে শকটারোহণে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যত্নে ও অতিথিসৎকারে স্থানীয় ইংরাজগণের মুখে তাঁহার প্রশংসা আর ধরিত না।

নূতন টোটা।

সার হিউ তাঁহার পুস্তকে একটা ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। এক জন ফরাসী ভ্রমণকারী যে কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কানপুরে ইংরাজ অধিবাসিগণের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সংহারের হুকুম দিয়া নানা সাহেব আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ে বর্ত্তকীর নয়নরঞ্জন লাস্যলীলা দেখিয়া সারা রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

সার হিউর আপনার সেনাদলেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ পঁচাশি জন অপরাধী সৈনিকের সামরিক বিচার করা হয়। বিচারকালে সার হিউ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অনশ্ন ঘটিল।

কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলে অপরাধীদিগকে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। তাহারা ভূমিতে উপবেশন করিল; সকলে দোষ অস্বীকার করিতে বিলম্ব করিল না। তাহাদের মধ্যে অনেকে বহু দিন ইংরাজ সেনাদলে কার্য্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে, অনেকে "মেডেল"ও পাইয়াছে। তাহাদিগের মুখে রোষভাব প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু অদৃষ্টবাদী প্রাচ্যজনোচিত স্থিরভাব সকলের মুখেই দৃষ্ট হইতেছিল। অল্পক্ষণমধ্যেই মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেল। বিচারকালে কেবল একটা গোল হইয়াছিল। "এডজুটাণ্ট" যখন নামধাম জিজ্ঞাসা করেন, তখন কয় জন অপরাধী রুক্ষ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এডজুটাণ্ট সাহেব কি ইহা বলিয়াছেন?" কথাগুলি আবার বলা হইলে, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা।"

অপরাধীদিগের দণ্ড বড় কর্ত্তার মঞ্জুর হইলে, অপরাধীদিগকে দণ্ড শুনাইতে আনা হইল। দেশীয় সৈনিকদিগের বন্দুক ছিল, কিন্তু গুলি বারুদ কিছুই ছিল না। দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিয়া শুনান হইল। সেনাদলে যে যত দিন কার্য্য করিয়াছে, তদনুসারে দণ্ডদান হইতে

জারিল। প্রাচীন সেনাগণ কেহ বা যাবজ্জীবন কারাবাস, কেহ বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড পাইল। অপরাপর অপরাধীদিগের কেহ বা বিংশতি, কেহ বা পঞ্চদশ, কেহ বা দশ বৎসর কারাবাসের দণ্ড পাইল,—তাহাদের দশ বৎসরের কম কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইল না। সর্ব্বসমক্ষেই তাহাদিগের জুতা খুলাইয়া পায়ে বেড়ী পরান হইল। যখন তাহাদিগকে জেলখানায় লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহাদিগের কেহ কেহ কর্ণেল্ কে লক্ষ্য করিয়া জুতা ছুঁড়িলেন; তাহারা হিন্দুস্থানী ভাষায় "কর্ণেল"কে গালি দিতে লাগিল, এবং সর্ব্বদিগকে তাহাদিগের কথা মনে রাখিতে বলিল। যে দিন ইংরাজ সেনাদল সজ্ঞ না থাকিলে, বোধ করি, এমন্টী শুভতর কাণ্ড হইয়া যাইত। সকলে ভাবিল, বুঝি গোল মিটিয়া গেল। তখন কেহই বুঝেন নাই—এই সকল সিপাহীর দণ্ডে অন্য সিপাহীরা বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিল।

পণ্ডদান।

সেই দিন অপরাহ্ণে অপরাধী সিপাহীরা সকলে ব্যাপার বুঝিতে পারিল। অন্যান্য সেনানায়কের সহিত সার হিউও তাহাদিগের বেতন চুকাইয়া দিতে কারাগারে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। যদিও লেখকের তখন অল্পবয়স্কমাত্র, তথাপি সে দৃশ্য তাঁহার তরুণ হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সিপাহীরা কারাগারের কোঠরে আবদ্ধ ছিল। তখনও দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা তখনও "খারস" রহিয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা সকল কথা বুঝিল—বুঝিল যে, এত দিন সম্মানের সহিত যে কার্য্য করিয়াছে, আজ তাহা হইতে বিচ্যুত হইল, তখন তাহাদের এ ভাব আর রহিল না। বিশেষতঃ সিপাহীদিগের মধ্যে সৈনিক-ব্যবসায় তখন কুলব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সিপাহীর পুত্রও সেনাদলে প্রবেশ করিত। সাময়িক উত্তেজনায় একটা কাজ করা এক কথা, আর সকল বুঝিয়া কাজ করা আর এক কথা। সকল বুঝিতে পারিয়া বহু বৃদ্ধ সিপাহী কাঁদিতে কাঁদিতে সেনানায়কদিগকে তাহাদের উদ্ধার করিতে বলিতে লাগিল। ব্রহ্মদেশ সিপাহীও বৃদ্ধদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

কারাগারে।

সেই রবিবারে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। প্রভাত কাটিয়া গেল। সার হিউ ম্যাকনাবের সহিত একত্র গির্জ্জায় গমন করিলেন। তার পর সেই দিনই ম্যাকনাবের জীবন শেষ হয়। ইহার পর সার হিউ ম্যাকনাবের মৃতদেহ রাজপথে পতিত দেখিয়াছিলেন। নিয়মমত আপনার এক এক বন্ধুর কথা কর্ণেটর তত্ত্ব লইলেন; প্রাণিত অশ্বারোহী দুইটি ও তিন বাদ্যকরের সংবাদ লইলেন, তাহার পর বিশ্রাম করিতে আসিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সংবাদ আসিল, আগ্রের গিরিস্থ দুর্গ সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়াছে। সার হিউ বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, দেশীয় পদাতিক সৈনিকদিগের বাহিরে আসি লাগিয়াছে; বহু বাঙ্গলোও দগ্ধ হইতেছে। তাহার পরেই সংবাদ আসিল যে, সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ নরনারীদিগকে সংহার করিতেছে। সার হিউ অশ্বারোহণ করিয়া বাহির হইলেন। সিপাহীদিগের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—সেই সশস্ত্রসৈন্য সিপাহীরা অস্ত্রাদি লইয়া উন্মত্তের মত নৃত্য করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, যে দিকে ইচ্ছা গুলি চালাইতেছে।

বিদ্রোহারম্ভ।

উপস্থিত হইয়াই সার হিউ বুঝিলেন, সেখানে থাকা উচিত নহে; সেখানে থাকিলে মৃত্যু নিশ্চিত। সিপাহীরা দেখিতে পাইল, সার হিউ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। চিহ্নিত হইয়া তিনি অশ্ব ধাবাইবামাত্র তাঁহারা তাঁহার মস্তকলক্ষ্যে গুলি ছুড়িতে লাগিল ও অনবরত আওয়াজ করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেশীয় সেনানায়কগণ

"নয়শো রূপেয়া"।

স্মৃতি ও সমালোচনা।

'নয়শো রূপেয়া' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ * সম্প্রতি আমাদের সমালোচ্য। ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, পঁচিশ বৎসরেরও বোধ হয় কিছু বেশী পূর্ব্বে। যাঁহারা ২৫।২৬।২৭ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর ঈশ্বরেচ্ছায় আয়ুষ্মান হইয়া অদ্যাপি জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিকট 'নয়শো রূপেয়ার' পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কিছুই নাই।

কিন্তু ২৫।৩০ বৎসর কাল বড় কম নয়। তা ভত বেশীই বা কি? ২৫।৩০ বৎসরের রাত্রি দিনগুলি অনেকেরই চক্ষের উপর দিয়া এই ভ দেখিতে দেখিতেই দ্রুত দৌড়াইয়া গেল; 'সে ত এই ক' দিন বই ত নয়!' আমাদেরই অব্যবহিত অতীতের—অতি নৈকট্যের এবং উপস্থিতিরই ত কত আঁচড় কত দাগ তাহাদের গায়ে মাথায় মুখে-বুকে এখনও ঐ দেখা যাইতেছে; ২৫।৩০ বৎসর বেশী দিন আর কি! তথাপি পাটীগণিতের গণনা-মতে ২৫।৩০ বৎসর কাল একটা শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ বা তাহারও বেশী, বিলক্ষণ দীর্ঘকালই বটে। কাজেই সেই কালের কথা এখন পুরাণ কথারই মধ্যে পরিগণিত বলা যাইতে পারে। কল্যকার কথা যখন অদ্যই অতীত ইতিহাস, তখন কে বলিবে, ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের কথা লুপ্ত উপন্যাসের গুপ্ত কাহিনী নয়, বা তেমনিতর আর একটা কিছু নয়? কাজেই এত দীর্ঘ কাল পরে উহার এই দ্বিতীয় সংস্করণে 'নয়শো রূপেয়া'র পরিচয় নূতন করিয়াই কিছু দেওয়া প্রয়োজন।

'নয়শো রূপেয়া'র প্রথম সংস্করণের সহিত আমাদের এখন বিস্মৃতপ্রায় পূর্ব্বস্মৃতি সংযুক্ত রহিয়াছে। এই সাংঘাতিক সত্যমূলক, হাস্য ও করুণরস-মূলক সামাজিক নাটক যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং অভিনীত হয়, তখনও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গ সমাজে, বঙ্গ সাহিত্যে এবং বাঙ্গালীর শিক্ষাপ্রণালীতে, ঐরাবত-শক্তি সঞ্চালিত করিতেছিলেন। তখন বঙ্গদর্শনের

* ২ নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, পত্রিকা প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৹ আনা।

বসন্ত সৌরভে রঙ্গিম বাবুর ফুরন্ত গৌরব ঢেউ খেলিতেছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের একত্র-সমবেত অদ্যকার অসংখ্য সিংহ ও শল্কী হইতে অসংখ্য কাঁচ-পোকা ও শিপীলিকার গঠিত একটা একাডমি অফ্ লিটারেচর প্রতিজ্ঞা করিয়া, সংকল্প করিয়া, সভাসমিতি করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, শত লোকের শত রকমে লেখনী চালাইয়া, রাশি রাশি রেজলিউশন প্রচার করিয়া যে শক্তি সঞ্চালন করিতে সক্ষম হইতেছেন না, যে কার্য্যের প্রায় কিছুই করিতে পারিতেছেন না, নয়শো রূপেয়ার প্রথম প্রকাশকালে, সেই শক্তি—সাহিত্যের স্বতঃসংবোধিনী শাসনশক্তি এবং সেই কার্য্য—সাহিত্যে স্বাস্থ্য, সুরুচি, সৌন্দর্য্য ও সংযমপ্রদানের কার্য্য, বিনা সংকল্পে, বিনা প্রতিজ্ঞায়, একক এক ব্যক্তি, জীবিকা-অর্জ্জনের অসীম শ্রমের মধ্যে বিরলপ্রাপ্ত অবকাশকালে কথঞ্চিৎ পরিমাণে লেখনী চালন করিয়া, একখানি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠার কতিপয় প্রবন্ধ, কতিপয় পংক্তির দ্বারা, যেন এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে অবহেলে সঞ্চালন ও সংসাধন করিতেছিলেন। যখন ঈশ্বরচন্দ্র সমাজসংগ্রামে ও সাহিত্য-সংস্কারে অসীম শক্তি বিস্তার করিয়া এক বিন্দু বিশ্রাম অন্বেষণ করিতেছিলেন, এবং অক্ষয়কুমার বাণপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক বালীর বনকুটীরে বসিয়া বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে ও 'উপাসকসম্প্রদায়' সঙ্কলনে নিযুক্ত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র নব্য বাঙ্গালীর নবোত্থিত সাহিত্যের শাসয়িতা সম্রাট এবং 'বঙ্গদর্শন' সেই সম্রাটের শাসনদণ্ড ও সমার্জ্জনী। সম্রাট, সাহিত্যের সৃষ্টি, শাসন ও সম্মার্জ্জন, এ তিনই করিতেছিলেন। শাসন ও সম্মার্জ্জন কেবল সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় নহে, স্বকীয় সুমার্জ্জিত ও সুন্দর সৃষ্টি দ্বারাও করিতেছিলেন। মধুসূদন তখনও জীবিত, হায়! জীবিত ত। 'মেঘনাদ' 'তিলোত্তমা'দি ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিভার প্রভাতসুরভিসমীরে, তখন শিক্ষিত প্রভাবিত ও অশিক্ষিত আয়ারিত হইতেছে; প্রবল, সার্ব্বজনিক ও বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রথম সুলভ সাহিত্যপত্র 'সুলভ সমাচার' প্রকাশিত হইয়াছে। হেম বাবুর ও নবীন বাবুর নব কবিতা তখন অগ্নিকণা,—উত্তপ্ত মদিরা উদ্গীরণ করিতেছে; 'বৃত্র' 'পলাশী' ও 'ক্লিওপেট্রা' তখনও বোধ হয় অপূর্ণ পাণ্ডুলিপি,—প্রেসে প্রেরিত হয় নাই। তখন 'সোমপ্রকাশ' রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালা সংবাদপত্র, এখনকার আধবুড়া 'ভারতী' তখনও ভবসংসার দর্শন করেন নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুর দিব্যোজ্জ্বল উপাদেয় কাব্য—অনাদৃত উপেক্ষিত স্বপ্নপ্রয়াণ তখনও অশরীরী স্বপ্নরাজ্যের সীমাতিক্রম করিয়া পৃথিবী পরে

প্রস্থনিত হয় নাই। প্রয়াণের প্রথম ক'টি সর্গ বঙ্গদর্শনের বক্ষ শোভিত করিয়াছিল। 'প্রয়াণ'-কারের অধিকতর ভাগ্যবান কনিষ্ঠ ও কবি ভ্রাতা তখন নেহাত 'নাবালক'। বন্ধুত্বপ্রাণ, সর্ব্বজনপ্রিয়, (প্রকৃত) দীনবন্ধুর সুখ্যাতি ও সাহিত্যজ্যোতি তখন বঙ্কিম অপেক্ষাও বেশী। তখনও (জীবনের কখনই বা নয়) প্রথমোক্ত শেষোক্তের সহায় সারথি, সহোদরপ্রতিম। 'নীলদর্পণ', 'লীলাবতী', 'সধবা' প্রভৃতি তাহার বহুপূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যাকাশে নাটকীয় নভোমণ্ডলে দীনবন্ধু তখন সন্তাপহীন দিবাকরবৎ বিচরণ করিতেছিলেন। ঢাকার এখন-বিলুপ্ত 'বান্ধব' তখনও বাহির হয় নাই। দেওয়ান বাহাদুর ও রায়বাহাদুর কালী বাবু তখনও কেরাণী-মহলের নিকটস্থ কক্ষে বসিয়া বিদ্যালোচনা করিতেছিলেন। চুঁচুড়ার অক্ষয় বাবু তখনও 'শিক্ষানবিশ'। বেঙ্গল দপ্তরের চন্দ্র বাবু বাঙ্গালা ভাষায় উদিত হন নাই। 'উদ্ভ্রান্তে'র চন্দ্র বাবু বোধ হয় উদিত হইয়া থাকিবেন; লায়ব্রেরিয়ান শাস্ত্রী মহাশয় তখনও বোধ হয় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র; ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রী মহাশয় বাহির হইয়া থাকিবেন। পোষ্ট আপিসের বাঁড়ুয্যে মহাশয় বঙ্গদর্শনে বাহির হইতেছেন; বর্দ্ধমানের বাঁড়ুয্যে মহাশয় তখনও বাহির হন নাই;—আরও অনেক মহাশয়ের মত বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শনী স্যার্টিফিকেটের জন্য সাহিত্য-মন্দিরে স্যুস্তরন করিতেছেন। বঙ্কিমী দলের কোনও কোনও ছোকরা—এখন যাঁহাদের কেহ কেহ হয় ত নিজের নিজের একটি একটি ছোটখাট দল বাঁধিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বঙ্কিমের সই-মোহরের ছাড় পাইবার তারিখের দিন হইতেই বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহারা এখন কেবল বঙ্কিমের সাহিত্যসংগঠনপ্রণালী নহে, বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বও বুঝি বা বিস্মৃত হইয়াছেন, অথবা তাহা উপেক্ষা ও আক্রমণ করিতেছেন; নহিলে বুঝি বা বড় লোক হওয়া যায় না। তখন রাজেন্দ্র লালা (পরে রাজা ও ডাক্তার) বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে সরিয়া গিয়াছেন; পালি, প্রাকৃত, বৌদ্ধ ও প্রত্নতত্ত্বে অন্নায় রাজকৃষ্ণ ও হেডমাষ্টার ক্ষীরোদ বাবু পাঠ লইতেছেন। তখন সাহিত্যের স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বিত ক্ষেত্রে শিশির বাবু সমুদীয়মান; তদীয় রাজনৈতিক নবানুরাগ, আকাশ পাতাল ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়াছে; তদীয় স্বাধীনতা ও সাম্যবাদ তখনও বিষ্ণুভক্তিতে বিভাসিত হয় নাই। 'পত্রিকা' তখনও পুরাপুরি বাঙ্গলাক্ষর-বর্জ্জিত হয় নাই। মিষ্টার রমেশচন্দ্র, বাগ্মী বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারক বিহারী গুপ্তের সহিত তখন বিলাতে 'সার্ভিস্'

ছাত্র। অভাগ্য উপেন্দ্র দাস বোধ হয় শিশিরী দলে তখন বিচরণ করিতেছেন, বিস্মৃত 'নরৎ-সরোজিনী' 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' তখন বাহির হইয়াছিল, বা হইতেছিল, মনে করিয়া বলিতে পারি না। তখন সাহিত্য সাহিত্যই ছিল; সওদাগরী, দূতীগিরী, দোকানদারী, ঝকমারী হইয়া পড়ে নাই। সমালোচনা তখন নরক-বিড়ম্বনায় ও বিকট বিজ্ঞাপনের ঘোষণায়, কপটতায়, কৃত্রিমতায়, চাটুকারিতায়, পক্ষপাতিতায় এবং নীচতায় নামিয়া পড়ে নাই। তখন ইতর সাহিত্য একেবারেই না ছিল, এমন নয়; কিন্তু শিক্ষিত জন ও ভদ্রসন্তানগণ ইতর-সাহিত্য লিখিতেন না। কচিৎ লিখিলে সমাজচ্যুত হইতেন, চাবুকে চাবুকে অস্থি-চর্ম্ম হারাইতেন। তখন সাহিত্যক্ষেত্র জুয়ার আসর ও বস্তায় পাঠক উপহার-খোর হয় নাই। তখন সাহিত্যে পুরাতনের প্রকৃত সম্মান ছিল, পুরাতনের পঙ্কিল পূতিগন্ধের পূজা ছিল না। তখন সাহিত্যে সুযুক্তি, সুবিচার, স্বাধীনতা, সত্যপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস ছিল, সাহিত্যের ও সমাজের কলঙ্ক ও কুসংস্কার কাটিয়া দিবারই চেষ্টা ছিল; কুযুক্তি, কপটতা, অবিচার, ও অন্ধ উগ্রতা দ্বারা তাহার আবরণ, সমর্থন ও সংরক্ষণ করিবার ও পথে পথে ফেরি করিয়া বেড়াইবার ব্যবসা ছিল না। তখন 'হেঁদুয়ানির' হাম্বারব উঠে নাই। কিন্তু দেশ এখনকার মত তখন এত অধিক অহিন্দু হয় নাই। দৃষ্টান্ত সম্মুখেই দেখ। নয়শো রূপেয়া পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের সমাজ-কলঙ্কের চিত্র; সে চিত্রের আসল আজও অক্ষুণ্ণ আছে; তাহার পার্শ্বে আর আসল,—যাহা তখন ছিল না,—এখন হইয়াছে। তখন ডাক-সিলামের মত অত্যুচ্চ হারে, মেয়ে বিক্রয়ের প্রথা থাকিলেও, ছেলে বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হয় নাই। এখন ছেলে মেয়ে, উভয়ই ডাকের দরে, 'হাইয়েষ্ট বিডারে' বিক্রয় হয়। হিঁদুয়ানির হাম্বারব বিক্রেতা ক্রেতা উভয়েরই কাঁধে হাত বুলায়; শুল্কবিক্রয়ের সাংঘাতিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিতে 'পশ্চাৎপদ' হয় না; বড় জোর তাহার জন্য 'তৈলবট'-প্রত্যাশায় মাসকড়াই ও কাঞ্চনদানের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করে। তখন, অন্ততঃ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে বৈবাহিক বণিগ্‌বৃত্তি প্রবেশ করে নাই। "আমার মতামত লইয়া আমাকে যে যাহাই বলুক, খৃষ্টানই বলুক আর নাস্তিকই বলুক, আমি শাস্ত্রবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ, আজও এত বয়ে যাই নাই যে, বেচে-বাড়ী মেয়ের বিবাহ দিয়া, জাতি কুল নষ্ট করিতে পারি।" কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ উপলক্ষে কোনও কুলীন বরকর্ত্তার নিকট হইতে সোণা রূপা টাকার 'ফর্দ্দ' পাইয়া, শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর ঐ

উক্তি করিয়াছিলেন। সক্রোধে ফর্দ্দ ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া তৎক্ষণাৎ 'পাকা কথা' ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। বরকর্ত্তার ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের অশেষ অনুরোধ ও অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও সে কুলে সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই। আত্ম-ইচ্ছায় উক্ত ফর্দ্দ অপেক্ষা আরও অধিক টাকা ব্যয় করিয়া অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু, এই বিদ্যাসাগরকে এবং তাৎকালিক এই প্রকৃতির শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচারী লোকদিগকে আমরাই বলিয়া থাকি অহিন্দু। হাঁ অহিন্দুই বটে! আর আমরাই এখন কেবল হিঁদু।

'নয়শো রূপেয়া' নাটক যাহির হইয়াছিল, শিশিরী দল হইতে। কিন্তু সেদিন এখনকার মত দলাদলের উপর পুস্তকের গুণাগুণ নির্ভর করিত না। এখন যেমন আত্মীয়ের ও আপনার দলের লোকের অতি অপকৃষ্ট ও অপাঠ্য পুস্তকও আপন আপন পত্রিকায়, প্রশংসাবাদের প্রোনঃপৌনিক ঢক্কা-নাদে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রবন্ধে, মস্ত ও স্ফীত করিয়া তোলা হয়, এবং অপরের, অন্য লোকের বা অদোলো লেখকের পুস্তক, অত্যুৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হইলেও, এক লাইনী সমালোচনা বা নীরস নিন্দার ঘোষণা করা হয়, বা চাপা কয়েকটা কথার চালাকিতে সব গোল চুকাইয়া দেওয়া হয়, তখন এরূপ রীতি, এরূপ নির্লজ্জতা ও নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান ছিল না। কাযেই তখন সমালোচনার সাহিত্য-মূল্য ছিল; সমালোচনা বলিতে শাঁকাই সাক্ষী বা 'সেল সার্টিফিকেট' বুঝাইত না; বেভাঁড় বিজ্ঞাপন বলিয়াও লোকে তাহাকে বুঝিত না। কিন্তু এখন ভদ্রলোকে শতকরা সাড়ে নিরনব্বই খানা সমালোচনাকে ঠিক তাহাই বুঝে। সুতরাং এখনকার সমালোচনার আর যত কিছু মূল্যই থাকুক, সাহিত্যগত মূল্য নাই, সূচ্যগ্রপরিমাণ সম্মানও নাই। পরন্তু ভাল পুস্তকের ও ভদ্রলোকের পুস্তকের আর এখন আদৌ সমালোচনা হয় না। ভদ্রলোকে এবং যে লোকে একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিতে পারে, লিখিবার শক্তি ধরে, সে ব্যক্তি কখনই এতটা আত্ম-অসম্ভ্রমহীন, অনুগত কুষ্মাণ্ড হইতে পারে না যে, আপন পুস্তকটিকে ভাল বলাইবার জন্য, আপন গুণগৌরবের ব্যাখ্যা ও স্তুতিগান করাইবার জন্য সম্পাদক ও সমালোচকদের ধামা ধরিবে, নিকৃষ্ট ও নিম্নস্তরের লেখকদের দ্বারে দ্বারে, দোকানে দোকানে, উমেদারি করিয়া বেড়াইবে। পরন্তু সেরূপ স্তুতিকীর্ত্তন তাঁহাদের তৃপ্তিদায়কও হইতে পারে না। ভাবুকে ও চিন্তাশীলে, চিন্তাশীলতার সমুজই চাহেন; চিন্তাহীনতার ও রসানভিজ্ঞতার অর্চ্চনা আরা কামনা করেন না। বিচক্ষণ ব্যক্তি বুঝিয়া

হুটা মন্দ বলিলেও ভাল লাগে, কিন্তু অযুযের কেতালা স্তব স্তুতিতেও গায়ে কেবল জ্বর আসে। তাহাতে কেবল প্রশংসকের উপর নহে, প্রশংসিতের প্রতিও অশ্রদ্ধা হয়। এ কারণেও উপযুক্ত লেখক অযোগ্য হস্তের সমালোচনা চাহেন না; তজ্জন্য গুড়ুক, গোলাপী খিলি ও গায়ে-পড়া 'আপ্যায়িত' রায় বাহাদুর ত কথাই নাই। কাজেই এখন মার্জ্জিত সাহিত্যের উন্নত শিল্পের সমালোচনা হয় না; অতএব বিক্রয়ও হয় না। উপস্থিত অবস্থায় না-হওয়াই শ্রেয় ও সম্মানকর বটে। কিন্তু তখন এমন ছিল না; দলেরই হউক আর বেদলেরই হউক, তখন বই ভাল হইলেই তাহার আদর হইত; মন্দ হইলেই নিন্দা ঘটিত। কাজেই 'নয়শো রূপেয়া' বাহির হইতে হইতেই সমাদৃত হইয়াছিল, সাহিত্য-সমাজে স্বকীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল। কেন না, তখন সে সমাজ বিদ্যমান ছিল। এখন প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্য-সমাজ নাই। অতএব আশ্চর্য্য কি যে, পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরে দ্বিতীয়বার-প্রকাশিত আমাদের আলোচ্য এই নাটকের এবার আদর হয় নাই; হইবার সম্ভাবনাও নাই, কথাও নয়। কিন্তু প্রথম সংস্করণে লোকসমাজের ও সাহিত্য-সমাজের সর্ব্বত্রই উহার যথোচিত প্রশংসা ও আলোচনা হইয়াছিল; যতটা মনে পড়ে, তখনকার নব-প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশন্যাল' নাট্যশালায় উহার অভিনয়ও হইয়াছিল। তখনকার সাহিত্য-শাসয়িতা বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম বাবু এণ্ড কোং 'নয়শো রূপেয়া' দেখিবামাত্র লুফিয়া লইয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে উহার বিস্তৃত বঙ্কিমী সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। এবং পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি যদি নেহাত প্রতারণা না করিয়া থাকে, সে সমালোচনা বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমের ও নয়শো রূপেয়ার নিজের উপযুক্তই হইয়াছিল।

কিন্তু 'নয়শো রূপেয়া' কাহার টাঁকশালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কোন মস্তিষ্কের মিণ্টে মুদ্রিত হইয়াছিল, তখন জানা যায় নাই। এই নাটকের উপর উহার লেখকের নাম তখনও ছিল না; এখনও নাই। আমাদের অনুমান এ সম্বন্ধে একান্ত অনির্দ্দিষ্ট, অনিশ্চিত। অতঃপর অতকাল পরেও, এই লেখকের—বাঙ্গালা ভাষার এই একমাত্র নাটকের লেখকের নাম প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল; আবশ্যকও ছিল। এই অনাবশ্যক অপ্রকাশে নব্য বঙ্গীয় সমাজের ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটা প্রয়োজনীয় কথা অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। তা যে মস্তিষ্কের 'মিণ্ট' হইতেই 'নয়শো রূপেয়া' নির্গত হউক, সেটি নিশ্চয়ই নাট্যরসের 'রয়াল মিণ্ট' বটে। এবং সে রয়াল মিণ্টের 'রূপেয়া'

খাদহীন খাঁটি রূপায় এমন রকম খোদিত যে, তাহার মুদ্রণচিহ্ন—মর্ম্মভেদী ছাপ মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। এত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই নয়শো রূপেয়ার নিলামী মুদ্রায় এক বিন্দু মোরচে ধরে নাই; রগ্ রগ্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে; টাঁকশাল হইতে যেন টাটকা তৈয়ার হইয়া আসিল।

সামাজিক চিত্রের হিসাবে 'নয়শো রূপেয়া' একরূপ অতুলনীয়। পরন্তু—সে হিসাবে উহা নিত্য-সংঘটিত প্রত্যক্ষ এক অতি সত্য ঘটনার অত্যন্ত সাংঘাতিক মূর্ত্তি। সংস্কার-উদ্দেশে কাব্যে নাটকে, স্যাটায়ারে ক্যারিকেচারে, যদি সমাজ-কলঙ্ক,—লোকব্যবহারের বিষাক্ত ব্যাধি,—মনুষ্যস্বভাবের অত্যন্ত অশৌচ আক্রমণ করিতে হয়, উদ্ঘাটন করিয়া লোকচক্ষুর উপর ধরিতে হয়, তবে তাহা এইরূপেই করিতে হয়, এইরূপেই ধরিতে হয়। এমনতর দেদীপ্যমান দৃশ্য, সত্য সরল উজ্জ্বল ও সকল-চিত্র-ফটো, লিথোগ্রাফের ক্যামেরার খুব কমই উঠে। আলেখ্যের হিসাবে ইহা সফল, অনুরূপ ক্রয়ের অবিফল; পরন্তু উহার মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ-সংশোধন-সম্বন্ধেও নয়শো রূপেয়ার লাটবন্দী নিলাম একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। আমরা ঠিক দূর জানি, উহা কিয়ৎপরিমাণে, প্রত্যক্ষ-ফল-প্রসূ হইয়াছিল। কারা-চিত্র ও নাট্য-দৃশ্যের দ্বারা কার্য্যগত তত্তটা ফল প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু নয়শো রূপেয়ার নিদারুণ অঙ্কুশ, কন্যাবিক্রয়-ব্যবসায়ী বেহায়া বড় বামুনের স্থূল চর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া ক্ষণেকের জন্যও তাহার পাংশুল চিত্ত বিকল ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তবে সাহিত্য-শক্তি সমাজের সে স্তরে পঁহুছিবার পথ তখন তত ছিল না বটে, তথাপি, নয়শো রূপেয়ার নিলাম-ডাক যত দূর পঁহুছিতে পারিয়াছিল, তত দূরের বৈবাহিক ক্রয়বিক্রয়ের বিকৃত বিষাক্ত বায়ু যে কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত করিয়াছিল, ইহা বেশ বলা যাইতে পারে।

মধ্য বঙ্গে উক্ত ব্যবসা, বোধ হয়, কিছু মন্দা হইয়া থাকিবে। উত্তর-বঙ্গে কিন্তু এখনও ঐ ট্রাফিকের খুব খর তেজ। বহু গৃহস্থ বটু, গৃহিণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণীহীন। উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গে, পদ্মার, মেঘনার ও কর্ণফুলীর কূলে কূলে, পশ্চিম বঙ্গেও বটে,—কোন্ বঙ্গেই বা নয়? বঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের জুরিস্‌ডিক্‌সান্ জুড়িয়া, নয়শো রূপেয়ার বহুল ও বিস্তৃত প্রচার বাঞ্ছনীয়, ও অভিনয় ও আবৃত্তি আকাঙ্ক্ষণীয়; অনুবাদ প্রয়োজনীয়। অয়ং শিশির বাবু ইহার একটা ইংরাজী অনুবাদ করুন না কেন? উহার হিন্দী অনুবাদ করুন, আমাদের বঙ্গবাসী আফিসের অমৃত বাবু। দেশের যাবতীয় বাঙ্গালা ও অন্যান্য

বার্ণাকুলার পত্র পত্রিকা প্রকাশকের অনুমতি লইয়া, নয়শো রূপেয়া ক্রমশঃ আপন আপন অঙ্গীভূত করুন। 'রূপেয়ার' ইংরেজী অনুবাদ অমৃত পত্রিকাতেই অগ্রে প্রকাশিত হউক না। সিডিসন্ আইনে সকলেরই ত প্রায় 'সে পৃষ্ঠ' উঠিয়া গিয়াছে; এখন এই পাঠই কিছুকাল চলুক না? কাপির অভাবে অনর্থক আপনাদের মধ্যে কামড়াকামড়ি না করিয়া, কুলেখকের কদর্য্য রুচি ও জঘন্য রচনা না ছাপাইয়া, বরং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, নাটক, নভেল—নিদেন খাঁচালী, পীরের গান, ছেপে দেওয়াই শ্রেয়। তাহাতে পুরাতন গ্রাহক রক্ষা ও নূতন গ্রাহকও কিছু কিছু আমদানি হইতে পারে। আমরা সত্যপাঠপূর্ব্বক শপথ গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি, নয়শো রূপেয়ায় নূতন গ্রাহক ও নগদ বিক্রয় নিশ্চয়ই বাড়াইবে।

নয়শো রূপেয়ার উৎপত্তিস্থান মধ্য বঙ্গে, সভ্য ও শিক্ষিত বঙ্গে, নয়শো রূপেয়ার আদান প্রদান অভিনয় বিলক্ষণই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব দূরবঙ্গের বটু বামুন, কায়েত, অশিক্ষিত শূদ্রাদি অসংখ্য হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে ও নিম্নতলে, এখন এই নয়শো রূপেয়া পৌঁছান উচিত। পরন্তু, সভ্য ও ভব্য বঙ্গের উপস্থিত ব্যাধির প্রশমনার্থ প্রয়োজন ক্ষেত্রপ্র, তাহাতে কিন্তু নয়শো রূপেয়ার অনুরূপ অপর ঔষধও আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে, এখন কেবল নয়শো রূপেয়া প্রচুর নয়; 'নয় হাজার রূপেয়া' বা 'নয় লাখ রূপেয়া' গোছের একটা লাটবন্দী নিলাম চাই। কিন্তু তাহাতেও কি নির্লজ্জ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লজ্জা হইবে? অশিক্ষিত লোকে অশিক্ষিতা কন্যার বিবাহ দিয়া বা বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ বাধ্য হইয়াই লইত, বা লয়; সে অর্থের অত্যুচ্চ পরিমাণ 'নয়শো রূপেয়া'। ইহাকে বিবাহ, বিক্রয় বা বিনিময়, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। কিন্তু ইহার মূলে কেবল বিকৃত সমাজ-পদ্ধতির নয়, অবিকৃত অর্থনীতির একটি অপরিহার্য্য সত্য নিহিত। যে পিতা দুহিতা বিক্রয় করিয়া অর্থ লয়, জানা আবশ্যক যে, সে পিতা অর্থ দিয়া পত্নী ক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং পত্নী এ স্থলে Reproductive capital অর্থাৎ উৎপন্নসম্ভাব্য মূল ধন। যে ব্যক্তি যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া একমাত্র stock in trade পত্নী ক্রয় করিয়াছে, সে সেই পত্নীপ্রসূত কন্যাধন বিনিময় না করিয়া প্রাপ্ত কি, এবং তাহার পত্নীক্রয়ার্থ অর্থের পূরণই বা হয় কিসে? অর্থের সদ্ব্যবহার কেবল বাণিজ্যেই হয়। বাণিজ্য ব্যতীত যে কিছু অর্থব্যয়, তাহার প্রায় অধিকাংশই অপচয়। সেই অর্থই সার্থক, যে অর্থ

উৎপাদনক্ষম ও যাহা হইতে অর্থাগম হয়। ইহা অর্থনীতির সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম। অতএব পত্নীক্রয়কারী কর্ত্তৃক কন্যাবিক্রয়ে সমাজনৈতিক নীচতা যতই হউক, উহা অন্ততঃ অর্থনৈতিক ব্যভিচার নহে, এবং অবৈধ ব্যবসাও নহে। যাহা হউক, ইহা অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামাজিক পাপ। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় কি করিতেছেন? যাহা করিতেছেন, সকলেই জানেন, সে জানা যেমন তেমন জানা নয়, মর্ম্মভেদী জানা। শিক্ষিত পিতা, শিক্ষিত পুত্র, দুইই পুরা পুণ্যশ্লোক; প্রথম পুণ্যশ্লোক, দ্বিতীয় পুণ্যশ্লোকের পরিণয়-বাণিজ্যে, অর্থ-ব্যবহারের মৌলিক আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া যে বিপুল অর্থরাশি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাহার তুলনায় অশিক্ষিতের কন্যা-নিলামের 'নয়শো রূপেয়া' নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহা পেশো-ও-পেশো বরের বাপের ও বাপের বধূর বাণিজ্য বটে; কিন্তু নেহাত অবৈধ বাণিজ্য। ইহা বিক্রয়ও নয়, বিনিময়ও নয়, খাঁটী প্রতারণা। ইহার পালটাও অবশ্য আছে বটে। না থাকিবে কেন? কিন্তু সেটা শেয়ানায় শেয়ানায় বা শঠতানে শঠতানে কোলাকুলী; সুতরাং সে ক্ষেত্রে 'নয়শো রূপেয়া' অপেক্ষা আরও অধিক চোকাল ও চিকণ চাবুক আবশ্যক।

'নয়শো রূপেয়া' সাহিত্যাংশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতি সরল সহজ সাদামাটা চলিত কথায়, কথা কহার গতে, ইহার আপাদমস্তক গঠিত। লেখক যেন একই নিশ্বাসে এই নাটকখানি লিখিয়াছেন। ইহা পাঠ করিতেও হয়, একই নিশ্বাসে; পাঠসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যেন পুনঃ নিশ্বাস গ্রহণ করা যায় না। পাঠসমাপ্তির পরেও ইহা পুনর্ব্বার পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হয়। অথচ এই নাটকে এক লাইন কবিতা নাই; একটিও গান নাই; এক বিন্দুও ভাল লেখার ভাণ নাই। ভাবার ও ভাবের রং ফলাইবার চেষ্টামাত্রই নাই। এ সকলের কিছুই ইহাতে নাই; আছে কেবল নাটক, নির্ভেজাল নাটক, নাটকীয় রূপ, রস, স্পর্শ, নাটকীয় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ইহা পূর্ণ। ক্রিয়ার প্রতিরোধিক ও ক্রিয়াবিহীন ভাব ও ভাবুকতার প্রতিপোষক একটি বাক্য, একটি বর্ণও প্রায় ইহাতে নাই। ক্রিয়ার, কথার ও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নাটকীয় কার্য্যস্রোত অঙ্কে অঙ্কে সবাধগতিতে ছুটিয়া গিয়াছে, এবং কেবল তাহারই সহায়তায় সুনগ্ন 'প্লট' ও নাট্যক্ষেত্রের কর্ম্মীদিগের প্রকৃতি পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। রঙ ফলাইতে, রস নিঙ্গড়াইতে, রসিকতা চালাইতে, রূপ রগড়াইতে ও বৃথা বাক্যব্যয় করিতে লেখক কোথাও ক্ষণেকের জন্য উপ-

বেশন করেন নাই। এক দৌড়ে গড় গড় করিয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গেই যাহা কিছু শুনাইবার, যাহা কিছু দেখাইবার, সবই শুনাইয়াছেন, সবই দেখাইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি সঞ্চালন করিয়াছেন, শরীরের শিরা-ধমনী নাচাইয়াছেন, এবং হাস্যকরুণ-বীভৎসাদি ভাবের উদ্দীপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অত্যল্প স্থানে, নাটকীয় নির্দ্দিষ্ট অত্যল্প সময়ে, এ সবই হইয়াছে; সেই সঙ্গে শ্লেষের সুতীক্ষ্ণ চুম্বন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অব্যর্থ বিরেচন এবং চিত্র ও চরিত্রের বিচিত্র অঙ্কন আছে। কবিত্বের কদর্থ নাই, কল্পনার কচকচি নাই, জল্পনার ইতস্ততঃ নাই, উদ্ভটের অবতারণা নাই; সবই সত্যের—প্রত্যক্ষের প্রতিকৃতি, মানুষগুলা মানুষীর রক্ত মাংসের মূর্ত্তি; সবই সত্য, দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষবৎ সটান যাইয়া মস্তিষ্ক ও মন স্পর্শ করে। 'নয়শো রূপেয়া' নিশ্চয় সজীব, 'রিয়ালিষ্টিক', অথচ রোমান্টিকের রেখা,—অকপ্ট রেখা উহাতে অলক্ষিত নয়।

আমাদের বিবেচনায় ও আমরা যাহা শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি, তাহার আলোচনায়, ঐ গুলিই নাটকের প্রথম উপকরণ ও প্রধান লক্ষণ। এবং সেই কারণেই আমরা বলিয়াছি, 'নয়শো রূপেয়া' নাটক যথার্থই নাটক; নিছক নিরবচ্ছিন্ন নাটক। পুনশ্চ এখন আমরা বলিতে পারি, উহা হয় ত অদ্য তারিখ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার একমাত্র নাটক। কেন না, অমনতর রকমের দ্বিতীয়টি আমরা দেখি নাই। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমও এ পর্য্যন্ত পাঠ করি নাই।

'নয়শো রূপেয়া' প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে, বাঙ্গালা ভাষায় তত অধিক সংখ্যক নাটক প্রচারিত হয় নাই। যতগুলি হইয়াছিল, তাহার প্রায় সবগুলিই বোধ হয় আমরা দেখিয়াছিলাম। সেই সবগুলির শ্রেষ্ঠতরগুলি, কাব্যাংশে বা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-গুণে 'নয়শো রূপেয়া' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; শ্রেষ্ঠই বটে; কিন্তু নাটকত্বে একমাত্র 'নীলদর্পণ' ব্যতীত তাহাদের কোনটিই উহার নিকটে পৌঁছে নাই বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু 'নয়শো রূপেয়া' প্রথম প্রকাশের পরে, উহার দ্বিতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে, বাঙ্গালা ভাষায় বহু শত নাটক প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইয়াছে; রঙ্গালয়ের অনিবার্য্যপ্রয়োজনপূরণার্থ প্রায় নিত্য নিত্য নূতন নাটক দেখা দিতেছে। এখন প্রতি বৎসর বড় দিনে পাঁচ সাত খানা করিয়া নূতন নাটক ও প্রহসন প্রকাশিত হয়, ছোট দিনেও সেই

পরিণামে হয়; মেজো দিনেও কোন না হয়? নিত্য নৈমিত্তিক পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে হয়, সংবাদপত্রের সুর ধরিয়া হয়, আন্দোলনস্রোতের গতি দেখিয়া হয়, থিয়েটারগামীদের মন ও মেজাজ বুঝিয়া হয়, শ্রোতৃসহরের হুজুক বুঝিয়া হয়, পরন্তু ইংরেজী ও বাঙ্গালা বৎসরের হিসাব ধরিয়া নূতন নূতন নাটক লিখিত, গীত, অভিনীত হইয়া থাকে; "মুদ্রিত" (?) হইয়া থাকে; পঠিত হয় কি না, জানি না। কিন্তু তখন কোথায় এত হইত? ইহার শতাংশের একাংশও তখন ছিল না। 'নয়শো রূপেয়া' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালার কেবল সবে মাত্র নূতন সৃষ্টি হইতেছিল। তখন বিডন ষ্ট্রীটে রঙ্গমঞ্চের বাজারি বসে নাই; কর্ণওয়ালিসে, মেছোবাজারে, চিতপুরে, বৌবাজারে, নেটিভ কলিকাতার এত পল্লীতে ও অলি-গলিতে পাবলিক ও প্রাইবেট "ষ্টেজ" উত্থিত হয় নাই। কিন্তু এখন সৌভাগ্যক্রমে আর সে দিন নাই! কলিকাতা ত রাজধানী, সমগ্র ভারতের মহা মেট্রোপলিস; জিলা ও মহকুমার সদর ত লজ্জিত নহর, বৃহৎ খানি। এ সকল 'মফস্বল' মোকামে বঙ্গালয় নাট্যবৈঠক ত হইয়াছেই। অজ পাড়াগাঁয়েও এখন সি-ই-ন উঠে, কনসর্ট ছুটে, করতালি, ক্যাপিটাল, এনকোর আদির আদানি প্রদান হইয়া থাকে। যাত্রার দল এখন হাফ থিয়েটার। পল্লীগ্রামের খোকা খুকীদের খেলাঘরেও আজকাল ঝম্প, কম্প, মূর্চ্ছা, পতন ও নেপথ্যাদির বালস্বভাবসুলভ নকল দেখিয়া সুখহাস্য সংবরণ করা যায় না। কিন্তু আমরা জানি যে, এই সব রুচি ছেলেপুলের পিতামহগণ কখনও নাট্যশালা, রঙ্গালয় ও নাটকাভিনয়ের নামও শুনিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, এখন তখন অপেক্ষা রঙ্গশালা ও নাট্যকলার কতই বিস্তার, বিকাশ, স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি হইয়াছে। অতএব ইহাতে আশ্চর্য্য আর কি যে, এখন তখন অপেক্ষাও নাটকের সংখ্যা শত গুণেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বয়ঃক্রমের পরিমাণে যে ইহা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই নয়; অবিশ্রান্ত নাটকাভিনয়ের অনুপাতেই নাট্যসাহিত্যের স্রোত বহিতেছে। এখন কেবল থিয়েটারের অধিনেতা, আচার্য্য, অধ্যক্ষ, এক্টর ও ম্যানেজারেরাই নাটক লিখেন না, থিয়েটারের বাজার-সরকার ও বিজ্ঞাপন-বরদারেরাও নাটক লিখিয়া থাকেন, এবং তাহা কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়া অভিনয় করা হয়। নূতনের প্রয়োজনীয়তা এখন এমনি প্রবল যে, রঙ্গগৃহের

পানওয়ালা ও পানীওয়ালারাও ক্রমে 'থেরিট' হইতে পারে। তা হউক; ফলতঃ কথা এই যে, ঐ সকল কারণের সমবায়ে সংখ্যায় হিসাবে নাটক এখন আমাদের অনেক হইয়াছে, এবং প্রতি বৎসরেই সেই সংখ্যায় অল্প স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। আমরা এখনকার এত অধিক নাটক পুস্তকের ও নাট্য প্রহসনের উত্তম ও অধম কতকাংশ অবশ্যই কিছু কিছু দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি বটে; কিন্তু তাহাদের বহুসংখ্যকই দেখার, শুনার বা পাঠ করার অবসর ঘটে নাই। কেন না, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ মনুষ্যজীবনের অবকাশ সেই পরিমাণে বা ততোধিক পরিমাণে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ। সুতরাং বাস্তিকসত্ত্বেও এখনকার বহুসংখ্যক নাটকই আমাদের দেখা ঘটিয়া বা জুটিয়া উঠে নাই। যাহা দেখি নাই, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা চলে না। হইতে পারে, তাহাদের ভিতর সেক্সপীয়র, মোলিয়ার, কালিদাসাদির অমর কীর্ত্তি আছে। কিন্তু সে কীর্ত্তির কথা অদ্যাবধি কাহারও মুখে শুনি নাই। শুনিলে অবশ্য সে কীর্ত্তিগ্রস্থ নাটক কয়েকটি আনাইয়া দেখিতাম, অথবা আপনারাই নিজে যাইয়া তাহাদের 'রসোদ্গার' দেখিয়া আসিতাম। পক্ষান্তরে, আমরা এখনকার যত নাটক দেখিয়াছি, তাহাদের কতকটিতে নানারকমের গুণপনা, রূপ রসের অবতারণা ও পাকা হাতের রচনা আছে; তাহাদের কোন কোনটিতে মৌলিকতা ও প্রকৃত নাটকীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যাংশে, কল্পনাংশে, রচনাংশে, অভিনয়ের ও আমোদপ্রদানের উপযোগিতাংশে, পরন্তু প্লট প্রভৃতির পারিপাট্যে, ঘটনাদির বৈচিত্র্যে, চিত্রাদির অঙ্কনে, গদ্যপদ্যাদি ভাষার সংগঠনে, হইতে পারে,—না হইবেই বা কেন?—এখনকার বহু নাটকই নয়শো রূপেয়া অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এত দিনের শিক্ষায়, প্রতি রজনীর পরীক্ষায়, শত রকমের সংঘর্ষণে ও সম্মার্জ্জনে, অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ হইবারই কথা। কিন্তু নাটকাংশে—নাটকীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ও নাটকীয় কার্য্যের নিয়মীকরণের হিসাবে, এখনকার একটি নাটকও 'নয়শো রূপেয়া' নাটকের সমকক্ষ নাটক নহে—নিকটস্থ নাটকও নহে। ইহা আমাদের নিজের অভিমত, অতএব ইহা অভ্রান্ত বা প্রমাদশূন্য, এমন কথা নিশ্চয়ই বলি না। পরন্তু, এই অভিমত অবিসংবাদী হইবে, এমন আশাও করি না। তবে পূর্ব্বাপর বিবেচনা ও যথাসাধ্য বিচার করিয়া, এবং অপক্ষপাত ও নিঃস্বার্থ সাহিত্য সমালোচনার সম্মানসংরক্ষার ঐকান্তিক আবশ্যকতা সর্ব্বথা স্মৃতি-পথে রাখিয়া, আমরা ঐ অভিমতে উপস্থিত

হইয়াছি; বিনয়-নম্রতাসহকারে কেবল এইমাত্রই বলিতে পারি। এইমাত্র বলিতে পারি, অতএব সেই জন্যই বলিয়াছি যে, নাট্যাংশে 'নয়শো রূপেয়া' বুঝি বা একমাত্র বাঙ্গলা নাটক; হায়! সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও বাঙ্গলা নাটকের সংখ্যা এত অল্প;—এবং এত অল্পসংখ্যক নাটক, নাটকের প্রকৃত-লক্ষণসমন্বিত ও সে বিষয়ে সমালোচনার অনুচিত-বিশ্লেষণ সহ্য করিতে পারে। 'নয়শো রূপেয়া',—যাহার কিঞ্চিৎ নাটকত্ব আমরা স্বীকার করিয়াছি, নিজেও সর্ব্বাংশে সেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সমালোচনা সহ্য করিতে সক্ষম নহে, ইহাও স্থির। তবে উহার অন্যান্য ত্রুটী ও অভাবাদি সত্ত্বেও নাটকত্বের লক্ষণ কিঞ্চিৎ আছে বলিয়াই উহাকে খাঁটি নাটক বলিতেছিলাম; কথা এই যে, অনেক পুস্তক, যাহা নাটক-নামে অভিহিত, নট নটীর কথোপকথনে, কবিতায় ও গীতাদিতে অভিনীত, অলঙ্কারকর্ত্তাদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে বা তাহার ব্যভিচারে অঙ্কে গর্ভাঙ্কে বিভক্ত হইয়া বিরচিত ও পঠিত, তাহা নাটকীয়-শরীরধারী শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সেই শরীর-ধর্ম্ম-লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, নাটকীয় আত্ম-সমন্বিত নহে, সুতরাং আত্মহীন মৃত বা সজীব (কেন না শোণিত জীবাণু-শক্তি থাকিলে, আত্ম-বিরহিত সজীবতা একবারেই অনুভব নয়) শরীরের মত প্রকৃত বা মৌলিক নাটকত্ববিহীন; অতএব নাটক নহে, বা নাটকীয় শরীরমাত্র। কিন্তু এই সকল নাটকাভিধেয় পুস্তকের অনেকানেক পুস্তক নাটক না হইলেও, অন্য রকমের, অর্থাৎ নাটকীয় দেহে নভেল-কাব্যাদির আত্মযুক্ত উৎকৃষ্ট রচনা, প্রীতিদায়িনী ও ভাবোদ্দীপনী রচনা; কেন না, তাহাতে শক্তি, সৌন্দর্য্য ও সজীবতা, এ সবই বিদ্যমান; অবিদ্যমান কেবল নাটকীয় আত্মা। নাটক না হইয়াও রচনা মনোমোহিনী, হৃদয়স্পর্শিনী, নবরসময়ী হইতে পারে; অধুনা স্থলবিশেষে ক্বচিৎ তাহা হইতেছেও বটে। আমাদের পূর্ব্বতন বাঙ্গলা নাটকে সাধারণতঃ নাটকত্ব অপেক্ষা মনোমোহিনী রচনার দিকেই অধিকতর দৃষ্টি রাখা হইত; আমাদের অধুনাতন নাটকে, নাটকত্ব অপেক্ষা 'ষ্টেজ এফেক্টে'র দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা হয়। সুতরাং বঙ্কিম বাবু বলিতেন,—সমীচীন সমালোচকমাত্রেই বলেন,—বাঙ্গলা ভাষায় নাটক নাই, অথবা খুব অল্পই আছে। পূর্ব্বতন নাটক চমৎকার পাঠোপযোগী হইত। অধুনাতন নাটক রঙ্গমঞ্চের অভিনয়েই খুলে; পাঠকালে তাহাতে প্রায়ই মন ভুলে না; পাঠোপযোগী তাহা প্রায়ই হয় না; কিন্তু অভিনয়োপযোগী হয়। 'নয়শো রূপেয়া' নাটকে আমরা ইত্যগ্রেই উল্লেখ

করিয়াছি, মনোহারিণী রচনা বা তদনুরূপ কোনও গুণপনা নাই; তাহাদের প্রতি লক্ষ্যই নাই; কেবল নাটকীয় আত্মা আছে; সাক্ষাৎসম্বন্ধে একটি সামাজিক অতি অপকৃষ্ট প্রচলিত প্রথা অঙ্কিত করিতে গিয়া, উহা হয় ত যেন লেখকের অজ্ঞাতেই নাটকীয় আত্মায় প্রভাবিত হইয়া উঠিয়াছে।

'নয়শো রূপেয়া' নাটক মিলনান্ত মিষ্টকাহিনী বা সিরিও-কমিডি; সুতরাং বলা বাহুল্য, শোকান্তের বা বিয়োগান্তের দারুণ করুণ ছায়া—ট্রাজিডির তীব্র আগ্নেয় তাপ, দৃষ্টাদৃষ্টের প্রারব্ধ ও পুরুষকারের সংঘর্ষ সংগ্রাম এবং তদুপযোগী উচ্চ অঙ্গের নাটকত্ব নয়শো রূপেয়ায় নাই; তাহার নিজের সজাতীয় অধিকার সীমার মধ্যেও তাহা নয়। সাধারণ মনুষ্যসমাজের 'রিয়ালিষ্টিক' রাজ্যে লোকপ্রচলিত উপ বা অপ-প্রথার নিত্য নৈমিত্তিক প্রত্যহিক ঘটনার বিবৃতি, বর্ণনা ও আলোচনাসূত্রে, যে প্রকৃতির নাটকত্ব উৎপন্ন হইতে পারে,—নাটকে ও প্রহসনে পরস্পর সাক্ষাৎ ও সংমিলনসূত্রে যে রকমের নাটকত্ব জন্মিতে পারে, 'নয়শো রূপেয়া' সেই শ্রেণীর নাটকত্ব-যুক্ত নাটক। 'রূপেয়ার' অনেকানেক গুণের কথা আমরা বলিয়াছি; উহার দোষের কথা কিছু বলিতে হইলে, মোটের উপর কেবল এই বলা যায় যে, উহা স্থলবিশেষে এবং অবশ্য স্থলবিশেষের উত্তাপাধিক্যের হেতুতেই, একমাত্রা অসংযত, একমাত্রা অনাবশ্যক অশ্লীল। নাটকেই হউক—সাহিত্যের ও শিল্পের যে অঙ্গেই হউক, অসংযম,—অসংযমজনিত অনাবশ্যক অশ্লীলতা অসমর্থনীয়।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

মোহনলাল।

পলাশী যুদ্ধের মোহনলাল, কবি নবীনচন্দ্রের অমৃতময়ী লেখনীর কল্যাণে আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত। কবি কয়েকটি ঐতিহাসিক চিত্র বিকৃতভাবে চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া, আজকাল কিছু গঞ্জনা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মোহনলাল প্রকৃত মোহনলালের সুস্পষ্ট চিত্র—এ বিষয়ে কোনও কঠোর ঐতিহাসিকেরও তাঁহার সহিত মতভেদ হইতে

পারে না। স্বয়ং মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন ইহার সাক্ষী। মুসলমান ঐতিহাসিক, বাঙ্গালী বীর মোহনলালের বীরত্বকাহিনীর অপলাপ করেন নাই। তাঁহার অযথা গর্ব্ব প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াও দক্ষতার উপযুক্ত সম্মানই করিয়াছেন। আপাততঃ ইতিহাস-সমালোচনায় মোহনলাল আমাদের পর হইতে চলিয়াছেন, তাঁহার মোহন মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কলঙ্কের ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সেই জন্যই তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবার সময় উপস্থিত।

সিরাজের রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মোহনলালকে দেখিতে পাই। মুতাক্ষরীণকার বলিতেছেন, 'মোহনলাল পূর্ব্বে সিরাজ উদ্দৌলার নিজের দেওয়ান ছিলেন।' এ দেওয়ানী সিরাজের যৌবরাজ্য অবস্থায়, স্পষ্টই অনুমিত হয়। সিরাজ নবাব হইয়াই তাঁহাকে 'দেওয়ানই-আলি' অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিত্ব-পদে উন্নীত করিলেন। রাজকার্য্যপর্য্যালোচনার জন্য সকল বিষয়ের সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। তাঁহাকে মহারাজ উপাধি ও তৎসহ নবাবী প্রথামত সম্মানসূচক ঝাণ্ডা, নকড়া, ঢালবরদার পাল্কী প্রদত্ত হইল। সেই অবধি তিনি পাঁচ-হাজারী মনসবদারী ও (সেনানায়কত্ব) প্রাপ্ত হইলেন। (১) কিন্তু মোহনলালের এই উন্নতিই সিরাজ উদ্দৌলার অধঃপতনের বীজবপন করিয়া রাখিল। হতভাগ্য সিরাজের প্রতি অনুকম্পার মাত্রা যতই কেন বর্দ্ধিত করা যাউক না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, একে তাঁহার যৌবনসময়োচিত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে প্রবীণ মন্ত্রিবর্গ পূর্ব্বাবধিই বিরক্ত ছিলেন; তাহার পর সিরাজ উদ্দৌলা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই, প্রবীণগণকে উপেক্ষা করিয়া, মীর মদন ও মোহনলালের মত অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ দুই জন ব্যক্তিকে, সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত করিলেন। এইরূপ অবিমৃষ্যকারিতার সহিত নিজের বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণের পুরস্কারপ্রদান সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া বোধ হয় না। ইহাই মীর জাফর, প্রবীণ মন্ত্রী রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতি দরবারের প্রধান সদস্যবর্গের অসন্তোষের মূল কারণ। (২) মোহনলাল সহজ বীর, স্বীয় দক্ষতার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; তাহাতে আবার তিনি নবাবী দরবারের মোলায়েম কায়দায় সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত,—প্রবীণগণের মুখ চাহিয়াও কাজ করিতেন না।

(১) Mustafa's Mutaqherin vol I. p. 717.

(২) Mutaqh-Trans vol I. p. 718.

এই জন্যই গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, তাঁহার সগর্ব্ব ব্যবহারই প্রবীণ মন্ত্রী দলের মনোভঙ্গের প্রথম কারণ।

মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদক মুস্তাফা নামক অনৈক স্বধর্ম্মত্যাগী ফরাসী মুসলমান, রাজা মোহনলাল সম্বন্ধে প্রবাদমূলক এক অলীক অপবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (৩) তিনি বলেন, 'মোহনলাল সিরাজ উদ্দৌলাকে আগন ভগ্নী উপহার দেন; এই ভগ্নী এ দেশের এক আদর্শ-সুন্দরী; অতি তন্বঙ্গী।' ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেব প্রবাদ বলিয়াই এই টীকার সার সংগ্রহ করিয়াছেন; প্রভুর অভিবিশস্ত ও উপকারী ভৃত্য বলিয়াও টীপ্পনীতে এই সঙ্গে মোহনলালের উল্লেখ করা হইয়াছে। (৪) মুতাক্ষরীণ, রিয়াজ-উস্ সালাতিন বা অন্য কোনও দেশীয় ইতিহাসে এ কথা নাই। যদি ভগিনীদানই মোহনলালের উন্নতির কারণ হইত, তাহা হইলে কোন মুসলমান লেখক যে এ কথার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন, এমন বোধ হয় না। গোলাম হোসেন সিরাজের চরিত্রবর্ণন বা মোহনলালের কথায় গ্রন্থের অনেকাংশ পূর্ণ করিয়াছেন। মোহনলালের ভগ্নী সিরাজের পত্নী বা বাঁদী হইলে, তাঁহার লেখনীতে এ ঘটনা বাদ পড়িত, ইহা সম্ভব নহে। আমাদের বিশ্বাস, সিরাজ ও মোহনলালের পতনের পর, গুজবপ্রিয় মুর্শিদাবাদ সহরের নিম্ন শ্রেণীর কোনও মুসলমানী আড্ডায়, মুস্তাফা এই মূল্যবান গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার অলীকত্ব সম্বন্ধে পরে বিচার করা যাইবে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের রাজসাহীর বন্ধু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার নবপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'সিরাজদ্দৌলা'য় মোহনলালের উপর অনেকটা নিগ্রহ করিয়াছেন। (৫) তিনি লিখিয়াছেন, "মহারাজ মোহনলালের নাম অনেকের সুপরিচিত। বাঙ্গালী কবি তাঁহার বীরত্ব বর্ণন করিতে গিয়া যে সকল কবিতা প্রসব করিয়াছেন, তাহাও অনেকের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু মোহনলাল হিন্দু হইয়াও কি উদ্দেশ্যে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন ও জীবনরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কবি তাহার মূলতত্ত্ব আলোচনা করেন নাই।" এই মুখবন্ধের পর এক জন প্রতিভাশালী

(৩) Mutaqh-Note vol I. p. 717.

(৪) Stewart's Bengal p. 309.

(৫) সিরাজদ্দৌলা; ৬৯—৭৫ পৃঃ।

ঐতিহাসিক সে তত্ত্ব হস্তে লইলেন; কিন্তু তিনি এখানে সুবিচার করিলেন কি না, এখনও অনেকের সন্দেহ রহিয়া গেল। তিনি বলেন, "মোহনলাল এক জন সামান্য অবস্থার লোক। নবাব সরকারে তাঁহার কোনই পদগৌরব ছিল না। সিরাজদ্দৌলা যখন যৌবনোন্মাদে মত্ত, সেই সময়ে যে সকল লোক দলে দলে তাঁহার পার্শ্বচর হইয়াছিল, মোহনলাল তাঁহাদেরই এক জন।" অতঃপর মোহনলালের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভগ্নীও আসিয়া সিরাজের অন্তঃপুরে উপনীত হইল; মোহনলালের ন্যায় আরও কত লোকে এইরূপে সিরাজদ্দৌলার উপর আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহাতে মোহনলালকে যে এক জন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি মানবপশুরূপে প্রদর্শন করা হইল, স্নেহভাজন সিরাজের দিকে একটু টানিতে গিয়া গরীব মোহনলালের মস্তকে যে লগুড়াঘাত করা হইল, আমাদের মিত্র মৈত্র মহাশয় তাহা লক্ষ্যই করিলেন না। যে ব্যক্তি যৌবনে সিরাজের পাশবলিপ্সার অযথা সাহায্য করিয়া ভগিনী-উৎসর্গে সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিল, লোকে তাহাকে কি ভাবের "বীরপুরুষ" বলিয়া ভাবিবে? সে কিরূপ "সমাদরের" পাত্র, বন্ধুবরই বলিতে পারেন! কোনও ইতিহাসই তাঁহার এ উক্তির সমর্থন করে না। মোহনলাল অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ; সিরাজের নিজের দেওয়ান ছিলেন, এইমাত্র নির্দ্দেশ আছে। সিরাজের যৌবরাজ্যসময়ে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ যে স্বয়ং মোহনলালকে দেওয়ানী পদে নিয়োগ করিয়া যান নাই, তাহার প্রমাণাভাব। অক্ষয় বাবু পরে রাজা মানসিংহের সহিত মোহনলালের তুলনা করিয়াছেন, এবং টীকায় আমার "নবাবী আমলের হিন্দু কর্ম্মচারী" (সাহিত্য; ১৩০২) প্রবন্ধে মোহনলালের "অপবাদ" সম্বন্ধে ইঙ্গিত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "আমরা ইহাকে অপবাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি; রাজা মানসিংহ এবং মোহনলাল উভয়েই সমাদরের পাত্র। মোগলকে ভগিনী দান করিয়াছেন বলিয়া বীরত্ব গৌরব অবসন্ন হইতে পারে না।" মুসলমানের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিলে গৌরবহানির সম্ভাবনা না থাকিতে পারে; কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে কি একরূপই দাঁড়াইতেছে? যদি বলা যায়, মুস্তাফার "Made a present" মানে বিবাহ দেওয়া হইল, আর কিছু নয়, তাহাতে অন্যের বড় একটা আপত্তি না হইতে পারে। (৬) কিন্তু বন্ধুবর যে ভাবে এই অপবাদ দেখাইলেন, তাহাতে আর

(৬) সিরাজের ইতিহাসে যে, দুই এক স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই, সেই

মলিবার কথা কি থাকিল? যাহা হউক, মোহনলালের ভগ্নী সিরাজের বিবাহিতা পত্নী মনে করিয়া লইলে কি হয়, দেখা যাউক। বাঙ্গলা দেশে কিন্তু নবাবী রাজজামাতার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের অভাব!

ইতিহাসে আমরা সিরাজ উদ্দৌলার দুই পত্নীর উল্লেখ পাই। ১ম, তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, মির্জা ইরেজ খাঁর দুহিতা—২য়, লুৎফউন্নেসা, সিবাজের জারিরা বা ক্রীতদাসী। প্রথমা পত্নীর কথা কেবল বিবাহের সময়েই পাওয়া যায়; নামনির্দ্দেশ নাই। লুৎফউন্নেসাই তাঁহার প্রণয়িনী, জীবন মরণের সুখ দুঃখের সঙ্গিনী। সিরাজ একবার বৃদ্ধ মাতামহের উপর অভিমান করিয়া যখন বলপূর্ব্বক পটনা-অধিকারে যাত্রা করেন, তখনও লুৎফউন্নেসা তাঁহার সঙ্গিনী; আবার পলাশী যুদ্ধের পরে পলায়নের সময়েও লুৎফউন্নেসাই তাঁহার অবলম্বন। (৭) উমদৎউন্নেসা নামে সিরাজের আর এক পত্নীর কথা প্রথমে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিভারিজ সাহেব ১৭৯১ সালের নিজামত রেকর্ড হইতে উদ্ধার করেন। (৮) আমরা পরে এ সম্বন্ধে সমস্ত কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহা এই:—১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর উমদৎউন্নেসার উকীল মীর ফতে আলি, লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট এক দরখাস্ত করিতেছেন; তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই, আমার মক্কেল নিজামত ফণ্ড হইতে ৪৫০ টাকা পেন্সন পান, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাকী ১১০৯৩৷৶০ দাঁড়াইয়াছে; এই টাকা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হউক। ইতিপূর্ব্বে প্রতিনিধি গবর্ণর ম্যাক্‌ফারসন সাহেবের নিকটও এক দরখাস্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। অতঃপর ১৭৮৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রের ইংরাজী অনুবাদে প্রকাশ যে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের অনুগ্রহে রেসিডেণ্ট স্মীক সাহেব উমদৎউন্নেসার পেন্সন মীমাংসিত দিয়া

খানেই বন্ধুবর অক্ষয় বাবু আমার নামোল্লেখ করিয়াছেন। মোহনলাল সম্বন্ধে পত্র-দ্বারা আমার শেষ বক্তব্য জ্ঞাত হইয়াও গ্রন্থ কলেবরে তাঁহার পূর্ব্ব উক্তির পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করেন নাই। অবশ্য শেষ নোটে লিখিয়াছেন, "মোহনলালের ভগিনীদানকাহিনী মুতাক্ষরীণে দেখিতে পাওয়া যায় না। সমসাময়িক ইংরেজেরা কিন্তু এ কথা রটনা করিতে ত্রুটী করেন নাই। অনেকে বলেন, এটি নিতান্তই ইংরেজের রটা কথা।" সমসাময়িক ইংরেজেরা কেহই রটনার ত্রুটী করেন নাই, তাহা হইলে প্রমাণের বাকী কি থাকিল? মুস্তাকার টীকা দেখিয়া ষ্টুয়ার্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। আমরা ইংরেজ মহাক্সর কথায় ষ্টুয়ার্টকেই লক্ষ্য করিয়াছি। "গৌরব অভাবে" বহুবচন প্রয়োগটা বোধ হয় ভুলই হইয়াছে।

(৭) Mutaqherin—vol I, 614.

(৮) Calcutta Review 1892 (April) p. 341.

আসিতেছেন; কিন্তু পূর্ব্ব বাকীর দরুণ ৫২৯২ টাকা এখনও পান নাই। উমদৎউন্নেসা এই পত্রে লর্ড কর্ণওয়ালিসকে অনুরোধ করিতেছেন, "আমি আমার জায়গীরের বন্দোবস্ত করিবার জন্য পাটনা যাত্রা করিতেছি; পাটনার জজকে আমার উপর অনুগ্রহ-প্রদর্শন করিতে পত্র দিলে কৃতার্থ হইব।" ইহার উত্তরে সেক্রেটরী চেরী সাহেব স্পীক সাহেবকে লিখিতেছেন যে বেগমের বাকী টাকার প্রার্থনা, নিজামতের দেনা পরিশোধের নিয়ম-অনুযায়ী হইলে, তাঁহাকে ঐ টাকা দেওয়া হউক। (৯) ইহার পরে ব্লারিজ সাহেবের উল্লিখিত ১৭৯১ সালের আগষ্ট মাসে পেন্সন্-বৃদ্ধির প্রার্থনা। ইহাতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, পূর্ব্বে বেগম মাসে পাঁচ শত টাকা পাইতেন; হেষ্টিংসের আমলে ৪৫০ হয়, এক্ষণে ৩২৫ দাঁড়াইয়াছে।

উমদৎউন্নেসার জায়গীর ছিল, এই প্রথম দেখা গেল। ব্লারিজ সাহেব ইহা জানিলে, অবশ্য উমদৎউন্নেসা ও লুৎফউন্নেসা অভিন্ন হইতে পারেন, এমন অনুমান করিতেন না। পরে মোহনলালের যেরূপ পরিণাম নির্দ্দেশ করা যাইবে, তাহাতে উমদৎউন্নেসা তাঁহার ভগ্নী হইতে পারেন না। সেন্ট পর্য্যন্ত জায়গীর স্থির থাকাই ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ। এই জায়গীর দ্বারা তাঁহাকে আমরা সিরাজের পাটরাণী ইরেন খাঁর দুহিতা বলিয়া অনুমান করি। ফষ্টার সাহেব নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে সিরাজের সমাধিমন্দিরে যে বেগমের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি উমদৎউন্নেসাও হইতে পারেন। এই সমাধিমন্দিরে (খোষবাগ) সিরাজের দুই স্ত্রীর সমাধি আছে বলিয়া প্রকাশ। একটি লুৎফ-উন্নেসার; অন্যটি উমদৎউন্নেসারই হওয়াই বিশেষ সম্ভব।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুরের মতে, লুৎফ-উন্নেসাই মোহনলালের ভগ্নী;—ব্লারিজ সাহেব তাঁহারই নিকট ঐরূপ শুনিয়াছেন। মুতাক্ষরীণের টীকাই তাঁহার প্রথম বিশ্বাসের মূল। তিনি এই জনশ্রুতি সম্বন্ধে পরে প্রাচীন লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা এই ঃ—"সিরাজ এক দিন সহচর সঙ্গে সহরের দক্ষিণ দিকে (বর্ত্তমান সাহানগরে) বাঙ্গালাপাড়ার পথে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। দেখিলেন, একটি অট্টালিকার উপরে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা কেশপাশ উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। রূপ দেখিয়া চঞ্চলমতি সিরাজ মোহিত হইলেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, ঐ কুমারী তাঁহার স্বীয় দেওয়ান মোহনলালের অবিবাহিতা ভগ্নী,

(৯) Letter to Mr. speke, Resident. Dated the 6th May 1789.

অনতিবিলম্বে বিবাহের প্রস্তাব হইল, ভদ্র ভঙ্গিতে মোহনলালের কোনও আপত্তি হইল না; শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।" এই জনশ্রুতি মোহনলালের উন্নতির কারণ এইরূপেই স্থির করিয়া দিল। মুতাক্ষরীর মানসী কন্যা যৌবনে এই বেশ ধারণ করিল। আমাদের দেশে অনেক জনশ্রুতিই এই আকারের। কোথাও কিছু লেখা দেখিলেই তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের আর সন্দেহের কারণ থাকে না; ক্রমশঃ লতা পল্লব ফুলফলে তাহার পুষ্টিসাধন করি। বিদ্যাসুন্দরের সুরঙ্গ বাহির করিবার জন্য বর্দ্ধমানে কত মনীষীর মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করে? যাহা হউক, নিম্নলিখিত কারণে আমরা লুৎফউন্নেসাকে মোহনলালের ভগ্নী বলিয়া স্বীকার করিতে অসমর্থ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সিরাজের পাটনা যাত্রার সময়ে লুৎফউন্নেসা তাঁহার সঙ্গিনী। মুতাক্ষরীণ-কার লিখিয়াছেন, সিরাজ এই সময়ে লুৎফউন্নেসা ও তাঁহার মাতাকে নিজের এক দ্রুতগামী বলদ-শকটে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং সেই একই বলে যাত্রা করেন। (১০) মোহনলালের মাতাও এই অবস্থায় সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে এক শকটে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে হয়। মনে রাখা উচিত, জনশ্রুতি মোহনলালের দেওয়ানী ও অট্টালিকা অস্বীকার করে নাই; তাহাতেই বোধ হয়, তিনি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন না।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত, মুতাক্ষরী তাঁহার এই স্থানের টীকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি স্বচক্ষে এই কথিত শকটের প্রকাণ্ড বলীবর্দ্দ দুইটি দেখিয়াছেন; নিজের মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদের কুঁদ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলেন, আরও অর্দ্ধ ফুট বাকী থাকে। আমাদের মনটা নাকি বড়ই সন্দিগ্ধ, তাই এই উক্তিটি একটু কেমন কেমন বোধ হয়। মুস্তাফী বলিয়াছেন, দুই বৎসর পরে এই বলদ দুইটি মীরজাফর ওয়াট্‌স সাহেবকে দান করেন। মীরজাফর নবাবের বহুমূল্য উপহার দিলেন; অতএব উপহার মীরজাফরের নবাবী প্রাপ্তির পরেই ঘটা উচিত। অথচ সিরাজের ও পাটনা-যাত্রা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে। কথাটা এজন্য বড় সঙ্গত বোধ হইতেছে না। আমরা বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, মুস্তাফা বড় গুজবপ্রিয় লোক। মুস্তাফীর অনেক কথা বড়ই সাবধানে গ্রহণ করিতে হয়। কুৎসারটনায় তিনি সিদ্ধহস্ত; তাঁহার ঐ বিষয়ের টিপ্পনীগুলি অনেক স্থলে এরূপ অশ্লীল ও জঘন্য

(১০) Mutaqherin vol I. 614-15.

যে, সভ্য ভাষায় তাহার উল্লেখ অসম্ভব। (১১) যাহাই হউক, তাঁহার মন্তব্য মোহনলালের ভগ্নীর উল্লেখ দেখিয়া, লুৎফউন্নেসাকে ঐ ভগ্নী বলিয়া স্থির করিবার কোনও কারণই নাই। লুৎফউন্নেসা পরিণামে খোষবাগে আলিবর্দ্দী ও সিরাজের সমাধিমন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার শব সিরাজের পদতলে সমাহিত রহিয়াছে।

আমাদের স্থানীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, এই মোহনলালের ভগ্নীর প্রসঙ্গে আরও একটু বেশী দূর গিয়াছেন। মুস্তাফা লিখিয়াছেন, কৈজী বা কুদ্ধ নামে এক পদ্মসুন্দরী নর্ত্তকীর রূপের কথা শুনিয়া সিরাজ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তাহাকে দিল্লী হইতে আনয়ন করেন। সে রূপসী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, অতি ক্ষীণাঙ্গী, ওজনে ২২সের মাত্র; এক কথায় সর্ব্বসৌন্দর্য্যের ললামভূতা। সে পরে সিরাজের ভগ্নাপ্রতি নৈয়দ মহম্মদের প্রেমে পড়ায় ক্রোধোন্মত্ত সিরাজ তাহাকে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া তাহার চারি দিক অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তিন মাস পরে ঐ স্থান হইতে তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট মৃতদেহ বাহির করা হয়। যে দুইটি প্রকাণ্ড টীকার কৈজী ও মোহনলালের ভগ্নীর উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার অনুবাদ বা নকল দিবার অবসর বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। (১২) এ মাসের "সাহিত্য"ও কেবল এই প্রবন্ধের জন্য নহে। যাহা হউক, বক্ষ্যমাণ টিপ্পনী দুইটির বলে কৈজীর স্কন্ধে মোহনলালের ভগিনীত্ব আরোপিত করিবার কোনও কারণ নাই। নিখিল বাবু নিজ কাহিনীতে ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেন কেন, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি ব্যস্ততার সহিত এই অংশটি লিখিয়াছেন। কৈজী মোহনলালের ভগ্নী, টীকার এই অর্থ হইলে, ষ্টুয়ার্ট বা বিভারিজ তাহা লক্ষ্য করিতেন। টীকাটির অর্থও বিশদ;—মোহনলালের ভগ্নীকে তন্বঙ্গী বলিয়া, এ দেশের লোকের সৌন্দর্য্যবোধের কথায় মুস্তাফা বলিয়াছেন যে, সুন্দরীর বর্ণনায় লোকে সাধারণতঃ বলিবে, এমন সুন্দরী যে পীন খাইলে গলার ভিতর দিয়া রক্তিম রাগ দেখা যায়; এতই ক্ষীণাঙ্গী যে, ওজনে ২২সের মাত্র। এই উক্তির পর স্পষ্টই বলিয়াছেন, কৈজীর ওজন এই ২২সের ছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেবেরও এই নোট্ দৃষ্টে মোহনলালের ভগিনীর ওজন দেওয়া সমীচীন হয় নাই। নিখিল বাবুর প্রথম ভ্রম তাঁহার পরবর্ত্তী তর্কগুলিকে এক দিকেই প্রযুক্ত করিয়াছে। ক্ষমতাবন্ত

(১১) See Notes Mutaqh. p. p. 636, 647, 650 &c. &c.

(১২) Vide Mutaqh-Foot note p. p. 614-15, 717.

গুণপনা যতই থাকুক, মৈজীর ভ্রাতা হইলে মোহনলালের উপর সিরাজের কতটুকু আস্থা থাকিতে পারে? মুস্তাফার স্পষ্ট উক্তির পর এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা অনাবশ্যক।

দেখা গেল, এ তিন জনের কেহই মোহনলালের ভগ্নী হইতে পারেন না। সম্বন্ধ সুস্থির করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, অন্য কোনও অজ্ঞাত বেগমের অনুসন্ধান আবশ্যক। এত কথার পরেও যদি সিরাজ মোহনলালের ভগিনীপতি ছিলেন, এই অনুশ্রুতি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাতেও মোহনলালের বীরপ্রকৃতির বিপক্ষে কিছু বলিবার থাকে না। এক্ষণে তাঁহার কি কৃতিত্ব ছিল, সেই প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক। তিনি মোসাহেব ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত।

সিংহাসনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সিরাজদ্দৌলা চারি দিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত দেখিলেন। এক দিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপত্নী ঘেসিটী বেগম কৌশলী রাজবল্লভের পরামর্শে সিরাজের মৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার এক অপোগণ্ড শিশু লইয়া উপস্থিত। পক্ষান্তরে প্রবীণ মন্ত্রিদল জগৎ শেঠের সহিত একমত হইয়া পূর্ণিয়ার নবাব, সিরাজের পিতৃব্যপুত্র শওকৎজঙ্গকে সিংহাসনপ্রদানের অভিলাষী। এ সময়ে একমাত্র মোহনলালই সিরাজের অবলম্বন। তাঁহারই প্রাণপণে এই আসন্ন বিপদগুলি কোরকেই নিষ্পিষ্ট করিবার ব্যবস্থা হইল। ঘেসিটী বেগম মতিঝিল প্রাসাদ হইতে অন্তঃপুরে আনীত হইলেন; বেগমের পাত্রসমিত অর্থগৃধ্নু সহকারিগণ কার্য্যকালে সরিয়া পড়িল। অতঃপর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে শওকৎজঙ্গকে শিক্ষা দিবার জন্য পূর্ণিয়া যাত্রা করেন। তিনি স্বয়ং এক দল সৈন্যসহ রাজমহলের দিক্ দিয়া অগ্রসর হইলেন; অপর সৈন্যদল মোহনলালের অধীনে গঙ্গা পার হইয়া সোমদহ, হাবেৎপুর ও বসন্তপুর গোলার দিক হইতে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইল। (১৩) নবাবগঞ্জ ও মণিহারীর মধ্যস্থলে প্রাকৃতিক

(১৩) মুতাক্ষরীণ (১—৭৩৯ পৃঃ) ইুয়ার্ট ভ্রমক্রমে 'নবদহ' পড়িয়াছেন। অক্রুর বাবু সুপরিচিত সরদহের উল্লেখ পাইয়া 'রাণী ভবানীর জমিদারী' যোগ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মুর্শিদাবাদ হইতে পূর্ণিয়া যাইতে হইলে, মাজদাহীর দক্ষিণ সরদহ পাওয়া যায় না। হরিয়াপুর ও সোমদহ—মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলার সীমান্তভাগে। পূর্ব্বে দুইটি স্থানই প্রসিদ্ধ ছিল। স্থানীয় লোকে সোমদহকে 'সমধা' বলে। এখানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা প্রভৃতি প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। বসন্তপুর গোলা পূর্ণিয়া নবাবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী।

পরিখাবেষ্টিত এক সুন্দর স্থানে পূর্ণিয়ার প্রবীণ মন্ত্রিগণের পরামর্শে সৈন্য-সংস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চারি দিকে বিলে পরিবেষ্টিত এক উচ্চভূমি, এক পার্শ্বে একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ পথ; সেখানে মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যেই ব্যূহ রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু নির্ব্বোধ শওকৎ জঙ্গের আদেশে তাঁহার সৈন্যের উৎকৃষ্ট অংশ ব্যূহের বাহিরে দুই ক্রোশ ব্যবধানে সন্নিবিষ্ট হইল। ১১৭০ হিজিরা সালের ২১শে জমাদিয়ল্ সানি বেলা আড়াই পহরের সময় মোহন-লালের সৈন্য আবারি ও মণিহারীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। এই স্থানের নাম বলদিয়াবাড়ী। এখান হইতে শওকতের শিবির দুই ক্রোশের অধিক নহে; কিন্তু মধ্যে বিলের ভগ্নাংশবিশেষ বর্ত্তমান। মোহনলাল সসৈন্যে গঙ্গার পাহাড়ের উপর একটি উচ্চস্থানে উপনীত হইলেন। সেনাপতিগণের মধ্যে মীরজাফর খাঁ, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, মীর কাসেম খাঁ, এবং প্রসিদ্ধ বীর উমের খাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয়, জিলির খাঁ ও আসালৎ খাঁ প্রভৃতি বাঙ্গলা সৈন্যের পদাধিকারিগণ পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। (১৪) তাঁহাদের ক্ষুদ্র কামান-গুলি কিছু অগ্রসর হইয়া শত্রুশিবিরে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিল, কিন্তু এত দূর হইতে সকল গোলা শিবিরে পৌঁছিল না, অর্দ্ধ পথে পঙ্কসলিলে পতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃহৎ কামানগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন দুই চারিটি গোলা শওকতের শিবিরে পড়িতে লাগিল। শওকৎ ত্রস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

শ্যামসুন্দর নামে এক জন বাঙ্গালী কায়স্থ শওকতের পিতার আমল হইতে পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন; ইনি প্রথমে বাহুবলে আপন সৈন্যদল ও কামান সংস্থাপিত করেন। (১৫) কিন্তু শওকৎ জঙ্গের অথ দেখিয়া, তিনি এই সময়ে আপন কামানগুলির সহিত অর্দ্ধক্রোশ অগ্রসর হইয়া, শত্রুপক্ষের প্রতি গোলা চালাইতে লাগিলেন।

মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন স্বয়ং শেষ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত

(১৪) অক্ষয় বাবুর "মীরজাফর খাঁকে নিরাস্ত্র আপন চক্ষে চক্ষে রাখিয়া সঙ্গে লইয়া চল", "যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের সৈন্যদলের সঙ্গে মীরজাফরের সৈন্যদল মিলিত হইল" ইত্যাদি নির্দ্দেশ মুতাক্ষরীণের সহিত একমত হইতেছে না। মোহনলাল এ যুদ্ধে সকল সেনাপতির উপরে কর্ত্তা ছিলেন, দেখা যাইতেছে।

(১৫) "Shiam Sundar, a Bengali Cahet", "The comptroller of the artillery"—(Mutaqh I, 740—42)

ছিলেন। তিনি বলেন, এইরূপ কার্য্যে সাহস ও প্রভুর হিতসাধনে উৎসাহ দেখাইতে গিয়া শ্যামসুন্দরের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরক্ষিত ব্যূহ হইতে বহির্গত হওয়ায় বিলের ব্যবধানরূপ সুবিধা অন্তর্হিত হইল। (১৬) সম্ভবতঃ বিপুল নবাবসৈন্যের সম্মুখে ব্যূহমধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া শ্যামসুন্দর হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার "সাবধানের বিনাশ নাই" দলের প্রবীণ লোক; তাঁহার সমালোচনা আবার পরবর্ত্তী কালে গৃহমধ্যে শান্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে কয় জন লোকে ওয়েলিংটনের মত নির্বাক্ নিরুদ্যম হইয়া থাকিতে পারে? শ্যামসুন্দরের সে সময়ের অবস্থাও বিবেচ্য। নবাবী বৃহৎ কামানগুলি যখন ভীমনাদে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে, শওকৎ জঙ্গ তখন ভয়বিহ্বল হইয়া নিজের "মাহী" পতাকা নামাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, অনেক লোক একত্র দেখিয়া শত্রুপক্ষ সেই দিকে কামান দাগিতেছে ভাবিয়া, নিজের অনুচরবর্গকে ধমক্ দিয়া সুনিস্তিরে যাইতে আজ্ঞা দিতেছেন, (১৭) তখন কি গোলন্দাজ সেনাপতির পক্ষে বিরুদ্ধপক্ষের কামানগুলিকে স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য নহে? শওকতের তীব্র ভৎর্সনায় তাঁহার শিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্যদল অগ্রসর হইতে গিয়া যদি সহাপক্ষে নিপতিত না হইত, তাহা হইলে যুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্যগণের কি অবস্থা হইত, তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, দেখা গেল, শ্যামসুন্দর বাঙ্গালী কায়স্থ হইলেও সামান্য "মন্ত্রীকেরাণী নহেন; লেখনী ত্যাগ করিয়াই সেনাপতি হন নাই।" (১৮) সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের নিকট অসি-মসীর সাপত্ন্য-সম্বন্ধ বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে শ্যামসুন্দর মোহনলালেরই প্রকৃতি। সুতরাং নবাবী আমলের হিন্দু সেনাপতিগণের মধ্যে ইঁহার আসন বড় নিম্নে নয়। অপ্রদার্থ শওকৎ জঙ্গের লবণের মর্য্যাদারক্ষার জন্য ইনিও প্রাণ দিতে অগ্রসর ছিলেন; অতএব, কালে শওকতের সহিত ইঁহারও কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইতে পারে। ভাগ্যবিড়ম্বনায় বাঙ্গালী জাতি নিজের যে যৎসামান্য গৌরবের বিষয় আছে, তাহারও কোনও ইতিবৃত্ত রাখে নাই, নতুবা মোহনলাল ও শ্যামসুন্দরের ন্যায় কত কর্ত্তব্যপরায়ণ অমিততেজা বাঙ্গালী বীরের নাম করিয়া এই হতভাগ্য দেশ রসনা তৃপ্ত করিতে পারিত!

(১৬) Mutaqhcsin, vol I. 742.

(১৭) Mutaqh. vol I. p. 743.

(১৮) ষ্টুয়ার্ট কায়স্থের অনুবাদে 'Scribe' করিয়া গোল করিয়াছেন; বাঙ্গালী বলিয়া

অতঃপর নবাবগঞ্জ যুদ্ধে যাহা ঘটিল, অক্ষয়বাবু তাহার ওজস্বিনী ভাষায় তাহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। ভয়চকিত শওকতের গঞ্জনায় দূরে সংস্থাপিত প্রধান সেনাপতি কারগুজার খাঁর অধীন পূর্ণিয়ার শিক্ষিত অশ্বারোহী দল শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া বিলের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গলা কামানের লক্ষ্যে পরিণত হইল। যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহাও বাঙ্গালী অশ্বারোহী সৈন্যের শাণিতকৃপাণমুখে উৎসৃষ্ট হইতে লাগিল; এই সময়েই মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি সেনানায়কগণ সদলে প্রচণ্ডবেগে বিপক্ষসেনার উপর নিপতিত হইয়া তাহাদের ধ্বংস সাধন করিলেন। শ্যামসুন্দর আহত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গোলাম হোসেন প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়া যুদ্ধের ঘনীভূত অবস্থায় সুরাপানে অবশ শওকতকে ধরাধরি করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহিত করাইলেন; বিপক্ষের এক গোলা আসিয়া তাঁহার ললাটচ্ছেদ ও ভবযন্ত্রণার অবসান করিল।

এই যুদ্ধে আমরা আর দুই জন হিন্দু সেনাপতির উল্লেখ পাই। এক জনের নাম মিঞ্জনলাল। ইনি শওকতের শরীররক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়ক। দ্বিতীয় মানু হাজারী। অন্যতম পদাতিক গোলন্দাজ সেনানী; শওকতের অসদ্ব্যবহারে বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইনি সিরাজদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন (১৯) ষ্ট্যাটিষ্টিকাল্ রিপোর্টের ওডনেল্ সাহেব ইহাকে শওকতের অশ্বারোহী সেনাপতি বলিয়া বিষম ভ্রম করিয়াছেন।

উল্লেখও করেন নাই। অক্ষয়-বাবু এই অংশ লিখিবার সময় বোধ করি, মুতাক্ষরীণের সাহায্য পান নাই। শ্যামসুন্দর 'বাঙ্গালী কায়স্থ' এ উল্লেখ পাইলে, বন্ধুবরের মত স্বজাতিপ্রাণ ঐতিহাসিক কখনই তাঁহার সম্বন্ধে অন্যরূপ মত লিপিবদ্ধ করিতেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। নব্য বাঙ্গালীর বাঙ্গলা পড়িতে যদি নিতান্তই ঘৃণা না থাকে, তবে 'সিরাজদ্দৌলা'র ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইবে। সেই সময়ে মৈত্র মহাশয় আমাদের কথা স্মরণ রাখেন, এই অনুরোধ।

হন্টার-সাহেবের সহযোগী ওডনেল্ পূর্ণিয়ার ষ্ট্যাটিষ্টিকাল্ রিপোর্টে সিয়ার-উল্-মুতাক্ষরীণের নবাবগঞ্জ-যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ বলেন, সিরাজ মীরজাফরকে অপদস্থ করার পর শওকত স্বয়ং পূর্ণিয়ায় গিয়া শওকৎ জঙ্গে উপাধিতে ভূষিত করেন,—"Hindu scribe shiam sunder who was probably a kaystha"—"শওকতের অশ্বারোহী সৈন্য বিখ্যাত হাজারীলালের অধীনে ছিল"—ইত্যাদি। মুতাক্ষরীণের নোহময় নাম লইয়া কত জনে কত কি বলিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করে?

(১৯) Mutaqhherin vol I. 742.

[illegible] শান্তিস্থাপন ও [illegible] মহারাজা মোহনলাল কিছুদিন [illegible] অপেক্ষা করিলেন। সৈয়দ আহম্মদের নামে সনন্দ, খেলাৎগণ ও [illegible] মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। সেখানে শওকতের [illegible] কোন ও ভয়ের নাই। পরিশেষে নিজ মনোনীত এক জন দক্ষ লোকের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করিয়া মোহনলাল রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার পুত্রকে পরে পূর্ণিয়ার নায়েব-নবাবী পদে নিযুক্ত দেখিতে পাই। সিরাজের অপদার্থতার পর পূর্ণিয়ার বিদ্রোহী সামন্তেরা ইহাকে বন্দী করিয়া সিংহাসন কাড়িয়া লয়। (২০) মোহন পুত্র একটা প্রদেশ নবাবী করিবার উপযুক্ত, এরূপ [illegible] এক জন বিষয় বীরপ্রকৃতির লোক বালক সিরাজদ্দৌলার যে মনোযোগের পাত্রীভূত হইতে পারেন কি না, পাঠক বিচার করিবেন।

যুদ্ধবিগ্রহে যে মোহনলাল নেতা, তিনিই আবার রাজকার্য্যপরিচালনেও কর্ণধার। পলাশী প্রান্তরের ভিতরে ভিতরে অগস্তি; রাজবিপ্লবের ষড়যন্ত্রে যোগদান দিতে। ইতিহাস বিশদ করিয়া না বলিলেও, মোহনলালের ন্যায় গতি-ভক্ত মস্তিষ্কের সাহায্য না পাইলে,—সিরাজদ্দৌলার প্রতিজ্ঞা হল শাইস্তে যতই বাড়াইয়া দেওয়া যাউক—এ অঙ্গে তাঁহার বুদ্ধির ধার পানি পাইত না, ইহা বেশ বুঝা যায়। এ অবস্থায় সিরাজ ও ইংরাজের মধ্যে যে পলাশির আরম্ভ প্রধান চরিত্রটিই, (২১) তাহাতে ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ করি, সিরাজের কৃতিত্বের এমন ভক্ত অতি বিরল, যাহারা মোহনলালকে তাঁহারই মস্তিষ্ক প্রসূত বলিয়া মানিয়া লইবেন। যৌবনোদ্ভিন্ন সিরাজ যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন সন্দেহ নাই; মন্ত্রী মোহনলালের বিচক্ষণতায় বুদ্ধির সাহস ক্রমশঃ বীরত্বের সংযোগ হইতেছিল। কিন্তু দেশ বিদেশের [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্বন্ধকার হওয়া, মোহনলাল কেন, স্বয়ং ম্যাকিয়াভেলীর পক্ষেও সহজ হইত না। এই জটিল ঘোর অবস্থায় প্রবীণ পক্ষেরই জয় হইল। সিরাজের পক্ষ হইতে কখনও ইহাকে, কখনও তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কার্য্যক্ষেত্রে যাহা দাঁড়াইল, সকলেই জানেন; এই কারণেই [illegible] মহারাজা মোহনলাল উপস্থিত থাকিবার নেতা ছিলেন না। বাঙ্গালা [illegible] এক দল সৈন্য সহ মুরশিদাবাদের বন্দোবস্ত করিবার জন্য

(২০) মুতাক্ষরীণ ২।৩ খণ্ড। পরে দেখান হইয়াছে মোহনলালের পুত্র বলিতে মোহনলাল নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে বুঝাইয়াছেন।

(২১) Ives' Voyage and Narrative; ইহাকে Journal বলা ঠিক নহে।

প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্যতায় নবাবী সেনা নবাবের জন্য অস্ত্রধারণ না করিয়া স্থির হইয়া রহিল; রাজার, মীরজাফরের ও ইংরাজদিগের আজ্ঞায় স্থাপিত সৈন্যদল সমস্ত নবাবী সৈন্যের অষ্টাংশের প্রায় নষ্টাংশ। তাহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় রণপ্রবাহির লহরীগণনাক্ষম হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। অবশিষ্ট সামান্য বিশ্বাসী সৈন্য, মোহনলাল ও মীরমদনের অধীনে দক্ষিণপার্শ্বে ভাগীরথীতীরে সন্নিবিষ্ট ছিল; যুদ্ধক্ষেত্রের মোহনলাল বাঙ্গালী কবির কল্যাণে সাধারণের সুপরিচিত। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বিপক্ষ পক্ষের গোলার আঘাতে ভগ্নোরু মীরমদন স্বর্গগত হইলে, মোহনলাল যখন বিপুল বিক্রমে শত্রুদলকে অসমঞ্জ করিয়া তুলিয়াছেন, তখনই (২২) মীরজাফর প্রভৃতির পরামর্শে ভয়-চকিত সিরাজের বারংবার অনুযোগে তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নবাবী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; এইখানেই যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত হইল।

পলাশীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মহারাজা মোহনলাল মুর্শিদাবাদে গত হন। গোলাম হোসেন বলিতেছেন, যে মন্ত্রীকে সিরাজ এত উচ্চপদে উন্নীত করিয়াছিলেন, যাহার মস্তক গর্ব্বে গগন-স্পর্শ করিয়াছিল, এবং অন্যের অসহ্যভার বহন করিয়া যে কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন, রাজা দুর্লভরামের প্রীতিসাধন জন্য তাঁহাকে মুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হয়। রাজা দুর্লভরাম তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন, এবং সম্ভবতঃ এই সম্পত্তির জন্যই তাঁহার জীবনলীলারও অবসান হয়। (২৩) মুস্তাফা টীকায় এ সম্বন্ধের শুদ্ধও দিতেও ভুলেন নাই। তিনি বলেন, কেহ কেহ বলে, মীরজাফর তাঁহার কতকগুলি অনুচর পাঠাইয়া লণ্ডভাণ্ড মোহনলালের

ইহার পরে ভগ্নবিহ্বল সিরাজ ফিরিবার জন্য জেদ করেন; মীরজাফর ফিরিবার সংবাদ পাঠান নাই। তিনি এ যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন, মনে করা ভিন ভুল। নবাব স্বয়ং উপস্থিত। প্রত্যেক সেনাপতির অধীনে আপন আপন দল যুদ্ধে উপস্থিত ছিল।

(২২) By this time Mohanlal who had advanced with Mirmadan was closely engaged with the enemy; his cannon was served with effect, and his infantry having availed themselves of some covers and other grounds were pouring a quantity of bullets in the enemy's ranks. It was at this moment he received the order of falling back and of retreating. He answered that 'this was not the time to retreat, that the action was so far

প্রাণবধ করান; কেহ বা বলে, ভুল ভরাম বিষপ্রয়োগে সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ভুল ভরামকে ছাড়িয়া নীরজাকর বেচারীর স্কন্ধে দোষ চাপান সমীচীন নহে। মোহনলালের পুত্র পূর্ণিয়ার কারাগার হইতে কখনও বাহির হইয়াছিলেন কি না, ইতিহাসে তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। পলাশী যুদ্ধের গ্রাম্য কবিতায় "কলিকাতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটা" এই চরণে তাঁহার এক কন্যার কথাও জানা যাইতেছে। যে সিরাজের অন্ন খাইয়া মোহনলাল চিরদিন তাঁহার মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, যাঁহার জন্য তিনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার পোষ্যনীর হত্যার সঙ্গে মোহনলালের পরিবারও এইরূপে বিড়ম্বিত। শত্রুদল এইরূপেই প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল।

মোহনলাল বাঙ্গালী কি না, যাঁহারা এই সন্দেহ উপস্থিত করেন, আমাদের মনে হয়,—তিনি যে বাঙ্গালী নন, তাহা প্রমাণিত করিবার ভার তাঁহাদের উপর। মুর্শিদাবাদের বাঙ্গালী নবাবের তদানীন্তন প্রধান হিন্দু সেনাবর্গ সকলকেই বাঙ্গালী দেখিতে পাই। কেহ অনাথা হইয়া কলিকাতাতেই আশ্রয় লন; দিল্লী যান নাই। মুসলমানী গ্রন্থে বলে, তিনি কায়স্থ ছিলেন। প্রবাদ এই, মুর্শিদাবাদেই তাঁহার বাটী। যদি বলা যায়, তিনি মুর্শিদাবাদিবাসী লালা কায়স্থ, তাহা হইলেও তাঁহার বাঙ্গালী হইবার কোনও বাধা দেখি না। মুর্শিদাবাদের লালা কায়স্থ বাঙ্গালী-পদবাচ্য না হইলে, ভারতনারায়ণের "খিচুড়ি মিশেল" বলিয়া আমাকেও "কানুজে" বলিয়া লোকের ভ্রম হওয়া সম্ভব। মোহনলালের বাসস্থান বা বংশাবলীর বিবরণ দিতে পারা যায় না। এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারা যায়, অন্যান্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারী, যথা বস্ত্র, বীরদত্ত, রাজারাম সিংহ প্রভৃতি আরও কত জনের খবর কে দিতে পারেন? বর্ত্তমান প্রস্তাবের শ্যামসুন্দরের মন্দিরের সন্ধান কেহ বলিতে পারেন কি? বিপ্লবের পর মোহনলালের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা একবার চিন্তা করুন। হতভাগ্য সিরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী না হইয়া বিপ্লবকারী দলের সহযোগী হইলে, আজ কলিকাতায় তাঁহার নামে একাধিক অর্দ্ধ

advanced that whatever might happen would happen now; and that should he turn his head to march back to camp his people would disperse and perhaps abandon themselves to an open flight—Mutaqh. vol. I, 768.

(২৩) Mutaqherin, vol I, 776.

ক্রোশব্যাপী প্রাসাদ ও গবর্মেণ্টের প্রসাদভোগী তাঁহার বংশাবলীগণকে দেখিয়া অনেকের নয়ন মন তৃপ্ত হইত। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় মোহনলালের ভাগ্য বিধান অন্যরূপ। (২৪)

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাষ্টার মহাশয়।

১

লোকে তাহাকে "পাগ্‌লা মাষ্টার" বলিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের "বি, এ," উপাধি লাভ করিয়াও সে কোনও ভাল চাকরীর, এমন কি, সকল ছাত্রের শেষগতি ওকালতীর চেষ্টাও না করিয়া, কেন যে তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে সুদূর পল্লীগ্রামে একটা মধ্য-ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, সে রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিত না। সেই জন্য নানা জনে সে সম্বন্ধে নানা মত ব্যক্ত করিত। কেহ বলিত, দরিদ্রদের কোনও কুৎসার জন্য তিনি লোকসমাগমবহুল সহরে বাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন; কেন না, সহরে এক জন না এক জন দেশের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। কেহ বলিত, প্রথম যৌবনে ভালবাসিয়া হতাশ হইয়া তিনি জনতা হইতে দূরে স্বজনমধ্যে নারিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আবার কেহ বলিত, লোকটার সাক্ষাৎ বাতিক, নহিলে কেহ এমন কাজ করে না।

গ্রামে একটা বড় বাজার ছিল। বাজারের পার্শ্বে, বাজারের ঘাট হইতে অনতিদূরে গোটাকতক ঝাউ ও দেবদারু-তরুবেষ্টিত একখানা বড় আটচালা ঘরে স্কুল বসিত। আর সেই আটচালার পশ্চাতে নদীর অনতিউচ্চ প্রাচীরের উপর একখানা ক্ষুদ্র ঘরে হেডমাষ্টার বাস করিতেন। তাঁহার ঘর হইতে সমস্ত দিন বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার উচ্চ কণ্ঠোপকথন ও কারবারীর প্রভৃতির কোলাহল দূরোচ্চারিত কলরবের মত অস্পষ্ট শ্রুত হইত। ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইলে দেখা যাইত, বাজারের ঘাটে বৃহৎ বৃহৎ নৌকা হইতে ধান্য

(২৪) এই প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া ইতিহাসের অনুরোধে দুই তিন জন হিতকামী সুহৃদ্‌কে লক্ষ্য করিয়া দুই চারিটি অপ্রিয় সত্য বলিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া অন্তরিত চিত্তে বিদায় লইতে হইতেছে। লেখক।

কয়না প্রভৃতি পণ্য নামান হইতেছে, বা চিটা, চিনি, তিসি প্রভৃতি মাপ নৌকায় বোঝাই হইতেছে; সেই ঘাটের এক পার্শ্বে পরিপুষ্ট-উদর দোকানদারদিগের মধ্যে কেহ বা স্নান করিতেছে, কেহ বা স্নানান্তে মার্জ্জনচিক্কণ পিত্তল-পাত্রে জল লইয়া যাইতেছে।

মাষ্টার মহাশয়ের মাসিক বেতনের পঁচিশ টাকার মধ্যে দশ টাকাতেই তাঁহার আপনার সকল ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। যত দিন মাতা জীবিতা ছিলেন, তত দিন মাষ্টার মহাশয় প্রতি মাসে তাঁহাকে দশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন; অবশিষ্ট পাঁচ টাকা দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্য ব্যয়িত হইত। মাতার মৃত্যুর পর হইতে সে পনের টাকার সবটাই ছাত্রদিগের কল্যাণে ব্যয়িত হয়। দরিদ্র ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তকক্রয়, চিকিৎসার ব্যয়নির্ব্বাহ, ক্বচিৎ কোনও অতি দরিদ্র ছাত্রের জন্য বর্ষাকালে ছত্র-ক্রয় প্রভৃতিতে সে পনের টাকা শেষ হইয়া যাইত। বেবার হাতের টাকা ফুরাইয়া গেলে কোনও ছাত্রের কোনও প্রয়োজনীয় অভাব মোচন করা হইয়া উঠিত না, সেই বারই মাষ্টার মহাশয় সত্য সত্য অর্থের অভাব অনুভব করিতেন, নহিলে নহে।

স্কুলের সময় ভিন্ন—প্রভাতে, অপরাহ্নে বা সায়াহ্নেও মাষ্টার মহাশয়ের বিশ্রাম ছিল না। ছাত্রগণ সকল সময়েই মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পাঠ বুঝাইয়া লইতে আসিত। দোকানীরা কেহ বা পত্র লিখাইতে, কেহ বা শিরোনামা লিখাইতে, কেহ বা মকদ্দমার কাগজপত্রের অর্থ করাইয়া লইতে, কেহ বা মনিঅর্ডারের তারিখ জানিতে, কেহ বা ঘাটের ইজারদার অথবা পোষ্টমাষ্টারের নামে দরখাস্ত লিখিয়া লইতে আসিত। মাষ্টার মহাশয়ের কিছুতেই বিরক্তি ছিল না। তাঁহাকে কেহ কখনও রাগ করিতে দেখে নাই। কেহ কখনও তাঁহার মুখে বিরক্তিভাব লক্ষ্য করিতে পারে নাই। এতদ্ভেও মাষ্টার মহাশয়ের কার্য্য শেষ হইত না। কোনও ছাত্রের শরীর অসুস্থ হইলে তাহার গৃহে যাইয়া চিকিৎসার সকল বিষয়ের খোঁজ লওয়া ও আবশ্যক হইলে তাহার ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করা, এমন কি, রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাত্রিজাগরণ পর্য্যন্ত, মাষ্টার মহাশয়ের স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যের মধ্যে ছিল। মাষ্টার মহাশয় যেন সকলেরই আপনার লোক ছিলেন। ছাত্রগণ মাষ্টার মহাশয়কে যেমন ভালবাসিত, ছাত্রদিগের অভিভাবকগণও মাষ্টার মহাশয়কে তেমনই ভালবাসিতেন। যে পরকে সত্য সত্যই আপনার মত দেখে, লোকে সহজেই তাহাকে আপনার ভাবিতে পারিয়া ওঠে।

মাষ্টার মহাশয়ের অনেকগুলি পুস্তক ছিল, তাহার অধিকাংশই জীর্ণ। একটু অবসর পাইলেই মাষ্টার মহাশয় পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। কিন্তু সে অবসরলাভের সৌভাগ্য তাঁহার প্রায়ই হইত না।

২

মাষ্টার মহাশয়ের বড় দুঃখ ছিল যে, তাঁহার ছাত্রগণ প্রায়ই অধিক দিন পাঠ করিতে চাহিত না। তিনি জিদ করিয়া কোন কোন ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে পাঠাইতেন বটে, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কেহই সহজে গিয়া পাঠ করিতে সম্মত হয় নাই। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীদিগের পুত্রগণ দোকানের হিসাব লিখিতে শিখিলেই পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়া দোকানের খাতা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িত। এক একটি বুদ্ধিমান ছাত্র স্কুল ত্যাগ করিলে মাষ্টার মহাশয় যেন কোনও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ ভোগ করিতেন। সেই জন্য যখন মাধব কর্ম্মকার কেহ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিলে পুত্র বিনোদকে যত দিন ইচ্ছা পড়িতে দিতে স্বীকৃত হইল, তখন মাষ্টার মহাশয়ের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

বিনোদকে সমস্ত দিন পড়াইয়াও মাষ্টার মহাশয়ের তৃপ্তি হইত না। তিনি সন্ধ্যাকাল হইতে আবার তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিতেন। তাহার পর কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, কি বর্ষায়, প্রতিদিন স্বয়ং গঠন করিয়া মাষ্টার মহাশয় বিনোদকে গৃহে রাখিয়া সুপ্তগ্রামের নির্জ্জন পথে গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। মাধবের গৃহের অনতিদূরে গ্রামের চৈত্যক্রমে অসংখ্য শঙ্খচিল ক্ষণবিলম্বিত ক্ষণবিলম্বিত জ্যোতিঃ-বিস্তার করিত, শিল্পীজননিমুখরিত প্রান্তরে দূরে কেহ চীৎকার করিত, পথোপরি শয়ান কুকুর শুষ্কপত্রে পদশব্দ শুনিয়া দুই এক বার ডাকিয়া উঠিত; বিনোদের অদূরবর্ত্তিনী সিদ্ধির কথা ভাবিতে ভাবিতে মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিত। দেখিয়া লোকে বলিত, "মাষ্টারের কাজ দেখিয়া মনে হয়, যেন মাধব কর্ম্মকারের ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সমস্ত উপকার মাষ্টারেরই হইবে।"

নিয়মিত সময়ে বিনোদ পরীক্ষা দিয়া আসিল। যতদিন পরীক্ষার ফল বাহির না হইল, ততদিন অসাধারণ উদ্বেগে মাষ্টার মহাশয়ের দিন কাটিতে লাগিল। তাহার পর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল। সে বিভাগের পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে বিনোদ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সংবাদ লইয়া মাষ্টার মহাশয় স্বয়ং মাধবের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মাষ্টার মহাশয়কে উপস্থিত

দেখিয়া মাধব তাড়াতাড়ি মলিন বস্ত্রে একখানা চৌকী ঝাড়িয়া তাঁহাকে বসিতে দিল। মাষ্টার মহাশয় বসিয়া মাধবকে পরীক্ষার ফলের কথা বলিলেন।

অন্যান্য কথার পর মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "মাধব, বিনোদের এখানে পড়া শেষ হইল। এখন উহাকে সহরে পড়িতে পাঠাইতে হইবে।"

মাধব বলিল, "বিনোদের লেখাপড়া যাহা কিছু হইয়াছে, সবই আপনার কৃপায়। আপনার কথার উপর কোনও কথা বলা আমার উচিত হয় না, কিন্তু মাষ্টার মহাশয়, গরিবের ছেলের আর বেশী লেখা পড়ায় কি হইবে?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "দেখ, লেখা পড়া শিখিয়া তোমার ছেলে যদি একটা বড়লোক হয়, ধর, মেজেষ্টার হাকিম হয়, তবে কি তোমার আনন্দ হইবে না? সে কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, আমি কল সকালে আবার আসিব।"

মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন।

৩

লেখা পড়া শিখিলে ছেলে জেলার হাকিম পর্য্যন্ত হইতে পারে শুনিয়া মাধবের স্ত্রীর নিতান্ত জিদ হইল, যেমন করিয়াই হউক ছেলেকে সহরে পাঠাইতে হইবে। স্ত্রীর ও পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মাধবও সেই মতে মত দিল।

পর দিন প্রত্যূষে মাষ্টার মহাশয় মাধবের বাটী উপস্থিত হইলেন।

মাধব বলিল, "আপনি যদি বিনোদকে সহরে পাঠাইতে চাহেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। বিশেষ বিনোদের নিজের বড় ইচ্ছা, সে সহরে পড়িতে যায়। আমি তাহাদের রোজগারের প্রত্যাশা করি না। আপনাদের আশীর্ব্বাদে দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের জন্য আমি ছেলের রোজগারের আশা করিনা। তবে ও যদি একটা বড়লোক হয়, তাহার অধিক সুখ আমার আর নাই। কিন্তু সহরে খরচ অনেক; খরচের কি হইবে?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "সে ভার আমার। সে জন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না।"

* * * * *

মাষ্টার মহাশয় হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সহরে যাইয়া পুস্তকাদি কিনিতে ও সব গুছাইয়া লইতে প্রথমেই বিনোদের কিছু অধিক অর্থ আবশ্যক হইবে। তাহার জোগাড় করিয়া তবে তাহাকে সহরে পাঠাইতে হইবে।

মাধবের বাড়ী হইতে মাষ্টার মহাশয় গ্রামের জমীদারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। জমীদার-বাবু তখন একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। মোসাহেব নামক পরান্নপুষ্ট জীবদল তখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

নমস্কার, প্রতিনমস্কার এবং কুশলাদিজিজ্ঞাসার পর, ক্রমে স্কুলের কথা আসিয়া পড়িল। স্কুলের নানা কথার পর মাষ্টার মহাশয় বিনোদের কথাটা পাড়িলেন। পরীক্ষায় বিনোদের সাফল্যের কথা বলিয়া তিনি তাহাকে আরও পড়িবার জন্য সহরে পাঠাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। জমীদারের মুখে বিরক্তিব্যঞ্জক ভাব লক্ষিত হইল। তাহার পর মাষ্টার মহাশয় বিনোদের জন্য কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জমীদার বলিলেন যে, কোনরূপ সাহায্য দান করা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না। মাষ্টার মহাশয় বিনোদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা বলিলেন। তখন জমীদার স্পষ্টই বলিলেন, "বাবু! ও সব পাগলামী তোমারই সাজে। আমি টুঁশ কলা দিয়া সাপ পুষিতে পারিব না। আমি সাহায্য দিয়া গরিবের ছেলেকে লেখা পড়া শিখাই, আর সে বিদ্বান হইয়া আমার উপর চালাকী করুক। তোমারি চালচুলা নাই, তুমি ও সব কর, আমি পারিব না।"

এই অন্যায় ও অপমানজনক কথায় মাষ্টার মহাশয়ের আত্মসংযম ব্যথিত হইল। নিবদ্ধমেঘমধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশের মত নিরীহ মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয়ে ক্রোধ অভিব্যক্ত হইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "প্রজাপীড়ন করিয়া দরিদ্র প্রজার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপনি এই সম্পত্তি করিয়াছেন। আর আজ এক জন দরিদ্র প্রজার পুত্রের শিক্ষার জন্য সামান্য কিছু ব্যয় করিতে পারেন না। আপনি বুঝেন না যে, দেশের শিক্ষিতগণ দেশের মূল্যবান সম্পত্তি; আপনি সাহায্য করুন আর নাই করুন, আমি বিনোদকে সহরে পাঠাইব।"

ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে জমীদারের দিকে চাহিয়া মাষ্টার মহাশয় দ্রুতপদে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। স্কুলের সামান্য মাষ্টারের ধৃষ্টতা দেখিয়া জমীদার ক্রোধে ও বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে হুরসীর নল খসিয়া পড়িল।

সেই দিন হইতে গ্রামের স্কুলে জমীদারের বার্ষিক দশ টাকা সাহায্য বন্ধ হইয়া গেল।

৪

এ দিকে গৃহে ফিরিয়া মাষ্টার মহাশয় মৃতজননীর শেষ অলঙ্কারখানি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। সেই অলঙ্কারখানিই তাঁহার জননীর শেষ-স্মৃতিচিহ্ন, সেখানি বিক্রয় করিতে মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল।

তাহার পর আপনার পুস্তকগুলির মধ্যে যে কয়খানি বিনোদের আবশ্যক হইতে পারে, সে কয়খানি লইয়া মাষ্টার মহাশয় ঝাড়িয়া আলাহিদা করিয়া রাখিলেন। বিনোদের মাসিক খরচও তিনি নিজ বেতন হইতে দেওয়া স্থির করিলেন।

মাষ্টার মহাশয় একে একে বিনোদের আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। কয় দিন ধরিয়া সে সকল গোছান হইল। এটা লওয়া আবশ্যক, ওটা লইবার আবশ্যক নাই, এইরূপ নানা তর্ক বিতর্কের পর জিনিষপত্র বাঁধা হইল। শুভদিন দেখিয়া জনকজননীর আশীর্ব্বাদ লইয়া বিনোদ বিদ্যানিকার্থ গ্রাম হইতে যাত্রা করিল। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে লইয়া সহরে গমন করিলেন।

বিনোদকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, তাহার বাসস্থান স্থির করিয়া, তাহাকে নানা বিষয়ে আবশ্যক উপদেশ দিয়া, পুত্রের শুভার্থ তাহাকে বিদেশে রাখিয়া ব্যথিতহৃদয় জনকের মত মাষ্টার মহাশয় আবার আপনার পূর্ব্বকার্য্যে ফিরিয়া আসিলেন।

কয় বৎসর বিনোদের শিক্ষাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, এখন মাষ্টার মহাশয়ের কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত। মাষ্টার মহাশয়েরও অজ্ঞাতে তাঁহার হৃদয়ে সেই শান্ত, বুদ্ধিমান, অধ্যয়নানুরাগী ছাত্রের প্রতি স্নেহবন্ধন উৎপন্ন হইয়া ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্নেহ মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। বিশেষ যৌবনের তপ্ত-রক্ত যতই শীতল হইয়া আইসে, হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহরাশি ততই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহে। সেই সময় মানব স্নেহের পাত্রের অভাব প্রথম অনুভব করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় মানব সন্তানের অভাব প্রথম অনুভব করে। বন্ধ্যা নারীর সন্তানলাভাকাঙ্ক্ষা বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল হইয়া উঠে। সেই বয়সে উপযুক্ত পাত্র পাইলে স্বভাবতঃ নিম্নগামী স্নেহ তাহাকেই চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরে, আর সহজে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। তাই স্নেহের পাত্র স্নেহের অনুপযুক্ত হইলেও স্নেহ সহজে দূর হয় না।

মাষ্টার মহাশয়ের স্নেহ সেই অধ্যয়নপ্রিয় ছাত্রটিকেই বেষ্টন করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাই দুই চারি দিন বিনোদের সংবাদ না পাইলে মাষ্টার মহাশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন।

৫

বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল। ছুটির সময় বিনোদ যখন বাড়ী আসিত, তখন মাষ্টার মহাশয়ের আর এতটুকু অবসর থাকিত না। তিনি পরীক্ষার সময় তাহাকে যেমন করিয়া পড়াইতেন, এখনও সে গৃহে আসিলে তাহাকে তেমনই করিয়া না পড়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না।

এমনই করিয়া তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত শুষ্কশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য বিনোদ গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখে আর সে স্বাস্থ্যনিত লাবণ্য নাই, প্রতিভাদীপ্ত নয়নে এখন ক্লান্তিভাব লক্ষিত হয়। তাহার অস্থিসার দেহে মস্তক অসম্ভব বড় বলিয়া বোধ হইতেছে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিয়া, দুই বেলা কোনরূপে পেটভরা আহার করিয়া অতিরিক্ত শ্রমে বিনোদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে; বায়ুসঞ্চালনহীন স্যাঁৎসেঁতে জীর্ণ গৃহের পরিবর্ত্তে স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিতে পাইলে, উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার পাইলে, বোধ করি, ঐ গুরুশ্রমও তাহার সহ্য হইত। মাষ্টার মহাশয় অর্থের অভাব এবার যেমন অনুভব করিলেন, পূর্ব্বে আর কখনও তেমন করেন নাই।

পরীক্ষার বিষমশ্রম হইতে বিশ্রাম লইয়া পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যস্থধাময়ী জল-বায়ুর প্রভাবে ও জননীর শুশ্রূষাগুণে বিনোদের মৃতপ্রায় দেহে যেন নবজীবন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বিনোদ আবার একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার জননী বা মাষ্টার মহাশয় কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, বিনোদের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল; আবার সামান্য শ্রমেই শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে। বিনোদ আপনিও তাহা বুঝিতে পারে নাই।

পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সময় সময় বিনোদ আবার সহরে গেল। মাষ্টার মহাশয় উদ্বিগ্নহৃদয়ে পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহার পর এক দিন বিনোদের পত্র আসিল, বিনোদ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে।

বিনোদ মাষ্টার মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়াছে ও তাহার পিতা মাতাকে এই সংবাদ জানাইতে অনুরোধ করিয়াছে।

পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দে মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল। মাষ্টার মহাশয় এক বার, দুই বার, তিন বার পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহার পর তিনি সেখানি হাতে করিয়া, আনন্দোৎফুল্লচিত্তে মাধবকে এই সুসংবাদ প্রদান করিতে গমন করিলেন।

মাধব তখন বাটীর মধ্যে একটা লাউগাছ মাচায় তুলিয়া দিতে ব্যস্ত। মাষ্টার মহাশয় বাহিরের ঘরে উঠিয়া তাহাকে ডাকিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া গামোছা স্কন্ধে মাধব তখনই বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মাষ্টার মহাশয় মাধবকে সুসংবাদ প্রদান করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না।

তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া পুত্রের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া মাধব জিজ্ঞাসা করিল, "বিনোদ ভাল আছে ত?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "বিনোদ ভাল আছে। সে পরীক্ষাতে সকলের উপর হইয়াছে। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে।"

শুনিয়া কিছুক্ষণ মাধব কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর আনন্দোচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলিল, "বিনোদের যাহা কিছু লেখা পড়া হইয়াছে, সে আপনারই কৃপায়। তাহাকে সহরে পাঠাইতেও আমার তেমন ইচ্ছা ছিল না; তাহার মাতা ও আপনিই জিদ করিয়া তাহাকে সহরে পাঠাইয়াছিলেন।"

আনন্দে মাধবের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমি আজ আসি। তুমি যাইয়া বিনোদের মাতাকে এ সংবাদ দাও।"

সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে গিয়া তাঁহার ছাত্র পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইবে ভাবিয়া, মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয় আনন্দাপ্লুত হইয়া উঠিতে লাগিল।

৬

কলেজ খুলিলে বিনোদ আবার নূতন উদ্যমে পাঠে মনোযোগ দিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদিগের জন্য যে মুখস্থ বিদ্যার বোঝা ব্যবস্থা করেন, সে বোঝা তাহার দুর্ব্বল শরীরের পক্ষে কিছু অতিরিক্ত হইল। দ্বিতীয় মাসের শেষেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। তৃতীয় মাসের শেষে বিনোদ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। এক জন প্রাচীন চিকিৎসক দেখিয়া বলিলেন, "তুমি দেশে ফিরিয়া যাও। বিশ্রাম ও স্থানপরিবর্ত্তনই এখন ঔষধ।" মনে মনে

চিকিৎসক বলিলেন, "এত গুরু প্রদাহে যে শতকরা নিরনব্বই জন ছাত্রের এই দশা হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুগ্নদেহে বিনোদ গৃহে ফিরিয়া আসিল।

গৃহে ফিরিয়া স্থান ও জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে প্রথম দুই এক দিন বিনোদ একটু সুস্থ বোধ করিল। কিন্তু সে কেবল প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে শেষ বার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিনোদের পাণ্ডুর আননে আর রক্ত দেখা দিল না, ম্লানজ্যোতি নয়নে আর উজ্জ্বলতা ফিরিল না।

এবার জননীর অবিশ্রান্ত শুশ্রূষাতেও কোনও উপকার দর্শিল না। বিনোদের জীবনস্রোত ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। সে ক্রমেই অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ আসিয়া দুই দিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রোগীর নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া হতাশ হইলেন। তিনি বলিয়া গেলেন, "রোগীর অবস্থা তত ভাল নহে। সারিবার হয়, আপনি সারিবে; অধিক ঔষধ দিবার কোনও প্রয়োজন নাই।" কবিরাজ মহাশয়ের কথাতেই মাধব বুঝিল যে, বিনোদের জীবনের আশা অতি অল্প।

মাষ্টার মহাশয়ের চিন্তার আর অবধি রহিল না। উদ্বেগাকুল হৃদয়ে তিনি রোগীর শয্যাপার্শ্বেই অনেক সময় কাটাইতে লাগিলেন।

স্কুলে ছেলেরা লক্ষ্য করিত, মাষ্টার মহাশয়ের মুখ শুষ্ক, তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক, আর যেন কোনও কার্য্যেই তাঁহার মন নাই।

এমনই ভাবে সপ্তাহাধিক কাল কাটিয়া গেল। তাহার পর বিনোদের জ্বর আরও প্রবল হইয়া উঠিল; দুই এক বার রক্তবমনও হইতে লাগিল।

জ্বরের ঘোরে বিনোদ অজ্ঞান হইয়া রহিল। অজ্ঞান অবস্থায় সে কেবল পাঠের কথা ও পরীক্ষার কথা বলিতে লাগিল। তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মাষ্টার মহাশয় আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। বিন্দু বিন্দু অশ্রু রোগীর গাত্রে পড়িতে লাগিল।

পর দিন প্রভাতে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল; সব ফুরাইল।

৭

পল্লীগ্রামে নিতান্ত লোকাভাব না হইলে নিকট আত্মীয় স্বজাতি ভিন্ন আর কাহাকেও মৃতদেহ বহন করিতে দিবার প্রথা নাই। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় যখন বিনোদের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন, তখন কেহ আর তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল না।

অদূরেই শ্মশানস্থ মৃতদেহ লইয়া শববাহিগণ শ্মশানে উপনীত হইলে মাষ্টার মহাশয় আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। শ্মশানতরুর কাণ্ডে মস্তক রাখিয়া তিনি বহুক্ষণ স্ত্রীলোকের মত রোদন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের যাতনা কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়?

প্রদোষে দেহসৎকারান্তে স্নান করিয়া মাষ্টার মহাশয় যখন শ্রান্তদেহে ব্যথিতহৃদয়ে গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন পথে তাঁহার সহিত জমীদারের এক মোসাহেবের সাক্ষাৎ হইল; সে তখন বাবুর বাড়ী যাইতেছিল। মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া সে একটু হাসিয়া বলিল, "কি হে মাষ্টার! মাধবের ছেলেটাকে মারিলে? জান ত—অনভ্যাসের চন্দনের ফোঁটায় কপাল চচ্চড় করে, গরিবের ছেলের অত সহিবে কেন?"

মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয়ে একটা কি ছিল, যাহা অন্যায় সহিতে পারিত না; অন্যায় দেখিলেই তাহা জ্বলিয়া উঠিত। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে, সে জন্য আমি কাহাকেও দোষী করিতে চাহি না। কিন্তু যদি কাহারও কোন দোষ থাকে, তবে সে তোমার মনিবের। আমি তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিয়াছিলাম। তাঁহার সাহায্য পাইলে, ভাল থাইতে পাইলে, ভাল স্থানে থাকিতে পারিলে, হয় ত বিনোদ মরিত না।"

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন।

মোসাহেবটিও এই কথা কেমন করিয়া বাড়াইয়া মনিবকে বলিবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে জমীদারের বাড়ীর দিকে গেল।

৮

শ্রান্তদেহে, ব্যথিতহৃদয়ে, মাষ্টার মহাশয় আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন। গৃহের চতুর্দ্দিকের দ্রব্যাদির সহিত তাঁহার মৃত ছাত্রের স্মৃতি বিজড়িত। সেই সকল দ্রব্যাদি দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়ের শোকাবেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠিতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না। আপনার প্রিয়তম সন্তানের মত প্রিয় ছাত্রের মৃত্যুশোক কি সহজে যায়? আপনার সন্তান থাকিলেও বুঝি মাষ্টার মহাশয় তাহাকে এত ভালবাসিতে পারিতেন না।

ক্রমে রাত্রি হইল, বাজারের কোলাহল থামিয়া গেল। চারি দিকে গভীর নিস্তব্ধতা, কেবল জ্যোৎস্নালোকসমুজ্জ্বল অম্বরতলে নদী কলরব করিয়া বহিতে লাগিল। দাওয়া হইতে রুক্ষকণ্ঠে কে ডাকিল, "মাষ্টার!"

বার মুক্ত করিয়া দাওয়ায় আসিয়া মাষ্টার দেখিলেন, জমীদারের দুই জন পাইক দাঁড়াইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে ডাকিতেছিলে?"

চড়া গলায় এক জন উত্তর দিল, "হাঁ, তোমাকে জমীদারের বাড়ীতে যাইতে হইবে।"

মাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন, মোসাহেবের মুখে সেই কথা শুনিয়া জমীদার তাঁহাকে ধরিতে পাঠাইয়াছেন; জমীদারের গৃহে যাইলে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইবে। তিনি বলিলেন, "আমি যাইতে পারিব না।"

পাইক উত্তর করিল, "তোমাকে যাইতে হইবে।"

স্থির স্বরে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমি যাইব না।"

পাইক উত্তর করিল, "তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার হুকুম আছে।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমার দেহ স্পর্শ করিও না। সাবধান!"

এক জন পাইক তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমাকে ধরিলে ভাল হইবে না।"

"কি হইবে?" বলিয়া এক জন পাইক অগ্রসর হইয়া মাষ্টার মহাশয়ের গণ্ডে চপেটাঘাত করিল।

উপর্য্যুপরি কয় দিন রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাত্রিজাগরণে ও মনঃকষ্টে মাষ্টার মহাশয়ের শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পাইকের চপেটাঘাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মাষ্টার মহাশয়ের অচেতন দেহ ঘরের দাওয়া হইতে নদীর নিম্নস্থ পাহাড়ের উপর গড়াইয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে পাইক দুই জনও লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহারা ধরিতে পারিবার পূর্ব্বেই সেই জনকোলাহলহীন নিশীথে, সেই চন্দ্রালোকপুলকিত, বীচিভঙ্গবহুল নদীগর্ভে সে দেহ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * *

পর দিন নিয়মিত সময়ে ছাত্রগণ শ্লেট, পেন্সিল ও পুস্তকাদি লইয়া স্কুলে আসিয়া শুনিল, মাষ্টার মহাশয় কোথায় গিয়াছেন, কেহ বলিতে পারে না।

সমাপ্ত।

ভানুমতী।

১—কমলে কামিনী।

শরৎ কাল। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল প্রাতঃসূর্য্যের মৃদুল কিরণে হাসিতেছিল। পশ্চিমে অনন্ত সাগরের নীলাম্বুরাশি; পূর্ব্বে বৃক্ষপল্লব-সমাচ্ছন্ন শ্যামল পর্ব্বতমালা। উভয়ের মধ্যে সাতিবিস্তৃত দীর্ঘায়ত-হরিৎ শস্য-ক্ষেত্রখচিত তটভূমি। তাহার স্থানে স্থানে নিবিড় তরুকাননশোভিত ছনুয়া, বড় ঘোনা, বড় বাঁকিয়া, পেকুয়া, গণ্ডামারা প্রভৃতি গ্রামাবলীর বর্ষাবিধৌত শ্যামকান্তি। উত্তরে বর্ষার পর্ব্বতপ্রবাহে পূর্ণকলেবর শঙ্খনদের ও দক্ষিণে মাতা মুহুরী নদীর বিশাল রজতধারা। বালসূর্য্যের তরলসুবর্ণকরে মণ্ডিত হইয়া এই দৃশ্যাবলী যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা কবির কল্পনাতীত, এবং চিত্রকরের চিন্তাতীত। কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভে কুতুবদিয়া, মহেষখালী, সোনাদিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ বিশাল মরকতখণ্ডের মত ভাসিতেছিল। কুতুবদিয়ার উত্তরপ্রান্তস্থিত "বাতিঘর" একটি গগনস্পর্শী তালবৃক্ষের মত, মহেষখালীদ্বীপস্থ আদিনাথ পর্ব্বত মরকতস্তূপের মত, এবং তাহার শেখরস্থ আদিনাথের মন্দির প্রকাণ্ড হীরকখণ্ডের মত, নীলাকাশপটে শোভা পাইতেছিল। সোনাদিয়া বা সুবর্ণ দ্বীপের ভূম্যধিকারী অনাথনাথ সমুদ্রতীর-সংলগ্ন বজরার ছাদে বসিয়া, গাম্ভীর্য্যপূর্ণহৃদয়ে প্রকৃতির এই মহাশোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন—

সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু; সুনীল সলিলরাশি,
রবির সুবর্ণ করে বিকাশি সুনীল হাসি,
নাচিতেছে, গাহিতেছে, দিয়া সুখে করতালি
তরঙ্গে তরঙ্গে, তীরে ফেন পুষ্পমালা ঢালি।
অনন্ত সিন্ধুর সেই অনন্ত অস্ফুট গীত
কি যেন অনন্ত স্মৃতি করিতেছে জাগরিত—
অতীত ও অনাগত, সুখ-দুঃখ-বিজড়িত,
সিন্ধু-নীলিমায় যেন রবিকর সংমিশ্রিত।
সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধু সহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি সুন্দর!

খেলিছে তরঙ্গমালা শিরে ফেনপুষ্পরাশি,
সমুদ্রমন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি।
নীলাকাশ বিশ্বরূপ—অনন্তের মহাভাস,
তরলহৃদয়-সিন্ধু—তরঙ্গ অনন্তোচ্ছ্বাস।

প্রৌঢ় অনাথনাথ স্তম্ভিতভাবে ভক্তিপ্রপূরিত হৃদয়ে এই মহাদৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা যে উভয় অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ও অসীমশক্তিসম্পন্ন, এই সিন্ধুগর্ভে বসিয়া সিন্ধু ও আকাশ দর্শন করিলে যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তিনি মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" বা চণ্ডীকাব্য সর্ব্বদা পড়িতেন ও তাহার গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। শরৎপ্রভাতে এই সমুদ্রশোভা দেখিতে দেখিতে দূরে তরঙ্গভঙ্গে যে ফেনরাশি উদ্গীর্ণ হইতেছিল, উহা তাঁহার যেন একটি কমল-কানন-বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং সেই কমলে যেন তিনি শ্রীমন্তের মত সেরূপ শিশু সহ ক্রীড়াশীলা একটি অপূর্ব্ব কামিনীও দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইল; তিনি তখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সিন্ধুতীর মুখরিত করিয়া এবং তাঁহার সুকণ্ঠে সিন্ধু-নিনাদ প্লাবিত করিয়া স্থানীয় কবি ৺শ্যামাচরণের একটি গীত গাহিতে লাগিলেন,—

১

অপরূপ অতি শুন নরপতি,
কালীদহের জলে দেখেছি নয়নে,
পদ্মেতে পদ্মিনী, জিনি সৌদামিনী,
হেরিলাম কামিনী কমল-বনে।

২

বঙ্কিম-নয়নী জিনিয়া হরিণী,
কেশবেণী ফণী, বিদ্যুৎ-বরণী,
ধরি করিবরে ধনী গ্রাস করে,
ক্ষণেকে উদ্গার করিছে বদনে।

৩

ক্ষণে দেখি জলে, ক্ষণেকে কমলে,
চঞ্চলা লুকায় ক্ষণেকে অঞ্চলে,
চপলা চমকে ক্ষণে কুতূহলে,
ক্ষণে গরুবাহু নিক্ষেপে গগনে।

কিন্তু এ কি ভ্রম! এ কি তাঁহার ভক্তিপ্রণোদিত কল্পনামাত্র? না, তিনি যেন সত্য সত্যই সেই ফেনপুঞ্জের মধ্যে শিশু সঙ্গে ক্রীড়াশীলা একটি রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তি তরঙ্গপৃষ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট—স্পষ্টতরা হইতেছে। ক্রমে তাঁহার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তরঙ্গফেনায় প্রচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা, যাহা এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, ক্ষুদ্র তরীর ক্ষুদ্র কর্ণধারি ধরিয়া যেন গৌরী স্বয়ং তরঙ্গে তরঙ্গে তরী সহ নাচিতেছেন, এবং নৌকার ছাদের উপর যে একটি ক্ষুদ্র শিশু নির্ভয়ে বসিয়া আছে, তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া এক হস্তে আলিঙ্গন করিতেছেন ও তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি চুম্বন করিতেছেন। তরীর অন্য প্রান্তে বসিয়া একটি পুরুষ ও নারী দাঁড় টানিতেছে। নৌকা আরও নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন—

কিশোরী বালিকা সোনার পুতুল,
দুই হাতে হাল চাপি বক্ষে ধরি,
হেলিছে দুলিছে উঠিছে পড়িছে
তরঙ্গে তরঙ্গে কি লীলা করি!
নাচিছে তরণী, নাচিছে তরুণী,
এই উঠিতেছে পড়িতেছে এই,
মোচার খোলার মত ক্ষুদ্র তরী
এই দেখি আছে, এই দেখি নেই।
এই তরী আগা উঠিল আকাশে
হেলিয়া সম্মুখে হা'লে ভর করি,
চুম্বিল কিশোরী শিশুর বদন
বাম করে তারে হৃদয়ে ধরি।
এই তরী 'পাছা' উঠিল এবার,
তরঙ্গে দ্বিতীয় আরোহণ করি,
পড়িল সরিয়া কিশোরী কৌশলে
তরী-কর্ণ বক্ষে সাপটি ধরি।
আরক্ত বসনে আঁটা ক্ষীণ কটি,
মুক্ত কেশরাশি কেতন মত

উড়িছে পশ্চাতে সমুদ্র অনিলে
সৌন্দর্য্যের লীলা করিয়া কত।
গৌর বরণে, আরক্ত বসনে,
সদ্যঃস্নাতি লীলাময়ী অলকায়,
শারদ রবির প্রভাত-কিরণ
ঝলসিছে, শোভা নাহি এ ধরায়।
তরঙ্গ-আঘাতে ক্ষুদ্র-তরী যবে
ফেনরাশিগর্ভে হয় নিমজ্জিত,
কক্ষে বক্ষে হাল চাপিয়া কৌশলে,
দুই ভুজে শিশু করিয়া উত্থিত,
কভু নুয়ে তুলি দেখে তার মুখ,
কভু বক্ষে রাখি চুম্বে আদরিণী;
বোধ হয় মনে, এ নহে মানবী,—
সত্য কালীদহে "কমলে কামিনী"।

নৌকা ক্রমে আরও নিকটস্থ হইলে রমণীকণ্ঠের গীতধ্বনি যেন অনাথনাথের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। ধ্বনি ক্রমে পরিস্ফুট হইতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বোধ হইল, যেন সমুদ্রের জীমূতগর্জ্জনের সঙ্গে মিশিয়া একটি বাঁশি বাজিতেছে; কণ্ঠ এত উচ্চ, এমন মধুর, এমন প্রাণস্পর্শী। মরুসদৃশ সেই নির্জ্জন সমুদ্রগর্ভে একখানি তরী, তাহাতে শিশু সঙ্গে সেই ক্রীড়াময়ী কিশোরীমূর্ত্তি, এবং সেই কিশোরীর কণ্ঠে এই গীত। গীতের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ নাচিতেছে, তরণী নাচিতেছে, তরুণী নাচিতেছে, এবং দুই হাতে তাল রাখিতেছে। সাগরানিল বহিয়া বহিয়া স্বরলহরী বহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রকপোত পক্ষসঞ্চালনে করতালিবৎ শব্দ করিয়া উড়িতেছে ও বসিতেছে, এবং তরঙ্গপৃষ্ঠে শ্বেত পদ্ম ফুলের মত শোভা পাইতেছে। দূর হইতে ইহারা ফেনরাশির সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার চক্ষে কমলকাননের ভ্রান্তি সঞ্চার করিয়াছিল। অনাথনাথ একমাত্র কর্ণসর্ব্বস্ব হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

"কেঁদ না কেঁদ না বাছা কাতর অন্তরে;
আমি এই চলিলাম অভয় দিতে বিজয়রসন্তেরে।
আমি আছি সদা,
ভক্তের প্রেমে বাঁধা,

(তা কি তুমি জান না হে?)

আমি মনানে করেছি রক্ষা সাধু শ্রীমন্তেরে।"

অনাথনাথের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিতেছিল, এই গীতে তাহা চরিতার্থ হইল। তাঁহার হৃদয়-বীণা ও কিশোরীর হৃদয়-বাঁশী প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় নিনাদিত হইয়া একই তানে বাজিতেছিল। তাঁহার আবার ভ্রান্তি হইল; তিনি ভাবিলেন, এই তরুণী সত্য সত্যই শ্রীমন্তের বিপদসঞ্চারিণী এবং মশানে রক্ষাকারিণী "কমলে কামিনী"।

২—মুক্তকেশী।

নৌকা তাঁহার বজরার নিকটস্থ হইলে অনাথনাথ দেখিলেন, হালে দুর্গা-প্রতিমার মত একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা, এবং তাহার সম্মুখে নৌকার ছাদের উপর বসিয়া চারি-পাঁচ বৎসরের একটি অতি সুন্দর শিশু। দুইটিই স্নেহমণ্ডিত মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। কোমলতা, স্নেহ ও লাবণ্য, উভয়ের দেহ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল। দেখিলেই বোধ হয়, উভয়ের মধ্যে যেন ভ্রাতা ভগ্নীর মত স্নেহসম্পর্ক। যে দু'জন দাঁড় টানিতেছিল, অনাথনাথের তাহাদিগকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া বোধ হইল, এবং উভয়ের উৎকট দাম্পত্যপ্রেমালাপ শরতের দক্ষিণানিল এইরূপে তাঁহার কর্ণে আনিতে লাগিল।

স্বামী। না, সম্মুখে যদি বজরা দেখিয়া থাক, উহা স্থানীয় জমিদারের হইবে। নৌকা তাহার কিঞ্চিৎ দূরে উত্তরে লাগাও।

স্ত্রী। তোর যেমন বুদ্ধি, উত্তরে কেন, দক্ষিণে লাগাও।

স্বামী। দক্ষিণের বাতাস। দক্ষিণে লাগাইলে আমাদের নৌকার বাতাস ও রান্নার ধোঁয়া জমিদারের বজরায় যাইবে, তিনি বিরক্ত হইবেন।

স্ত্রী। এখন বুঝি দক্ষিণের বাতাস? অন্ধ কি সাধে! বাতাস যে উত্তর দিক হইতে বহিতেছে, তাহাও টের পাইতেছ না? আর কোণাকার জমিদার যে তাহার ভয়ে আমরা উত্তর দিকে নৌকা লাগাইব। যাও নৌকা দক্ষিণ দিকে।

বালিকার মুখ ম্লান হইল, সে সভয়ে নৌকা দক্ষিণ দিকে লাগাইতেছিল, এমন সময়ে অনাথনাথের নৌকার মাঝি ও ভৃত্যগণ গর্জ্জন করিয়া নৌকার উত্তর দিকে লাগাইতে বলিল।

স্ত্রী। ওরে নবাব সিরাজদ্দৌলার বেটারে। ওঁদের হুকুম মত নৌকা লাগাতে হবে।

"কি, থাক মাগি" বলিয়া বজরা হইতে ভৃত্যগণ লাফাইয়া ডাঙ্গায় পড়িতেছিল। অনাথনাথ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

রমণী তখন তাহার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে ইহারা গালি দিতেছে, মারিতে আসিতেছে, আর তুই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছিস্। অন্ধ আর কাহাকে বলে।"

স্বামী। আমি ত তখনই দক্ষিণ দিকে নৌকা লাগাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম।

স্ত্রী। তুই নিষেধ করিয়াছিলি, না আমি নিষেধ করিয়াছিলাম? আমি বলিয়াছিলাম না উত্তরের বাতাস বহিতেছে, নৌকা দক্ষিণে লাগান ভাল হইবে না? আমারই দোষ, সর্ব্বদা আমারই দোষ, আমি মন্দ।

শেষ কথা কটি রমণী তাহার বদনব্যাপী বিপুল নাসিকা হইতে নির্গত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৌকার 'পালা' পুতিতে লাগিল, এবং বলিতে লাগিল, "এখনও ধর্ম্ম আছে, এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হয়। আমি ভাল মানুষের মত কথাটি বলিলাম, তার জন্য তাহারা এত গালি দিল, মারিতে আসিল। তার উপর স্বামীর এই গালি ও তিরস্কার। হা ঈশ্বর! তুমি ইহার বিচার করিবে। আমি মন্দ, আমার জিহ্বা বিষ, আর সকলের জিহ্বায় অমৃত।"

পালাপোতা হইলে উঠিয়া গিয়া বালিকাটিকে এক প্রস্থ প্রহার করিল, "লক্ষ্মীছাড়ি! আমার খাস্, আমার কথা শুনিস্ না। আমি বলিলাম, নৌকা উত্তর দিকে লাগা, তুই দক্ষিণ দিকে লাগাইলি কেন?" বালিকা চুপ করিয়া মার খাইল। রমণী নাসিকাপথে ক্রন্দন করিতে করিতে—যেন সমস্ত জগৎ তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে,—ছহির মধ্যে গিয়া শয্যা লইল। বজরার মাঝি মাল্লারা এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

বালিকা অশ্রুমোচন করিয়া ছহির মধ্যে গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিতে লাগিল। "উঠ মা, নৌকাতে কিছুই খাবার নাই, কি রাঁধিব মা? গোপাল এখনই খিদেয় কাঁদিতে আরম্ভ করিবে; জমিদারের বজরার কাছে খেয়া করিলে দু' পয়সা পাইতে পারিব।"

স্ত্রী। আমি যাইতে পারিব না, আমার শরীরে সুখ নাই। এক দিকে খাটিতে খাটিতে মরি; দিন রাত্রি অষ্ট প্রহরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও অবসর পাই না। আমার সোনার শরীর মাটি হইল। তাহার উপর এই গাল।

স্বামী নৌকার 'পাছায়' বসিয়া তাম্রকূট সাজিতে সাজিতে নেপথ্যে ইহার টিপ্পনী করিয়া বলিতেছিলেন, "খাটুনির মধ্যে যাহা হইতেছে এই।—মেয়েটি সমস্ত দিন বাজি করে, তাহার পর রাঁধে, তাই-বাপ বেটা দুটো খাইতে পায়।"

গতিপরায়ণা পত্নী এই টীকা শুনিতে পাইলেন না। মাঝিরা শুনিল ও হাসিয়া উঠিল।

দাম্পত্য প্রেমের এই মধুর অভিনয় হইতেছে, এমন সময় রজ্জুবা হইতে এক জন ভৃত্য ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি বাজিকর?" বৃদ্ধা উত্তর করিল, "হাঁ। হুজুর কি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাজি দেখিবেন?" ভৃত্য বলিল, "দেখিবেন, তোমরা শীঘ্র আইস।"

বেদিনী ঠাকুরাণী তখন অশ্রুজল মোচন করিয়া নৌকার ভিতর হইতে পূর্ব্ববৎ মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিবে কি?" তাহার স্বামী বলিল, "বাবুর যাহা খুসি দিবেন। তাহা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়?" বেদেনী তখন আবার জীমূতমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "তুই আবার আমার সঙ্গে লাগতে আসিলি, আমি বাবু টাবু চিনি না, এই খাটিয়া আসিয়াছি, যদি বাবু হয়, দুই টাকা দেয় ত খেলব।"

অনাথনাথ স্বীকৃত হইলেন, বেদেনীর মন তখন বড়ই প্রসন্ন হইল। সে আট গণ্ডার বেশী কখনই পায় নাই, তাহাতে দুই টাকা। তার উপর বাবুকে সন্তুষ্ট করিলে টাকাটা সিকাটা আরও কোন দিবেন না? তখন সে মধুর কণ্ঠে "এই আমরা আসিতেছি" বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া, সাজ সজ্জা করিতে লাগিল।

আর পাঁচ মিনিট পরে ঢোল বাজাইয়া তাহারা বজরার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বালক বালিকা দুটি রাধাকৃষ্ণবেশে সজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বালিকার হাত ধরিয়া বালক আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাথার চূড়া নাচিতেছে। ঢোলের শব্দ শুনিয়া সমস্ত গ্রামের নরনারী ও বালকবালিকাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, খেলা আরম্ভ হইল। প্রথম বাজিকর নিম্নে কয়েকটি অদ্ভুত কৌশল দেখাইল। বেদেনীর খাটুনির মধ্যে মন্দিরা বাদন, এবং বালকবালিকা যে বেদের সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছিল, সময়ে সময়ে তাহার সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠের যোগদান। তাহা না দিলেই ভাল হইত। বেদের খেলার সময়ে বালিকা ঢোল বাজাইতেছিল। তাহার পর সে ও

বালক ধড়াচূড়া ও মুকুট খুলিয়া ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল। সে ব্যায়াম দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের বোধ হইল, রমণীর দেহ নবনীত-ময়; তাহাতে অস্থি নাই। সেই নবনীতাঙ্গে অদ্ভুত শক্তি ও কৌশল। এক একটি ব্যায়াম দেখিতে দেখিতে অনাথনাথের হৃদয়ে তাহার জীবনের জন্য আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। কিশোরী কখন চরণে মহিষের বক্রশৃঙ্গ বাঁধিয়া বহু ঊর্দ্ধে দুই খুঁটার মধ্যে টাঙ্গান দড়ির উপর দিয়া শিশুটিকে অঙ্কে লইয়া দ্রুতবেগে হাঁটিয়া যাইতেছে, কখন বা দড়ির উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া এক এক পা সরাইয়া নাচিতেছে। কখন বা শিশুটিকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লুফিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেছে। অনাথনাথ এত ক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, কিরূপে তরঙ্গে দোলায়মান তরীর হালে দাঁড়াইয়া সে "কমলে কামিনী"র অভিনয় করিতে পারিয়াছিল। কখন সে বেদিয়ার নাভিস্থ একটি উচ্চ বাঁশের উপর উঠিয়া, কখন এক পা, কখন এক হস্ত, কখন বক্ষঃ কক্ষ পৃষ্ঠমাত্র স্থাপন করিয়া নিরালম্ব নিরাশ্রয় ভাবে দীন নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কখন সে চিৎ হইয়া ক্ষুদ্র দেহলতা-টিকে একটি চক্রে পরিণত করিয়া, এবং বক্ষের উপর শিশুটিকে দণ্ডায়মান রাখিয়া, মাটি হইতে একটি ক্ষুদ্র ছুয়ানি গোলাপসন্নিভ অধরোষ্ঠে তুলিয়া লইতেছে। তাহার সেই স্বেদাক্ত, কুসুমকোমল মুখখানি দেখিয়া অনাথনাথের হৃদয় করুণায় উছলিয়া উঠিল। বালিকা তাঁহার এই করুণভাব লক্ষ্য করিতে-ছিল, এবং এক একবার তাঁহার দিকে সস্নেহ করুণ কাতর দৃষ্টিতে দেখিতে-ছিল। তাহার পর বালিকা এক আম্রের আঁটি পুতিল। কিঞ্চিৎ পরে সে আঁটিতে বৃক্ষ হইল; আরও কিছু পরে তাহাতে আম্র ফলিল। সকলে দেখিল, প্রকৃত আম্রের ডাল ও তাহাতে আম্রের ফল। সর্ব্বশেষে বাজিকর একটি ক্ষুদ্র শিবির প্রস্তুত করিল, তাহার ভিতর সেই বালিকা প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে বাজিকর বাহির হইয়া আসিয়া সম্মুখের আবরণ উন্মোচন করিল। দর্শকগণ সবিস্ময়ে দেখিল, বালিকা নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিশ্চল স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তির মত একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারির অগ্রভাগের উপর বসিয়া আছে।

কিশোরী তখন অবলম্বনবিহীনা,
মুদ্রিত নীলাব্জনেত্র বসি শূন্যাসীনা।
বিমুক্ত কবরী আলুলায়িত কুঞ্চিত
করিয়াছে গ্রীবা অংস উরস আবৃত।

কেশ-অন্তরালে চারু মুখ অনিন্দিত,
শোভিতেছে পূর্ণচন্দ্র মেঘরেখাঙ্কিত।
ঈষৎ হেলিয়া গ্রীবা পড়িয়াছে বামে,
মাধুরী বসিয়া যেন করুণার ধ্যানে।
শোভিতেছে দেহলতা রক্তবাসাবৃতা,
সন্ধ্যার রক্তিমা যেন মেঘরেখাঙ্কিতা।
অবশ যুগল কর পড়ি অযতনে,
যেন অঙ্কপুষ্পপাত্রে চর্চ্চিত চন্দনে।
ক্রমে আরও মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে আকাশ,
বহিতেছে আরও বেগে সমুদ্রবাতাস।
কুঞ্চিত অলক কৃষ্ণ উড়িতেছে ধীরে,
তুলিয়া হিল্লোল নীল সরসীর নীরে।
মেঘাচ্ছন্ন সিন্ধুবেলা, পর্ব্বত, কানন,
ঢোলের গম্ভীর শব্দ, সমুদ্রগর্জ্জন,
পাতীব্যপূর্ণিত বাজিকরের সঙ্গীত,
সোণার প্রতিমা শূন্যে বসিয়া মূর্চ্ছিত।
নিরাশ্রয়া, দীনাহীনা, চেতনবিহীনা,
কি করুণা, কাতরতা, কিবা মধুরিমা,
ভাসিছে নিশ্চল মুখে-দেহ অবয়বে,
কি যেন করুণা ভিক্ষা করিছে নীরবে।
শিশুটি সে মুখ পানে চাহি অবিরল,
গাহিছে করুণকণ্ঠে নেত্র ছল ছল।

বাজিকর কিছু ক্ষণ পরে তরবারিখানিও সরাইয়া নিল, এবং অনাথনাথের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, "ভানুমতী!"

অনাথনাথ এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন; দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ, নীরব, নিশ্চল।

ক্রমশঃ।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ওমার খাইয়াম।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের তিন জন ছাত্র এই প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহাদের মধ্যে এক জন ধনবান হইলে অপর দুই জনের সহিত সে ধন সমভাবে ভাগ করিয়া লইবে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই তিন জনই কোন না কোন প্রকার খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে নিজাম-উলমুলকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। তিনি সুলতানের উজীর হইয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। হাসান সব্বা তত্রত্য বিশেষবিখ্যাত হত্যাকারী-সম্প্রদায় সংস্থাপিত করেন, এবং পরিশেষে তাঁহারই সম্প্রদায়ের লোক নিজাম উলমুলককে হত্যা করে। এই বন্ধুত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির নাম ওমার খাইয়াম।

ওমারের পিতা তাঁবুনির্ম্মাতার কার্য্য করিতেন। অল্প দিন হইল, প্রতীচ্যে ওমারের কবিতার আদর হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে পারস্যের পঞ্জিকা সংশোধক বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি ছিল।

পরিচয়।

প্রতীচ্যে জ্যোতিষী ওমারের খ্যাতি ছিল, কবি ওমারকে কেহ চিনিত না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফিট্‌জেরাল্ড প্রথমে ওমারের কতকগুলি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ওমারের কবিতার সহিত বিদেশীদিগের সেই প্রথম পরিচয়। আজ ওমারের কবিতার অসাধারণ আদর; এখন ওমারের অঙ্কশাস্ত্রবিষয়ক ও জ্যোতিষসম্বন্ধীয় গ্রন্থ অতি অল্প লোকেই পাঠ করিয়া থাকে।

ওমারের কবিতার একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদই প্রথম। পুনঃ পুনঃ নকলে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত নানা ভুলে, মূল কবিতাগুলি পূর্ণ হইয়াছে; তদ্ভিন্ন যে সকল কবিতা ওমারের বলিয়া চলিতেছে, সে সকলই তাঁহার কি না সন্দেহ। প্রাচীন রচনার এই সকল বিপদের কথা সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগীকে আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ওমারের কবিতার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে, সে সকল কবিতা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। যে ছন্দে ওমারের কবিতা সকল রচিত, সে ছন্দ তাঁহার আপনার নহে, পরন্তু তাহা পারস্যের কবিকুলের প্রায় সকলেই ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার প্রতি শ্লোক চারি ছত্রে সম্পূর্ণ। কিন্তু তাহারই রচনায় এত বৈচিত্র্য আছে যে, রচনা একঘেয়ে বলিয়া মনেই হয় না। দুঃখের বিষয়, ওমারের বহু অনুবাদকের মধ্যে কেহই তাঁহার ছন্দ বাঁধিয়া অনুবাদ করিবার চেষ্টা করেন নাই; তাই অনুবাদ পাঠ করিয়া মূলের ভাষালালিত্য বুঝিবার কোনও উপায় নাই। তবে ফিট্‌জেরাল্ড অনুবাদে যে ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও বড় মধুর। অন্য অনুবাদকগণও ফিট্‌জেরাল্ডের পথানুসরণ করিয়াছেন। কোনও য়ুরোপীয় পণ্ডিতের যত্নে যদি ওমারের কবিতার মূলগুলির একটা সংশোধিত সংস্করণ প্রচারিত হয়, এবং ফিট্‌জেরাল্ডের মত অনুবাদে সিদ্ধহস্ত কোনও কবি ওমারের ছন্দ বাঁধিয়া তাহার অনুবাদ প্রকাশ করেন, তবে মূলের ভাষানভিজ্ঞ পাঠকও ওমারের কবিতার ভাবের ও ভাষার মাধুরী উপভোগের অবসর পাইবেন।

ওমারের প্রেমের কবিতাগুলি এক হিসাবে জয়দেবের গীতগোবিন্দের মত। এক জন তাহার ভাবাগত সরল অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট, আর নানা দল তাহার নানারূপ "আধ্যাত্মিক" অর্থ বাহির করিতে ব্যস্ত। ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদে তিনি সহজ সরল অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন,—"আধ্যাত্মিক" অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া আপনি কষ্ট পান নাই, পাঠককেও কষ্ট দান করেন নাই।

প্রেমের কবিতা।

ওমারের প্রেমের কবিতাগুলি বড়ই মধুর। বি
অতি মধুর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমেরিকান
সহিত সম্মিলিত হয়, তখনই তাহার কবিত্ব বৃদ্ধি
কবিতার একটি প্রধান বিষয়। ওমার সে-বিষয়ে
ফিট্‌জের কৃত অনুবাদ হইতে আমরা তাহার একটি
সেথায় দেখিবে তুমি গোলাপ-
জানিও—পড়েছে সেথা নৃপতি
যথা নিশিগন্ধা মেলে কুসুম-নয়
সেথা ভূমিতলে আছে ক্রীসীয়
আমেরিকান কবি গার্ণারের কৃত অনুবাদ হইতে
প্রদান করিলাম,
এই যে নদীর তীরে ফুটিয়া উঠে
কে জানে অপর কার পরশিছে
ধীরে ধীরে ফেল পদ শ্যামতৃণ-
কে জানে কে নিদ্রাগত হেথা
ওমারের এই সকল মধুর কবিতা পাঠ করিতে
ক্ষুদ্র কবিতাগুলিই কেবল সৌন্দর্য্যে ওমারের কবিত
প্রেমের কবিতা ব্যতীত ওমার আরও অনেক প্র
আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল কবিতা ওম
কবিতাই ওমারের রচিত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ
ওমারের কবিতার ফ্রেঞ্চ গদ্য অনুবাদ হইতে
প্রদান করিলাম,
অদৃষ্টের অন্ধকারে কত শত শ
অর্দ্ধস্ফুট ফুল কত না ফুটিয়া
জীবনের, যৌবনের পূর্ব্ব-স্তরে
না ফুটিতে ঝরি যায় মুকুলেই
ওমারের ধর্ম্মমত লইয়া নানা তর্ক বিতর্ক হইয়া
ভিন্ন ভিন্ন লোকে তাঁহাকে ভিন্ন-ভিন্ন-ধর্ম্মমতাবলম্ব
বিশ্বাস, তিনি হৃদয়ে অত্য
ধর্ম্ম-মত
করিয়াছিলেন। তবে ওমা
ঘোর ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা
ওমারের কবিতার অন্যতম অনুবাদক লুলালিয়ে বলে
ঈশ্বরের নিন্দা করেন, দ্বিতীয় পাত্র পান শেষ করিয়
এই অসীমরহস্যময় বিশ্বে যখনই জীবন অর্থশূ
বলিয়া বিশ্বাস হয়, যখনই মনে হয়,—ইহলোকের
বর্ত্তমানের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ সমর্পণ করাই
হয়, বর্ত্তমানে সুখলাভের চেষ্টা করাই উচিত, অ
অবহেলা করা মূর্খের কার্য্য। যদি সত্যই বর্ত্তমানে
কবি হরেষ্‌ ও পারসীক কবি ওমার যাহা বলেন,

ফুলকুল চিরদিন সমান সুন্দর থাকে না, চন্দ্রের রক্তলালও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, তবে অনন্তের অজ্ঞেয় চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইয়া মর কেন?"

ওমার তাঁহার একটি কবিতায় এ সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, ফিট্‌জেরাল্ড-কৃত অনুবাদ হইতে আমরা তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম ;—

আমরা ত নিরন্তর চলেছি সকলে,
ছায়াবাজি-চিত্র যথা যায় দলে দলে।
সূর্য্যালোকে আলোকরা,
শোভে এই বসুন্ধরা,
কবি মোরা চৌদিকে ভ্রমণ—
চলি শুধু যেই পথে বালিকর চালায় যখন।

এ ত শুধু মুহূর্ত্তের তরে অবস্থান,
প্রান্তরে মুহূর্ত্ত তরে প্রাণবায়ুপান ;
মুহূর্ত্তের পরে সবে
সেথা উপনীত হবে—
যেথা কই—কিছু নাই আর।
যেথা হ'তে এসেছিল, সেথা গিয়া মিলিবে আবার।

গৌরবের তরে কেহ ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
কেহ খুঁজে মৃত্যুপারে স্বরগ-আবাস ;—
নগদ যা' কিছু পাও,
তাই সাথে লয়ে যাও,
ধারে কাজ বৃথা বলে গণি,—
কি কাজ শুনিয়া কোথা দূরে উঠে দুন্দুভির ধ্বনি?

পূর্ণ কর মদ্যপাত্র, বসন্ত অনলে
অনুতাপ শীতবস্ত্র নিক্ষেপ সকলে ;
এই কথা বুঝি সার—
সমস্ত বিহঙ্গ আর
করিবে না অধিক গমন,
উড়েছে পবনপথে, দেখ ওই মেলিয়া নয়ন।

এর পরে আছে কিছু এই ভাবি মনে
ত্যজিব কি সব সুখ এ মর জীবনে?
এই জীবনের পরে
মদ্য পা'ব আশা ক'রে
ভাজিব কি পানপাত্র মোর—
ভাবি সেই মদ্যপানে পাইব কি মহানন্দ ঘোর?

স্বরগের আশা আছে, নরকের ভয়,
আমি জানি এ জীবন বেশী দিন নয় ;
এই কথা সত্য জানি

আর সব মিথ্যা মানি;
এই কথা জানি আমি সার—
যে ফুল বারেক ফুটে, ফুটে না সে কখন আবার।

যে পাঠক কেবলমাত্র এই কবিতাটি বা ঐরূপ কোনও একটি কবিতা পাঠ করিবেন, তিনি ওমারের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে একরূপ বিশ্বাস করিবেন। সে বিশ্বাস সত্য কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ওমারের ধর্ম্মমত বুঝিতে হইলে, ওমানের বহু কবিতা পাঠ করিতে হইবে, তাহা না হইলে ভ্রান্ত মত অবলম্বন করিবার সম্ভাবনাই অত্যন্ত অধিক। ওমার মুসলমানের মানব—তিনি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দেবতা নহেন। কাজেই পাপ-প্রলোভন হইতে ওমারও একেবারে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহার কবিতাতেও আমরা তাহার নিদর্শন পাইয়া থাকি। ওমার প্রকৃত কবির মত হৃদয়ে যখন যে ভাব উদিত হইয়াছে, তখন সেই ভাবই আপনার কবিতায় লিখিয়া অমর কবিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা ওমারের কবিতার অন্যতম অনুবাদক—ফুগালিয়ের কৃত অনুবাদ হইতে একটি কবিতার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম;

বাম করে রাখিয়াছি কোরাণ পুস্তক ধ'রে,
মদ্যপূর্ণ পানপাত্র ধরেছি দক্ষিণ করে;
ঈশ্বরের দৃষ্টিপথে এমনি দাঁড়ায়ে রই,
সাধু আমি নহি, কিন্তু নরকের কীট(ও) নই।

প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। কাজেই হুইনফিল্ড-কৃত অনুবাদ হইতে ওমারের আর একটি কবিতার অনুবাদ প্রদান করিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। এই কবিতা হইতে ওমারের প্রকৃত ধর্ম্মমতের কতটা আভাস পাওয়া যাইবে।

পাতিয়া রেখেছ ফাঁদ, তুমি মোর পথময়,
পড়িলে সে ফাঁদে, তুমি দেখাও নরকভয়।
তোমার নিয়মে চলে এ অসীম ধরাতল,
তুমি যা করাও করি; তবু তুমি পাপী বল।
হৃদয়ের চিন্তারাশি নহে তব অগোচর,
বিপদ সময়ে কর প্রসারিত স্নেহকর।
ক্ষমা ভবে কর প্রভো, দাও মোরে অনুতাপ,
বিপদ-সময়ে তুমি ক্ষম সকলের পাপ।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

জাপান ও জাপানী।

জাপানের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাপান আমাদিগের নিকট স্বপ্নরাজ্য। সেখানকার খর্ব্বাকৃতি অধিবাসিগণ সর্ব্বাঙ্গে উল্কি পরে, বর্ণবৈচিত্র্যবহুল বেশে সজ্জিত হয়, ছোট ছোট পেয়ালায় চা পান করে ও চিন্তাক্লেশ-হীন জীবন যাপন করে। আমেরিকান ধর্ম্মযাজক পিরীর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা জাপানের ও জাপানীদিগের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

জাপানীদিগের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০ বৎসর হইতে জাপানের ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু অতিপ্রাচীন লিখিত বৃত্তান্ত সকল ও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত নহে। তৎপূর্ব্বে কেবল দেবদেবীর কল্পিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। লেখকের মতে, ইতিহাস ও কল্পনা।

৪৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানের ইতিহাস পাওয়া যায়। জাপানী পুরাণে জগৎসৃষ্টির কোনও বিশেষ বিবরণ নাই। জাপানী পুরাণের মতে সৃষ্টির আদিতে জড় জগৎ বর্ত্তমান ছিল; সেই জড়জগৎ হইতে পৃথ্বী উৎপন্ন উদ্ভূত হয়। তাহার পর প্রথমে এক জন ও তৎপরে আর চারি জন স্বয়ম্ভূ দেবতার আবির্ভাব হয়। ইঁহারাই জড় জগৎকে কাঠ, অগ্নি, ধাতু, ভূমি ও জলে বিভক্ত করেন। ইহার পর এই দেবকুলে ইজানাগি ও ইজানামী নামক ভ্রাতা ও ভগিনীর জন্ম হয়। ইঁহারাই বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, জাপানের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ ও অনেক্য দেবদেবীর জন্মদান করেন। অগ্নি দেবতাকে প্রসব করিয়া সতী ইজানামীর মৃত্যু হয়। শোকার্ত্ত পতি, পত্নীর অনুসন্ধানে পাতালে প্রেতপুরীতে গিয়া পত্নীকে তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন। পত্নী স্বীকৃতা হইয়া সে স্থানের দেবকুলের অনুমতি আনিতে গমন করিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইলে, পতি তাঁহার অনুসৃত পথে গিয়া দেখিলেন, পত্নীর মৃতদেহ গলিত শবে পরিণত হইয়াছে—আর সেই গলিতশবমধ্যে অষ্টবজ্রদেবতা উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। নিরাশ পতি জাপানে ফিরিয়া কোনও নদীর নির্ম্মল নীরে অবগাহন করিয়া দেহ পবিত্র করেন। অবগাহনকালে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এমন কি, তাঁহার বস্ত্র হইতেও দেবকুল উদ্ভূত হইলেন। সূর্য্যদেবী তাঁহার বাম চক্ষু হইতে ও চন্দ্রদেব তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু হইতে উৎপন্ন।

জাপানের পৌরাণিকযুগের দেবদেবীগণের বৃত্তান্তের সহিত সম্রাটদিগের বৃত্তান্ত বিজড়িত। জাপানীদিগের মতে, প্রথম সম্রাট খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাম্রাজ্ঞী জিঙ্গো সেনাদল সংগ্রহ করিয়া মৎস্যকুলের সাহায্যে সেনাদলকে জলবিস্তার উত্তীর্ণ করাইয়া কোরিয়া অধিকার করেন। প্রকৃতপক্ষে বোধ হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে মিকাডো-কুলের রাজ্য আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে চীন দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম আনীত হয়। এই সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দুর্ব্বল মিকাডোগণ নামমাত্র সম্রাট; দেশশাসনের ভার অভিজাতবংশীয়গণের হস্তেই সমর্পিত।

রাজ-শাসন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্টুগিজগণ জাপান দেখে। ইহার পরই জেসুইট ধর্ম্মযাজকগণ জাপানে উপনীত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। কোনও প্রাচীনধর্ম্মাবলম্বী জাতির মধ্যে শান্ত-সুস্থ-নিয়মবদ্ধ কোনও নবধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইলে, প্রথমেই খৃষ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব। অনেক অজ্ঞ লোক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে। জাপানেও তাহাই হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সিন্ধুপরপারবাসী পোপের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত। রোমান-ক্যাথলিক-ধর্ম্মাবলম্বী স্পেনের তখন প্রাবল্য। স্পেনের কোনও জাহাজের কাপ্তেন একবার জাপানের কোনও অভিজাতবংশীয় ব্যক্তিকে মানচিত্রে স্পেনের বিশাল সাম্রাজ্য দেখাইতেছিলেন। জাপানী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া স্পেন রাজ্য এই বৃহৎ সাম্রাজ্য অধিকার করিলেন? কাপ্তেন উত্তর করিয়াছিলেন যে, স্পেনরাজ প্রথমে দেশে ধর্ম্মযাজক পাঠাইয়া দেশবাসিগণকে বশ করিয়া লয়েন, পরে সৈন্য প্রেরণ করেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশীয়গণ সৈন্যদিগের সাহায্য করিলে দেশ অধিকার করা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। এই কথায় ও ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহে জাপানীদিগের সন্দেহ

সূত্রপাত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। তখন জাপানে দশ লক্ষেরও অধিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল। যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল; অবশিষ্ট সকলেই নিহত হইয়াছিল। খৃষ্টানদিগকে খড় জড়াইয়া অগ্নিসন্তপ্ত কেলিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইত। ক্রশ ভাঙ্গিয়া সেই কাষ্ঠেও অনেককে বদ্ধ করা হইয়াছিল। পরিশেষে ত্রিশ সহস্র দেশীয় খৃষ্টান একটি সুবৃহৎ গৃহে গিয়া আক্রমণরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। চারি মাস আক্রমণরোধের পর তাহারা পরাজিত হইয়া সকলেই নিহত হয়। দেশ হইতে খৃষ্টধর্ম্ম বিতাড়িত হইল। ইহার পর কেবল বিগত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে বিদেশীয়গণ পদার্পণ করিবার অনুমতি পাইয়াছে।

এমন কি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেও জাপানের রাজপথপার্শ্বে এই ইস্তাহার দেখিতে পাওয়া যাইত,—

"যত দিন সূর্য্য পৃথিবীকে উত্তপ্ত করিবে, তত দিন যেন কোনও খৃষ্টান জাপানে আসিতে সাহসী না হয়। সকলে এই কথা জানুক যে, যদি স্বর্গের রাজা স্বয়ং, বা খৃষ্টানের ঈশ্বর, বা পরমেশ্বর স্বয়ং এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁহারও শিরশ্ছেদন হইবে।"

যাহা হউক, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন বিদেশীয়গণ জাপানে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, তখন ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ যাইয়া দেখেন যে, কোনও কোনও পল্লীগ্রামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থায় খৃষ্টধর্ম্ম তখনও বর্ত্তমান।

সিন্টো ধর্ম্মই রাজ্যের অভিজাতবংশীয়দিগের ধর্ম্ম। সিন্টো ধর্ম্ম এক প্রকার পূজাপদ্ধতি-মাত্র। মিকাডোর আজ্ঞাপালনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল, এখনও বৌদ্ধধর্ম্মের অসাধারণ অন্যান্য ধর্ম্ম। প্রভাব। জাপানে কনফুসিয়ানিসমেরও ভক্ত অনেক। আবার গত এক শত বৎসরের মধ্যে টেন্‌রিকিও নামক এক নবধর্ম্ম বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কৌতুকের বিষয় এই যে, জাপানে একধর্ম্মাবলম্বন অর্থে অন্যধর্ম্মত্যাগ নহে। বহু জাপানী একাধিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, কেহ কেহ প্রচলিত সকল ধর্ম্মেই বিশ্বাস করিয়া থাকে।

জাপানী কারদায় ভদ্রতার মাত্রাধিক্য দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কাহাকেও কোনও উপহার দিতে হইলে বলিতে হয়, "এ জিনিসটা এতই সস্তা ও সামান্য যে, আপনার সম্মুখে আনিতে লজ্জা করে।" নিমন্ত্রিতদিগকে "উপযুক্ত ভদ্রতার মাত্রাধিক্য। খাদ্যভোগ" দিয়া বলিতে হয়, "এই সামান্য ও অপরিষ্কার আহার্য্য আপনাদের পাতে দেওয়া অন্যায়। ক্ষমা করিবেন।" দুই জন বন্ধুতে পথে সাক্ষাৎ হইলে টুপি তুলিয়া নমস্কারান্তে কিরূপ আলাপ হয়, তাহার একটা নমুনা এখানে প্রদত্ত হইল,—

ক। আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইবার সৌভাগ্য আমার বহুদিন হয় নাই।

খ। আপনার সহিত ইহার পূর্ব্ববার যখন আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন আমি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম।

ক। আমিই রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম;—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।

খ। আপনার মহান্ স্বাস্থ্য এখন কেমন?

ক। খুব ভাল। আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

খ। আপনার মহিমান্বিতা পত্নী ভাল আছেন ত?

ক। আপনাকে ধন্যবাদ। বুড়ো বুড়ী ভাল আছে।

খ। আপনার কুমারতুল্য সন্তানগুলি কেমন আছে?

ক। আপনার অনুগ্রহের জন্য সহস্র ধন্যবাদ। দুরন্ত অপরিষ্কার হতভাগারা ভালই আছে।

খ। আমি এখন একটা পচা গলিতে বাস করিতেছি। আমার বাটী ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কার, আপনি যদি সহ্য করিতে পারেন, তবে এক দিন আমার গৃহে যাইয়া আমাকে সম্মানিত করিয়া বাধিত করিবেন।

ক। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিবার উপযুক্ত ভাষা পাইতেছি না। আমি শীঘ্রই আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, আমার এই নগণ্য দেহ আপনার সম্মুখে যাইয়া কৃতার্থ হইব।

রাজপথে শিষ্টের সহিত রূঢ় কহিতে হইলেও বৃদ্ধ টুপি খুলিয়া তবে কথা কহিবেন। কোনও উচ্চস্থান হইতে কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করা অভদ্রতা, সেই জন্য যে দিন সম্রাট বা কোনও উচ্চপদস্থিত ব্যক্তি পথে গমন করেন, সে দিন অধিবাসীদিগকে গৃহের দ্বিতলস্থ কক্ষ হইতে নামিয়া আসিতে হয়। লেখক ও তাঁহার এক বন্ধু এক দিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; সঙ্গে বন্ধুর অল্পবয়স্ক পুত্র। সেই সময় কোনও অভিজাতবংশীয়া মহিলা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বন্ধু পুত্রকে তুলিয়া ধরেন। পাহারাওয়ালা আসিয়া তখনই বালককে নামাইয়া দিতে আদেশ করিল।

কঠোরতা।

জাপানীগণ প্রাচীন স্পার্টানদিগের মত দুঃখের রাহিক চিহ্নমাত্র কঠোরতার কঠিন আবরণে বিলুপ্ত করিতে চাহে। কেহ সন্তানের মৃত্যুর কথা বলিবার সময় শোক কান্নাও হাসিয়া থাকে। প্রাচীন স্পার্টানদিগের মত জাপানীগণ জীবনকে ঘৃণা করে, এবং মরণ মঙ্গলাস্পদ বলিয়া মনে করে। ইহার কারণ, জাপানীর গর্ব মতে কেহ অমরী কিছুই নহে, সমস্ত পরিবার অবশ্য অবশ্যক—আর বৌদ্ধমতে, জীবনই যত অনিষ্টের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

আত্মহত্যা।

জাপানে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০০ আত্মহত্যা হয়। অতি নগণ্য কারণে জাপানীরা আত্মজীবন নষ্ট করে। এমন কি, এক বৎসর অজন্মা হইয়া ধান্য দুর্মূল্য হইলেই লোকে আত্মহত্যা করিয়া কষ্টমুক্ত হয়। অধিক কি, শীত গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হয়; অর্থাৎ, গ্রীষ্মাধিক্যের মত শীতাধিক্য কারণেও লোকে আত্মহত্যা করে।

প্রাচীন নিয়মানুসারে যোদ্ধৃদিগকে সাধারণ লোকের মতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইত না। কিন্তু জাপানীগণ জীবনকে এতই তুচ্ছ বলিয়া মনে করে যে, তাহাদিগকে দণ্ডদান করা অতি সহজসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আপনার উদর বিদীর্ণ করিয়া আত্মহত্যা করা অতি সম্মানজনক ও সর্ব্বপাপক্ষয়কর বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন এ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কোনও অভিজাতবংশীয় যদি সাম্রাজ্যের অহিতকরণেচ্ছু বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তবে তাঁহাকে একখানি ক্ষুদ্র তরবারি সাঠান হইত। তিনি আহারান্তে মাদুরে বসিয়া উদরের বামপার্শ্বে তরবারি বসাইয়া দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে অবিলম্বে মৃত্যু না ঘটিলে, এক জন ভৃত্য তরবারির আঘাতে প্রভুর শিরশ্ছেদন করিত।

বিবিধ।

গ্ল্যাডষ্টোনের দৈনন্দিন জীবন।

যে জ্যোতিষ্ক বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া আপনার অমিয় কিরণে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অম্বর উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, সে জ্যোতিষ্ক আজ চিরান্ধকারে আপনার কিরণজাল সংবৃত করিয়াছে। অসাধারণ বাগ্মী, প্রগাঢ় পণ্ডিত, গীর্জ্জিতের সহায়, ধর্ম্মপ্রাণ গ্ল্যাডষ্টোন

আজ মরণের মহাস্বপ্নে অভিভূত। বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলকার্য্যে বহু বর্ষ যাপন করিয়া গ্ল্যাডষ্টোন আজ মরণের অঙ্কে চিরনিদ্রায় শান্ত হইয়াছেন। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চারিদিক হইতে একটা ইন্দ্রপাতজন্য দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছে। গ্ল্যাডষ্টোনের বহুবিধকার্য্যময় জীবনের ও তাঁহার কার্য্য সকলের সমালোচনা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমরা তাঁহার কন্যার লিখিত বিবরণ হইতে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের আভাস দিতেছি।

গ্ল্যাডষ্টোনের জীবনের মূলমন্ত্রই ছিল—"অতিরিক্ত অধিক কাজে হাত দিও না,—এক সময়ে একাধিক কার্য্যও করিও না। আবার যে কার্য্য করিবে, সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহা সম্পন্ন করিবে।" বাল্যকালে এক দিন গ্ল্যাডষ্টোন যখন অধ্যয়নরত, সেই সময় এক জন দাসী তাঁহার জন্য ঔষধ আনিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন ঔষধ লইয়া যাও, আমি একেবারে দুই কাজ করিব কেমন করিয়া?"

গ্ল্যাডষ্টোন যে কার্য্য করিতেন—ভাল করিয়াই করিতেন। সেই জন্য কি ধর্ম্মতত্ত্বে, কি ভাষাসম্বন্ধে, কি রাজনৈতিক তর্কে, যিনি তাঁহার সহিত যে বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছেন, তিনি গ্ল্যাডষ্টোনকে সেই বিষয়ে পরম পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ দিতেন।

গ্ল্যাডষ্টোন অতি সদালাপী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, কেবল শ্রোতার কার্য্য না করিয়া, তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে হইত।

কার্য্যের সময় কোনরূপ বাধা দিলে গ্ল্যাডষ্টোনের কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। কিন্তু একবার তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আর তাঁহার কাছে বসিয়া কথা কহিলেও তিনি তাহা শুনিতে পাইতেন না। তিনি সঙ্কল্পিত কার্য্যে অখণ্ড মনোযোগ দান করিতেন। তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তবে উত্তর প্রদান করিতেন।

তিনি যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, ক্রীড়াতেও তাঁহার সেইরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ দৃষ্ট হইত। গ্ল্যাডষ্টোনের সকল কার্য্য সুনিয়মে শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইত। প্রভাতে আট ঘটিকার সময় তিনি পুস্তকালয়ে উপস্থিত থাকিতেন; তাহার পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তিন পোয়া পথ ব্রুবস্থ গির্জ্জায় সাড়ে সাত ঘটিকার মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রতিদিন ঈশ্বরোপাসনা করিতেন।

তিনি যখন গৃহে থাকিতেন, তখন কোনও পুত্র বা কোনও কন্যা পিতার পত্র বাছাই করিতেন। প্রতিদিন নানাবিষয়সম্বন্ধীয় এত পত্র আসিত যে, পড়ে পত্রের একরূপমাংশ-মাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইত; ইহার মধ্যে তিনি অর্দ্ধাংশের উত্তর দিতেন। তিনি যখন রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন অবশ্য তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহার পত্র বাছাই করিতেন। যেখানেই হউন না কেন, তিনি প্রভাতে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। দুই ঘটিকার সময় আহারান্তে তিনি আবার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন ও প্রায় একঘণ্টা কাল কার্য্যের পর বৃক্ষচ্ছেদনে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার মতে, বৃক্ষচ্ছেদনে অতি অল্প সময়ে যথেষ্ট শারীরিক শ্রম করা হয়। জীবনের শেষ দুই তিন বৎসর ব্যতীত তিনি বৃক্ষচ্ছেদন করিতে পারিতেন না—সে সময়টা নিরন্তর্দ্দিষ্ট পুস্তকাগারেই কাটাইতেন।

তিনি প্রতিদিনই কতকগুলি প্রকাশকের মূল্যতালিকা দেখিতেন ও কোন না কোন পুস্তক আনিতে পাঠাইতেন। সাধারণতঃ, তিনি এক সময়ে তিন বিষয়ের তিনখানি পুস্তক কাছে রাখিতেন। তাঁহার আপ্রবার মতে, আরিষ্টটল, সেণ্ট অগষ্টাইন, ড্যান্টে ও বাট্‌লার, ইঁহাদিগের রচিত গ্রন্থ তাঁহার উপর প্রভূত প্রভাব সংস্থাপিত করিয়াছিল।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় চা পান করিয়া তিনি আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তিন চারি মিনিটেই তাঁহাদের বেশপরিবর্ত্তন সম্পন্ন হইত। সন্ধ্যাকালে আহারান্তে তিনি পাঠ আরম্ভ করিতেন। পাঠকালে সময় সময় চক্ষু মুদিয়া চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। একবার ঘুমন করিতে পারিলে তিনি সকল ভাবনা দূর করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। প্রত্যূষে তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে হইত। স্থনিদ্রা ও শ্রমনাশ।

এমন কি, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে পার্লামেণ্টে Home-Rule বিল পরাজিত হইয়াও গৃহে ফিরিয়া তিনি নিয়মমত আট ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিলেন। রবিবারে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বিশ্রাম করিতেন। সে দিন তিনি কোনও কাজে বই পড়িতেন না। কিম্বানবারে তিনি কোনও পীড়িত বা শোকতপ্ত বন্ধুর গৃহ ভিন্ন অন্য কোথাও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না।

সন্ধ্যাকালে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন প্রায়ই উপন্যাস পাঠ করিতেন। কাজ করিয়া শ্রান্ত হইলে তিনি পুস্তক পাঠ করিয়া শ্রম দূর করিতেন।

একবার মন্ত্রিদলের গঠনকালে Home Rule সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিতেছিলেন, Psalm সম্বন্ধে কোনও রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে Oriental Congressএ পাঠ করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ—ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের রচনাও চলিতেছিল। রচনাকালে রচনা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। একবার একটি প্রবন্ধের রচনাকালে সামান্য কয়টি কথার জন্য তিনি দুই ঘণ্টাকাল হিউমের গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে পাঠ করিতেন, কিন্তু তাঁহার রচনা দ্রুত সম্পাদিত হইত। প্রথম লিখিবার পরে তাঁহার রচনার বিশেষ সংশোধন আবশ্যক হইত না।

গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বলিতেন যে, টেনিসনের সহিত তাঁহার প্রণয়ের প্রধান কারণ—উভয়েই জাতি-বিরোধবিহীন শ্রমশীল জীবন যাপন করিতে ভালবাসিতেন। জীবনের সায়াহ্নেও তিনি নব-নির্ম্মিত পুস্তকাগারে স্বহস্তে পঞ্চবিংশতি সহস্র পুস্তক বিষয়-বিভাগ করিয়া সাজাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে লর্ড রোজবেরী সত্যই বলিয়াছেন—"যে জাতি হইতে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের উৎপত্তি, হয় ত সে জাতি হইতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ জন্মিতে পারেন, কিন্তু যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন সে জাতি তাঁহার স্মৃতিতে ও তাঁহার আদর্শে পূর্ণ থাকিবে।" গ্ল্যাড্‌ষ্টোন আপনি বলিয়াছেন যে, "উপদেশ মর্ম্মমূর্ত্তির মত,—আদর্শ রক্তমাংসময় মানবের সহিত উপমেয়।" জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একটা দ্রব্যের আদান-প্রদান যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ও বন্ধ থাকে না—সে কেবল উচ্চ জীবনের আদর্শের আদান-প্রদান।

দিনেকের শিশু।

নবতৃণউচ্ছ্বসিত শিশু—বৃন্তচ্যুত ফুল,
উষার অরুণ-অঙ্কে হেরিয়ে নিদ্রাকুল।
বারেক মেলিল আঁখি, কেলিল নিশ্বাস,
কত কল্প-পরিচয় মুহূর্ত্তে প্রকাশ!

মরণ শিয়রে বসি, গেয়ে মৃদু গান,
আদরে যতনে দিল ঢাকি দু'নয়ান।

শোকে দুঃখে ঘুমে পড়ি মূর্চ্ছিতা জননী
শুনে দূর ধরাপ্রান্তে শিশুপদধ্বনি।

হে মায়াবী, পাতাইয়া ক্ষিতিতলী-তলে
কি ভাবিছ মনে মনে আঁখি দুটি তুলে!
আশাধালু মতিচ্ছন্ন ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে!
কি আশা ভরসা তোর পেয়েছে বাতাসে!

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

আর্য্যশিক্ষাপদ্ধতি।

"সুবিচারসমাগম" পত্রের মুন মাসের সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত বাসুদেব রাও আপ্‌টে, বি. এ. মহোদয় "আর্য্যশিক্ষাপদ্ধতি" সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে, মুম্বই (বোম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবীদানসমারম্ভ (Convocation) কালে লর্ড স্যাণ্ডহর্ষ্ট বলিয়াছিলেন,—Under the ancient Hindu System the young Brahmin had to undergo a severe and long continued discipline of the will as well as of the mind before he was permitted to enter upon the duties of a secular life. The ideal it set before itself, with its reverence for teachers and the aged, its rules of self-denial and its minutely prescribed duties show at least that to the men who established it, education ment more than the imparting of knowledge. প্রবন্ধারম্ভে লেখক বলিয়াছেন, লর্ড স্যাণ্ডহর্ষ্টের মুখে উল্লিখিত বাণী শ্রবণ করিয়া, প্রাচীন আর্য্যদিগের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হয়। তিনি মনুসংহিতা, মহাভারত, আপস্তম্বসূত্র, আশ্বলায়নসূত্র ও গোতমসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া যে তথ্যসংগ্রহে সমর্থ হন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই একত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

লেখক বলেন, বর্ণাশ্রমব্যবস্থা হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ। বর্ণব্যবস্থার অপেক্ষা আশ্রমব্যবস্থার সহিত প্রাচীন আর্য্যদিগের শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর ছিল। আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই প্রথমস্থানীয় ও জ্ঞানোপার্জ্জনের মুখ্যকালরূপে পরিগণিত। বেদের (জ্ঞানের) অপর নাম ব্রহ্ম; এই কারণে বেদের অধ্যয়নকারিগণ (জ্ঞানোপাসকগণ) ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইতেন। উপনয়ন না হইলে বেদপাঠের অধিকার জন্মিত না। উপনয়ন শব্দের অর্থ গুরুগৃহে উপনীত করা। সপ্তম বর্ষে ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়নের কাল নির্দ্দেশ করিয়া, শাস্ত্রকারগণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। উপনয়নের পূর্ব্বে বেদ-শিক্ষারম্ভ নিষিদ্ধ হওয়ায়, কোমল বয়সে বিদ্যাভ্যাসের চিন্তা বালকদিগকে সন্ত্রস্ত ও ভগ্নোদ্যম করিতে পারিত না। স্পেন্সার প্রভৃতি আধুনিক তত্ত্ববেত্তাদিগের মতও এ বিষয়ে প্রাচীন ঋষিগণের মতের অনুরূপ। শিক্ষারম্ভকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশপালনে অবহেলা বর্ত্তমান আর্য্যসন্তানগণের দৈহিক অবনতির অন্যতম কারণ। উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন দ্বৈবর্ণিক আর্য্য বালকগণ "দ্বিজ" বা পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্ত (জ্ঞানরাজ্যে লব্ধজন্ম) আখ্যায় অভিহিত হইয়া গুরুকুলের ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে (জ্ঞানোপাসকের ব্রতে) দীক্ষিত হইতেন। উপনয়নের পর বিদ্যাভ্যাসের জন্য দ্বাদশ বর্ষকাল গুরুগৃহে থাকিয়া, সে কালের ব্রহ্মচারিগণ যেরূপ শিক্ষা পাইতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সহিত তাঁহাদিগের হৃদয় ও আত্মা মহনীয় আদর্শের দিকে ধাবিত হইত। এই কারণে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে (ছাত্রাবস্থাকে) ঋষিগণ ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রথম সোপান, সদাচার-বৃক্ষের আদিবীজ, জীবিতসাফল্যের মুখ্য সাধন, স্বর্গদ্বারের একমাত্র কুঞ্চিকা প্রভৃতি বিবিধ গৌরবব্যঞ্জক রূপকাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকুমার ষোড়শ, ক্ষত্রিয়সন্তান দ্বাবিংশতি ও বৈশ্যপুত্র চতুর্বিংশতি বৎসরের মধ্যে (গুরুগৃহে) উপনীত না হইলে, শিষ্টসমাজনিন্দিত "ব্রাত্য" আখ্যা প্রাপ্ত হইত। ব্রাত্যত্বপ্রাপ্তির ভয়ে সে কালে সকলেই বালকগণের (গুরুগৃহে) "উপনয়নসংস্কার" সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেন। অধুনা

আমাদিগের দেশে উপনয়ননংস্কার প্রহসনমাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ায়, সেকালের জ্ঞানগৌরব ও শক্তি সামর্থ্য উপকথার স্থান অধিকার করিয়াছে।

মনুসংহিতাদি গ্রন্থে ব্রহ্মচারীর যেরূপ নিয়ম, ধর্ম্মপালন ও গুরুগৃহে থাকিয়া যে সকল শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার বিধান আছে, তাহা পাঠ করিলে, সেকালের ঋষিসমাজ শরীরকে সুদৃঢ়, নীরোগ ও উদ্যমশীল করিতে কিরূপ যত্নবান ছিলেন, তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায়। যে সকল বালক ঐ সকল নিয়মপালনে অনুৎসাহিতা প্রকাশ করিত, ঋষিগণ তাহাদিগকে বিকলবিদ্য, ব্রহ্মবজ্ঞাদির অনুষ্ঠানজনিত পুণ্যলাভের অযোগ্য ও নিরয়গামী বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

মানসিক শিক্ষাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম, বুদ্ধিবিষয়ক শিক্ষা, বা লিখন, পঠন ও অঙ্কপাত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। ২য়, মনোনিগ্রহ বা চিত্তসংযম। বুদ্ধিবিষয়ক শিক্ষাকে আজকাল আমরা যতটা প্রাধান্য দিয়া থাকি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ততটা প্রাধান্য দিতেন না। তাঁহারা চিত্তসংযমকেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। লেখক বলেন, প্রাচীনকালে লেখনকলা অপরিজ্ঞাত থাকায়, প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে লিখন, পঠন ও অঙ্কপাত প্রভৃতি শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, এরূপ মনে হয় না। কিন্তু উক্ত কলা আবিষ্কৃত হইবার পরও যে তাঁহাদিগের ইংরাজীতে যাহাকে The three R's বলে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এরূপ মনে হয় না।

উপনয়নের পর গুরুগৃহে বিদ্যার্থীদিগের শিক্ষাক্রম কিরূপ ছিল, তাহার স্পষ্ট বিস্তারিত উল্লেখ কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইৎসিং নামক চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভ্রমণকারী স্বপ্রণীত ভারত-ভ্রমণ-বিষয়ক পুস্তকে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে,— গুরুগৃহে গিয়া "বিদ্যার্থিগণ প্রথম ছয় মাসে প্রত্যহ মূল বর্ণ ও ১০০০ যুক্তাক্ষর শিক্ষা করিত। তাহার পর আট মাসের মধ্যে তাহাদিগকে পাণিনির ব্যাকরণের সূত্রগুলি মুখস্থ করিতে হইত। সূত্রপাঠ শেষ করিয়া বালকেরা "ধাতুরূপ" ও "লিঙ্গ" নামক পরিশিষ্টত্রয় অভ্যাস করিত। সপরিশিষ্ট ব্যাকরণ শেষ হইলে তাহাদিগের প্রথম বৈত্রৈবার্ষিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। ইহার পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর শিক্ষার্থীদিগের ব্যাকরণভাষ্য-অধ্যয়নের কাল। এই আট বৎসর কাল ক্রমাগত পাঠ অভ্যাস করিয়া বালকগণের স্মরণশক্তি এরূপ তীব্র হইয়া উঠিত যে, তাহারা বড় বড় গ্রন্থ একবারমাত্র পাঠ করিয়া মুখস্থ বলিতে পারিত।" ইৎসিংএর বর্ণিত শিক্ষাক্রমের মধ্যে বেদাধ্যয়নের উল্লেখ না থাকিলেও, উহা ইহার পর আরম্ভ হইত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। কারণ সর্ব্বজ্ঞানের আকরস্বরূপ বেদের অধ্যয়ন ভিন্ন যে কালে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। আট বৎসর ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মিলে ও স্মরণশক্তি প্রখরতা প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অবশিষ্ট চারি বৎসরের মধ্যে বেদাধ্যয়ন শেষ করা অসম্ভব নহে।

ইৎসিং সেকালের ছাত্রগণের স্মরণশক্তির যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাদিগের বুদ্ধির সেরূপ প্রশংসা করেন নাই। ইহা হইতে লেখক অনুমান করেন যে, যাহাতে ছাত্রগণের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ হইতে পারে, সেকালের শিক্ষাপদ্ধতিতে তাহার কোনও উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞানলাভের সহিত বালকেরা যাহাতে সংযতচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইতে পারে, তৎপ্রতি প্রাচীন আচার্য্যগণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বালকগণকে শ্রদ্ধাবান, ইন্দ্রিয়সংযমী, কষ্টসহিষ্ণু ও শুদ্ধচিত্ত করাই আর্য্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য যত দিন অক্ষুণ্ণ ছিল, তত দিন ভারতের গৌরবসূর্য্য মধ্যাহ্নগগনে বিরাজ করিতেছিলেন। আপস্তম্ব বলেন, কলিযুগের ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য্যাদি কঠোর ব্রত-

নিয়মসমূহ যথাযথ পালন করে না বলিয়া, তাহাদিগের মধ্যে কেহ প্রতিভাশালী বুদ্ধিরা বেদমন্ত্রের স্রষ্টা হইতে পারে না। লেখকের মতে, শ্রদ্ধালুতা প্রভৃতি গুণনিকায় উপার্জ্জনই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অধঃপতনের প্রধান কারণ। বেজ্জারেণ্ড হোয়াইটহেড সাহেব মনে করেন, এই কারণেই প্রাচীন গ্রীক জাতির অধঃপতন হইয়াছিল।

গুরুগৃহে অবস্থানকালে ছাত্রদিগের ভোজনাচ্ছাদনাদির ব্যয়ভার আচার্য্যগণই বহন করিতেন। কদাচিৎ কোনও শিষ্য ভিক্ষান্নসেবী হইলেও, বস্ত্র পাত্রাদি শিক্ষকের নিকটই প্রাপ্ত হইত। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের সাহায্যে কৃষিকর্ম্ম ও গোসেবা দ্বারা যাহা লাভ করিতেন, তাহাতেই সশিষ্যে সন্তুষ্টচিত্তে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কখনও কখনও দেশের নরপতিগণের নিকট তাঁহারা অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন।

কোনও ছাত্র শিক্ষার্থীদিগের পালনীয় নিয়ম ভঙ্গ করিলে, তাহার প্রতি কি প্রকার কায়িক দণ্ডের বিধান করা হইত, তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায় না। গৌতমসূত্রে শিষ্যের প্রতি কঠোর কায়িক দণ্ডের বিধান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, বাচনিক তিরস্কারে কোনও ফল না হইলে, আচার্য্য মুঞ্জ রজ্জু বা যুদ্ধ বেত দিয়া তাহাকে স্বয়ং মৃদুভাবে তাড়না করিবেন—অপরের প্রতি প্রহারের ভারার্পণ করিবেন না। এই বিষয়ের অপালনে, গুরুপ্রহারে যদি কোনও ছাত্রের অঙ্গহানি প্রভৃতি গুরুতর অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে রাজা আচার্য্যকে অভিযুক্ত করিয়া যথোচিত দণ্ড প্রদান করিবেন।"

শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বে বালকগণের যেরূপ উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইত, অধ্যয়নের পরিসমাপ্তি হইলেও সেইরূপ একটি সংস্কারের অনুষ্ঠান করিতে হইত। (সেই সংস্কারকে "সমাবর্ত্তন" বলে।) সেই সংস্কার সম্পন্ন করিয়া, যথাসাধ্য গুরুদক্ষিণা দিয়া, শিষ্য স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। দ্বাদশবর্ষান্তে শিষ্যকে বিদায়প্রদানকালে, আচার্য্য বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদকণ্ঠে শিষ্যকে যে উপদেশ প্রদান করিতেন; তাহা, বর্ত্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবীদানসমারম্ভকালে প্রদত্ত উপদেশের অপেক্ষা কোনও অংশ ন্যূন নহে। এই উপদেশের একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাধ্যায়ের ১১ অনুবাদক হইতে লেখক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবটুগণ উপনয়নের পর গুরুগৃহে গিয়া গায়ত্রী ও ব্রহ্মচরণাদি শিখিত। তাহার পর, তাহারা শাস্ত্রাভ্যাসে অধিক সময় অতিবাহিত না করিয়া, স্ব স্ব ব্যবহারশিল্পের জন্য যথাস্থানে গমন করিতে পারিত।

সদয়, শুদ্ধচিত্ত, সুবিদ্য ও সাধুজ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থাশ্রমীকে আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শাস্ত্রকার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত গুণগ্রামসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ না হইলেও আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইতেন। কোনও কোনও ক্ষত্রিয় নরপতি ব্রাহ্মণগণকে উপনিষদ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, সেকালের শিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য রক্ষিত হইত না। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন, এবং পণ্ডিতসভায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মবিচারে আপনাদের প্রতিভার পরিচয় দিয়া বুধমণ্ডলীকে আশ্চর্য্য ও চমকিত করিতেন। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন,—They (women) even had legetimate influnce upon politics and administration (ancient India pp 187) বালকবালিকাগণকে লিখন, পঠন, চিত্রবিদ্যা ও নৃত্যগীতকলাদি শিক্ষা দিবার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্ট দ্বাদশ শতাব্দীর একখানি প্রস্তরলিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয়চূড়ামণি সোমবংশের মহারাজাধিরাজ বিশালদেবের সহধর্ম্মিণী রাণী শবল দেবী রাজসভায় নানাশাস্ত্র-

কথাপাবদর্শী, নৃত্যগীতব্যুৎপন্ন বিদ্বজ্জনসমাজে সঙ্গীতকলায় স্বীয় অসাধারণনৈপুণ্য দেখাইয়া সামাজিকদিগকে পরিতুষ্ট ও মহারাষ্ট্রপতির নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। (J. A. S. Bom; July 1892,) স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অধুনা আমাদিগের পূর্ব্বসংস্কারের কত দূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ইহা হইতে সম্যক বুঝিতে পারা যায়।

উপসংহারে লেখক নবদ্বীপের সংস্কৃত টোলের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এখনও নদীয়া-অঞ্চলে প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণে, সংস্কৃত পাঠশালার স্থাপন-করিয়া আচার্য্যগণ ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছাত্রদিগের ব্যবহারের উপর প্রাচীন আচার্য্যগণের ন্যায় তাঁহাদিগেরও বিশেষ লক্ষ্য থাকে। কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন পূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গের অধ্যয়নে জীবনের অধিকাংশ কাল যাপন-করিয়াছেন, এরূপ প্রৌঢ় ছাত্র এখনও ঐ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য্যশিক্ষাপ্রণালীর অনুকরণে স্থাপিত এইরূপ পাঠশালা নদীয়া ভিন্ন ভারতের আর কোথাও বিদ্যমান নাই।

রাণী মা চৌধুরানী।

"মানিক-মনোরঞ্জনে"র মে মাসের সংখ্যায় দেবী চৌধুরাণীর সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত হরি পুরুষোত্তম মটঙ্গে মহাশয় দেবীকে রাণী মা, গোপী মা ও রাণি মা চৌধুরাণী নামে অভিহিত করিয়াছেন। দেবীর কাহিনী বলিতে গিয়া ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাই, হোলকার-রাজবধূ অহল্যা বাই ও পাশ্চাত্য বীরাঙ্গনা জোয়ান অফ্ আর্কের কথা লেখকের মনে পড়িয়াছে। ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার জন্য সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বীরাঙ্গনাদিগের সহিত প্রমকক্ষতা করিবার যোগ্যা মনস্বিনী বীরনারীর আবির্ভাব হইয়াছিল ভাবিয়া, লেখক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন; এবং বঙ্গবাসীর কলঙ্কমোচনকারিণী এই মহিলার বীরত্বকাহিনী সাদরে ও সগৌরবে স্বদেশীয় পাঠকগণের করে উপহার দিয়াছেন। আমরাও বঙ্গীয় পাঠককে লেখকের বিবৃত কাহিনীর আভাসে পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সৌভাগ্যশালী নবাব রাজ্যশাসনের নিষ্প্রয়োজন ক্লেশভার ও দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন; এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণে বৃত্তিগ্রহণ করিয়া ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা মানবজীবনের সার্থকতসম্পাদনের প্রচুর অবসর প্রাপ্ত হন। কেবল নবাবকে ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার অবসর প্রদান করিলে কোম্পানী বাহাদুরের অপক্ষপাতিতায় দোষস্পর্শ করিতে পারে ভাবিয়া, অথবা নবাবের রাজকার্য্যপরিশ্রান্ত সামন্তবর্গ, ওমরাহ ও সর্দ্দারগণকে জীবনের শেষ কয়টা দিন বিশ্রামসুখে অতিবাহিত করিবার অবসর প্রদান করিবার জন্য, মহামতি ওয়ারেন হেষ্টিংস্ তাঁহাদিগকে সমশ্রেণীস্থ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। কিন্তু নবাব যেরূপ শান্তশীল ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সামন্তগণ সেরূপ সুশীল ছিলেন না। তাঁহারা বিদেশী বণিকের এই অযাচিত উপকার সহ্য করিতে না পারিয়া, ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। রাজনীতি-চতুর ইংরাজ বণিকের বুদ্ধিকৌশলে ও বাহুবলপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও, বিদ্রোহিগণ সহজে বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা কোম্পানীর সৈন্যের সহিত সম্মুখসংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া লুট যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ইংরাজ বণিকেরা নবরাজ্যলাভচেষ্টায় এ দেশে যে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, সর্দ্দার ও সামন্তগণের বিদ্রোহে তাহা দ্বিগুণ ভীষণভাব ধারণ করিল। দেশময় উৎকট অশান্তি ও

ঘোর অরাজকতার ঘনচ্ছায়া বিস্তৃত হইতে লাগিল। চোর ডাকাতের উপদ্রবে লোকের পথ চলা ভার হইল; বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার ও লুণ্ঠনপিপাসায় নিরীহ প্রজাকুলের ধন প্রাণ রক্ষা করা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। প্রজাগণ কাতরকণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতে লাগিল, কিন্তু তাহা শুনে কে? নবাব তখন দুর্ব্বল ও শক্তিসামর্থ্যহীন, ইংরেজ প্রজার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিহীন ও স্বোদরপূরণে উন্মত্ত। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে অচিরকালমধ্যে বঙ্গ দেশের অধিকাংশ বিদ্রোহীদিগের করতলগত হইল।

কিন্তু এই সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে একটি অতি বিস্ময়কর জিনিষ ছিল। একটি রমণী—বিশেষতঃ একটি কোমলশরীরা বাঙ্গালী রমণী, এই বিদ্রোহিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শৌর্য্যশালিনী বঙ্গীয় অবলার প্রকৃত নাম ধাম বর্ত্তমান লেখকের নিকট যেরূপ সমাক্ অপরিজ্ঞাত, তাঁহার অনুবর্ত্তী বিদ্রোহীদিগের নিকটও তাহা সেইরূপ রহস্যাবৃত ছিল। রাণী মা, চৌধুরাণী ও গৌরীমা প্রভৃতি গৌরবসূচক নামে তিনি জনসমাজে পরিচিতা ছিলেন। সেই বিদ্রোহের পূর্ব্বে কেহই তাঁহার নাম শুনে নাই। তাঁহার সেই বিদ্রোহে যোগ দিবার কারণও কেহ অবগত ছিল না। অজ্ঞ লোকে তাঁহাকে ভূভার হরণার্থ অবতীর্ণা দেবী বলিয়া মনে করিত। সুতরাং তাঁহার যে কখনও পরাজয় হইতে পারে, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিত না। চৌধুরাণীর নাম শুনিলে সেকালের সাহসী পুরুষেরও অন্তর ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িত। এই শূর অবলার নামোল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় জননীগণ দুষ্ট বালককে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইতেন।

বিদ্রোহীদিগের নেতৃত্বগ্রহণ করিবার পর, অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই এই কৃতান্তোপমা বীর-রমণী প্রায় সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিলেন। তথাপি সে দিকে ইংরাজদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। চৌধুরাণী অচিরে আপনাকে বঙ্গ দেশের রাণী বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং দেশের দস্যুদলকে একত্র করিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে মহাসমরের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইংরাজদিগকে এই পুণ্যভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, বঙ্গের অনেক বড় বড় জমিদার আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিলেন। রাণীর প্রবলতালাভের সংবাদ হেষ্টিংসের কর্ণগোচর হইলেও, তিনি রাণীমাকে সামান্য অবলাজ্ঞানে তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বাঙ্গীয় দস্যুসৈন্যগণ সহসা একদিন কলিকাতার কোনও বর্দ্ধিষ্ণু বণিকের কুঠী আক্রমণ করিলে, হেষ্টিংসের ভ্রম দূরীভূত হইল।

রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া রাণীর সৈন্যেরা উপদ্রব করিতেছে দেখিয়া, হেষ্টিংস আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে রাণীর বিরুদ্ধে এক দল সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণের আদেশ করিলেন। ইংরাজ সৈন্যের সহিত সম্মুখসমরে বিদ্রোহিগণের নানা স্থানে পরাজয় ও ক্ষতি হইতে লাগিল। একদা বিদ্রোহিসৈন্য ভীষণ বেগে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিস্তর সৈন্য নিহত হয়; কিন্তু ইংরাজদিগের শিক্ষিত সিপাহী সৈন্যের সম্মুখে তাহারা অধিকক্ষণ স্থিতিতে না পারিয়া, একটি সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইংরাজসৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। বিদ্রোহী দল বহুক্ষণ গোলা গুলি, শর ও প্রস্তরাদি বর্ষণ করিয়া বাহুবলে দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল; ইংরাজসৈন্য তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, বিপুলবিক্রমসহকারে দুর্গাধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় বিদ্রোহীদিগের একদল সৈন্য সহসা নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া ইংরাজদিগের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। ইহাতে ইংরাজসৈন্যের বিশেষ ক্ষতি হইলেও তাহারা হটিল না। প্রায় এক প্রহর কাল এইরূপ ভাবে যুদ্ধ চলিতেছিল।

এ দিকে দুর্গাভ্যন্তর হইতে মধ্যে মধ্যে এক একটি অব্যর্থ গুলি আসিয়া ইংরাজদিগের এক একটি সৈন্যকে ইহলোক হইতে বিদায় করিতেছিল। এই অব্যর্থ অজ্ঞাত গুলিতে ইংরাজ-সৈন্যের যত অনিষ্ট করিয়াছিল, তত অনিষ্ট আর কিছুতেই করিতে পারে নাই। এই কারণে ইংরাজ সেনাপতি ভল্‌ফিবার দল সঙ্গে লইয়া প্রাণনাশক গুলির নিক্ষেপককে বিনাশ করিয়া স্বীয় সৈন্যের ভয় দূর করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তিনি সবেগে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, আবার উভয় দলের ঘোর সংগ্রাম বাধিল। বিদ্রোহীদিগের একটি সৈনিকও জীবিত অবস্থায় স্থান হইতে অঙ্গুলিমাত্র বিচলিত হইল না—যথাস্থানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে স্বর্গলোকে চলিয়া গেল। যে অব্যর্থ গুলির গতিরোধের জন্য ইংরাজ সেনাপতি এত চেষ্টা করিতেছিলেন, পূর্ব্ববৎ অব্যাহতভাবে শত্রুসৈন্যের প্রাণসংহার করিতেছিল। ইংরাজ সেনাপতি দুর্গদ্বার অভিমুখে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া, বিদ্রোহী পক্ষের এক রাজপুত বীর সহসা উল্লম্ফন পূর্ব্বক সেনাপতিকে আক্রমণ করিলেন। আর এক মুহূর্ত্ত অবকাশ পাইলে রাজপুতের হস্তে সেনাপতির ভবলীলা সাঙ্গ হইত; কিন্তু রাজপুত বীর সলক্ষে ইংরাজ সেনানীর নিকট উপস্থিত হইতে না হইতে এক সাহসী শ্বেত সৈনিক সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীন প্রহারে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিল। পরক্ষণেই সকলে দেখিতে পাইল, রাজপুতবেশধারিণী চৌধুরাণীর ছিন্নভিন্ন দেহ ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ২২ ভাগ; বৈশাখ। এই সংখ্যা হইতে প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতী"র সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছেন। বাইশ বৎসরের পর "ভারতী"কে বালিকা সাধনার বেশ ধারণ করিতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। "ভারতী"র সহসা এ কুব্জ-ভাব কেন? "দুঃসময়" নামক দুর্বোধ কবিতাটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ইহাতে কবিত্বপরিচয় আদৌ নাই।—শব্দের দিকে লেখকের যেমন দৃষ্টি, ভাবের অভিব্যক্তির প্রতি তাঁহার তেমনি ঔদাসীন্য। শব্দবিন্যাস ও অনুপ্রাসই যেন রচনাটির লক্ষ্য,—আর সিদ্ধহস্ত প্রবীণ কবির রচনায় mannerism নিতান্তই অসহ্য। "দুরাশা" একটি ক্ষুদ্র গল্প—আখ্যান-বস্তু মনোরম, বর্ণনাকৌশল ও শব্দবিন্যাস অতি সুন্দর। সকলেই জানেন, "কণ্ঠরোধ" নামক প্রবন্ধটি টাউন হলে নিডিসন ব্লেকের প্রতিবাদ-সভায় পঠিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র বাবুর এই রাজনৈতিক প্রবন্ধটির ভাষা "কাদম্বরী"কেও পরাজিত করিয়াছে। যুক্তি ও তর্কই রাজনৈতিক রচনার প্রাণ,—এবং তাহা সাধারণবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হওয়াই বিধি। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর কনকক্কিভিরঞ্জিত বাণীর শিঞ্জিতধ্বনি চটপটকরতালিলাভের অনুকূল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজনৈতিক প্রসঙ্গালোচনার উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। বক্তৃতার একটা বিশেষ ভাষা আছে, এবং থাকাও আবশ্যক;—আমাদের রাজনৈতিক রচনার ভাষাও কি এইরূপ 'জীমূতমন্দ্রবিনিস্বনী' না করিলে চলিবে না? যাঁহারা শব্দশাস্ত্রের পার-গামী, তাঁহাদের অন্য ভাবি না;—কিন্তু যাঁহারা নহিলে সভা হয় না,—অতঃপর সেই সাধারণ কেরাণীকুল ও ছাত্রবৃন্দ কি "প্রকৃতিবাদ" অভিধান বগলে করিয়া সভায় ছুটিবে?—তাহাদের যদি হাত যোড়া থাকে, তাহা হইলে কাহারা করতালি দিবে? মনে করিয়া

দেখুন,—পার্লামেণ্টের একটা বিদ্রূপের আলোচনার সময় যদি কোনও সভ্য করি সুইনবরণের আমায় তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহা কেমন শুনায়? আমাদের দেশে অনুকরণ বা হনুকরণ-বৃত্তি বড় প্রবল,—তাই এই তুচ্ছ বিষয় লইয়া "সাহিত্যের" এতটা স্থান নষ্ট করিলাম।

"কবিতা-হরিণী" লেখকের কল্পনা দেখুন,—তাঁহার কবিতা-হরিণী "নব নব ভাবতৃণ পুটিয়া পুটিয়া করিতেছেন।" "দৃষ্টিপ্রদীপেন" একটি ভ্রমণ-বিবরণ; যদিও লেখকের লিপিনৈপুণ্য নাই,—কিন্তু বিষয়গুণে রচনাটি প্রীতিপ্রদ। "শিল্পীর চিত্রশালিকা" প্রবন্ধটিতে লেখক বিবিধ চিত্রের বিচিত্র সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ণনবাহুল্যে প্রবন্ধটি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত,—এবং সেই জন্য ইহার অনেকটা সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। আর ক্রমাগত "ঈষন্নালিসমুখ স্পাতুন্ন লাবণ্যরাশি" ও তত্তুল্য বিবিধ বর্ণনায় পাঠককে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আমরা মনে করিয়াছিলাম, অন্ততঃ বাঙ্গালা লেখা হইতে "শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে" চিরবিদায় লইয়াছে। তাহাকে সভ্যতার সূক্ষ্ম 'ক্রেপে' আপনাকে ঈষদাবৃত করিয়া নানা ভাবে পুনরায় আবির্ভূত হইতে দেখিয়া আমরা একটু বিব্রত হইয়াছি। হায়! চিরসৌবনবরপুষ্ট এই সুরম্য জগতে পিশিতপিণ্ডপ্রিয় লৌল্যলোলচক্ষের কি ঘৃণিত নিবাসঃ, কি দুঃসহ নিরানন্দ! "শুনঃশেপের বিলাপ" একটি সুরচিত বৈদিক চিত্র। এবারকার "ভারতীর" প্রবন্ধাবলীর মধ্যে "শুনঃশেপের বিলাপ"ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রচয়িতার বিষয়নির্ব্বাচন, রচনাকৌশল ও আন্তরিকতা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আমরা সকলকে প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বৈদিক যুগের হোমগন্ধসুরভিত, সামগানমুখরিত আশ্রমের সুখদুঃখময়ী নিস্তরঙ্গ পাঠকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে। "ঐতিহাসিক স্যালিসন" প্রবন্ধটি সংবাদপত্রবিশেষে প্রকাশিত স্যালিসনসম্বন্ধীয় একটি সংক্ষিপ্ত উক্তির প্রতিবাদমাত্র;—আমরা স্যালিসনের একটা মোটামুটি নক্সা দেখিবার আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু লেখক আমাদের অত্যন্ত নিরাশ করিয়াছেন।

"বঙ্গভাষা" প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ সেনের রচিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" অবলম্বন করিয়া লিখিত। "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" প্রবন্ধটির বক্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। "প্রসঙ্গকথায়" ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে নিরবচ্ছিন্ন গালাগালি ও অক্ষয়-বাবুকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে। পুষ্পাঞ্জলির সঙ্গে আমাদের দুই চারিটি গন্ধহীন ফুল ডালি দিয়া সুখী হইতে পারি, কিন্তু মহেন্দ্র বাবুর জন্য সঞ্চিত গালিগুলি যথাপ্রযুক্ত মনে হইতেছে না।

—**তত্ত্ববোধিনী**। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের রচিত "তিব্বতের সাধন-প্রণালী" প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। লেখক এই সংক্ষিপ্ত রচনায় তিব্বতের ধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির একটি স্থূল বিবরণ ও পরিচয় দিয়াছেন।

—**বামাবোধিনী**। চৈত্র। "বামাবোধিনীর জোয়ার ভাঁটা নাই,—একই ভাবে চলিতেছে। আমাদের মনে হয়, অন্ততঃ আর এক বিন্দু জীবনীশক্তির প্রয়োজন। "লবঙ্গলতা" বঙ্কিম বাবুর "বঙ্গনী"র লবঙ্গ-চরিত্রের সমালোচনা। প্রবন্ধটি সুলিখিত। "গার্হস্থ্য প্রবন্ধ" উল্লেখযোগ্য। "নাব্বী বৈলেসিকামিনী" প্রবন্ধে প্রকাশ—"বামাবোধিনী-সম্পাদকের গুরুতর পীড়া এবং অন্যান্য কারণবশতঃ ১২৮৫ সালে পত্রিকা যখন উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়, তখন ইনি নিজের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া বামাবোধিনীর পুনরুদ্ধারের সহায়তা করেন। তদবধি ২০ বৎসর কাল ইনি বামাবোধিনীর কার্য্যভার বহন ও প্রকৃত অধ্যক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন।" এই পুণ্যবতী মহিলা বামাবোধিনী-সম্পাদকের সহধর্ম্মিণী। ভগবান্ সম্পাদকের এই দুর্ব্বহ শোকে শান্তি দান করুন। বৈষম্যপূর্ণ জীবনপথে পতি-পত্নীর জীবনব্রতের এমন সাম্য সচরাচর দেখা যায় না।

মীরণের পরিণামরহস্য। (প্রবন্ধ)

পলাশীযুদ্ধের রহস্যময় অভিনয়ের শেষ হইয়া গেলে, মীরজাফর, নবাব জাফর আলি খাঁ উপাধি ধারণ করিয়া, বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার মসনদে উপবেশন করিলেন। তাহার পর সেই রাজ্যভ্রষ্ট, সিংহাসনভ্রষ্ট, হতভাগ্য সিরাজের নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ডের অভিনয় আরব্ধ হইল। এই অভিনয় ব্যাপারের প্রধান অভিনেতা মীরণের নাম ইতিহাসপাঠকমাত্রেই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। উক্ত অভিনেতার কৃত অভিনয়ব্যাপার রহস্যময় বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারও পরিণাম সেইরূপ রহস্যে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই রহস্যোদ্ভেদের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

মীরজাফর সিংহাসনে উপবেশন করিলে, ইংরাজেরা সন্ধির নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের দাবী করিয়া বসিলেন। মীরজাফর প্রকাশ্য রাজকোষ হইতে সমস্ত দাবীর পূরণ করিতে পারিলেন না। সিরাজের গুপ্ত ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া তিনি অনেক ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলিকে হস্তচ্যুত করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। অগত্যা ইংরাজদিগের প্রাপ্য অবশিষ্ট অর্থের জন্য তাঁহাকে বর্দ্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব ছাড়িয়া দিতে হইল। তিনি শূন্য রাজকোষ লইয়া ও বাঙ্গলার দুইটি প্রধান প্রদেশ হস্তান্তরিত করিয়া অত্যন্ত অর্থাভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগকে ইহার কারণ জানিয়া, তাঁহাদের প্রতি ক্রমে তাঁহার বিরক্তির সঞ্চার হইল। এই সময়ে ইংরাজেরাও আপনাদের অধিকার ক্ষমতা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন; তাহাতে নবাবের বিরক্তি দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ, রায়দুর্ল্লভ ও জগৎশেঠের সহিত নবাবের মনোমালিন্য ঘটায়, এবং ইংরাজেরা তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করায়, নবাব বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, সিরাজের ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধেও একটি ষড়যন্ত্রের সূচনা হইতেছে।

মীরজাফর কেবলমাত্র স্বীয় পুত্র মীরণকেই বিশ্বাস করিতেন। মীরণ তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, এবং সকল বিষয়ে তাঁহাকে পরামর্শ প্রদান করিতেন। মীরণ আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিয়া সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি পিতাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পরিণামে তাঁহাকেও সিরাজের দশা ভোগ করিতে হইবে। সেই জন্য তিনি বারংবার তাঁহাকে সতর্ক করিতে লাগি-

সেন। মীরণের এই সতর্ক হইবার পরামর্শ মীরজাফর একেবারে বিস্মৃত হন নাই। ইংরাজেরা পরিশেষে যখন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীর কাসিমকে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার মসনদ প্রদান করেন, সেই সময়ে মীরজাফর দুঃখে কষ্টে অভিভূত হইয়া বলিয়া ফেলেন যে, "আমার পুত্র মীরণ পূর্ব্বেই আমাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়াছিল।" * মীরণ কেবল পিতাকে সতর্ক করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি নিজেও ইহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মীরণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, বৃদ্ধ পিতা আর কত দিন জীবিত থাকিবেন, পরিণামে বাঙ্গলার মসনদ তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে। পিতাও উপযুক্ত পুত্রের প্রতি একরূপ সমস্ত ভারই প্রদান করিয়াছিলেন। মীরণ অনেক চিন্তা করিয়া ক্রমে আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, ইংরাজেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, কিন্তু সহসা তাঁহাদের সহিত বিবাদ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কাজেই ধীরে ধীরে তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মীরণের মনে হইল যে, ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে আপনারাই বাঙ্গলার মসনদ দখল করিয়া বসিতে পারেন, অথবা আর কাহাকেও তাহা প্রদান করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে যাহারা ইংরাজদিগের ও তাঁহাদের পক্ষীয় দুর্লভরাম প্রভৃতির সহানুভূতি পাইত, তাহাদিগকেই তিনি অগ্রে চিরবিদায় দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জন্য সিরাজউদ্দৌলার ভ্রাতা এবং তাঁহার মাতা ও মাতৃস্বসা মীরণের আদেশে নিহত হন। পাছে সিরাজউদ্দৌলার ভ্রাতা সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, এই আশঙ্কা মীরণ ও মীরজাফর উভয়েরই মনে বলবতী হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণের সহিত যোগ আছে বলিয়া সিরাজের মাতা ও মাতৃস্বসা চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করিতে বাধ্য হন। ঘাসেটি কস্তকিতাল পুরাতন কর্ম্মচারী সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যিনি মীরণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, মীরণ তাঁহার জন্য কোনি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার ভগিনীপতি ইতিহাসবিখ্যাত মীর কাসিম। মীর কাসিম অনেক দিন হইতে বাঙ্গলার মসনদের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; একমাত্র মীরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আপনার পক্ষকে অবাধ মনে করিতে পারিতেন না। মীরণ যে ইহা বুঝিতেন না, এমন নহে; তবে সহসা ইহার কোনও উপায় করিতে

* "My son Meeran forewarned me of all this."—Torens "Empire in Asia p. 44.

পারেন নাই বলিয়াই অনুমান হয়। ইংরাজদিগকে প্রভূতক্ষমতাশালী মনে করিলেও, মীরণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য তলে তলে আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরে ধীরে রাজ্যের সমস্ত ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন; বিশেষতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সৈনিক বিভাগের তত্ত্ববিধানে নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত সৈন্য ক্রমে মীরণের যাবপবনাই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া উঠিল। মীরণ নিজেও অত্যন্ত সাহসী পুরুষ ছিলেন। প্রায়ই তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন। মীরনের এইরূপ অসাধারণ সাহস, রাজ্যশাসনে অধ্যবসায়, সুন্দর রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হইবার চেষ্টা দেখিয়া, কূট-বুদ্ধি ইংরাজ যারপবনাই চিন্তিত হইলেন। প্রচলিত ইতিহাসে মীরণকে একটি গোঁয়ার রূপে চিত্রিত দেখা যায়। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে, মীরণের বেশ একটু রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল, এবং তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তিনি কতকগুলি নৃশংস কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিলেন। মীরণের এই রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় চতুরপ্রবর ইংরাজ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, মীরণ ধীরে ধীরে আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিতেছেন, রাজ্যশাসনে বেশ দক্ষতা দেখাইতেছেন, সৈন্যদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষদৃষ্টি করিতেও ছাড়িতেছেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, হয় নিজেরাই বাঙ্গলার মসনদ দখল করিয়া বসিবেন, না হয় আর কাহাকেও তাহা প্রদান করিতে হইবে। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পিটের নিকট লিখিত ক্লাইবের একখানি পত্র হইতে আমরা মীরণের প্রতি ইংরাজদিগের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারি। উক্ত পত্রে তিনি মীরজাফরের দুর্ব্বল রাজত্বের উল্লেখ করিয়া অতি সহজ ছলে বা কৌশলে নবাব হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার ইঙ্গিত প্রকাশ করেন। তাহাতে মীরণকে ইংরাজদিগের বৈরী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, এবং মীরণ রাজ্যাধিকার পাইলে, ইংরাজদিগের পক্ষে নিরাপদ হইবে না বলিয়া লিখিত হয়। আরও লিখিত হয় যে, দুই সহস্র ইউরোপীয় চেষ্টা করিলে কোম্পানীকে রাজ্যভার গ্রহণ করাইতে পারে। ইংরাজেরা আপনাদের

* 'Where in he depicts the weakness of the Nawab's administration; hints that they could easily find a pretence for breaking with him; describes his son, Meerun, as so inimical to the English 'that it would be

হস্তে রাজ্যভার লইবার ইচ্ছা করিলেও সহসা তাহা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু মীরজাফর-ও মীরণের হস্ত হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইবার জন্য তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে মীর কাসেম খাঁ মীরণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বাঙ্গলার মসনদের প্রার্থী ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে ক্লাইব ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছিলেন, হলওয়েল তখন কলিকাতার গবর্ণর। মীর কাসেমের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, যেরূপে হউক, মীরণের ক্ষমতার হ্রাস করিতেই হইবে।—কিন্তু এই পরামর্শে মীরণকে এ জগৎ হইতে চিরাপসারিত করিবার আয়োজন হইয়াছিল কি না, ইহাই এক্ষণে বিবেচ্য। ইতিহাস কিন্তু সে বিষয়ে কতটা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, আমরা পরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা পাইব।

ইংরাজ ও মীরণ উভয়ে উভয়কে অন্য চক্ষে দেখিলেও, কোন একটি রাজনৈতিক কারণের জন্য আপাততঃ উভয়কে মিলিত হইতে হইল। মীর জাফরের রাজত্বে অনেক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় ও বিহার প্রদেশ সাহজাদা আলিগহর (পরে বাদশাহ সাহ আলম) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই সকল বহিঃশত্রুর দমন করা প্রথমে অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের শক্তি পৃথগ্‌ভূত হইলে বিশেষ কোন ও ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, 'শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি' হইল। কিন্তু উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তমরূপে লক্ষ্য রাখিলেন। পাটনা, পূর্ণিয়া প্রভৃতির বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তাকে দমন করিয়া, তাঁহারা সাহজাদার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ক্লাইব ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণেল ক্যালিয়ার্ড ইংরাজ সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মীরণ ও কর্ণেল সাহজাদার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পাটনার নিকট উপস্থিত হন। সেই সময়ে পূর্ণিয়ার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা খাদেম হোসেন খাঁ সাহজাদার সহিত যোগ দিবার জন্য বিহারে উপস্থিত হইতেছিলেন। তিনি পাটনার নিকট গঙ্গার পরপারে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মীরণ ও কর্ণেল প্রথমতঃ তাঁহাকেই আক্রমণ করা উচিত মনে করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। খাদেম হোসেন জানিতেন যে, এই নিশ্চিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু বর্ষার নদীপ্লাবনের জন্য তিনি পিছু হটিতে অসমর্থ

unsafe trusting him with the succession ; and that 2000 Europeans would enable the company to take the sovereignty upon themselves."—Torrens' Empire in Asia pp 42—43

হওয়ায় যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করিলেন, এবং একেবারে মীরণের সৈন্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মীরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধে আহত হওয়ায়, এক্ষণে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, ও কর্ণেলকেও বিপক্ষ পক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান। কিন্তু শত্রুকে একেবারে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, অগত্যা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। খাদেম হোসেন পলায়ন করিয়া একটি জঙ্গলে আশ্রয় লন। সেইখানে তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল।

পরদিন রাত্রিতে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, সে সময় বর্ষাকাল। রাত্রি দশটা হইতে মুষলধারে বৃষ্টি ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইয়া প্রলয়ের ন্যায় করিয়া তুলিল। মীরণ একটি বৃহৎ তাম্বুতে ছিলেন। ঝড়বৃষ্টির বেগবৃদ্ধি দেখিয়া তিনি দিলারখানি পাল নামে একটি ক্ষুদ্রাকার তাম্বুতে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় দুই চারিটি স্ত্রীলোক থাকিত। সেদিন যে স্ত্রীলোকটি ছিল, তাহাকে তিনি অগ্রেই বিদায় দিয়াছিলেন। কেবল একটিমাত্র ভৃত্য সংবাহনক্রিয়ার জন্য ও এক জন কাহিনীকথক তাঁহার নিদ্রাকর্ষণের জন্য তাম্বুমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। ক্রমে ঝড়বৃষ্টির বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর প্রকৃতি কথঞ্চিৎ শান্তভাব অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইল যে, মীরণ ও তাঁহার অনুচরদ্বয়সহ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যখন তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তখন বজ্রাঘাত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কাজেই রাষ্ট্র হইল যে, বজ্রাঘাতেই মীরণের মৃত্যু হইয়াছে! সে কোনও কারণেই হউক, প্রথমতঃ কিন্তু মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়াই রাখা হয়, পরে বজ্রাঘাত বলিয়া রাষ্ট্র করা হয়। কিন্তু মীরণের পরিণাম যে কত দূর রহস্যময়, আমরা পরে তাহা দেখাইতেছি।

মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যুর সহিত আর একটি ঘটনার একটু বিশেষরূপ সম্বন্ধ আছে, এবং সেই জন্য উক্ত বজ্রাঘাতে মৃত্যু সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সে বিষয়ে অন্যরূপ মনে করিয়া থাকেন। মীরণের আদেশে যখন তাঁহার অনুচর কর্ত্তৃক সিরাজের মাতা আমেনা ও মাতৃস্বসা ঘেসেটী সলিলগর্ভে চিরসমাহিত হন, সেই সময়ে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেন বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু হয়। * কেহ কেহ বলেন যে, যে দিন তাঁহারা সলিলগর্ভে আশ্রয় লন, সেই রাত্রি-

* আমাদের কবি আবার ইহার উপর আর একটু রঙ্গ চড়াইয়া বলিয়াছেন,—"বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে মরিবে মীরণ।" প্রকৃত অভিশাপবাক্যে বিনা মেঘের কথা নাই।

তেই মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাহার এক মাস পরে মীরণের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অনুসন্ধানে ইহা স্থির হইয়াছে যে, তাঁহাদের মৃত্যুর ৯।১০ দিন পরে মীরণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাদের সেই অভিশাপবাক্য মীরণের মৃত্যু ব্যাপারের সঙ্গে মিশাইয়া সাধারণের মনে বজ্রাঘাতেই মৃত্যু বলিয়া বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং মীরণের রহস্যময় ধরিণান গোপন করিবার এই একটি উত্তম সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু তৎকালে অনেকের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, ইংরাজগণের মন্ত্রণায় মীরণের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়; বস্তুতঃ বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই। মীরণের মনে ইংরাজদিগের বন্ধমূল হওয়ায় ও তাঁহার স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী থাকায়, ইংরাজেরা তাঁহাকে চিরাপসারিত করিবার জন্য এইরূপ কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিলেন। এই সময় মীর কাসেমের সহিত তাঁহাদের গোপনে সন্ধি হয়, এবং মীর কাসেমও যে এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, ইহাও কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ক্রমে ইংরাজদিগের ও মীর কাসেমের এই গুপ্ত মন্ত্রণা একমাত্র মীর কাসেমেরই স্কন্ধে পড়িয়া যায়। কারণ ইংরাজ আপনাদের নাফাই গাহিতে বড়ই দক্ষ। কিন্তু বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহারা কত দূর অব্যাহতি পাইবার যোগ্য, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিবেন। মুতাক্ষরীণের অনুবাদক কতকগুলি যুক্তি দেখাইয়া ইহাকে বজ্রাঘাতজন্য মৃত্যু বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার যুক্তিগুলি কত দূর সারগর্ভ, আমরা পরে দেখাইব। কিন্তু তিনিও লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সাধারণে, এমন কি, ইংরাজদিগের কর্ণেল, কাপ্তেন পর্য্যন্ত, এই ব্যাপারকে ঘোরতর সন্দেহজনক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। অনুবাদক বলেন যে, যেসেটী ও আরমানীর অভিশাপবাক্য মীরণের মৃত্যুসংবাদ পঁহুছিবার এক মাস পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সংবাদ প্রথমতঃ চাপিয়া রাখা হয়। আশ্চর্য্য হইলেও ইহা সত্য যে, মীরণের মৃত্যু ইংরাজদিগের, অর্থাৎ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রণানুসারে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত হয়। কারণ, মীরণের বাক্যে ও কার্য্যে স্বাধীনতার ভাব প্রবল দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ঈর্ষাপ্রবণ ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এইরূপ স্থির হয় যে, মীর কাসেম খাঁ সেই সময় হইতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ইংরাজ গবর্ণর হলওয়েলের সহিত সম্মিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। যত দিন মীরণ জীবিত থাকিতেন, তত দিন পর্য্যন্ত

তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত না। এই জন্য তিনি এই চক্রান্তের তলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। (কারণ, ইহাকে চক্রান্তই কহিত, বজ্রপাত নহে) এই সমস্ত ব্যাপার, রাত্রির ঝড় বৃষ্টি, অন্ধকার ও তাম্বুদাহের * সহিত মিশিয়া প্রকৃত ঘটনাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে স্বয়ং কর্ণেল ক্যালিয়ার্ডের সন্দেহ হওয়ায় লোকের মনে উক্ত ধারণা বলবতী হইয়া উঠে, এবং কর্ণেলের বিশ্বস্ত বন্ধু ও দ্বিভাষী লসিংটন কর্ণেল কর্ত্তৃক মৃতদেহপরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়া, প্রবেশাধিকার হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু কর্ণেলের পরিচিতবর্গের মধ্যে অনেকে, এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ, বিজ্ঞ ও প্রতিভাশালী কাপ্তেন কার্নাক, ইহাকে তামস ব্যাপার (হত্যা) বলিয়াই অভিহিত করিয়াছিলেন। † ইহার

* তাম্বুদাহ বিষয়ে অনুবাদকের সহিত আমরা একমত নহি। মূল মুতাক্ষরীণে তাম্বুদাহের উল্লেখ নাই, আমরা পরে দেখাইতেছি।

† "We are certain that both the imprecation and speech were mentioned at Moorshoodabad, full thirty days before any intelligence reached the city of meem's death; and incredible as it may look at this distance of time, this piece of news was stifled at first, and what is singular, but true, that death was attributed to the machinations of the English, say, of the English goverment, that had at all times taken much umbrage at that aspiring spirit of independence, so conspicuous in Meemn's words, still more than in his actions. It was asserted, that Mir-Cassem-ghan, who had already made his treaty public, or private, with Holwell, governor of Calcutta, and who could not compass his end, so long as Meem should stand in his way, was really at the bottom of the whole contrivance, (for contrivance it was called and not lightening); and this, together with the storm and darkness of the night, as well as the burning of the tent was made use of as a curtain to conceal and colour the whole transaction. What gave a strong bias to the minds on that occasion is, that the colonel himself seemed to have his doubts; and that Lushington, his confident and interpreter, whom he sent to inspect the body, was refused admittance. Moreover, it is well known, that several officers of the Colonel's family and amongst others, Captain Carnac, who held the first rank in it, and was unquestionably a man of extensive

পর অনুবাদক মহাশয় ইহাকে যথার্থতঃ বজ্রাঘাতে মৃত্যু বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা পরে তাঁহার যুক্তিগুলির উল্লেখ করিয়া তাহাদের উত্তরপ্রদানে চেষ্টা পাইব। এক্ষণে সাধারণে বিচার করিয়া দেখুন যে, অনুবাদক মহাশয়েরই লিখিত পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতে মীরনের মৃত্যু সন্দেহ-জনক বলিয়া বোধ হয় কি না? বিশেষতঃ ইংরাজদিগের কর্ণেল, কাপ্তেন প্রভৃতিও যখন এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে একরূপ স্পষ্টতঃ হত্যা বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন, তখন সাধারণে যে ইহাতে সন্দিহান হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অনুবাদক, ইংরাজ অর্থে এখানে ইংরাজ গবর্মেণ্ট, অর্থাৎ গবর্ণর ও তাঁহার সঙ্গীদিগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ ইংরাজ কাপ্তেন, কর্ণেল প্রভৃতি এই চক্রান্তের বিষয় জানিতেন না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস; নতুবা তাঁহাদের এ বিষয়ে সন্দেহ ও অনুসন্ধানের কথা তিনি উল্লেখ করিবেন কেন? ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, ইংরাজ কর্ণেল ও কাপ্তেনের অজ্ঞাতে এই চক্রান্তের আয়োজন হইয়াছিল। অন্ততঃ তাঁহাদের উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান ও সন্দেহ হইতে ইহাই বিবেচিত হয়। কিন্তু পরিশেষে সকলে মিলিয়া যে ব্যাপারটিকে চাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও কতকটা সত্য। ফলতঃ এ বিষয়ে যখন প্রধান প্রধান ইংরেজেরাও সন্দিহান হইয়াছিলেন, তখন আমরা অনুবাদক মহাশয়ের ন্যায় ঘটনাটিকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া বজ্রাঘাতের সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। এ বিষয়ে আমরা আরও প্রমাণ দিতেছি।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মীরণের সহিত এক জন ভৃত্য ও কতিপয় কাহিনীকধক শিবিরমধ্যে ছিল এবং তাহারাও মীরণের দশা প্রাপ্ত হয়। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, সে রাত্রির ঝড়বৃষ্টি কিছু ক্ষণ পরে শান্তভাব ধারণ করিলে, যে সকল ভৃত্য বাহিরের পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা পূর্ব্বোক্ত ভৃত্যদ্বয়কে বিশ্রাম দিবার জন্য তাম্বুমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, মীরণ ও তাঁহার সেই অনুচরদ্বয় চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাহারা সেই দৃশ্য দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইলেও কোনরূপ গোলযোগ না করিয়া কয়েক-

knowledge, keen penmus and much information spoke in strong terms of what they called this dark affair"—Mutakherin, English Translation; pp. 32-33. Translator's note.)

অন্য কর্ম্মচারীকে জাগরিত করেন। তাহারা সকলে নিঃশব্দে তাম্বুমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মীরণের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, তাঁহার মস্তকে অনেকগুলি ছিদ্র রহিয়াছে; সেগুলি ৫।৬ টির কম হইবে না। উদরে ও পৃষ্ঠেও ৬।৭টি দাগ দেখিতে পায়, সেগুলি চাবুকের ক্ষতের ন্যায়। সে স্থলের সংস্কারানুসারে উপদেবতাগণের প্রভাবনিবারণের জন্য মস্তকের নীচে যে একখানি অস্ত্র রক্ষিত হইত, তাহাতেও দুই তিনটি ছিদ্র লক্ষিত হয়। কিন্তু মস্তকের নিকটস্থ শয্যার কাষ্ঠ অত্যন্ত বিশীর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মুতাক্ষরীণকার ইহাকে বজ্রাঘাতের চিহ্ন বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহার লিখনভঙ্গীতে ইহাই বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে সন্দিহানের সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, বজ্রপাত কখনও নিঃশব্দে হয় না, নতুবা নিদ্রিত ভৃত্যেরা তাহা জানিতে পারে নাই কেন? জানিতে পারিলে তাহারা পূর্ব্বেই কি ইহার অনুসন্ধান করিত না, এবং তাহা লইয়া কি শিবিরমধ্যে কোনও গোলযোগ হইত না? ভৃত্যেরা নিঃসন্দেহ শিবির-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা বাহির কিংবা ভিতর হইতে তাম্বুদাহের কোনও চিহ্নই দেখিতে পায় নাই; মুতাক্ষরীণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। বজ্রপাতে নিশ্চয় তাম্বুদাহ হইবার কথা, কিন্তু ভৃত্যেরা বাহির হইতেও অগ্নি জ্বলিতে দেখে নাই, নতুবা নিঃসন্দেহে তাম্বু মধ্যে প্রবেশ করিবে কেন? এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াও তাহার কোনও চিহ্নই দেখিতে

* "The rain and storm having closed after some time, the servants that watched without, and whose turn it was to relieve the two others that were on duty, came into the tent, and found Miren with those two unfortunate youths, plunged in the endless sleep of annihilation; and although such a sight did much surprise and frighten them, they recollected their minds enough to awaken some officers and some other persons, without tumult and noise. These getting silently into the tent, examined the body, found that it had no fewer than five or six holes on the head, with six or seven streaks on the belly and back; and these last looked like so many strokes inflicted by an angry whip. On the sabre, which was close to his pillow, they discovered two or three holes, where the metal seemed to have run: but the wood of his bed towards his head was entirely rotten."—Mutaqherin, Translation, pp 127-28.

পায় নাই। অনুবাদক যে তাম্বুদাহের কথা লিখিয়াছেন, মূল মুতাক্ষরীণের সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয় না। সুতরাং তাম্বুদাহের কথা যে কত দূর সন্দেহজনক, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিতেছেন। তাহার পর মৃতদেহের ছিদ্রের কথা। কত লোক বজ্রাঘাতে মরিয়াছে, কিন্তু কাহারও মস্তকে ৫।৬টি ছিদ্র হইতে আমরা দেখি নাই, বা শুনি নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন যে, বজ্রপাতে মস্তকে ছিদ্র হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। বৈদ্যুতিক শক্তি নূতন ছিদ্র করিয়া কখনও কোন পদার্থমধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং মীরণের মস্তকের ছিদ্র কোথা হইতে আসিল? মুতাক্ষরীণকার বজ্রাঘাতে মৃত্যু বিশ্বাস করিয়া, মস্তক ও তন্নিম্নস্থ অস্থি সাধারণ সংস্কারানুসারে ধাতুনির্ম্মিত বজ্র কর্ত্তৃক ছিদ্র হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মীরণের মস্তকে বস্তুতঃ যে ৫।৬টি ছিদ্র ছিল; তাহারও উল্লেখ করিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার বিশ্বাস যাহাই থাকুক, কিন্তু তাঁহার বর্ণনা কি আমাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে না? এক্ষণে আমরা বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, মুতাক্ষরীণকারের বর্ণনা হইতে মীরণের মৃত্যু কি প্রকারে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়? বজ্রাঘাতে, না বন্দুকের গুলিতে, অথবা আর কোনও আঘাতে? অনেকে বলিতে পারেন যে, বজ্রাঘাত যেমন নিঃশব্দে হয় নাই, বন্দুক-চালনাও ত সেইরূপ হইতে পারে। তবে ইহাও বিবেচ্য যে, একটা সৈন্যশিবিরে কত কারণে কত দিকে বন্দুকের শব্দ হয়, তাহা সকলে লক্ষ্য করে না; এবং তাহা তাদৃশ কৌতূহলের বিষয়ও নহে। বিশেষতঃ, ঝড়বৃষ্টির শব্দের মধ্যে বন্দুকের শব্দ লীন হইতেও পারে, কিন্তু বজ্রাঘাতের শব্দ সকল শব্দকে অতিক্রম করিবেই করিবে। বৈজ্ঞানিকেরা যখন প্রমাণ দিতেছেন যে, বজ্রপাতে মস্তকে ছিদ্র হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, এবং মীরণের মস্তকে ৫।৬টি ছিদ্র ছিল, এবং অন্যান্য যথেষ্ট সন্দেহের কারণ দেখা যাইতেছে, তখন মীরণের হত্যাব্যাপার যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। তৎকালীন প্রধান প্রধান ইংরাজ সেনানীর সন্দেহ এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ইংরাজ গবর্মেণ্ট ও মীর কাসেমের গুপ্ত পরামর্শে মীরণের অনুচরদিগের মধ্যে কোনও বিশ্বাসঘাতকের দ্বারাই হউক, অথবা কোনও গুপ্তচরের দ্বারাই হউক, এই নৃশংস ব্যাপার যে সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এ বিষয়ে ইংরাজ ও মীর কাসেম উভয়েই যে লিপ্ত ছিলেন, সে সময়ে লোকের মনে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল।

কেবল মীর কাসেম কর্ত্তৃক এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইলে, তাঁহার রাজ্যচ্যুতির সময় ইংরাজ তাঁহাকে দোষী করিতে কদাচ বিরত হইতেন না, এবং তাহা লইয়া বিলক্ষণ হুলস্থূল বাধাইতেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া কোনরূপ উচ্চবাচ্য হয় নাই, এবং বজ্রাঘাতে মৃত্যু রাষ্ট্র করিয়া, তাহাই বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করা হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুতাক্ষরীণের অনুবাদক মহাশয় কতকগুলি যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়া উহাকে বজ্রাঘাত প্রমাণ করিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই যুক্তিগুলির উল্লেখ করিয়া যথাসাধ্য তাহাদের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিতেছি। তাহার যুক্তিগুলি এই ;—(১) বজ্রপাত ঘটার বিশেষ সম্ভব। (২) যে কেহ হত ও দগ্ধ হয়, তাহার দেহ বজ্রাহত দেহ হইতে দেখিতে বিভিন্নপ্রকার। (৩) তিন জন একইরূপে আহত হয়, এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ যাহা দেখিয়াছিল বা শুনিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। (৪) দেহটাকে সমস্ত দিন হস্তিপৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখা হয়, এবং সাধারণে মস্তক, পদদ্বয় ও সমস্ত দেহই দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিল। (৫) কৌতূহল ও অনুসন্ধাননিবৃত্তির জন্য মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ সমাহিত করা হয় নাই, কিন্তু ছয় দিনের পরে (অর্থাৎ পাটনা হইতে রাজমহলে প্রেরিত হইয়া) বহু লোকের চক্ষের সমক্ষে মুসলমান-শাস্ত্রানুযায়ী কুড়ি ত্রিশ প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর সমাহিত করা হইয়াছিল। (৬) মীর-কাসেম এই চক্রান্তের জন্য পরিশেষে, এমন কি, তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পরও নিন্দিত হন নাই। (৭) এই জনপ্রবাদ ক্রমশঃ লয় পাইয়াছিল। ইংরাজদিগের প্রভুত্বে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। উপরে তাঁহার যুক্তিগুলির মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইল। কিন্তু এগুলি কত দূর সারপূর্ণ, তাহা সাধারণে বিচার করিয়া দেখিবেন। তাঁহার প্রথম যুক্তি অনুমানমাত্র। রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল, অতএব বজ্রপাতেরই সম্ভব। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বাহিরের ভৃত্যগণ বজ্রপাতের শব্দও শুনিতে পায় নাই, তাবুদাহও দেখিতে পায় নাই। বজ্রপাত হইলে শিবিরের অন্যান্য লোকেরাও জানিতে পারিত। নিঃশব্দে কখনও বজ্রপাত হয় না, ঝড়বৃষ্টি কেবল বজ্রপাতের সহায়ক নহে, হত্যারও সহায়ক; কারণ ঐরূপ রজনীতে ঐ প্রকার তামসব্যাপার ঘটিবার বিশেষ সুযোগ। দ্বিতীয় যুক্তিরও উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি যে, মীরণের দেহের চিহ্ন বজ্রাহত দেহের চিহ্ন হইতে পৃথক। বজ্রাহত ব্যক্তির মস্তকে পাঁচ ছয়টি ছিদ্র

থাকিতে পারে না; কিন্তু মীরণের মস্তকে বস্তুতঃ তাহাই ছিল। তৃতীয় যুক্তিতে তিনি বলিতেছেন যে, তিন জন একইরূপে আহত হইয়াছিল; হত্যা হইলে কি তাহা হইতে পারে না? আর তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা যে প্রকাশ করে নাই, এ কথাই বা কে বলিল? তাহা না হইলে এই ঘটনা সন্দেহজনক বলিয়া লোকের মনে ধারণা হইবে কি প্রকারে? অবশ্য কোনও না কোনও প্রকারে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। চতুর্থ ও পঞ্চম যুক্তির উত্তর আমরা এক সঙ্গে প্রদান করিতেছি। উক্ত দুই যুক্তির মর্ম্ম এই যে, মৃতদেহ সমস্ত দিন হস্তিপৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিয়া সাধারণকে পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল। এবং পাটনা হইতে রাজমহলে আনীত হইয়া তাহা বহুলোকের চক্ষের সমক্ষে সমাহিত হয়। হত্যা হইলে অবশ্য মৃতদেহ গোপনের চেষ্টা হইত। বোধ হয়, তাঁহার যুক্তির তাৎপর্য্য এই, সাধারণ লোকে দেখিয়া তাহাকে হত্যা বলিয়া সন্দেহও করে নাই। অনুবাদক যাহা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রকৃত নহে। মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে ঝুলাইয়া সাধারণকে পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেওয়া হয় নাই। বরঞ্চ ইহা মৃতদেহ নহে, কিন্তু রোগীর দেহ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। মীরণের মৃত্যুসংবাদে পাছে সৈন্যদিগের মধ্যে গোলযোগ ঘটে, এই আশঙ্কা করিয়া কর্ণেল সাহেবের আদেশে মৃতদেহ হইতে নাড়ী প্রভৃতি বাহির করিয়া রোগীর দেহের ন্যায় ঝুলাইয়া রাখা হয়। কিন্তু পরিশেষে লোকে মৃতদেহ বলিয়া বুঝিতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, নাড়ী প্রভৃতি বাহির করিবার পর সে দেহ পূর্ব্বদেহ হইতে কি কিছু পরিবর্ত্তিত হয় নাই? ঐরূপ একটি ক্রিয়া করিলে নিশ্চয়ই তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব। সুতরাং দেহে পূর্ব্ব রাত্রিতে যে চিহ্ন ছিল, ঠিক সেইরূপ চিহ্ন কি লোকে দেখিতে পাইয়াছিল? তদ্ভিন্ন প্রথমতঃ তাহাদিগকে মৃতদেহ বলিয়া বিশ্বাস করিবারই অবকাশ দেওয়া হয় নাই। তাহার পর যখন রাজমহলে নানাপ্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর মৃতদেহ সমাহিত করা হয়, তখন সে দেহ পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তজ্জন্যই তাহা রাজমহলে সমাহিত করা হয়। নতুবা সম্ভবতঃ তাহা মুর্শিদাবাদে আনীত হইত। গলিত দুর্গন্ধ দেহ দেখিয়া কেহ কি তাহার মৃত্যুচিহ্ন কেবল চক্ষুর দ্বারা বুঝিতে পারে? ঐ মৃতদেহকে রোগীর দেহের ন্যায় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ও দুর্গন্ধের জন্য রাজমহলে সমাহিত করা, মুতাক্ষরীণে স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। * সুতরাং অনুবাদ-

* "He (colonel) immediately adopted the opinion that this death

কেব উক্ত যুক্তি কত দূর সুসঙ্গত, সাধারণে তাহার বিচার করিবেন। ষষ্ঠ যুক্তির উত্তরও পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজরাও সেই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া কেবলই মীর কাসেমের নিন্দা হয় নাই। আর এ সম্বন্ধে যে কোন প্রকার কথাবার্ত্তাই হয় নাই, ইহাই বা কে বলিল? অনুবাদক মহাশয় ২৮। ২৯ বৎসর পরে সে কথা নিজ গ্রন্থে উল্লেখই বা কি করিয়া করিলেন? নানা চেষ্টায় ইহাকে বজ্রাঘাত সিদ্ধান্ত করিয়া সেই অভিশাপবাক্যের সহিত মিলাইয়া, লোকের মনে বজ্রপাতের ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাজেই পরিণামে মীর কাসেম ও ইংরাজ অব্যাহতি পাইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সপ্তম যুক্তিতে ক্রমশঃ প্রবাদটি যে লয় পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন, তাহারও উত্তর একই। বজ্রপাতের ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়ার কাজেই তাহা ধীরে ধীরে লয় পাইয়াছিল। অবশ্য ইংরাজের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া কোন কোন প্রবাদের সৃষ্টি হইবার সম্ভব বটে, কিন্তু যাঁহারা বিশেষ ক্ষমতাশালী, অন্ততঃ একটু কারণও না থাকিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন একটি প্রবাদের সৃষ্টি করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অনুবাদক মহাশয় যতই কেন বলুন না, ইংরাজদিগের প্রতি এ সন্দেহ কদাচ একেবারে দূর হইতে পারে না। সিরাজদ্দৌলার মাতা ও মাতৃস্বসার অভিশাপবাক্যের আবরণে তাহাকে বজ্রপাতে পরিণত করা হই-

---

ought to be kept secret; and he ordered the entrails and other parts to be taken out of the body, and buried; but the body itself to be carried about, as if Miren had been only sick. Next day he beat the general and marched off, the body being carried stretched on the hoodah of an elephant. The feet hanging outwards, as those of a sick man, but that very moment it became public that it was only a dead body stretched on an elephant." * * *

"meanwhile Miren's body having been put into a coffin was carried rapidly upon chair-men's shoulders to the Ganges when it was put in a boat, and carrid down the river, as far as Radge-Mahal; but the abominable stench that exhuled from it obliged the messengers to land it immediately and it was buried in a spot which now goes by the name of his monument,—(Mutaqherin p. 123) ইহা অনুবাদক মহাশয়ের নিজেরই অনুবাদ। এগুলিও অন্ততঃ তিনি নিজে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিতেন।

রাছে। সাধারণে বিচার করিয়া দেখিবেন, আমাদের সিদ্ধান্ত একেবারে অমূলক কি না? মীরণের বৃদ্ধ পিতা পুত্রের মৃতদেহ আর দেখিতে পান নাই। দেহ মুর্শিদাবাদে আনীত হয় নাই; বিকৃত হওয়ায় রাজমহলে সমাহিত করা হয়। অদ্যাপি রাজমহলের সরিফা-বাজারে অসংস্কৃত অবস্থায় তাঁহার সমাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মীরণের মৃত্যুতে মীরজাফর আপনাকে দক্ষিণহস্তশূন্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন; ইহার কিছু দিন পরে ইংরাজেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীর কাসেমকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদ প্রদান করিলেন। অনেক দিন হইল, মীরণ এ জগৎ হইতে চির-বিদায় লইয়াছেন। কিন্তু আজিও মুর্শিদাবাদের নবাব-প্রাসাদে রাজপক্ষী হস্তে পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি, সেই রহস্যময় পরিণামের কথা স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দেয়।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

বৃষ্টি-রহস্য।

কুহেলিকা ও মেঘ, গঠন ও উপাদানে এক; তবে কুহেলিকা ভূপৃষ্ঠের নিকটে সমুদ্ভূতা হন, তপনতাপে বাতাসের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া অদৃশ্য হন। আর মেঘ দূরগগনে বায়ুর স্রোতে নানা রঙ্গে নাচিতে নাচিতে কখন শৈলমালার রচনা করে; কখন তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিরি-উপত্যকা কন্দর কান্তারে পরিণত করে; আদিত্যের আলোক মাখিয়া উত্তালতরঙ্গভঙ্গে ধরার জলধিকে উপহাস করে। কিন্তু জলধরের এ বাহাদুরী কত ক্ষণ? পরিশেষে সেই সাগরে আসিয়াই ত আশ্রয় লইতে হয়।

মেঘবাহী বায়ু আপন অপেক্ষা শীতলতর বায়ুর সংস্পর্শে বা অন্য কারণে কথঞ্চিৎ উত্তাপ হারাইলে, উহা আর মেঘ বহন করিতে পারে না। তখন মেঘকণিকা সকল পরস্পর মিলিত হইতে থাকে। এই মেলামিশি ও মৈত্রীর ফলে কণা বৃহত্তর আকার ধারণ করিলে, উহা বায়ুস্তরের বাধা অতিক্রম করিয়া ভূতলে পতিত হয়। ইহাই বৃষ্টি।

আর একরকম করিয়া বলি। ধরাতলের জলরাশি আর্দ্র-ভূখণ্ড, জীবশরীর ও তরুত্বক হইতে বারিবাষ্পাকারে বাতাসে মিশিতেছে। জলের বাষ্প দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন বাতাসে অনেক উত্তাপ থাকে, তখন উত্তপ্ত

বায়ু বাষ্পাকারে পরিণত জলরাশিকে আপনার দেহে মিশাইয়া লইয়া আকাশ পানে উঠিতে থাকে। আকাশের উপরের বায়ু অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু অধিকতর উত্তপ্ত, এবং সেই জন্য "হাল্কা" বলিয়া উহা শীতলতর ও গুরুতর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া, তৈলের জলস্তর ভেদপূর্ব্বক উত্থানের ন্যায়, উপরে উঠিতে থাকে। কিন্তু উঠিতে উঠিতে শীতলতর বায়ুর সংস্পর্শে ক্রমে ক্রমে আপন উত্তাপ হারায়। কারণ, উত্তাপ সকল বস্তুতে সমতা রক্ষিবার জন্য সতত ব্যাকুল। উষ্ণদুগ্ধপূর্ণ এক পাত্রকে শীতলজলপূর্ণ পাত্রে নিমজ্জিত করিলে, দুগ্ধ শীতল হয়, এবং জল উষ্ণ হইয়া থাকে। উত্তাপ কমিয়া গেলে বায়ু জলীয়বাষ্প ধরিয়া রাখিতে অক্ষম হয়। তখন জলীয়বাষ্প ক্ষুদ্র কণিকায় আকারে ধারণ করিয়া মেঘ হইয়া বায়ুভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে। বায়ু অধিকতর শীতল হইলে মেঘও বহন করিতে পারে না; তখন মেঘের কণা সকল একত্র মিশিয়া পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। নিপতিত হইতে হইতে জলকণা যদি উষ্ণ বায়ু স্পর্শ করে, তবে আবার জলীয়বাষ্প কিংবা মেঘ হইয়া যায়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শীতলতর বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যখন জলীয়বাষ্পবাহী উষ্ণতর বায়ু শীতল হইতে থাকে ও জলীয়বাষ্প মেঘ কিম্বা বারিকণায় পরিণত হয়, তখন ঐ শীতলতর বায়ুও উত্তপ্ত হইতে থাকে; তবে কেন জলীয়বাষ্প সেই নবোত্তপ্ত বায়ুর আশ্রয় গ্রহণ করে না? কিন্তু জ্ঞানময় ও দয়াময় বিধির বিধান অন্যরূপ। পরিমিতউত্তাপসম্পন্ন ক নামক বায়ুতে যদি ম পরিমিত জলীয়বাষ্প থাকে, এবং পরিমিতউত্তাপসম্পন্ন খ নামক বায়ুতে যদি প পরিমিত জলীয়বাষ্প থাকে, তবে ক ও খ বায়ুর সংমিশ্রণে যে বায়ুরাশি হইবে, তাহার উত্তাপের পরিমাণ ত হইবে বটে, কিন্তু ত পরিমিত উত্তাপসম্পন্ন বায়ু ম+প পরিমিত জলীয়বাষ্প ধারণ করিতে সক্ষম হইবে না। বায়ুর উত্তাপ ২, ৫, ৮, ১১ ইত্যাদি পাটীগণিতিক অনুপাতে হ্রাস হয়; কিন্তু বায়ুর জলীয়বাষ্পধারণশক্তি ২, ৪, ৩২, ১২৮ ইত্যাদি জ্যামিতিক অনুপাতে কমিতে থাকে। এক ঘনফুট বায়ুর যখন উত্তাপ ৫০ ডিগ্রি, তখন উহাতে ৪·১ গ্রেণ জলীয়বাষ্প থাকে; ঐ বায়ুর উত্তাপ যখন ৪০ ডিগ্রি, তখন উহাতে ৮ গ্রেণ জলীয়বাষ্প থাকে। এই উভয় বায়ু একত্র মিশিলে তাহার উত্তাপ ৬০ ডিগ্রি হইবে; কিন্তু মিশ্রিত বায়ুর প্রতি ঘনফুটে ৫·৮ গ্রেণের অধিক জলীয়বাষ্প বিরাজ করিতে পারে না; সুতরাং এ দুই বায়ুর সংমিশ্রণে প্রতি ঘনফুটে ·২৫ গ্রেণ পরিমিত জলীয়বাষ্প মেঘরূপে পরিণত হইবে।

শীতলতর বায়ুর সহিত মিশিয়াই যে বায়ু শীতল হইয়া জলীয়বাষ্পধারণ-শক্তি হারাইয়া থাকে, তাহা নহে। তাড়িতশক্তিবলে অথবা শীতল শৈলমালা ও তজ্জাত অরণ্যের সংস্পর্শেও উষ্ণ বায়ু শীতল হইতে থাকে। এই জন্য পর্ব্বতের গাত্রে দূর হইতে মেঘ লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। বোধ হয়, এই জন্য আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মেঘ সকল পাহাড়ে শালপাতা খাইতে যায়।

ভূপঞ্জরের ও ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক অসমঞ্জস্য, সমীরস্রোতের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বিবিধ কারণে পৃথিবীর সকল স্থানে সমান বৃষ্টি হয় না, এবং এক স্থানেও বৎসরের সকল সময় সমান বারিপাত হয় না। মিসর দেশ, সাহারার মরুভূমি, গাবুনের ও মঙ্গোলিয়ার বালিভূমি, আরবের পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রভৃতি অনেক স্থানে আদৌ বৃষ্টি হয় না। উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে বারিপাতের অত্যাশ্চর্য্য অসামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়। খাসিয়া পর্ব্বতস্থিত চেরাপুঞ্জিতে প্রতি বৎসর পাঁচ শত হইতে ছয় শত ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে; আবার পশ্চিমে জাকোবাবাদের বার্ষিক বারিপাত সাড়ে চারি ইঞ্চির অধিক নহে। তথায় কোন কোন বৎসর কেবলমাত্র এক ইঞ্চিও বৃষ্টি হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতেও বারিপাতপরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি সামান্য নহে। পশ্চিমঘাটের বৌরাডুর্গে ২৫১ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়; এবং তথা হইতে কেবলমাত্র ৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী গোকাকে ২২ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া থাকে। এক স্থানে প্রতিবৎসরই যে সমান বৃষ্টি হয়, তাহা নহে। দেখিয়া শুনিয়া যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে প্রদেশের বার্ষিক বারিপাত সমধিক, তথায় প্রায় প্রতি বৎসর সমপরিমিত বৃষ্টিই হইয়া থাকে; এবং যেখানে বারিপাত স্বল্প, তথায় বৎসর বৎসর বারিবর্ষণপরিমাণের বিলক্ষণ ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। দক্ষিণ মহাসাগরের জলীয়বাষ্প হিমগিরির পরপার তিব্বতে কদাচিৎ যাইতে পারে; হিমালয়ের গ্রেট রঞ্জিৎ উপত্যকা ও তাহার কিছু উত্তরবর্ত্তী স্থানে প্রায় এক গজ কুট জল হয়। নেপাল উপত্যকায় কাটামণ্ডু নগরের বার্ষিক বারিপাত ৫৭ ইঞ্চি; তিব্বতে গে-নামক স্থানে আড়াই ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না।

গ্রীষ্মের মনসুন বায়ুপ্রবাহ ভারতের অধিকাংশ জল আনয়ন করে। জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত কয়েক মাসই বোম্বাই প্রদেশে বৃষ্টির নভ বৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, পঞ্জাব, রাজপুতানা, হাইদ্রাবাদ, ডেকান, বেরার, উত্তরাট, দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিমোপকূল প্রদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশে এই সময় অধিক বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বভাগ, কর্ণাট,

পূর্ব্বঘাট শৈল ও সিংহলের পূর্ব্বার্দ্ধে সে সময় বারিপাত হয় না। তথাকার বর্ষাকাল অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত; সেই কয়েক মাস বঙ্গোপসাগরের উত্তরপশ্চিমাংশে উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু বহিতে থাকে; এবং উত্তর-পূর্ব্ব মনসুন সমীর মন্দ মন্দ গতিতে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণার্দ্ধ ও কার্টি রেখা গিয়া উপনীত হয়। এ সময় বর্ষা দক্ষিণাভিমুখে গমন করে; অবশেষে ডিসেম্বর মাসের শেষে, যেখানে চিরবর্ষা বিরাজমানা, সেই বিষুব রেখার দুই পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে গিয়া মিশিয়া যায়।

ভারত গবর্মেণ্টের হাওয়া আপিস (Meteorological Department) নানা স্থানে যন্ত্র বসাইয়া জল ও বায়ুর গতি-ক্রম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সেই সকল স্থানের দর্শনফল প্রত্যহ তারযোগে বিজ্ঞানবিৎ সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট যাইতেছে। তিনি তাহা অনুধাবন করিয়া তাহার দর্শনফল সাধারণ্যে প্রচার করিতেছেন। তাহাতে নাবিকগণের যে পরিমাণ উপকার হইতেছে, কৃষককুলের সেরূপ হইতেছে না। তাহার কারণ এই যে, জলবায়ুর বিজ্ঞানের এখনও কৈশোরকাল। বৎসরে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, কোন মাসে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, তাহা অনেকটা দৃঢ়রূপে জানুয়ারি মাসে বলিবার ক্ষমতা এখনও এই বিজ্ঞানের হয় নাই। অধ্যাপক ইলিয়ট ও পেডলার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ বিজ্ঞানের পুষ্টির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; এবং দশ বৎসর পূর্ব্বে যে অন্ধকার ছিল, কিয়ৎপরিমাণে তাহার অপনয়ন করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বৃষ্টিপাতের মোটামুটি-নিয়ম ভিন্ন সূক্ষ্ম কারণসমূহের এখনও কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বহুকালের অধ্যবসায় ও পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন তাহা সাধিত হইতে পারে না।

আমাদের দেশে বৃষ্টিসংক্রান্ত নানাবিধ প্রবাদ আছে। পৌষ মাসের বাতাস দেখিয়া কৃষকেরা আগামী বর্ষের বৃষ্টি কিরূপ হইবে, তাহার একটা অনুমান করিয়া লয়। পশ্চিম বঙ্গে ইহাকে "মাস শোষা" বলে। ইহা ব্যতীত খনা ও ডাকপুরুষের বচন বলিয়া অনেক পদাবলী লোকমুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি,—

কোদালে কুড়ুল মেঘের গায়, মশুরকে বল বাঁধতে শালি,
আউলে বাউলে দিচ্ছে বায়। আধ না হয় হবে কাল।

১২৯৪ সালে "হিন্দুরঞ্জিকা" পত্রে পরাশরের একটি বচন প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা এই,—

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে নবম্যাং যদি বর্ষতি।
বর্ষত্যেব নদা দেবস্তত্রাবৃষ্টৌ কুতো ভয়ং॥
শুক্লাষাঢ়নবম্যামুদ্ধবর্ষিবিতটীনির্ম্মলপ্লবং প্রযাতে
স্বীয়ং কালং বিধত্তে খরতরকিরণো মণ্ডলাকারযুর্য্যঃ।
জীমূতৈর্বেষ্টিতোঽসৌ যদি ভবতি বরিবর্ম্যমানোঽস্তশৈলে
তোয়ৈঃ পর্য্যাপ্তমেব প্রনদতি জলদো যাবদব্দস্তু তুলায়াঃ॥

এই পরাশরীয় শ্লোকের যে অনুবাদ লোকমুখে বিচরণ করিতেছে, তাহাও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা,—

আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা। পর্ব্বতে লাগে সমুদ্রের ফেনা।
তাতে আছে মূলের লেখা। যদি বর্ষে মুষল ধারে।
যদি বর্ষে ঈষি ঝিষি। মধ্য সমুদ্রে বন্যা হবে॥
নক্ষত্রের ভার না সহে মেদিনী। যদি সূর্য্য হেঁসে বসে পাটে।
যদি বর্ষে কণা কণা। চাষার গরু বিকায় হাটে॥

এরূপ অনেক বচন আছে। খিত্রবী খনা অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার শ্লোক সকল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল কোথায়, তাহার স্থির নাই। পরাশর ও খনা কোন্ প্রদেশের জন্য তাঁহাদিগের শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক বৈষম্যে বারিপাতের প্রভূত ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিম গগনে মেঘের উদয় হইলে বৃষ্টি অনিবার্য্য; কিন্তু ঐ সময়ে অলপাইগুড়িতে পূর্ব্বাকাশের মেঘই বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। বৃষ্টিসংক্রান্ত বারদীয় প্রবাদ ও শ্লোক সংগ্রহ করিয়া তাহার তথ্যনির্ণয় অধ্যবসায়সাপেক্ষ। আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বিজ্ঞানজ্ঞ গ্রাজুয়েট কি এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন না?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল বারিবৃষ্টির কথা কহিলাম। কিন্তু সময় সময় যে বারি ভিন্ন অন্যান্য পদার্থ আকাশ হইতে ভূপতিত হয়, তাহার আলোচনা করিলাম না; মৎস্যবৃষ্টি, ভেকবৃষ্টি, প্রস্তরবৃষ্টি, রক্তবৃষ্টি, ইত্যাদি আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ঘটনার বিষয় বারান্তরে বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

ভাষা ও সাহিত্য।

ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিষয়ে সমাজের উন্নতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। কোন দেশের জাতীয় প্রকৃতি কি, তাহা বুঝিতে হইলে, অগ্রে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করা উচিত। সমাজের যখন যে অবস্থা ঘটে, জাতীয় সাহিত্য তখন সেই অবস্থার অনুরূপ বিষয়ে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। ইংলণ্ড যখন বিলাসতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল, বিষয়বাসনার পঙ্কিলভাবে ইংলণ্ডবাসিগণ যখন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ইংলণ্ডে দূষণীয় নাটক ও সঙ্গীত প্রভৃতির বিরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। রাজসভায় এই কুপ্রবৃত্তিমূলক বিষয়ের আন্দোলন হইত; নাট্যশালায় এই কুচরিত্র ও কুদৃশ্যের আবির্ভাবে দর্শকগণ নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিত; প্রকাশ্য পথে, লোকালয়ে, বা বিপণীতে এই পাপাচার ও পাপময়ী কথা স্বকীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণভাবে রাখিত। সাহিত্যক্ষেত্রের কর্ম্মবীরগণের অসামান্য সাধুভাবে ও মহীয়সী প্রতিভায় এই প্রবৃত্তিস্রোত ক্রমে সঙ্কুচিত হয়। ইঁহাদের প্রতিপত্তিতে, ইঁহাদের গৌরবে, ইংলণ্ডের সাহিত্য প্রতিপত্তিশালী ও গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে।

এক সময়ে আমাদের সাহিত্যেও এইরূপ পঙ্কিলভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। যাঁহাদের ক্ষমতায় উহা অপসারিত হইয়াছে, তাঁহারা অনন্তকীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রের গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এখন যাঁহারা তাঁহাদের পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন, তাঁহাদের একাগ্রতা ও উৎসাহ আছে বটে, কিন্তু তাদৃশ ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য নাই। উত্তম পুরুষের প্রাধান্যে আত্মহারা হইলে যে সকল কুফলের উৎপত্তি হয়, এখন তৎসমুদায় প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। যাহা হউক, এই অহংজ্ঞানী লেখকগণ কখনও সাহিত্যক্ষেত্রের অধিনায়ক হইতে পারিবেন না। ইঁহারা যে সকল বিষয় রাখিয়া যাইবেন, তৎসমুদয় সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনের সহায় হইবে কি না, ভবিষ্যদর্শিগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, কখনও তাহার বিনাশ হয় না। নবীন লেখকগণের সমর্পিত বিষয়গুলি কালে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবে।

যাহা হউক, বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। এখন যে ভাবে সাহিত্যের গতি হইতেছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, উহার উন্নতির জন্য কতকগুলি অভাবের পূরণ করা উচিত। বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্য উপন্যাস প্রভৃতিতে যেরূপ অলঙ্কৃত, ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিতে সেরূপ গৌরবযুক্ত নয়, ইহা অনেক দিন হইতে অনেকেই বলিয়া আসিতেছেন। এখন এই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে বটে, কিন্তু চেষ্টার ফল পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। যাঁহারা উক্ত অভাবের উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহারা অভাবপূরণের প্রতিকূল বিষয়ের নির্দ্দেশ করিতেছেন না। কোন দুঃসাধ্য ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, অনেক প্রতিকূল বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। জাতীয় ভাষার পরিপুষ্টি ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন নিঃসন্দেহ দুঃসাধ্য ব্যাপার। সহজে ঈদৃশী সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধনার পথে যে সকল প্রতিকূল বিষয় উপস্থিত হয়, তৎসমুদায় দূর করিতে হইলে, যথোচিত ধীরতা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যে ঘটনা প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক লিখিত হয়, সেই সকল পুস্তকের মধ্যে বিষয়বিশেষে পরস্পর সামঞ্জস্য থাকা উচিত। ঐতিহাস লিখিতে হইলে, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নামের উচ্চারণগত প্রকৃতি অনুসারে অক্ষরান্তর এবং ইতিহাসরচনার প্রণালী প্রভৃতি একরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সকল বিষয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের মধ্যে বৈষম্য থাকে, তাহা হইলে ভাষা ও সাহিত্যের একটা বন্ধন থাকে না। নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে মূর্ত্তির অবয়বসংস্থান না হইলে, উহা মূর্ত্তি বলিয়াই গ্রাহ্য হয় না, এবং লোকেও উহা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। হস্তের স্থলে যদি পদের সন্নিবেশ হয়, এবং পদ যদি হস্তের স্থান পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে ঐ দৃশ্য যেমন অপ্রীতিকর হয়, প্রণালীবিরুদ্ধ বিষয়ও সেইরূপ অশ্রদ্ধেয় ও অবজ্ঞেয় হইয়া থাকে। যে ভাষায় এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয় থাকে, সে ভাষাও অপরের সমাদৃত হয় না। কোনও কোনও স্থলে স্বেচ্ছাচারিতা মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতা অমার্জ্জনীয়। এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতার সংযমন আবশ্যক। দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হয়, তৎসমুদয়ের পরিভাষা একরূপ হওয়া উচিত। কি প্রণালীতে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি লিখিতে হয়, তাহার নির্দ্ধারণ করা বিধেয়। এ বিষয়েও স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া বিধেয় নহে।

ব্যক্তিসমষ্টির একীভূত চেষ্টায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কোনও বিষয়ের আবিষ্কার বা কোনও বিষয়ে গ্রন্থপ্রণয়ন করা ব্যক্তিগত-চেষ্টাসাধ্য। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যকে সুনিয়মিত ও সুশৃঙ্খল করা ব্যক্তিগত চেষ্টার সাধ্য নহে। এরূপ স্থলে ব্যক্তিসমষ্টির সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। ভাষার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য শব্দতত্ত্বের নির্ণয় করা, পরিভাষা প্রভৃতি স্থির করা, বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ লিখিবার বিশেষ বিশেষ প্রণালী নির্দ্ধারণ করা প্রভৃতি কার্য্য দূরদর্শী অভিজ্ঞ লোকের সমবেত চেষ্টায় সম্পন্ন হইতে পারে। ইউরোপের "একাডেমিগুলি" এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। ইউরোপে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনার জন্য বিশেষ বিশেষ "একাডেমি" রহিয়াছে। এক "ফ্রেঞ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্" কয়েক ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগ এক এক "একাডেমি" নামে প্রসিদ্ধ। এক "একাডেমি" ভাষা ও সাহিত্যের, অন্য "একাডেমি" ইতিহাসের, অপর "একাডেমি" বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন। ভাষা ও সাহিত্যের "একাডেমি" দ্বারা ফরাসী ভাষা কিরূপ পরিপুষ্ট ও উন্নত হইয়াছে, তাহা সহৃদয়সমাজের অবিদিত নাই। এইরূপ একাডেমি থাকাতেই ফরাসী, ইংরেজী, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষাগুলি খরবেগে উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ "একাডেমির" একান্ত অভাব। এ পর্য্যন্ত বিদ্বদ্গণের সমবেত চেষ্টায় কোনও বিষয় প্রণালীবদ্ধ হয় নাই। আমাদের সাহিত্যসেবকগণ নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া যে জ্ঞানগরিমার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভাষা গৌরবান্বিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের একীভূত চেষ্টায় যাহা সিদ্ধ হইতে পারে, তদনুরূপ কোনও কার্য্য এ পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে হয় নাই। প্রধানতঃ এই কারণে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সর্ব্বথা ভাব প্রকাশ করিতেছে। তরণী কর্ণধারশূন্য হইলে যেমন ইতস্ততঃ ধ, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যও সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়ত গতির হ। স্বদেশে যাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের অধিনায়ক, তাঁহারা যদি স্বদেশীয় অভিমত বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে ানের সার্থকতা থাকে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতসমাজ এ বিষয়ে ষ্ট রহিয়াছেন, আমাদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী সেইরূপ নিশ্চেষ্ট ভাব াইতেছেন। ইহার ফল এই হইতেছে যে, ইউরোপীয় ভাষা উন্নতিপথে গ্রসর হইয়া, জগতে প্রাধান্য লাভ করিতেছে; আমাদের ভাষা শিশুর হস্তে কর্দ্দমের ন্যায় শিথিল অবস্থায় রহিয়াছে। শিশু যেমন কর্দ্দম দ্বারা যাহা

ইচ্ছা তাহাই গড়িয়া ক্রীড়াসুখের অনুভব করে, আমাদের মাতৃভাষাও এখন সেই বালকদিগের সেইরূপ ক্রীড়ার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

যাঁহারা জ্ঞানবিস্তারের সহিত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এক সূত্রে নিবদ্ধ করিতে চাহেন, তাঁহারা, বোধ হয়, ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে তাদৃশ প্রয়াসী নহেন। জ্ঞানের বিস্তার এবং ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন, পৃথক্‌ভাবে এই দুইটি বিষয়ের বিচার করা উচিত। জ্ঞানের বিস্তার যে কোনও ভাষায় হইলেই পৃথিবীর উপকার হইতে পারে। নিউটন আপনার গবেষণার ফল লাতিন ভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কেবল লাতিন পাঠকদিগের মধ্যেই সেই অপরিমেয় জ্ঞানরাশি আবদ্ধ থাকে নাই। পৃথিবীর বাবতীয় সভ্যসমাজ সেই জ্ঞানরত্নে আপনাকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং বাবতীয় সভ্যসমাজের ভাষাতে সেই জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইতেছে। চীনের চিরপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউএন্‌থসঙ্গ স্বদেশীয় ভাষায় আপনার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার বিবরণ লিখিয়া গেলেও, উহা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যসমাজের অপরিজ্ঞাত থাকে নাই। সেই জন্যই বলিতেছি, জ্ঞানবিস্তার যে কোনও ভাষাতেই হউক না কেন, জ্ঞানপিপাসুদিগের পিপাসার কখনও অপরিতৃপ্তি হয় না। কিন্তু যাঁহারা স্বদেশের হিতকামনা করেন, অগ্রে তাঁহাদের স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যকে সুশৃঙ্খল করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির নাম করিয়া, জ্ঞানবিস্তারের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাঁহারা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কেবল উদ্ভ্রান্তভাবে বিচরণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর শৃঙ্খলা থাকে না। তাঁহারা যেমন ভাষা ও সাহিত্যকে সুনিয়মিত করিতে পারেন না, সেইরূপ প্রকৃত জ্ঞানবিস্তারেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। দুই নৌকায় পা দিলে যে দশা ঘটে, তাঁহাদের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। দুই দিক্ রহিয়া, তাঁহারা তরঙ্গময় জলে আত্মবিসর্জ্জন করেন। যাঁহারা নিছক বিস্তারের প্রবাগী, ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন তাঁহাদের গণ্য হয় না। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স যখন এসিয়াটিক্ সোসাইটি করেন, তখন জ্ঞানবিস্তারই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এসিয়াটিক্ সোসাইটি দ্বারা যে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহা বোধ হয়, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ভাষা ও সাহিত্যের শৃঙ্খলাসম্পাদন যে উক্ত সভার উদ্দেশ্য নয়, তাহা উহার নামেই পরিব্যক্ত হইতেছে।

আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মক্ষম নই; অভিজ্ঞতায়ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সমকক্ষ নই; তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাঁধিয়াছেন; একটি বিষয়ের সহিত আর একটি বিষয়ের সংযোগ করিয়া, তাঁহারা কোনরূপ গোলযোগের সূত্রপাত করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের কর্ম্মনৈপুণ্য ও কর্ম্মক্ষমতা উভয়ই পরিস্ফুট হইতেছে। আমরা দীর্ঘকাল তাঁহাদের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত থাকিয়াও যে এইরূপ কর্ম্মপ্রবণতায় অভ্যস্ত হইতে পারিলাম না, ইহা অল্প ক্ষোভের বিষয় নহে।

এখন ভাষা ও সাহিত্যকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়া যথোচিত উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে যত্ন না করিলে, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু পরিষদ এখন নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাতে মেদভারাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায়, বোধ হয়, পরিষদের ক্রিয়দংশে বলক্ষয় হইয়াছে। প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, পরিষদের সেই শক্তি আছে কি-না, এখন তাহা সদস্যগণের বিবেচ্য।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সেকালের 'কলিকাতা গেজেট'।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে "কলিকাতা গেজেটে"র জন্ম হয়। মিঃ নানক অনেক ইংরেজ সম্পাদক, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতশাসন গ্রহণ করিয়া, এই সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; এ মত সেকালের কলিকাতা গেজেটে কেবলমাত্র সরকারী অঙ্কিত হইত না। অন্যান্য সংবাদপত্রের ন্যায় ইহাতে নানাবিধ পন ও পদ্যগদ্যময় সম্পাদকীয় ও পত্রপ্রেরকলিখিত বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত; তৎসঙ্গে অবশ্য অনেক জ্ঞাতব্য সরকারী সংবাদও দেখিতে পাওয়া যাইত।

শতবর্ষ পূর্ব্বে এ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে সম্যক জানিতে পারা যায় না। সেই জন্য ইতিহাসপাঠকদিগের নিকট পুরাতন কলিকাতা গেজেট বহুমূল্য বলিয়া সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন গেজেটের খণ্ডশঃ প্রকাশিত সংখ্যাগুলি এখন আর সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু তাহার সারসংগ্রহ করিয়া সিটন্‌কার সাহেব যে পুস্তক প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্ত দুর্লভ নহে। অবসরসময়ে তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, অনেক পুরাকাহিনীর সন্ধানলাভ করা সম্ভব। এই প্রবন্ধে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদত্ত হইতেছে।

কলিকাতা গেজেটের সম্পাদকের স্বাধীনতা ছিল। তিনি রাজনৈতিক বিষয়েও স্বাধীন মতামত প্রদান করিতে পারিতেন; কিন্তু সেকালের নিয়মানুসারে তাঁহাকে ইংরেজসরকারের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে হইত। প্রথম প্রথম সম্পাদকীয় স্তম্ভে কেবল সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবেরই বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু কালক্রমে সকল প্রকার বিষয়েই সম্পাদক মহাশয় অল্পাধিক হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

সেকালে এখনকার মত পথঘাটের সুব্যবস্থা না থাকায় ডাকঘরের সুবন্দোবস্তও ছিল না; কলিকাতার সঙ্গে মফস্বলের অল্প কয়েক স্থানের সংযোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও বর্ষাসমাগমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। এই সকল কারণে মফস্বলে পত্রপ্রেরণ করা বা মফস্বল হইতে প্রত্যুত্তর পাওয়া সকল সময়ে ঘটিয়া উঠিত না, এবং যখন ঘটিত, তখনও কোনও নিশ্চয় ছিল না। ডাকমাশুলের হার কিছু অধিক ছিল, এবং ছোট ছোট চিঠি ভিন্ন বড় বড় কাগজ বা পুলিন্দা পাঠাইতে হইলে, সপ্তাহে দুই এক মাত্র বাঙ্গীডাকে তাহা পাঠাইতে পারা যাইত। চিঠির ডাকে ৸৹ আয়তনের চিঠি পর্য্যন্তই গৃহীত হইত, আয়তন তাহার অপেক্ষা বড় হইলে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বাঙ্গীডাকে প্রেরণ করিতে হইত। পর্য্যন্ত এক মাশুল, ৩৷৷৹ তোলা পর্য্যন্ত তাহার দ্বিগুণ, ৪৷৷৹ ত্রিগুণ, ৫৷৷৹ তোলা পর্য্যন্ত চারিগুণ—এইরূপ হারে মাশুল এবং স্থানের দূরত্ব অনুসারে মাশুলের তারতম্য হইত। ১৭৮৪ কয়েকটিমাত্র ডাকঘর ছিল, তাহার নাম,—বারাকপুর, হুগলী, চন্দননগর, মুঙ্গের, পাটনা, বক্সার, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, ভাগলপুর, দিনাজপুর, রাজাপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কল্লী, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক এবং গঞ্জাম।

২৷৷০ তোমার চিঠি কলিকাতা হইতে পাঠাইতে হইলে, বারকিপুর, হুগলী ও চন্দননগরের জন্য এক আনা, বর্দ্ধমান ও মুরসিদাবাদের জন্য দুই আনা, রাজমহল ও ভাগলপুরের জন্য তিন আনা, দিনাজপুর ও মুঙ্গেরের জন্য চারি আনা, পাটনার জন্য পাঁচ আনা, বক্সারের জন্য ছয় আনা, এইরূপ হারে মাশুল দিতে হইত।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে হইলে অসুবিধার অন্ত ছিল না; কিন্তু পুলিশের নিকট আবেদন করিলে তাহারা ডাকের নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া দিত। একখানি আট-দাঁড়ী বজরার দৈনিক ভাড়া দুই টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং তাহাতে কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ গমন করিতে হইলে পঁচিশ দিনের ভাড়া গণিয়া দিতে হইত।

কলিকাতার পুলিশের উপর নগররক্ষার ও অন্যান্য কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। তজ্জন্য সহরে একত্রিশটি থানা সংস্থাপিত ছিল। থানাগুলির নাম,—আর্মানী গির্জ্জা, পুরাণা কেল্লা, চাঁদপালঘাট, লালদীঘী, ধর্ম্মতলা, ওল্ডকোর্ট-হাউস, ভৌদতলা, আমড়াগলী-পঞ্চাননতলা, চীনাবাজার, চাঁদনী চক, টুকসবাজার, ঝামাপুকুর, চকডাঙ্গা, সিমলাবাজার, লনলঙ্কা বাজার, মলঙ্গা-পটলডাঙ্গা, গোবরডাঙ্গা, বৈঠকখানা, শ্যামপুকুর, শ্যামবাজার, পদ্মপুকুর, কুমারটুলী, ঘোড়াঘাকো, মেছোবাজার, জানবাজার, ডিঙ্গাভাঙ্গা, সুতানটি-টুটিপোলা, দয়েহাটা, হাঁসপুকুরিয়া, কলিঙ্গা ও জোড়াবাগান। প্রতি থানায় এক জন থানাদার ও এক জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকিবার ব্যবস্থা ছিল; ইহারা সকলেই বাঙ্গালী। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের তালিকায় দেখা যায়, থানাদার-দের মধ্যে ১৮ জন হিন্দু এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগের মধ্যে ৮ জন হিন্দু; সমস্ত মুসলমান। এখনকার মত তখন থানায় ইংরেজ কর্ম্মচারীর [illegible]।

ইংরেজদিগেরই প্রাধান্য ছিল। তাঁহারা সকলেই ক্ষুদ্র নবাবের [illegible]মে কালাতিপাত করিতেন। ইংরাজগৃহে যতগুলি দাস দাসী [illegible], তাহার সংখ্যা গণনা করিলে এখনকার সাহেবেরাও বিস্মিত [illegible]। ইহাদের বেতন নিতান্ত অল্প ছিল না। ইংরাজেরা একবার [illegible] দের বেতন কমাইবার জন্য কমিটি করিয়াছিলেন।

সেকালের ইংরাজদিগকে দায়ে পড়িয়া এ দেশের লোকের মত অনেক-গুলি আচার ব্যবহার অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে ধূমপানের কথাটাই

সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। একালের সাহেবেরাও ধূমপানে কম মজবুত নহেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদের ধূমপানপ্রথার বড়ই বিরোধী। সেকালে ইহার বিপরীত ছিল। ইংরেজ ধূমপায়িগণ আমাদের মতই হুঁকায় ব্যবহার করিতেন, কিন্তু কেহ কাহারও হুঁকায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। তজ্জন্য তাঁহারা বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণরক্ষা করিবার সময়ে আপন আপন হুঁকা কলিকা বাঁধিয়া রওনা হইতেন। কেবল গবর্মেণ্ট হাউসের ভোজে হুঁকা প্রবেশ করিতে পারিত না, এবং কোন কোন প্রকাশ্য নাচ তামাসায় বা সভা সমিতিতে হুঁকা কলিকা নীচের তলায় রাখিয়া আসিতে হইত।

বিলাতী জিনিসের আমদানী অল্প ছিল। সময়ে সময়ে বিলাতী জিনিসের আমদানী হইত, এবং তখন তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। কলিকাতা গেজেটে এক জন ইংরেজ মহিলা কবিতাচ্ছলে ইহার একটি সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—

"But stay, let me reserve my rhyme,
To shew you how I spend my time.
After a sultry restless night
Tormented with the hum and bite
Of pois'nous insects out of number,
That here infests one's midnight slumber,
I rise fatigued almost expended,
Yet suddenly when breakfast's ended,
Away we hurry with our tops
To rummage o'er Europe shops,
And when of Caps and Gauze we hear
Oh! how we scramble for a share!"

ইংরাজদিগকে দায়ে পড়িয়া এ দেশের শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া নির্ব্বাহ করিতে হইত। সেকালে এ দেশে যে সকল পট্টবস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা বিলাতেও বহুমূল্য বলিয়া পরিচিত থাকায়, ইংরাজ নরনারী তাহাকে হতাদর করিতে পারিতেন না। তদ্ভিন্ন ইংরাজ ব্যবহারোপযোগী অনেক জিনিস এ দেশেও প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সেকালের বাঙ্গালীরা শিল্পকৌশলের জন্য সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ বা ইংরাজ নাবিকগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে

এ দেশের শিল্পজাত দ্রব্য এত অধিকপরিমাণে লইয়া যাইতেন যে, তাহা নিবারণ করিবার জন্য ঘোষণাপত্রের প্রচার করা আবশ্যক হইত।

ইংরেজেরা এ দেশে আসিয়া বাণিজ্যব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেন, এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বিলাসবিভ্রমের পরিচয় দিবার জন্য এ দেশের কৃষ্ণকায় ভৃত্যবর্গকে বিলাতে টানিয়া লইয়া যাইতেন। কিছু দিন পরে তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইয়া পথে পথে বোদন করিয়া বেড়াইত; অর্থাভাবে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না। ইহার গতিরোধ করিবার জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টার নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কেহ কৃষ্ণকায় ভৃত্য সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিলে, কোম্পানীর তহবিলে পাঁচ শত টাকা জমা দিতে হইবে। সেই হইতে হতভাগ্য বাঙ্গালী ভৃত্যবর্গের বিড়ম্বনা দূর হইয়াছিল। বাঙ্গালী ভৃত্য-ভিন্ন ইংরাজদিগের বাটীতে মালয়দেশজ কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসও থাকিত; তাহারা সময়ে সময়ে পলায়ন করায়, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে হইত।

ইংরাজেরা যেখানে পদার্পণ করেন, সেইখানেই ভজনালয় এবং নাট্যশালার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টির প্রতি সেকালের ইংরাজদিগের অধিকতর অনুরাগ ছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। কিন্তু সেকালে কলিকাতায় ভজনালয়ের ন্যায় নাট্যশালারও যে সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, পুরাতন কলিকাতা গেজেটে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাট্যশালায় সাময়িক বৃত্তান্তমূলক নাটক-ভিন্ন সেক্‌স্‌পিয়র-কৃত বিখ্যাত নাটকাদিরও অভিনয় হইত, এবং তদুপলক্ষে কলিকাতার ইংরাজ-মহলে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইত।

পুরাতন কলিকাতা গেজেটে দুই চারিটি মামলা মকদ্দমার সংবাদও দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি মকদ্দমা কিছু কৌতুকাবহ ও তাহার ইতিহাসের সংস্রব আছে। মীর কাসিমকে সিংহাসন দান করিয়া তিনি প্রত্যুপকারস্বরূপ ইংরাজ সদস্যগণকে যে পুরস্কারবিতরণে প্রবৃত্ত হন, কালক্রমে সেই পুরস্কারের অংশনির্ণয় লইয়া ইংরাজদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্ণেল প্রিক্কো, মিঃ পেটি, মেজর বেভান্ এবং আণ্টনি ষ্লোয়ান সাহেবের অ্যাডমিনিস্‌ট্রেটার মিঃ জন মিলার বাদী হইয়া, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে

উক্ত পারিতোষিকের অংশনির্ণয়ার্থ মকদ্দমা উপস্থিত করেন। উভয় পক্ষেই সুযোগ্য কৌন্সলী তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের বিচারে বাদিগণ ডিক্রী প্রাপ্ত হন।

বিজ্ঞাপনস্তম্ভে যে সকল বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইত, তন্মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে। একটি বিজ্ঞাপন এইরূপ,

Thursday, June 15th, 1786. For sale by Moore, Sanders, and Lacey, the Bhagvat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon translated from the original Sanskreet, by Charles Wilkins, price one Gold Mohur.

চার্লস উইলকিন্স নামক জনৈক ইংরেজ ভগবদ্গীতার ইংরাজি অনুবাদ করেন। কোর্ট অব ডিরেক্টারের সভাপতি স্মিথ সাহেব উহা বিলাতে মুদ্রিত করিয়া এক মোহর মূল্যে বিক্রয়ার্থ এ দেশে পাঠাইয়া দেন। গবর্ণর জেনরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনুরোধে কোম্পানীর ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং লভ্যাংশ ও গ্রন্থসত্ব অনুবাদককে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ইংরাজেরা যেমন এক দিকে গীতার অনুবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অন্য দিকে স্তুতি সামান্য কথা লইয়া পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেন, এবং তাহাতে অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেন।

ইংরাজের নামের প্রবল প্রতাপ এত দূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, ইংরাজের নামের দোহাই দিয়া দেশের লোকেও দেশের উপর অত্যাচার করিতে ছাড়িতেন না। ইংরাজদিগের শুভদৃষ্টি লাভ করিয়া কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী নানা উপায়ে ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুযোগ্য বংশধরগণ এখন দেশে গণ্যমান্য ও প্রতাপশালী হইয়াছেন; তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া পূর্ব্বকাহিনীর অনুসরণ করা প্রীতিপ্রদ হইবে না। ইংরাজেরা নিজের বরকন্দাজগণকে কোম্পানীর সিপাহী ও লস্কর সাজাইয়া দেশের লোকের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। তাহা নিবারণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়।

"The Honorable the Governor General and Council having receive information that a practice has gradually crept in amongst the Banians and other richmen of Calcutta, of dressing some of their servants in, or near in, uniform of the Ho'nble Company's Sepoys and Lascars, and that in this dress they became the terror of the common people, and often com-

mit most oppressive acts, for which the Honorable Companys Sepoys and Lascars bear the odium;

Notice is therefore hereby given that the honorable the Governor General and council forbid this practice in future.

By command of the Hon'ble Board.

Fort William. W. Bruere
April 7th, 1786. Secretary.

বাঙ্গালীরা কোম্পানীর সরকারে কেরাণীগিরি প্রাপ্ত হইয়া প্রথম হইতেই কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। কোম্পানীর দেওয়ানী সেরেস্তায় প্রথম প্রথম বাঙ্গালীগণ উচ্চ পদও প্রাপ্ত হইতেন। ইহারা জমিদারী সেরেস্তার প্রচলিত রীত্যনুসারে প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রায় অষ্ট প্রহরই প্রভুর কার্য্য সরবরাহ করিতেন। সুতরাং পার্ব্বোপলক্ষে ছুটির জন্য এখনকার মত এত ধুমধাম ছিল না। ব্রাহ্ম রাইয়ানের অনুরোধক্রমে ১১৯৪ সালের যে ছুটির তালিকা বাহির হয়, তাহা সবিশেষ কৌতুকাবহ;—অনেক বিষয়ে সেকালের হিন্দুসমাজের আচারব্যবহারাদির পরিচায়ক। উক্ত তালিকাটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

পর্ব্বদিন	তারিখ	যত দিন ছুটি
রথযাত্রা	৫ আষাঢ়	১
উল্টা রথযাত্রা	১৩ আষাঢ়	১
রাখি পৌর্ণমাসী	১৪ ভাদ্র	১
জন্মাষ্টমী	২২।২৩ ভাদ্র	২
দুর্গাষ্টমী	৫।৬ আশ্বিন	২
মহালয়া	৭ আশ্বিন	১
পূর্ণোৎসব	৩রা হইতে ৭ই কার্ত্তিক	৫
কালী	২৬।২৭।২৮শে কার্ত্তিক	৩
একাদশী	৮ অগ্রহায়ণ	১
সংক্রান্তি	পৌষের শেষদিন	১
রুক্মী	৩ ফাল্গুন	১
ঐ	২৯।৩০ ঐ	২
দোল	১০ই হইতে ১৪ই চৈত্র	৫
বারুণী	৫ চৈত্র	১
চড়কপূজা	চৈত্রসংক্রান্তি	১
রামনবমী	১৪ বৈশাখ ১১৯৫	১

মোট ২৯ দিন

সে কালের ছুটির তালিকাতে পর্ব্বদিনোপলক্ষে আপিসাদি বন্ধের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, তদনুসারে দুর্গোৎসব, হোলী ও দেওয়ালীরই প্রাধান্য সূচিত হয়। জনশ্রুতিও ইহার অনুমোদন করে। সেকালে কাহারও সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিচয় দিতে হইলে, লোকে বলিত, অমুক "দোল দুর্গোৎসব" করিয়া থাকে। এই তিনটি উৎসবে সামাজিক সৌভাগ্যের পরিচয় প্রকাশিত হইত বলিয়া, লোকের টাকা হইলেই ইহার অনুষ্ঠান করিত, এবং ধনশালী জমীদারগণকে দোলমঞ্চ নামক অত্যুন্নত মন্দিরনির্ম্মাণে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিতে দেখা যাইত। পর্ব্বোপলক্ষে কলিকাতার ধনকুবেরগণ যে সাহেবসেবা করিয়া থাকেন, তাহাও নিতান্ত আধুনিক নহে; সেকালেও দুর্গোৎসবে সাহেব সুবার নিমন্ত্রণ হইত, এবং তাঁহারা দুর্গোৎসবোপলক্ষে হিন্দুগৃহে যে সকল নাচ তামাসা দর্শন করিতেন, তাহার বর্ণনায় বিলাতের বন্ধুজনকে বিস্মিত করিতেন। এই সকল মজলিসে যে সকল বাইজী নৃত্যগীতে কলাবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিত, তাহারা অধিকাংশই মুসলমান রমণী। এক বার মহরম ও দুর্গোৎসব একই সময়ে সমুপস্থিত হওয়ায়, সে বৎসর মুসলমান বাইজীগণ হিন্দুগৃহে প্রতিযোগিতার সম্মুখে মহরমের পুণ্যতিথিতে নৃত্যগীত করিতে অসম্মত হয়; অনেক অর্থপ্রলোভনেও তাহারা স্বধর্ম্মের শাসন লঙ্ঘন করিতে সম্মত হয় নাই। সেবার দুর্গোৎসবে নৃত্যগীত তেমন জমাট বাঁধে নাই। ইংরাজেরা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ রামকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ;—মাতা ও পুত্র।

ইংরাজদিগের বিশ্বাস, মাতার ধর্ম্মজীবনের আদর্শে চরিত্রগঠন করে রামকৃষ্ণ বিষয়বুদ্ধিহীন জড়ভরতে পরিণত হইয়াছিলেন; এবং তাহাতে রাজ্যনাশ সংঘটিত হইয়াছিল! এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, তাঁহারা ঐতিহাসিকতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

রাণী ভবানীর ধর্ম্মজীবন ও রামকৃষ্ণের ধর্ম্মজীবন এক শ্রেণীর হইলেও, একরূপ ছিল না। মাতা আড়ম্বরহীন কর্ত্তব্যপালনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি একদিনের জন্যও রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন

না। পুত্র ধ্যান ধারণা পুরশ্চরণাদি আত্মোন্নতির শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সময়ে সময়ে সংসারে থাকিয়াও শ্মশানবাসী সন্ন্যাসীর ন্যায় সর্ব্বকার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন।

মাতার জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে মনে হয়, তিনি যেন পরের জন্যই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;—পরের জন্য ভাবিতে, পরের জন্য খাটিতে, পরের জন্য প্রাণপণ করিতেই তাঁহার পুণ্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। পুত্রের জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যেন আত্মোন্নতি ও মুক্তিলাভের জন্যই নিরন্তর লালায়িত।

মাতা পুত্রের উভয়ের জীবনেই ধর্ম্মের জন্য ঐকান্তিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত, তথাপি উভয়ের ধর্ম্মজীবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু পার্থক্য থাকিলেও, উভয়ের জীবনেই রাজ্যরক্ষার্থ প্রজাহিতৈষণার অভাব ছিল না।

রামকৃষ্ণ যোগী, বিষয়বিরাগী, আত্মত্যাগী; হিন্দু-সমাজের পূজনীয় মহাপুরুষ। রাণী ভবানী রাজান্তঃপুরবাসিনী, অতুলৈশ্বর্য্যশালিনী রাণী, অথচ নিয়ত পরহিতব্রতধারিণী, কল্যাণরূপিণী, দীনজননী মহাদেবী;—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই তাঁহার কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

রাণী ভবানী যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল; রামকৃষ্ণ যখন রাজসাহীর রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন ভারতবর্ষে এক অশ্রুতপূর্ব্ব নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সে যুগের প্রবলাবর্ত্তে পড়িয়া ভারতবর্ষের লোকের বহুযুগার্জ্জিত শাসনপ্রতিভা ভাসিয়া গিয়াছিল। রামকৃষ্ণ বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী না হইয়া সংসারকীট হইলেও, রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন না।

কিন্তু রামকৃষ্ণ বীরের ন্যায় প্রতিকূল ঘটনাবলীর সহিত প্রাণপণে যুঝিতে ত্রুটি করেন নাই। রাজ্যরক্ষার জন্য, প্রজারক্ষার জন্য, নাটোর গৌরবরক্ষার জন্য, তিনি নবাগত ইংরাজ রাজের সঙ্গে যত কলহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে জড়ভরত বলিয়া পরিচিত করা যায় না। মনে হয়, রাজ্যরক্ষার্থ প্রাণপণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, রামকৃষ্ণ নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী হইয়া পারলৌকিক সদ্গতিকামনায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা রক্ষক, রামকৃষ্ণের পক্ষে তাঁহারাই ভক্ষক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক দিকে তাঁহার অন্নে আজন্মপ্রতিপালিত ভৃত্যবর্গ, অপর দিকে তাঁহার

আশা ভরসা ও আশ্রয়ের আধার কোম্পানীর ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী,—দুই দিক হইতে এই দুই প্রবল শক্তি প্রচণ্ডবিক্রমে মুবলাঘাত করিয়া রামকৃষ্ণের রাজশ্রীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহারাজ রামজীবন ও মহারাণী ভবানীর সময়ে নাটোর রাজবংশের রাজ্যোন্নতি, তাহার ইতিহাসের সহিত মুসলমান নবাব ও নাটোর রাজমন্ত্রী দয়ারাম রায়ের নাম চিরসংযুক্ত; মহারাজ রামকৃষ্ণের সময়ে রাজ্যনাশ,—তাহার ইতিহাসের সঙ্গে কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও নাটোর রাজমন্ত্রী কালীশঙ্করের নাম চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

কালীশঙ্কর দত্ত যশোহর প্রদেশের এক জন দরিদ্র কায়স্থসন্তান, প্রতিভাবলে নাটোরের রাজমন্ত্রী হইয়া উত্তরকালে নড়াল জমীদারবংশের ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজের ইতিহাসে কালীশঙ্কর দস্যু-নামেই পরিচিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ জুন কালীশঙ্কর ও তাঁহার ভ্রাতা নন্দ দত্ত একখানি নৌকা লুঠ করিয়া নাবিকগণকে আহত করেন। যশোহরের কালেক্টার হেস্কেল সাহেব কালীশঙ্করকে ধরিয়া আনিবার জন্য কুড়ি জন পদাতিকের অধীনে এক দল সিপাহী পাঠাইয়াছিলেন। কালীশঙ্কর ১৫০০ লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে হেস্কেলের সিপাহীদলকে পরাজিত করেন। ইংরাজ পক্ষে দুই জন ধৃত ও ১৫ জন আহত হয়। কালক্রমে নন্দ দত্ত ধৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু নাটোর রাজবংশের মন্ত্রিপদে আসীন থাকায়, কালীশঙ্করকে কেহ সহজে ধরিতে পারিল না। কিছু কাল পরে কালীশঙ্কর ধরা পড়িয়াও ধনবলে সহজেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হেস্কেল, রামকৃষ্ণ বা কালীশঙ্কর কাহাকেও শ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি লিখিলেন,—"নাটোরের মহারাজ ভূষণা থানার শাসনকার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন; দস্যুদল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা থানায় প্রবেশ করিয়া আসামী ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিতেছে।" এই ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর হইতে রাজসাহীর জজ ও কালেক্টর নাটোরে শুভাগমন করায়, সেই সময় হইতেই রামকৃষ্ণের সর্ব্বনাশ হইল।

এই সময়ে বৎসর বৎসর নূতন কর ধার্য্য হইত বলিয়া, রাজা কাহারও মঙ্গল হইত না। ক্ষুদ্র সম্পত্তির অধিকারিগণ অল্পদিনেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারাও পতনোন্মুখ হইয়াছিলেন। জনৈক ইংরাজ লেখক বলেন, "এই সময়ে কোম্পানী বাহাদুর যথাসাধ্য

পোষণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া জমীদারদলকে প্রজাপালন বা উন্নতিসাধনের জন্য কিছুমাত্র উৎসাহদান করিতেন না।" * ইহাতে প্রাচীন জমীদারবংশ ক্রমশঃ উৎসন্ন হইতে লাগিল। দোষ কাহার? তৎসম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ লেখক স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজের দোষেই এই সকল সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছিল। †

এইরূপ অদৃষ্টবিড়ম্বনায় নিপতিত হইয়াও রামকৃষ্ণ যেরূপ ভাবে রাজ্য ও রাজসম্মান রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে, তাঁহার অলীক কলঙ্ক আস্থাস্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা ক্রমশঃ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা করিয়া, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

রোগ-শয্যায়।

১

প্রথম ফাল্গুনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাত। বসন্তাগমে নবকিশলয়দলশোভিত তরুরাজির মধ্য দিয়া নদীর তরঙ্গসঙ্গশীতল সমীরণ সোহাগস্পর্শের মত বহিয়া যাইতেছে। খিদিরপুরের পোতাশ্রয়ে একখানা ইংলণ্ডযাত্রী ষ্টীমারে বিদায় লইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

যাহারা আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। জাহাজ হইতে বাষ্পোদ্গীরণের গম্ভীর নিনাদ হইল। অদূরে যে ফিরিঙ্গী বালকটি কূলে বসিয়া মৎস্য ধরিতেছিল, সে কেবল ছিপে টান দিয়াছে; মুহূর্ত্তের জন্য একবার জাহাজের দিকে

* ...nment had, it must be acknowledged, given the Zamindars ...agement to rely on its generosity; it had acted far too much ...ter of landlord determined to get the utmost out of his lands. ...the truth is that the English added to the native system pre-cisely those elements which producted all the evils; namely, watchful-ness to seize any opportunity for new demands and power to enforce the demands they made.

চাহিয়া বালক সদ্যোধৃত মৎস্যটিকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। জাহাজ ছাড়িয়া দিল। তীরে একখানি গাড়ীতে কয়টি বঙ্গরমণী ছিলেন;—তাঁহাদিগের নয়ন হইতে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। মাতা, কন্যা, শ্বশ্রূ, পুত্রবধূ পরস্পরের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পুরুষ অভিভাবকগণ আসিয়া অন্য একখানি গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহাদের গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে এ গাড়ীখানি গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

জাহাজের ডেকে দুইটি বাঙ্গালী যুবক দাঁড়াইয়া ছিল। এক জন গম্ভীর, তাহার স্বভাবতঃ গম্ভীর মুখ আজ দুশ্চিন্তার ছায়াপাতে গম্ভীরতর হইয়াছে; দ্বিতীয় জন হাস্যপ্রফুল্লমুখ, চপল।

জাহাজ কূল ছাড়াইতে না ছাড়াইতে দ্বিতীয় যুবক প্রথম যুবকের পৃষ্ঠে একটি অনতিতীব্র চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এখানে দাঁড়াইয়া কি হইবে! চল, কামরায় যাই।"

দ্বিতীয় যুবক কোনও উত্তর দিল না। তাহার দৃষ্টি সেই গৃহাভিমুখগামী শকটে নিবদ্ধ ছিল। তাহার সমস্ত হৃদয় যেন তাহার দৃষ্টিতে আসিয়া সেই শকটখানির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

প্রথম যুবক বলিল, "ইহার মধ্যেই এত ভাবনা। তুমি কেমন করিয়া তিন বৎসর বিদেশে থাকিবে? আমিও ত বিদেশে যাইতেছি। কই আমার ত কোনরূপ কষ্ট হইতেছে না!"

দ্বিতীয় যুবক গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমার অবস্থায় আর আমার অবস্থায় অনেক প্রভেদ।"

"তুমি যে স্ত্রীলোকের অধিক করিলে! যদি এখনই এত ভাবনা তবে তোমার পক্ষে ইংলণ্ডে না যাওয়াই উচিত ছিল। 'ভাবিতে উচি' প্রতিজ্ঞা বখন। এখন আর ভাবিয়া কি হইবে?"

জাহাজ ততক্ষণে পোতাশ্রয় হইতে বাহির হইতেছিল। সে ফটক পার হইয়া সেই শকটখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

দ্বিতীয় যুবক বলিল, "আমি যে কিছু না ভাবিয়াই বিদেশে এমন কথা তোমাকে কে বলিল! পূর্ব্বে আমার ভাবা উচিত ছি কিন্তু তাই বলিয়া এখন আমাকে ভাবিবার একটু অবসর না দেওয়াই কি তোমার একান্ত উচিত?"

এই উত্তরে বিরক্ত ও অপমানিত হইয়া শ্রীলক ললিতমোহন কামরায়

চলিয়া গেল। ভগিনীপতি সুকুমার সেই ডেকের উপর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

প্রিয়ভূমি কলিকাতার শেষ সীমারেখা ক্রমই অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল, সুকুমারের হৃদয়ে প্রতী লাবণ্যময়ীর ও শিশুপুত্র বিনয়ের স্মৃতি ততই অধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। একটা অব্যক্ত যাতনা তাহার সমস্ত হৃদয় বেদনাচঞ্চল করিয়া তুলিল। যুবক কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিল।

শ্যালক ও ভগিনীপতি ব্যারিষ্টার হইবার আশায় একত্র দেশ ছাড়িয়া সুদূর ইংলণ্ডে যাইতেছিল। শ্যালক ললিতমোহন অবিবাহিত। ভগিনীপতি সুকুমার, পত্নী ও একবৎসরবয়স্ক পুত্র রাখিয়া বিদেশে যাইতেছিল।

সেই ডেকের উপর বসিয়া সুকুমার নানা কথা ভাবিতে লাগিল। তখন তাহার শ্যালক ললিতমোহন স্মোকিং-কামরায় একটা চুরুট ধরাইয়া সুকুমারের রূঢ় ব্যবহারে আহত আত্মসম্মানহানিজনিত মনোবেদনার লাঘব করিতেছিল।

ক্রমে কলিকাতার শেষ সীমারেখাও অদৃশ্য হইয়া গেল। শ্যামশোভাময় তটযুগশালিনী ভাগিরথীর বক্ষে জাহাজ ঘুমোদ্গীর করিতে করিতে চলিতে লাগিল।

২

ইংলণ্ডে যাইয়া নূতন দেশে নূতন সভ্যতা, নূতন সমাজ ও নূতন সঙ্গীর মধ্যে যুবক দুই জনের দিনগুলা যেন অনুকূল পবনে পালের নৌকার মত বহিয়া যাইতে লাগিল। সেই সুদূর প্রবাসে ললিতমোহন যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। সুকুমার বহু চেষ্টা করিয়াও সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনস্রোত হইতে ফিরাইতে পারে নাই। সুকুমার মনে উৎকণ্ঠিত হইত; কিন্তু দূরগৃহে তাহার পিতামাতাকে উৎকণ্ঠিত করিত না,—তাই তাঁহাদের এ কথা কিছু লিখিত না।

এক দিন সুকুমার অধিক তিরস্কার করিলে ললিতমোহন বলিল, "তোমার আমাতে অনেক প্রভেদ। তোমার স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, তাদের সকল কাজ ভাবিয়া করা আবশ্যক। আমার সে সব নাই। আমার পক্ষে একটু আনন্দ-উপভোগের চেষ্টা দোষ অন্যায় নহে।"

সুকুমার বলিত, "স্ত্রী পুত্রের প্রতি তোমার কোনও কর্ত্তব্য নাই সত্য; কিন্তু আপনার সম্বন্ধেও কি তোমার কোনও কর্ত্তব্য নাই!"

প্রণতিমোহন হাসিয়া বলিত, "সব জিনিসেরই দুইটা দিক আছে, জীবনেরও দুইটা দিক আছে। গম্ভীর দিকটা তোমার মত দার্শনিক পেচকের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্তচিত্তে অপর দিকটা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

চুরুট ধরাইয়া ললিতমোহন বেড়াইতে বাহির হইত। ব্যথিতহৃদয় সুকুমার আপনার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিত।

এক এক দিন ললিতমোহন সুকুমারকে দলে টানিতে চেষ্টা করিত। অকৃত-কার্য্য হইয়া সে বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "বিবাহিত লোক যেন জিয়ল মাছ; যে একবার বঁড়শী গিলাইতে পারে, তাহার হাত হইতে আর উদ্ধার পায় না; কিন্তু আর কেহ ধরিতে গেলেই মরিয়া যায়—এমনই পিচ্ছিল; জান ত—'বেঁধেছি লম্বা দড়ায়, ঘুরে-ফিরে সেই খুঁটার গোড়ায়।' তোমাদের বন্ধনরজ্জু যতই দীর্ঘ হউক না কেন, খুঁটাটি ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।"

সুকুমার বলিত, "তোমার মত লোক দেখিয়াই ত সেক্‌স্‌পিয়র লিখিয়াছেন,—

'ত্যজিও না দীর্ঘশ্বাস রমণীরা আর,
চিরদিন প্রবঞ্চক পুরুষনিচয়,
একপদ জলে, স্থলে অন্যপদ তার,
একে কভু স্থির নহে পুরুষ-হৃদয়।'

মধুকর-বৃত্তিটা ভাল নহে।"

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল; তৃতীয় বৎসরও শেষ হইয়া আসিল। শেষ পরীক্ষার সময় সুকুমার পীড়িত হইয়া পড়িল। ললিতমোহন পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইল।

যেদিন ললিতমোহন দেশে যাইবার জন্য যাত্রা করিল, সেদিন তাহার শূন্য কক্ষে একাকী বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিল। অদৃষ্টের উপহাস! সে-ই দেশে ফিরিবার জন্য অধিক ব্যগ্র হইয়াছিল, তাহাকেই বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হইল। এখানে তাহার শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই, শোকে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই, মৃত্যু তৃষ্ণার্ত্ত হইলে মুখে একবিন্দু জল দিবার কেহ নাই। এতদিনে বিনয় কত বড় হইয়াছে, লাবণ্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তাহাদের যেমন রাখিয়া আসিয়াছিল, যাইয়া আর তেমন দেখিতে পাইবে না। বিদায়কালে লাবণ্য-

মর্ম্মীর অশ্রুবিপ্লুত মুখখানি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সুকুমার না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না।

৩

জাহাজে অন্য কোনও কাজ ছিল না; কাজেই ললিতমোহন সময় সময় আপনার কথা ভাবিত। একটু চিন্তা করিয়াই ললিতমোহন বুঝিল যে, বিদেশে সে যে টাকাটা অপব্যয় করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া তাহাকে তাহার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। সে আরও বুঝিল যে, দেশে ফিরিয়া অদৃষ্ট-লক্ষ্মী যত দিন সুপ্রসন্ন না হয়েন, তত দিনও পৈত্রিক অর্থ ধ্বংস করিতে হইবে; সুতরাং পিতার প্রিয় হওয়াটা নিতান্তই আবশ্যক। বোম্বাই বন্দরে আসিয়াই সে "বেটী" "নেলি" প্রভৃতির প্রেমপত্রগুলা সাগরসলিলে নিক্ষেপ করিল; তাহার পর বোম্বাই পৌঁছিয়া হাট কোট ছাড়িয়া ধুতি পরিল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া যখন সে পিতা মাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইল, তখন সকলেই বলিল যে, বিলাতফেরত ছেলের এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। জনকজননীর নিকট ললিতমোহন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।

পিতা সুকুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ললিতমোহন কৃত্রিম ব্যথিত-ভাবে বলিল, "তাহার কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। কুসঙ্গীর দলে পড়িয়া সে একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সৎপথে আনিতে পারি নাই। আমার যে এত অধিক ব্যয় হইত, সে কেবল তাহারই জন্য। সে একটা বিপদে পড়িলে তখন আর রাগ করিয়া থাকিতে পারি না; যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে বিপন্মুক্ত করিতে হইত।"

লাবণ্যময়ী সেখানেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া ললিত-মোহন বলিল, "লাবণ্যের অদৃষ্টে যে কি আছে, বলিতে পারি না। এত করিয়া সুকুমারকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলাম না। পাছে আমার সঙ্গে আসিতে হয়, এই ভয়ে এবার সে পরীক্ষাও দিল না।"

স্ত্রী পুত্র যে কোনও কারণে মিথ্যা কথা কহিতে পারে, পিতার মনে এ বিশ্বাস ছিল না; কাজেই তাঁহারা পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিলেন।

লাবণ্যময়ী ছল ছল নেত্রে আপনার কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। পুত্র বিনয়কুমার তখন হর্ম্ম্যতলে বসিয়া একটা কাঠের ঘোড়া লইয়া খেলা করিতে-

ছিল। ব্যথিতা জননী তাহাকে বক্ষে লইয়া আবেগভরে তাহার মুখচুম্বন করিল; তাহার পর শয্যায় পড়িয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। জননীর অভিনব ভাব দেখিয়া পুত্র খেলা ভুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া লাবণ্যময়ী উঠিয়া বাক্স খুলিয়া স্বামীর পত্রগুলা বাহির করিল। সে এক একখানা করিয়া পত্রগুলা পাঠ করিতে লাগিল, আর তাহার ভাসা চক্ষু হইতে টপ টপ করিয়া পত্রের উপর চোখের জল পড়িতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, এ-সব কি মিথ্যা কথা? ভালবাসা না থাকিলে কি কেহ এমন করিয়া লিখিতে পারে? সে আবার ভাবিল, দাদাই বা মিথ্যা কথা কহিবেন কেন?

লাবণ্যময়ী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে এত দিন যাহাকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছে, আজ সহসা তাহাকে বেদীচ্যুত করিতে পারিল না। কেবল আত্মঘৃণায়, অভিমানে, বেদনায়, সেই কোমল হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সুকুমার স্থির করিয়াছিল, এবার পীড়া হইলেও পরীক্ষা দিতে হইবে। সে পরীক্ষার পাঠ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত ছিল। সময় সময় সে বাটীতে নিয়মমত পত্র লিখিবারও অবকাশ পাইত না। সুকুমারের পত্র আসিতে এই বিলম্বে লাবণ্যময়ীর হৃদয়ে সন্দেহাগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বেদনায় অভিমানে তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। যেখানে আত্মসমর্পণ যত সম্পূর্ণ, সেখানে সামান্য কারণে বেদনাও তত অধিক; সেখানে সামান্য কারণে অভিমানও তত অধিক।

৫

পর বৎসর যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়া, পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, সুকুমার দেশে ফিরিল। কিন্তু সে গৃহে ফিরিলে যে-আদর দেখিতে পাইবে আশা করিয়াছিল, আসিয়া তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। ললিতমোহনের কথা শুনিয়া তাহার পিতা তাহার উপর বিরক্ত ছিলেন; তদ্ভিন্ন তাহার জন্য তিনি যেন অন্য পুত্রদিগের নিকট অপরাধী ছিলেন। তাহার জন্য অধিক অর্থব্যয় হয় বলিয়া, সুকুমারের ভ্রাতারা তাহাকে দেখিলেই অসন্তোষ প্রকাশ করিত। ললিতমোহনের নিকট তাহার কথা শুনিবার পর হইতে, তাহাদের অসন্তোষগুঞ্জন ক্রমে কর্ণবধিরকর উচ্চনিনাদে পরিণত হইয়াছিল।

সুকুমার পিতার নিকট বা ভ্রাতাদিগের নিকট প্রত্যাশিত আদর পাইল না। তখন সে মনে করিল, আর সে যাহাই করুক, তাহাকে পাইয়া লাবণ্যময়ীর আনন্দের আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু হায়, মানুষের সকল আশা পূর্ণ হয় না। সাক্ষাতের সময় লাবণ্যময়ী কুশলজিজ্ঞাসার উত্তরে কুশল-জিজ্ঞাসা ভিন্ন অন্য কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুকুমার বড় আশায় হতাশ হইল। কি অভিমানে যে তাহার প্রেমময়ী পত্নী তাহার সহিত এই দীর্ঘ চারি বৎসরের সুখদুঃখের কথা কহিবার প্রলোভন সংবরণ করিল, কি দুঃখে যে সে তাহাকে প্রেমসম্ভাষণ করিবার ও তাহার প্রেমসম্ভাষণ পাইবার প্রবল বাসনা মনেই রুদ্ধ করিল, কি বেদনায় যে সে স্পর্শলোলুপ সুন্দর-খানিকে সংযত করিল, সুকুমার তাহা বুঝিল না। কাজেই পত্নীর ব্যবহারে সে বড় ব্যথিত হইল।

ইহার পরদিবস সুকুমারের কোনও বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কথায় কথায় তিনি বলিলেন, "ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা কি সুন্দর দেখিলে?" সুকুমার উত্তর করিল, "ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পথের শোভা—কনককেশিনী, নীলনয়না প্রাহুনমণী, আর গৃহের শোভা—বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা গৃহিণী।"

লাবণ্যময়ী পার্শ্বের কক্ষেই ছিল। সুকুমারের কথা শুনিয়া তাহার অশ্রু আর বাধা মানিল না। সে মনে মনে ভাবিল, "যাহারা ইংরাজ-রমণীর মত হয় না, তাহারা জন্মে কেন?"

কয় দিন সুকুমার পত্নীর সহিত নানা কথা পাড়িল, কিন্তু লাবণ্যময়ীর পাষাণী কিছুতেই দূর হইল না। সুকুমার লাবণ্যময়ীর এই পরিবর্ত্তনের জিজ্ঞাসা করিল। লাবণ্যময়ী কারণ বলিতে পারিল না, বলিবে মনে থেকে অভিমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

ভাবিল, তাহার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মত তাহার পত্নীও কি করিতেছে! অথচ সে উপেক্ষিত হইবার কোনও উপযুক্ত পাইল না। সুকুমারের হৃদয়বেদনা ক্রোধে পরিণত হইল।

ক দিন সুকুমার পত্নীকে বলিল, "আসি আসিয়া অবধি যেরূপ থিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আমার সহিত একত্রবাস তোমার পক্ষে কষ্ট-কর হইয়া উঠিয়াছে। আমি তোমার নিকট এরূপ ব্যবহার কখনও প্রত্যাশা করি নাই। আমার উপর যদি তোমার ভালবাসা না থাকে, তবে আমার

সহিত একত্রবাস যন্ত্রণাকর বটে। যদি তাহাই হয়, তবে তুমি বাপের বাড়ীতে গিয়া থাক, আমিও অন্যত্র যাই। তোমার যখন যে ব্যয়ের আবশ্যক হইবে, আমাকে জানাইও, আমি পাঠাইয়া দিব।"

শুনিয়া লাবণ্যময়ী ভাবিল, "তুমি দোষ করিলে, তুমিই আবার আমাকে তিরস্কার করিবে? আমি কি এমনই হেয়!" উচ্ছ্বসিত অভিমানে সে বলিল, "তবে তাহাই হউক।"

পত্নীর কথা শুনিয়া সুকুমারের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। কি বেদনায়, কি যাতনায়, তাহার পত্নী এই কথা বলিল, ঘটনাচক্রের কি আবর্ত্তনে তাহার মুখ দিয়া এমন কঠোর কথা বাহির হইল, সুকুমার তাহা বুঝিবার অবকাশ পাইল না।

পরদিবস একটা গৃহের দুইটা ঘর ভাড়া করিয়া, সুকুমার দ্রব্যাদি লইয়া সেখানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় পুত্র বিনয়কুমার বলিল, "বাবা! আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" সুকুমার তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখচুম্বন তাহার পর তাহাকে নামাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ী চালাইতে বলিল, পাছে কেহ তাহার নয়নে অশ্রু দেখিতে পায়। এই অনাদর উপেক্ষার মধ্যে তাহার বালক পুত্রই কেবল তাহাকে সমস্ত আদর দিয়াছিল। কি স্বাভাবিক আকর্ষণে যে বালক পিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলা অসম্ভব; কিন্তু পিতাকে পাইয়া বালকের আনন্দের আর অবধি ছিল না। সে সমবয়স্কদিগের সহিত খেলা করিবার প্রলোভনেও পিতার নিকট হইতে যাইতে চাহিত না।

সুকুমার চলিয়া গেলে, লাবণ্যময়ী আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ধূলাবলুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিল। তাহার পর উঠিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার দোষ কি?"

৫

সুকুমার একটি গৃহের দুইটিমাত্র কক্ষ ভাড়া লইয়াছিল, তাহাতে শয়ন, উপবেশন, ভোজন, সবই সম্পন্ন হইত। বাড়ীর অবশিষ্ট ৬ জন বিলাতফেরতের দখলে ছিল। প্রথমে দিনকতক অর্থকষ্টে সুকুমার হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল। সুকুমারের প্রতিজ্ঞা ছিল, সে একটা "বড়লোক" হইবে; যাহাতে বিনয় তাহার পুত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে, এমন একটা

কিছু হইবে। সে বুঝিয়াছিল, তাহার মত দরিদ্রের পক্ষে যশোলাভের প্রথম সোপান, আপনার ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ। যেই জন্য সে আপনার ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুকুমার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিল যে, বিনয় সপ্তাহে এক দিন তাহার নিকট যাইবে। রবিবারে বিনয় পিতার নিকটে যাইত। সে দিন সকাল হইতে দ্রব্যাদি গুছান, সাজান প্রভৃতি কার্য্যে সুকুমারের আর অবসর থাকিত না; যেন কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার গৃহ দেখিতে আসিবেন।

বিনয় আসিলে সুকুমারের আনন্দের আর সীমা থাকিত না। অন্য স্বজনগণের প্রতি তাহার স্নেহ ভালবাসা যতই বিদূরিত হইতেছিল, এই বালকের প্রতি তাহার স্নেহ ততই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। এই বালকই তাহার সমগ্র স্নেহরাশি অধিকার করিয়া বসিতেছিল।

৬

সুকুমারকে অধিক দিন দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করিতে হইল না। তাহার এক পিতৃব্য পশ্চিমপ্রদেশে ওকালতি করিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও সন্তান ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের মধ্যে সুকুমারেরই জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা প্রবল দেখিয়া, তিনি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তিনি তাহার সমস্ত সম্পত্তি সুকুমারকে দান করিয়া গেলেন। দারিদ্র্যদুঃখ হইতে সুকুমার সহসা ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্যে উপনীত হইল।

সুকুমার দেখিল, উদরান্নের জন্য তাহাকে আর পরিশ্রম করিতে হইবে না। সে মনে করিল, একটা কোন মহদনুষ্ঠানের জন্যই সে ব্যবসায়ের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইল।

[illegible]র উপবনবেষ্টিত একখানি রম্যগৃহ ও রাশি রাশি পুস্তক ক্রয় [illegible]ন্ত আপনার নূতন গৃহে গিয়া সুকুমার দেখিল, সংসারের জ্বালা [illegible]র; সংসারের বাজার-খরচের হিসাব-পরীক্ষা হইতে বাগানের [illegible]র তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত এমন অনেকগুলা খুঁটিনাটি কাজ [illegible]করিতে বিরক্তি জন্মে, কিন্তু না করিলেও চলে না। এই সকল সে তাহার এক পিতৃস্বসৃপুত্রকে আপনার নিকটে আনিয়া [illegible]ধিল। তিনিই সংসারের সকল কার্য্য দেখিতেন, সুকুমার আপনার অধ্যয়ন ও চিন্তা লইয়া ব্যস্ত থাকিত। অল্পদিনের মধ্যে সুকুমার গৃহস্থাসী হইয়াও সর্ব্বতোভাবে পিতৃস্বসৃপুত্র বিজয়চন্দ্রের অধীন হইয়া পড়িল, আর বিজয়চন্দ্র

কর্ম্মচারী হইয়াও গৃহকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইল। সুকুমারের সকল কার্য্যেই বিজয়চন্দ্র হুকুম চালাইত, এবং সুকুমারও নির্ব্বিবাদে তাহার হুকুম পালন করিত। বিজয়চন্দ্র তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে অধ্যয়ন ও চিন্তা লইয়া ব্যাপৃত থাকিবার অবসর দিয়াছে, সুকুমার তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিত।

যে দিন বিনয় তাহার গৃহে আসিত, সেই দিন কেবল সুকুমার আপনার বিষাদময় গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিত। সে দিন যেন তাহার হৃদয়ে নব উৎসাহ জন্মিয়া উঠিত। সে দিন বালকের সহিত মিশিয়া সে আবার যেন বালক হইত। পিতাপুত্রে কত কথা, কত খেলা হইত। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিনয় জননীর কাছে ফিরিয়া যাইত। শূন্যগৃহের নিস্তব্ধতা তখন সুকুমারের নিকট যেন দ্বিগুণ কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হইত। সুসজ্জিত গৃহের নানা দ্রব্যের মধ্যে বিনয় সে দিন যাহা চাহিত, সুকুমার তখনই তাহাকে তাহা দিত।

এক দিন সুকুমার পুত্রকে গৃহের ছাতে লইয়া গেল। সেখান হইতে কলিকাতার শতসৌধছাদ দেখিয়া বিনয়কুমার কেবল "ওরাড়ীটা কাহার, কোন গির্জ্জা, ও গম্বুজটা কোন্ বাড়ীর" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিল। অদূরে একটা গৃহের ছাদে একঝাঁক গৃহপারাবত দেখিয়া বিনয় বলিল, "আমাকে গোটাকতক পায়রা কিনিয়া দিবে?" সুকুমার বলিল, "কাল আসিয়া দেখিবে, আমি তোমার জন্য পায়রা কিনিয়া রাখিয়াছি। সকাল করিয়া আসিয়া পায়রা লইয়া খেলা করিবে।"

পর দিন সুকুমার আপনি যাইয়া বাছিয়া কতকগুলি সুন্দর পারাবত কিনিয়া আনিল। বিনয়ের জিনিস আর কাহাকেও দিয়া কিনিয়া আনাইলে তাহার তৃপ্তি হইত না।

রবিবারে বিনয়কুমার আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আমার পায়রা আছে?" সুকুমার বলিল, "আনিয়াছি; দেখিবে চল।" পিতাপুত্রে নের এক প্রান্তে অবস্থিত পারাবতগৃহের সম্মুখে যাইয়া উপ নানা প্রকারের পারাবত দেখিয়া বিনয়ের বড় আনন্দ হইল। করতালি দিয়া উঠিল। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করের করতালিশব্দে চমকিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া বিনয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উ

পারাবতগৃহ হইতে ফিরিবার সময় বিনয় দেখিল, গৃহের সম্মুখে রাজ পথে একটি ইংরেজ বালক অশ্ব ছুটাইয়া যাইতেছে। দেখিয়া বিনয় পিতাকে বলিল, "আমার অমনি করিয়া ঘোড়ায় চড়িতে ইচ্ছা করে।" সুকুমার বলিল,

...াড়া কিনিয়া আনিব। তুমি এবার ...
...য় ... মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার মুখে সেই হাসিটুকু দেখিবা... ...কুমার আপনার সর্ব্বস্ব দিতে পারিত।

পরদিবস সুকুমার পুত্রের জন্য একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া আনিল। কিন্তু সেই দিনই তাহার জ্বর হইল। দুই দিন পরে নিউমোনিয়া প্রকাশ পাইল। নিউমোনিয়া-গ্রস্ত রোগীর নিকট অল্পবয়স্কদিগের আসা উচিত নহে জানিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্তে শুক্রবারে সে বিজয়চন্দ্রকে বলিল, "আজ একবার আমার শ্বশুরবাড়ীতে বলিয়া আসিও যে, রবিবারে বিনয় যেন এখানে না আইসে। আমি পীড়িত।"

৭

বিনয়চন্দ্র যখন সুকুমারের শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল, তখন বিজয়কুমার গৃহ-প্রাঙ্গনে আর কয়টি বালকবালিকার সহিত খেলা করিতেছিল। বিজয়চন্দ্রকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ঘোড়া আনা হইয়াছে?" বিজয় বলিল, "হইয়াছে; কিন্তু তুমি এবার আমাদের বাড়ী যাইতে পাইবে না।" আগ্রহভরে বালক বলিল, "কেন?" বিজয় বলিল, "সুকুমারের অসুখ হইয়াছে।" বালকের মুখ গম্ভীর হইল; সে বলিল, "আমি বাবাকে দেখিতে যাইব।"

সুকুমারের শ্বশুর যে কক্ষে বসিয়া কাজ করিতেন, বিজয় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বিনয় সঙ্গে সঙ্গে গেল। বিজয়চন্দ্র সুকুমারের শ্বশুরকে সকল কথা বলিল। বিদায়কালে তিনি বলিলেন, "কাল যেন একটা সংবাদ পাই।" ...চন্দ্র বিদায় লইল। বালক কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না; সে ...হিত যাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। শেষে বিজয়চন্দ্র বলিল, ...মার যাইবার দিন নহে। আমি ত আবার কাল আসিব; তখন ...বে।"

...জয়কে ছাড়িয়া দিল। সে দিন আর খেলা করিতে গেল না।

প্রভাতে সুকুমারের শ্বশুরালয়ে সংবাদ দিতে আসিয়া বিজয় ..., বিনয় তাহার অপেক্ষায় গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। বালকের মুখ গম্ভীর, বিষণ্ণ। বিজয়কে দেখিয়া সে ছুটিয়া রাস্তায় গেল,—জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কেমন আছেন?" কোন উত্তর না দিয়া বিজয় সুকুমারের শ্বশুরের নিকট গেল। বিনয়ও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

সুকুমারের খুড়ত জিজ্ঞাসা করিতে
—রোগীর অবস্থা Worse."

পার্শ্বের কক্ষে বিনয়ের এক মাতুল একটা অ[illegible] বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন; বালক তাঁহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "worse মানে কি?" তিনি বলিলেন, "খারাপ।"

বালক আসিয়া বিজয়চন্দ্রকে ধরিল—সে সুকুমারকে দেখিতে যাইবে। কেহ তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে পারিল না। বালক কাঁদিতে লাগিল।

ছাড়াইবার অন্য উপায় না দেখিয়া বিজয় বলিল, "তোমার মাকে বলিয়া আইস।" সে ভাবিল—জননী পুত্রকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন।

বিনয় ছুটিয়া অন্তঃপুরে জননীর নিকট গেল। সে লাবণ্যময়ীকে বলিল, "মা, আমি বাবাকে দেখিতে যাইব।" লাবণ্যময়ী বলিল, "আজ তোমার সেখানে যাইতে নাই।"

বালক জননীর নিকট হইতে সরিয়া গেল। অভিমানে ও বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইল। সে বলিল, "আমি আর কখনও তোমার কাছে আসিব না, কখনও তোমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিব না। তুমি আমাকে যত ভালবাস, আমি বাবাকে তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি। বাবার মরিবার সময় তুমি আমাকে একবার তাঁহাকে দেখিতে দিবে না; তবে হয় ত আমি মরিবার সময় তুমি আমাকে একবার দেখিতেও আসিবে না।"

একদিন জলধরধারাপাতে যেমন পর্ব্বত-অঙ্কে সুপ্ত নির্ঝরের বারিরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনি পুত্রের এই কথায় লাবণ্যময়ীর রুদ্ধ-বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল,—তাঁহাকে দেখিবার জন্য এই হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে; আর আমি রাক্ষসী তাঁহার পীড়া শুনিয়াও অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারি!

লাবণ্যময়ী আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। সেই অশ্রুজলে তাহার সমস্ত অভিমান, সমস্ত ক্রোধ বিধৌত হইয়া গেল। সে লাবণ্যময়ী পুত্রকে বলিল, "চল, আমিও যাইব।"

বিনয়কুমার ছুটিয়া বহির্বাটীতে গেল। বিজয় তখন কেবল রাজপথ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিনয়কুমার তাহাকে ধরিল, বলিল, "চল; মাও যাইবে।" বিজয় ফিরিয়া আসিল।

সুকুমারের শ্বশুর জানিয়া আসিয়া বিজয়কে চাহিতেছে।"

লাবণ্যময়ী ও বিনয়কুমার সুকুমারকে দেখিতে যা আনন্দে রোগীর পাছে অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কা করিয়া, বিজয় চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে গেল। বিনয় তাহার সঙ্গে গেল;—পলাইয়া যায়।

সকল কথা শুনিয়া চিকিৎসক বিজয়কে বলিলেন, "অপ্রত্যাশিত দুঃখাঘাত পক্ষে যেরূপ অপকার হয়, অপ্রত্যাশিত আনন্দাতিপক্ষে সেরূপ অপকার হয় না; বরং তাহাতে সময় সময় উপকার হইয়া থাকে। যাহা হউক, আপনি কথাপ্রসঙ্গে রোগীকে পূর্ব্বে সকল কথা জানাইয়া তবে তাঁহাকে স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন। কারণ 'সাবধানের বিনাশ নাই।' তাহা হইলে আশঙ্কার আর কোনও কারণ থাকিবে না।"

বিজয়চন্দ্র সুকুমারের শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল। পুত্রকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় বর্ষাধিকাল পরে লাবণ্যময়ী স্বামিসন্দর্শনে চলিল।

৮

লাবণ্যময়ী ও বিনয়কুমারকে কক্ষান্তরে রাখিয়া, বিজয় ভ্রাতার কাছে আসিয়া বসিল। তাহাকে দেখিয়াই সুকুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা শুনিয়া বিনয় কি বলিল?"

বিজয় বলিল, "সে তোমার কাছে আসিবার জন্য ব্যাগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল,—কাঁদিতে লাগিল।"

সুকুমারের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সে বলিল, "ডাক্তার কি বলি- যে, একবার আমার কাছে আসিলেই তাহার অনিষ্ট হইবে? আমি র সময়ও একবার তাহাকে দেখিতে পাইব না? সে ভিন্ন জগতে আমাকে ভালবাসে না। সে ভিন্ন জগতে আমার আর কে আছে? রাখিয়া দেখাইও,—আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব। কিন্তু মরিবার তাহাকে দেখাইও।"

বলিল, "তুমি মরিবার কথা বলিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুকুমার বলিতে লাগিল, "আমার হাত- বাক্সে আমার উইল আছে। আমার সর্ব্বস্ব আমি বিনয়কে দিয়াছি, যাহাতে

সুবন্দোবস্ত হয়, তাহা করিও। আর সে বড় হইয়া আসিয়া বাস করে। এই শূন্য গৃহে আমি আমার যাপন করিয়াছি। বিনয় আসিয়া আমার এই গৃহে বাস শূন্য গৃহে তাহার পুত্রকন্যার কলহাস্য মুখরিত হইবে, ইহাই বনের একটা সুখের স্বপ্ন ছিল। জীবনে অনেক সুখের স্বপ্ন রচনা ছিলাম, একটিও সফল হয় নাই; বোধ করি, এ সুখস্বপ্নও সফল পাইব না।"

বিজয় আবার বলিল, "কেন মরিবার কথা বলিতেছ?"

সুকুমার কোনও উত্তর দিল না।

বিজয় বলিল, "সুকুমার! তোমার স্ত্রী যদি একবার তোমাকে দেখিতে চাহেন, আনিব কি?"

সুকুমার দুঃখের ম্লানহাসি হাসিল। সে বলিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? তিনি জীবনে আমাকে দেখিতে চাহেন নাই; আর আজ আমাকে দেখি আসিবেন; এক বার আসিলে হয় ত ভাল হইত। কেন যে এ মনোমালিন্য হইল, তাহা বুঝিতে পারি নাই। জীবনে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাই নাই, মরণের পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতাম। জানিতে পারিলে হৃদয়ের একটা ভার নামিয়া যাইত। সে যাহাই হউক, বিনয়ের বিষয়ে যাহা বলিলাম, ভুলিও না।"

এই সময় রুদ্ধদ্বার হইতে কে ডাকিল, "বাবা!"

সুকুমারের ম্লান পাণ্ডুর মুখে আনন্দে রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বিনয় আসিয়াছে?"

বিজয়চন্দ্র বলিল, "তোমার স্ত্রী বিনয়কে লইয়া আসিয়াছেন।"

সুকুমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

"তোমার স্ত্রী একবার তোমার নিকটে আসুন" বলিয়া, বিজ গেল।

লাবণ্যময়ীর পিত্রালয়ের দাসীকে দিয়া তাহার নিকট সংব বিজয় বিনয়কুমারকে তাহার ঘোড়া দেখাইতে লইয়া গেল।

৯

ধীরে ধীরে আসিয়া লাবণ্যময়ী স্বামীর শিয়রের কাছে বসিল।

সুকুমার বলিল, "আজ আমার মৃত্যুকালে তুমি যে অনাদর উপেক্ষা

ত্যাগ করিয়া একবার আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, ইহাই আমার সৌভাগ্য। আমি মরিলে বিনয়ের সকল ভার তোমার, তোমাকেই তাহার পিতামাতা উভয়ের কার্য্য করিতে হইবে।"

সুকুমার শুনিতে পাইল, কে তাহার শিয়রে বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। সে বলিল, "একবার সরিয়া আসিয়া পাশে বসিবে? অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, হয় ত আর দেখিতে পাইব না।"

লাবণ্যময়ী আসিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিল। তাহার অশ্রু আর বাধা মানিল না, দুই গণ্ড বহিয়া ঝরিতে লাগিল।

সুকুমার বলিল, "কেন যে তুমি আমার সহিত এমন ব্যবহার করিলে, জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার কারণ জানিতে পারি নাই। যদি কখনও কোনও দোষ করিয়া থাকি, সে জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি, ক্ষমা করিও।"

লাবণ্যময়ী আর থাকিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমিই অপরাধ করিয়াছি। তুমি আমাকে ভুলিয়াছিলে; কিন্তু আমি ত মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে ভুলিতে পারি নাই! তুমি আমার সর্ব্বস্ব—আমি কেন তোমার উপর রাগ করিয়াছিলাম? তুমি যাহাই কর, তুমি আমার স্বামী—ইহকালে পরকালে সর্ব্বস্ব। তুচ্ছ অভিমানে কেন এত দিন আসিয়া তোমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে পারি নাই? আমি গর্ব্বে অন্ধ হইয়া অভিমানকে প্রেমের অপেক্ষা অধিক যত্ন করিয়াছি। আজ আমি আমার ভুল বুঝিয়াছি। আমাকে ক্ষমা কর।"

লাবণ্যময়ীর কথা সুকুমারের নিকট প্রহেলিকার মত বোধ হইতে লাগিল। বলিল, "তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি কবে ক ভুলিয়াছিলাম?"

ময়ী বলিল, "দাদা আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিনাতে গিয়া তুমি লিয়াছিলে। তুমি যদি আর কাহাকেও ভালবাসিয়া থাক, তবু স্বামী—আমি কেন তোমার উপর রাগ করিলাম?"

যেন সহসা জাগরিত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। লাবণ্যময়ীর কথা রোগশয্যায় শয়ান সুকুমার চঞ্চল হইয়া উঠিল, উত্তেজিতস্বরে সে বলিল, ললিত এই কথা বলিয়াছে! যাহার জন্য সেই সুদূরপ্রবাসে আমাকে লজ্জিত হইতে হইয়াছে, যে অর্থে আমার ব্যয়সঙ্কুলন হইত,—পাপের অপব্যয় হেতু তাহার দ্বিগুণ অর্থেও যাহার ব্যয়সঙ্কুলন হইত না,—যাহার অবৈধপ্রেমের

সাক্ষ্য অনেকগুলা পত্র এখনও আমার কাছে আছে, সেই আমার বিরুদ্ধে এই কথা বলিয়াছে। আপনার দোষ কাটাইবার জন্য মানুষ অপরের নামে এমন অপবাদও দিতে পারে! মানুষ এত নীচও হইতে পারে? আর দূরে থাকিলে নিতান্ত আপনার জনও মানুষকে এমন ভুল বুঝে!"

লাবণ্যময়ীর মুখ প্রফুল্ল হইল। তপনোদয়ে তুচ্ছ কুজ্ঝটিকা যেমন অপসৃত হইয়া যায়, আজ এই কথায় স্বামীস্ত্রীর মনোমালিন্য তেমনই দূর হইয়া গেল। সুকুমার বুঝিল, লাবণ্যময়ীর দোষ নাই, দোষী ললিতমোহন। লাবণ্যময়ী বুঝিল, সুকুমার দোষী নহে, দোষী ললিতমোহন।

তাহার পর লাবণ্যময়ীর মুখ আবার গম্ভীর হইল।

আপনার হাতে পত্নীর হাতখানি লইয়া সুকুমার পূর্ব্বের মত করিয়া বলিল, "লাবণ্য! কি ভাবিতেছ?"

এত দিন পরে স্বামীর আদরে, স্বামীর সোহাগে, লাবণ্য এবার আনন্দের কান্না কাঁদিল। সে বলিল, "ভাবিতেছি, এত দিন তোমাকে কেন এ কথা বলি নাই? কেন এ সন্দেহ, এ অভিমান, এ বেদনা লইয়া কষ্ট পাইয়াছি?" এই বলিয়া উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে লাবণ্য আবেগময় চুম্বনে রোগশয্যাশায়ী সুকুমারের পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া দিল।

* * * *

এই অপ্রত্যাশিত আনন্দ সুকুমারের পক্ষে ঔষধের অপেক্ষা অধিক উপকারী হইল। সুকুমার শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল। এই আনন্দের সুখস্মৃতি তাহার রোগশয্যার যাতনা-স্মৃতিকেও সুখময় করিয়া রাখিল।

বকুল।

হেরি অনাদৃত তোরে এ বিজন বনে,
বকুল, আকুল প্রাণ কাঁদে রে কিসলে।
যতনে কুড়ায়ে তোরে তুলাইতে গলে
আসে না শিশুর দল, উষার কিরণে
ফিরে না বালিকা সব চপল চরণে
চিকণ মালিকাখানি পরিতে কুন্তলে,
ভরিয়া সুসাজিখানি সিক্ত পূতজলে
পূজারী লয় না গৃহে ইষ্টে
প্রবীণ-বয়স মোর, শঙ্কিত
সদা করি, বৃথা সাধিয়া
অতি বৃদ্ধ বিজ্ঞতার বৃথা অ
মনের বাসনা মনে নিবাবি আপন।
হায়! বাঞ্ছা জাগে তবু, সর্ব্ব বিনিময়ে
পেতাম যদ্যপি সেই শৈশব-জীবন!

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং।

অল্প দিনের মধ্যে ইংরাজপাঠকসমাজে অসাধারণ প্রশংসালাভের সৌভাগ্য রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিংএর যেমন হইয়াছে, তেমন অতি অল্প লোকেরই হয়। তাঁহার কবিতার, ছোট গল্পের, গানের ও উপন্যাসের প্রশংসার আতিশয্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। লাহোরের একখানা সংবাদপত্রের যুবক সহকারী সম্পাদক যে অল্প দিনের মধ্যেই ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এত সুখ্যাতিলাভ করিতে পারিবেন, তাহা বোধ করি, কেহ কল্পনাও করেন নাই। তাঁহার এই অসাধারণ প্রশংসার কারণ আমরা ক্রমে অনুসন্ধান করিব।

লাহোরে অবস্থানকালে কিপ্‌লিং যে সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, তৎকালে মিষ্টার রবিন্‌সন্ সেই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে "ম্যাকলুরস্ ম্যাগাজিন" পত্রে মিষ্টার রবিন্‌সন যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিপ্‌লিংএর প্রথম রচনার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

দশ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, লেখকের সহিত কিপ্‌লিং যখন প্রথম পরিচিত হয়েন, তখন তাঁহার মুখ বালোচিত কোমলশ্যামবর্ণপূর্ণ, কিন্তু অধিক দিন টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিতে বসিতে প্রাপ্তবয়স্কগণ যেমন একটু কোমকুঁজো হইয়া পড়েন, কিপ্‌লিং তখনই সেইরূপ একটু সামান্য কুব্জ ছিলেন। তিনি চশমা ব্যবহার করিতেন। তখন তাঁহার সকল কার্য্যেই বিশেষ ব্যস্ততা লক্ষিত হইত। তাঁহার নবম কথাবার্ত্তায় সকলে সন্তুষ্ট হইত।

১০ বৎসর পূর্ব্বে।

কিপ্‌লিংএর একটা রোগ ছিল। গ্রীষ্মকালে তিনি একটা সাদা পেণ্টুলেন ও ঢলা শ্বেত পরিধেয় আফিসে কার্য্য করিতেন; দিবসের কার্য্যের পর যখন তিনি বাটী যাইতেন, তখন তাঁহার পরিধেয় বসন বহু মসীচিহ্নে বিভূষিত হইত। কিপ্‌লিং আপিসে যত অধিক দূর পর্য্যন্ত ডুবাইতেন, আবার তাঁহার সকল কালেই ব্যস্ততা ছিল বলিয়া তত অধিক কালি ছিটাইয়া পড়িত। কিপ্‌লিং কোনও কার্য্যের অনুরোধে সম্পাদক করিলেই, সম্পাদক তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিতেন; কারণ তিনি জানিতেন, কলমে কালি ভরিয়া এক কলম পূর্ণ করিয়া কালি আনিয়াছেন, তিনি কাছে আসিয়া অন্যমনস্কভাবে টেবিলে কাপড় রাখিলে, বা কোনও কাজ করিলেই, কালি ছিটকাইয়া সম্পাদকের গায়ে লাগিবে।

রচনার উপাদান সংগ্রহ করিতে কিপ্‌লিং কখনও শ্রম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার City of Dreadful Night কল্পিত চিত্রমাত্র নহে। উক্ত রচনার উপাদান সংগ্রহ

করিবার জন্য, গ্রীষ্মকালের ক্লেশদায়ী নিশীথে কিপ্‌লিং স্বয়ং লাহোরের দুর্গন্ধপূর্ণ গলিতে গলিতে গুলির আড্ডায় ও পাপের গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার City of Two Creeds ও তাঁহার কল্পিত চিত্র নহে। ভাষায় চিত্রাঙ্কনীপ্রতিভা

রচনা। কিপ্‌লিংএর প্রথম হইতেই ছিল; তিনি ভাহার বিকাশের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবাসীদিগের ভিন্ন ভিন্ন জাতি সম্বন্ধে কিপ্‌লিং সকল বিষয় অবগত আছেন। কিপ্‌লিংএর কবিতা আপনি আসিত। লাহোরের সাধারণ উদ্যানে ব্যাণ্ড বাদ্য শুনিয়া তাঁহার কবিতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। একবার একটা সুর মাথায় ঢুকিলে, সে সুরের উপযোগী কথার জন্য কিপ্‌লিংকে ভাবিতে হইত না, কথা আপনি আসিত।

ভারতবর্ষে ইংরাজ সমাজে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনীষাসম্পন্ন মহিলার অভাব নাই। মহিলাসমাজে কিপ্‌লিং বিশেষ আদৃত ছিলেন। কাজেই তাঁহার উপর মহিলাদিগের প্রভাবও অল্প ছিল না। সিমলা শৈলে কোনও সেনাধ্যক্ষের পত্নী এখনও গর্ব্ব করিয়া

মহিলার প্রভাব। বলিয়া থাকেন যে, কিপ্‌লিং তাঁহার প্রথম পুস্তকের উৎসর্গপত্রে যে লিখিয়াছেন, To the Wittiest woman in India, সে তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া। কিন্তু লোকে বলে, কিপ্‌লিং আপনার জননীকেই পুস্তক উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিপ্‌লিংএর আর এক জন বান্ধবী এখন মৃতা, তিনি কোনও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান উপন্যাস ও কবিতা লেখকের পত্নী ছিলেন। কিপ্‌লিং ছাপাইবার পূর্ব্বে কোনও কোনও রচনা তাঁহাকে দেখাইতেন বলিয়া তিনি গর্ব্ব করিতেন। মহিলাচরিত্রে কিপ্‌লিংএর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এই সংমহিলার সহিত পরিচয়ের ফল।

কিপ্‌লিংএর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইলে, প্রবন্ধলেখক তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠকসমাজে পরিচিত করিবার ইচ্ছা করেন। তিনি Departmental Ditties পুস্তকের আট

কবিতা-প্রকাশ। খানি ইংলণ্ডের প্রধান-প্রধান পত্রে সমালোচনার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সমালোচনা হয় নাই। বোধ হয়, ইহার কারণ এই যে, কোনও বিজ্ঞাপনদাতা প্রকাশক সে গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রেরণ করেন নাই।

এই প্রথম পুস্তক সম্বন্ধে কিপ্‌লিং স্বয়ং My First Book নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, লাহোরে সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত থাকিবার সময় তিনি কবিতা লিখিতেন, এবং সংবাদপত্রেই প্রকাশ করিতেন। সংবাদপত্রে প্রবন্ধের অসংকুলান হইলে, তাঁহার নিকট কবিতা চাহিতে আসিয়া প্রেসের বলিত, "এক আউন্স চিন্স।" অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইবার পর, সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য অনেকে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন শুনিয়াছিলেন, তাঁহার কোনও কোনও কবিতা সৈনিকদিগের এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, তাহারা সেগুলি গান করে। তিনি জানিতেন, প্রেসের লোকদিগকে কিছু আফিসের খাবার পর তাঁহার পুস্তক ছাপিয়া দিবে; শেষে তাহাই হইল। পৃষ্ঠায় ছাপা, ব্রাউন কাগজে বাঁধা, লাল ফিতা বাঁধা পুস্তক প্রকাশিত হইল। লেখক, আপনি প্রকাশক। রিপ্পাই পোষ্টকার্ডের এক দিকে পুস্তকের দিকে পুস্তক পাঠাইবার আদেশপত্র ছাপাইয়া, সেগুলি পাঠান হইল। সর্ব্বত্র, এমন কি, এডেন হইতে সিঙ্গাপুর, কোয়েটা হইতে কলম্বো, সর্ব্বত্র হইল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংস্করণ বিক্রীত হইয়া গেল; দ্বিতীয় সংস্করণের একটা কালে এক জন প্রকাশক স্থির করা হইল। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানি কিছু পরিবর্দ্ধিতও হইল। তাহার পর প্রতি সংস্করণেই গ্রন্থখানি পরিবর্দ্ধিত হইয়া শেষে লণ্ডনে টাকাল বাঁধাই

হইয়া প্রকাশিত হইল। কিন্তু সেই ব্রাউন কাগজে বাঁধা প্রথম অবস্থার পুস্তকখানিকেই গ্রন্থকার অধিক ভালবাসিতেন।

ইহাই কিপ্‌লিংএর প্রথম পুস্তক প্রকাশের বিবরণ। ইহার পর গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার অর্থ ও যশ কিছুরই অভাব হয় নাই। কিপ্‌লিং তাঁহার এক একটা দীর্ঘ গল্পে প্রতি কথার আমার আমারও অধিক হিসাবে মূল্য পাইয়াছেন। কিন্তু এ দেশে সে-কথা বলিয়া আর সাহিত্যসেবী পাঠককে কষ্ট দিব না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কিপ্‌লিংএর কবিতায় উপন্যাসের গল্পের অভাব নাই। অল্প দিন হইল, প্যাটনামা আমেরিকান উপন্যাসিক হাওয়েল্‌স্ কোনও আমেরিকান পত্রে কিপ্‌লিংকে

The laureate of that larger England whose wreath it is not for any prime minister to bestow.

বলিয়াছেন। পূর্ব্বে কিপ্‌লিং ভারতবর্ষীয় সৈনিকদিগকেই প্রায় সঙ্গীতের বিষয়ীভূত করিতেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে "পিক্ মি-আপ্" পত্রে কতকগুলি হাস্যোদ্দীপক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। য়ুরোপের অনেকগুলি বিখ্যাত লোকের প্রতিকৃতিতে যিনি যে-বিষয় লইয়া অধিক ব্যস্ত, তাঁহার মস্তিষ্কে সেই বিষয়েরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাতে কিপ্‌লিংএর মস্তিষ্কে এক-জন ভারতবর্ষীয় সৈনিকের চিত্র প্রদত্ত হয়। নিম্নে সেই চিত্রখানি সন্নিবিষ্ট করিলাম।

কিপ্‌লিং এখন নানা বিষয়ের কবিতা লিখিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহার কবিতায় সেই অশিক্ষিত-সৈনিক-সুলভ গাম্ভীর্য্য-হীনতা আজও যায় নাই। ইংরাজী পাঠক-সমাজে কবি-কিপ্‌লিংএর অসম্ভব আদরের একটা প্রধান কারণ, ইংরাজের জাতীয় সুখ-দুঃখ, আশা অভিলাষ, এমন কি, জাতীয় দুর্ব্বলতার সহিতও তাঁহার সহানুভূতি। ম্যাথু আর্ণল্ড যাহাকে Spirit of insularity and contempt for foreign ideals বলেন, তাহা ইংরাজ চরিত্রে যেমন প্রবল, তেমন আর কুত্রাপি নহে। তাই ইংরাজ এত দিন আমাদিগকে শাসন করিয়া আজও আমাদের সহিত মিশিতে পারে না, আজও আমাদের চিনিতে পারে না। সম্প্রতি পুনার ব্যাপারে ও সিডিশন আইনে তাহার প্রভূত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহা ইংরাজের ই দুর্ব্বলতাকে ইংরাজ গর্ব্ব বলিয়া মনে করে। আপনার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণ গর্ব্বের ধন। কিপ্‌লিংও সেটাকে এই ভাবেই দেখিয়াছেন। প্রবাসী কে তিনি লিখিয়াছেন ;—

কবে বটে বাস তাবা দেশ দেশান্তর ;
হৃদয় তাদের কিন্তু রহে এক স্থানে ;
জননীর মুখে শুনি—শিশুর অন্তর
সুদূর ইংলণ্ড তার দেশ বলি জানে

হৃদয়ের শোণিত দিয়া ইংরাজ জলযুদ্ধে যশ কিনিয়াছে। তাই সে যশ তাহার প্রাণের অধিক প্রিয়। ইংরাজ আজও এই বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে যে, জলযুদ্ধে তাহার সমান বল আর কাহারও নাই। কিরূপ দুর্ম্মূল্যে ইংরাজ এই যশ ক্রয় করিয়াছে, সে কথায় কিপ্‌লিং লিখিয়াছেন;—

সিন্ধুর আহার মোরা যোগায়েছি সহস্র বৎসর;
এখনও সে ডাকিতেছে, আজও তার ভৈরবী উদর।
একটি তরঙ্গ কোথা নাহি উঠে অর্ণব জীবনে—
যেথায় ইংরাজ বীর না শুয়েছে মরণ-শয়নে।

শত শত বীর দেহ সাগরে দিয়াছি উপহার,
হয়েছে তা হাঙ্গরের, জলচর পক্ষীর আহার,
দেহের শোণিত যদি বীরত্বের মূল্য হয়, তবে,
বীরত্বের পূর্ণ মূল্য ঢালিয়াছি আমরা অর্ণবে।

জাতীয় সুখ দুঃখ, আশা অভিলাষ, এমন কি, দুর্ব্বলতার সহিত এই সহানুভূতির জন্যই, গভীর গীতোপযোগী গভীরোদাত্ত সুর না থাকিলেও, কিপ্‌লিংএর কবিতা ইংরাজ পাঠক-সমাজে এমন অসাধারণ আদর পাইয়াছে।

কিপ্‌লিংএর ছোট গল্পেরও যথেষ্ট প্রশংসা হইয়াছে। আমাদিগের সাহিত্যে ছোট গল্প বড় অধিক দিন প্রচলিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়টি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আবার দুইটিকে বর্দ্ধিত করিয়া উপন্যাসে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছোট গল্প দুইটি তাঁহার উপন্যাসের পার্শ্বে নিতান্ত ম্লান। মাসিকপত্রে মাসে মাসে ছোট গল্প দিবার চেষ্টা প্রথম "সাহিত্য" হইতে আরম্ভ। সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মূল্য আমরা এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

ছোট গল্প কি?

কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোট গল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনা বর্ণনার চেষ্টা করে। একখানা উপন্যাসে হয় ত সে ক্ষুদ্র ঘটনাটি কয়েক ছত্র মাত্র অধিকার করিতে পারে; ছোট গল্পে তাহাই পাঁচ সাত পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া বসে। চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে "বুল্‌স্ আই" লণ্ঠনের আলোক যেমন এক স্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটিনাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, গল্পরচনার কৌশল তেমনই জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া, সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে। সেই চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারে সেই একটা স্থান স্বাভাবিক নাস্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহাই সে লণ্ঠনের আলোকের কৃ বিচিত্র সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, উত্থান পতন, সংঘাতময় জীবনে একটা ছোট প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সেই রচনাকৌশলের কার্য্য। এই হিসাবে দেখিতে গেলে, প্রকৃত ছোট গল্প

ছোট গল্পের আদর্শ।

সাহিত্যে পাওয়া যাইবে—ইংরেজী সাহিত্যে না। প্রকৃত শিল্প; ইংরাজী গল্প শিল্পচাতুর্য্যবিহীন। ইংরাজী গল্প লেখকদিগের মধ্যে কেবল টমাস হার্ডি প্রভৃতি দুই চারি জন ছোট রচনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বহুদোষ সত্ত্বেও কিপ্‌লিংএর ছোট গল্পগুলি প্রকৃত শিল্পকার্য্য।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে "ব্ল্যাকউড্‌স ম্যাগাজিন' পত্রে কোনও লেখক কিপ্‌লিংএর ছোট গল্পের

প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কিপ্‌লিংকে Star of India-ভূষিত করা উচিত। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মহারাণী যদি ভারত সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে কিপ্‌লিংএর পুস্তক কয়খানি পাঠ করিলে, তাঁহাকে আর কোনও পুস্তক পাঠ করিতে হইবে না। সেগুলি একত্র করিলে একখানা বড় উপন্যাসের সমান হইবে কি না সন্দেহ; কিন্তু তাহাতেই ভারতসাম্রাজ্যসম্বন্ধীয় সকল তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

ছোটগল্পে কিপ্‌লিং।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কোনও ফরাসী পত্রে কিপ্‌লিংএর পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া মঁসো বেটজন বলিয়াছেন যে, কেবল দুই তিন বৎসর হইতে লোকে কিপ্‌লিংএর নাম শুনিতেছে। কিন্তু ব্রেট হার্টের উজ্জ্বল রচনায় কালিফর্ণিয়ার প্রতি ফরাসী সমালোচক।

পাঠকের মনোযোগ যেমন আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিপ্‌লিংএর রচনায় তেমনই ভারতবর্ষের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে। ব্রেট হার্ট ও কিপ্‌লিং, উভয়েই আপন আপন বর্ণিত বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত। সুদূরদর্শী স্তাবকগণ যুবক কিপ্‌লিংকে ডিকেন্সের সহিত একাসনে বসাইতে চাহে! সেটা বড় ভুল। ডিকেন্স আপনার সৃষ্ট চরিত্রে আপনার আন্তিত্ব নিমজ্জিত করিতেন; কিপ্‌লিং তাঁহার পুস্তকে বর্ণিত চরিত্রগুলির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহার অহংত্ব অত্যন্ত অধিক। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কিপ্‌লিংএর ক্ষমতার অভাব নাই।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে "কটনাইট্‌লি রিভিউ" পত্রে মিষ্টার ফ্রাঙ্কিস্ অ্যাডাম্‌স্ একটি সারগর্ভ প্রবন্ধে কিপ্‌লিংএর পুস্তক সমালোচনা করেন। কিপ্‌লিংএর প্রশংসা করিয়া লেখক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, রচনার বিষয়ীভূত ভারতবাসীদিগের সহিত ইংরাজ সমালোচক।

কিপ্‌লিংএর সহানুভূতির লেশমাত্র নাই। যেন ইংরাজ কর্ত্তৃক বিজিত ও শাসিত হইবার জন্যই তাহাদিগের জন্ম। কিপ্‌লিং যেখানেই পারিয়াছেন, সেখানেই কুলো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মত ভারতবাসীদিগের নিন্দা করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন, তাঁহার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার মত মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ থাকিলে, এক কিপ্‌লিংএর পুস্তক পাঠ করিলেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জীবনের সকল কথা জানা যাইত। লেখক আরও বলেন, কিপ্‌লিং আজকালকার ইংরাজী গদ্য ভিন্ন আর বড় কিছু জানেন না; কাজেই কণ্টিনেণ্ট্যাল লেখকদিগের শিল্পকৌশল তাঁহার নিকট অজ্ঞাত রহস্যমাত্র। সমালোচকের কিপ্‌লিংএর চরিত্ররচনার ক্ষমতাও অল্প। তাঁহার Soldiers Three পুস্তকে চরিত্রগুলি পুত্তলিকামাত্র। আজকাল লোকে লেখক ও শিল্পীদিগের চরিত্রচিত্রাঙ্কণী বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। এমন চরিত্ররচনাক্ষমতার অভাব প্রশংসার কিপ্‌লিং এখনও ভরুণবয়স্ক; কিন্তু তাঁহার পর পর প্রকাশিত পুস্তকে রচনা-কৌশল লক্ষিত হয় না; ইহা আদৌ আশাপ্রদ নহে।

পূর্ব্বে "এডিনবরা রিভিউ" পত্রে কোনও সমালোচক কিপ্‌লিংএর রচনার রিভিউ ও সমালোচনা।

বিষয়ে লিখিয়াছিলেন। সমালোচক কিপ্‌লিংএর পর্য্যবেক্ষণশক্তির ও বর্ণনাচাতুরীর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কিপ্‌লিং যাহা দেখেন, তাহারই প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে পারেন। কি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজ, কি ভারতবর্ষীয় সমাজ, কি সৈনিক, কি নাবিক, কি কোনও পশু, কিপ্‌লিংএর বর্ণনায় সবই যেন চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। পর্য্যবেক্ষণ-কৌশল ও বর্ণনাশক্তির হিসাবে তাঁহার রচনার তুলনা নাই বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কেবল এই দুই গুণ থাকিলেই সাহিত্যসেবকের ভাগ্যে স্থায়িযশোলাভ ঘটে

না। এখন পাঠকসমাজে কিপ্‌লিংএর রচনার প্রচুর আদর; কিন্তু সে সকল রচনায় কোনও সার্ব্বজনীন, চিরস্থায়ী বিষয় আলোচিত হয় না। সে সকল রচনার আলোচ্য বিষয় নিতান্তই বর্ত্তমান সময়ের; নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর। সাহিত্য হিসাবে কিপ্‌লিংএর রচনার মূল্য অল্প। তদ্ব্যতীত কিপ্‌লিংএর রচনায় প্রচলিত কথা, এমন কি, সমাজের নিম্নস্তরের প্রচলিত ভাষা, অর্থাৎ Slang যথেচ্ছপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে পুস্তকে এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়, সে পুস্তক অধিকদিন টিকিবে কি না সন্দেহ। আমরা আজকাল এতই বাস্তবপ্রিয় বা বাস্তবপাগল হইয়া উঠিয়াছি যে, এইরূপ ভাষারও প্রশংসা করি। কিপ্‌লিংএর রচনায় কেবল বর্ত্তমান সময়ের দুই চারিটা ব্যাপার আলোচিত হয়। তাঁহার Plain Tales from the Hills প্রভৃতি এখন যতই আদৃত হউক না কেন, সে আদর ক্ষণস্থায়ী, কিছুদিন পরে লোকে আর সে সকল পুস্তক পাঠ করিবে না। কারণ, সে সকল পুস্তকে মানবচরিত্রের কোনও চিরস্থায়ী অংশ চিত্রিত হয় নাই,—তাহাতে সমাজের খেয়ালী ও ক্ষুদ্র চিত্রিত হইয়াছে মাত্র। কিপ্‌লিং ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনার বিষয় চিরদিন লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে না; সাহিত্য হিসাবে তাঁহার রচনার মূল্য অল্প, তিনি আজকাল একটু যশ পাইবার আশায় সুদূর ভবিষ্যতে দীর্ঘকালস্থায়ী যশোলাভের আশাও ত্যাগ করিয়াছেন।

সমাজনীতি।

কাবুলে সামাজিক জীবন।

প্রসিদ্ধা চিকিৎসক কুমারী হ্যামিল্টন বহু দিন কাবুলে বাস করিয়াছেন। তিনি "মেডিক্যাল পিকটোরিয়াল" পত্রে কাবুল সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে সকল হইতে কাবুলের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারা যায়। সেই সকল প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া আমরা পাঠকদিগকে কাবুলের সামাজিক জীবনের চিত্র প্রদান করিবার চেষ্টা করিব।

যেরূপ দাসপ্রথার উচ্ছেদ করিবার জন্য ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল, কাবুলের প্রচলিত দাসপ্রথা সেরূপ নহে। কাবুলে ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীদিগের অবস্থা শোচনীয় নহে। সেখানে ধনীর গৃহিণীগণ প্রায়ই অলস; কাজেই দাসীরাই গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা। এক জন ক্রীতদাসীর উপর গৃহস্থালীর সকল ভার থাকে। তাহার বেশের বাহার দেখিলে কেহ আর তাহাকে দাসী বলিয়া মনে করিতে পারে না। গৃহিণীর খাস-চাকরাণীও ক্রীতদাসী। সে প্রভুর ও প্রভুপত্নীর বেশভূষার ভারপ্রাপ্ত। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, কাবুলে দাসী গৃহকর্ত্তার বেশ গুছাইয়া দেয়, স্বামীর বেশভূষায় সাহায্য করে, নমাজের পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে ও পদে জল ঢালিয়া দেয়, তাঁহার নমাজের আসন পাতিয়া দেওয়া প্রভৃতি, স্বামিসোহাগিনী পত্নীর কাজ।

ক্রীত দাসী।

গ্রন্থকর্ত্রী প্রথমেই বলিয়াছেন যে, প্রতীচ্য দেশবাসিগণ প্রাচ্যদেশবাসীদিগকে ঠিক বুঝিতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। লেখিকার কোন বুদ্ধিমতী দাসী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিত। সে বহুদিন তাঁহার নিকট থাকায় তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্তাও হইয়াছিল। তাহার মনোভাব বুঝিবার জন্য একদা লেখিকা তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা মিনোরিয়া, তোমার আগা যদি আবার বিবাহ করেন, তবে তুমি কি করবে?"

সে বলিল, "কি আবার করিব? এখনও যাহা করি, তখনও তাহাই করিব।"

"তখন তাহার এ সকল কার্য্য তাহার পত্নী করিবে, তুমি আর করিতে পাইবে না।"

"তাহাও হইতে পারে।"

তোমার কি তাহা ভাল লাগে?"

'তাহাতে আর কি বিশেষ হয়?"

লেখিকা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "তোমার অবশ্য অত্যন্ত ঈর্ষ্যা হয়? কোনও স্ত্রীলোকই অপর কোনও স্ত্রীলোককে আপনার অধিকার দিতে চাহে না।"

জিনোবিয়া যেন কুপিতা হইল। সে উত্তর করিল, "যাহার বুদ্ধি আছে, সে পুরুষের জন্য কোনও স্ত্রীলোককে ঈর্ষ্যা করে না, বা তাহার সহিত কলহ করে না। আর এক জন স্ত্রীলোক আসিলেই কি আমার প্রতি তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে? পুরুষের হৃদয় তরঙ্গিণীতুল্য। যদি এখানে একটা কুকুর, ওখানে একটা উষ্ট্র স্রোতের জলপান করে, তবে তাহাতে কি স্রোতের কোনও পরিবর্ত্তন হয়? সে জন্য কি স্রোতের গতিতে কোনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে?"

প্রিয়তমকে আপনার জন্য এত উচ্চ মনে করিয়া আপনি অনুগত কুকুরের মত তাহার অধীন থাকিবার এই কল্পনা, ইংরাজ মহিলার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাই কথায় বলে যে, 'যে দেশে যেমন আচার'।

বিদেশীয় লেখকগণের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহম্মদের মতে মহিলাগণ পশুর মত। পুরুষের সুখসাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্যই তাহাদের জন্ম। পরলোকে মহিলার কোনও স্থান আছে কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ মহম্মদ কোথাও এমন কথা বলেন নাই।

মাতা ও পুত্র।

তবে মুসলমান সমাজে মহিলার যেরূপ অনাদর, তাহাতে লোকের এ কথায় বিশ্বাস করা আশ্চর্য্য নহে। মুসলমানগণ এখন কোরাণের ভাব গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছেন, আবার অনেক মুসলমান কোরাণ পাঠও করে না। মুসলমানগৃহে মহিলাগণ অন্তঃপুরে অর্থাৎ "হারেমে" রক্ষিতা—সেখানে তাঁহাদের থাকিবার পরিবার কষ্ট নাই সত্য, কিন্তু পশুও পশুশালায় যত্নে রক্ষিত হয়। জীবুলে পুত্র জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বালক জননীকে তাড়া দেয় ও আপনার টুপি প্রভৃতি আনিতে আদেশ করে। লেখিকার কোনও পরিচিত পরিবারে দুইটি বালক ছিল, বয়স দশ এগার বৎসর হইবে। আমীর তাহাদের বড় ভালবাসিতেন। তাহাদের দুষ্টামির অন্ত ছিল না। প্রায়ই ঘষ্টাগে তাহাদের কোন না কোন অঙ্গে ক্ষত লাগিয়াই থাকিত। জ্বর, কাশি, বেদনা প্রভৃতি তাহারা কষ্ট পাইত; ইহার কারণ সহজেই দেখা যাইত। কারুলে বালকগণ এক ঘণ্টার অধিক অধ্যয়ন করে না। অধ্যয়নের পরেই এই দুইটি বালক বাটীর বাহির হইত—রৌদ্রে ঘুরিত, পরস্পরকে জলে ফেলিয়া দিত, সিক্তবস্ত্র গাত্রেই শুকাইত, রৌদ্রে ঘোড়া গাড়ীর পশ্চাতে দৌড়িত, কাঁচা, পাকা, ডাঁসা ফল খাইত—ইত্যাদি। দুইটি আলেয়ার আলোক। বলা বাহুল্য, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার দেখিয়া কেহ কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিত তাহাদের জননীকে বলিয়াছিলেন যে, ছেলেরা অমন করিয়া বেড়াইলে তিনি চিকিৎসা করিতে আসিবেন না। জননী উত্তর করিয়াছিলেন, "আমি কি জানি? আমার স্বামী সরকারী কার্য্যে সমস্ত দিন আফিসে থাকেন। কিছু খাইয়াই বালকদ্বয় ছুটিয়া বাহির হয়। আমি লোক পাঠাই বটে, কিন্তু সে লোক উহাদের খুঁজিয়া পায় না, পাইলেই বা কে উহাদের সঙ্গে সমস্ত সহরময় ছুটিয়া বেড়াইবে? কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। একটু বড় হইলে পুত্র আর জননীকে গ্রাহ্য করে না।

এইরূপ অত্যাচারে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকায় পুত্রগণ প্রায়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আবার সে দেশের জলে অনেক সময় সবলগণই মরিয়া যায়। কাজেই কাবুলী জননীরা সন্তানের মৃত্যুতে অভ্যস্তা হইয়া পড়ে। আর বোধ করি, কাবুলী জননীর অপত্যস্নেহও কিছু অল্প। আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র ধাত্রীর কাছে থাকে, তাহার পর পিতাই পুত্রদিগের পর্য্যবেক্ষণের ভার লইয়া থাকেন। তবে কাবুলী জননীদের সারাদিন কাটে কেমন করিয়া? অভিজাতবংশীয়াদিগের কোনও কার্য্যই নাই। তাঁহারা সন্তান পালন করেন না—লিখিতে বা পড়িতেও জানেন না। স্বামী মনে ভাবেন, পত্নী তাঁহার আশায় পথ চাহিয়া আছেন।

কিন্তু যদি "আশায় নিরাশা ফলে দুঃখ কামনায়" তবে কাবুলী পত্নীর আশায় তীব্র নিরাশা ও কামনায় তীব্র দুঃখই ফলিয়া থাকে। কারণ সময় সময় এমনও হয় যে, কোনও পত্নীর পক্ষে কুড়ি একুশ দিন স্বামিসন্দর্শনলাভ হইয়া উঠে না।

পতিপত্নী।

লেখক আমীরের বংশসম্ভূতা কোনও রমণীর কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার স্বামী এক দিন মস্তকে ঔষধ লেপন করিয়া দরবারে আসিয়া উপস্থিত। লেখিকা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "তোমরা স্ত্রীলোকরাই ত যত অনিষ্টের মূল।" লেখিকা বলিলেন, "কেন, আপনার কোনও পত্নী কি আপনাকে প্রহার করিয়াছেন নাকি?" সর্দ্দার কোনও উত্তর প্রদান না করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। দরবারে লেখিকা এক জন রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন যে, এক জন সর্দ্দারকে তাঁহার পত্নী প্রহার করিয়াছেন।

আমীরের সমক্ষে কেহ মৃদুস্বরে কোনও কথা কহিলে আমীর কথাটা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা হইতেছে?" রাজকর্ম্মচারী কথাটা আরও একটু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলেন। সর্দ্দার তখনই আহূত হইলেন; এবার সর্দ্দারকে সব কথা বলিতে হইল। তিনি তাঁহার কোনও পত্নীর সহিত বিংশতি দিবস সাক্ষাৎ করেন নাই। একবিংশতি দিবসে পত্নীর কক্ষে উপস্থিত হইয়া সর্দ্দার দেখেন যে, পত্নী তখন পোলাও আহার করিতেছেন। প্রলাতক ছাত্র যেমন স্কুলে গিয়া পুস্তক খুলিয়া বসে, সর্দ্দার তেমনই পত্নীর নিকটে গিয়া আহার করিতে বসিয়া গেলেন। পত্নীর মুখে ক্রোধভাব দৃষ্ট হইল না। তিনি অস্থি হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বামীকে দিতে লাগিলেন; স্বামী ভাবিলেন, এবার সহজেই গোল চুকিয়া গেল। কিন্তু তিনি তখনও পত্নীর অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই। অস্থি হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করা শেষ হইলে, পত্নী অস্থিখানা তুলিয়া মস্তকে প্রহার করিলেন। তাহারই ফলে সর্দ্দারকে মস্তকে ঔষধ-লেপন করিয়া আসিতে হইয়াছিল। ইহারই নাম "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রার্থনা।

১

নদিয়ার পুরে আজি আনন্দ অপার,—
নীলাচল-পরবাসী নদিয়ার প্রভু আসি'
স্বগণ-সমাজ মাঝে উদিলা-আবার;
তুমুল উৎসব-রব ভরঙ্গে প্লাবিয়া সব
দিশি দিশি সে সংবাদ করিল প্রচার।

২

অসংখ্য ধাইয়া ধেয়ে বৈষ্ণবের দল;
সঙ্কীর্ত্তনে উতরোল উচ্চে 'হরি হরি'-বোল,
ছাইয়া অবনী ঊর্দ্ধে উঠে কোলাহল;—
এ সংসার পারাবার, প্রভু তাহে কর্ণধার,
কেন না নাচিবে প্রাণী উল্লাসে বিহ্বল?

৩

সাথে লয়ে অনন্ত সে জনতার রাশি,
সন্ন্যাসী ভিখারী-বেশে নিজ পুরদ্বারদেশে
বিনাদে বিকল প্রভু দাঁড়াইলা আসি;
দেখিতে দেখিতে তাঁর দুটি পদ আশ্রিতার
সহস্র স্মৃতির স্রোতে উঠে যেন ভাসি'।

৪

শৈশবের লীলাভূমি স্নেহের ভবন,—
সেই সে আঙ্গিনা মাঝে সে তুলসী মঞ্চ বাজে,
দেবতার গৃহচূড়ে গরুড়-কেতন,—
চির জনমের তরে নিরখি ব্যগ্রতাভরে
প্রেমোচ্ছ্বাসে প্রভু মোর কহিলা তখন;—

৫

"প্রণমামি জন্মভূমি, জননী আমার।
নাশিয়া সন্ন্যাসি-সাজ কত যুগ পরে আজ
মধুর মূরতি তব হেরিনু আবার।
জনমিয়া ভবতলে তোমারই প্রসাদবলে
পাইনু মা কৃষ্ণপ্রেম কামনার সার।

৬

"প্রণমামি শেষবার, বিদায় এখন।
তোমার পবিত্র ধূলি লইনু মা শিরে তুলি';
এই আশীর্ব্বাদ আজি কর বিশ্বজন,—
যেন এ প্রেমের ডোরে বাঁধি সে রূপস-চোরে,
পাই যেন বৃন্দাবনে কৃষ্ণ প্রাণধন।"

৭

সহসা করুণ কণ্ঠ উঠিল কাঁপিয়া,
উৎসারিত উৎস-ছুটি' বিশাল নয়ন দুটি
বিষাদ স্রোতে যেন দিল ভাসাইয়া;
বিগলিত তনু মন কাঁদিল বৈষ্ণবগণ,
কোটি কণ্ঠে 'হরি-হরি' উচ্চে উচ্চারিয়া।

৮

কাঁদিয়া লইলা প্রভু অন্তিম বিদায়,—
নদিয়ার নাট্যাগার হয় চির-অন্ধকার,
নদিয়া ভাসিবা যায় নয়ন-ধারায়!
হেনকালে বজ্রাঘাত!— কে পড়িল অকস্মাৎ
প্রভু-পাদমূলে আসি পাগলিনীপ্রায়!

৯

নিবিড় বসনে ঢাকা আপাদ-কুন্তল;
বিমলিন বেশবাস, চিরকক্ষ কেশরাশ,
তবু সে কপালে কীর্ত্তি কাঞ্চন-তরল,
নদিয়ার চাঁদে হায়, হেরি অস্তমিতপ্রায়
নদিয়ার লক্ষ্মী কিবা হইলা চঞ্চল?

১০

সমুখে সুন্দরী হেরি' সন্ন্যাসী নিমাই,
বর্ম্মলোপ ভাবি' মনে রোষ-করি'-আবরণে
"কে তুমি?" কহিলা শুধু তাহারে সুধাই,—
স্তম্ভিত সকল মন, স্তম্ভিত বৈষ্ণব সব
সবিস্ময়ে নির্নিমেষ চাহি পানে চাই'!

১১

বিস্ময়ে বিকল সবে, কে করে উত্তর?
কারও মুখে নাহি বাণী, নীরব সহস্র প্রাণী
দাঁড়াইয়া চিত্রে যেন আঁকা কলেবর;—
অতঃপরে কর্ণে আসি' পশিল সুধার বাণি,
মূর্ত্তে যেন নয়নের ঘুচিল নির্ঝর।

১২

"প্রথম আশ্রমে প্রিয় নিবাসে যখন
ছিলে তুমি বিশ্বরাজ! সে গৃহ-মন্দির মাঝ
কণিত যে দিবানিশি চরণ-নূপুর;—
পাদপদ্ম-অভিলাষী আমি সে দাসীর দাসী,
হয় ত আজিও মনে হইবে স্মরণ।"

১৩

বৈশাখী প্রভাত সম প্রফুল্ল সবল
প্রভুর আনন, হায়, ঘনমেঘে ঢেকে যায়,
উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া উঠে নয়নের জল;

তবু আত্ম সম্বরিয়া কহিলা পাষাণ-হিয়া,—
"কি প্রার্থনা? সন্ন্যাসীরে করিও না ছল।"

১৪

করুণ সে বাণী-বীণা-বাজিল আবার,—
"হে ঠাকুর! আছি মোর দুঃখের করহ ওর;
প্রেমদানে জিয়ন্তে করিলে উদ্ধার,
চির প্রেম কাঙালিনী বিষ্ণুপ্রিয়া-অভাগিনী
পড়িয়া কি র'বে শুধু চরণের মাঝার?"

১৫

প্রিয়ার কাতরা শুনি কহিলা নিমাই,—
"পূর্ণ হ'ক মনস্কাম,— বিষ্ণুপ্রিয়া তব নাম,
হও তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া, এই তব চাই;
জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি কৃষ্ণ বিনা নাহি আর;
শুন বাণী, কহি আমি কৃষ্ণের দোহাই।"

১৬

প্রভুর বচনে প্রিয়া প্রবোধ না পায়;
পুনঃ কহে,—"হে ঠাকুর! কহ কৃষ্ণ কত দূর?
দাসীর পরাণ-নে-ত তাঁরে নাহি চায়,
আমার নয়ন-আগে একমাত্র মূর্ত্তি জাগে,—
অন্তরে বাহিরে আমি নিরখি তোমায়।

১৭

"কিশোর শৈশব হ'তে তটিনী সমান,
সকল আকাঙ্ক্ষাচয় এক স্রোতে করি লয়
যে গৌরাঙ্গ-সিন্ধু পানে ছুটিয়াছে প্রাণ,
তাঁরে ত্যজি' অকস্মাৎ কোথা যেতে বল, নাথ?
নারীর জীবন-বারি বহে কি উজান?"

১৮

যতনে নিবারি প্রভু নয়নের জল,
প্রসন্ন-মানসে কয়, "হে সাধ্বী! তোমারি জয়;
সাধের সাধনা তব হউক সফল;—
যাই এবে বৃন্দাবন দেহ আজ্ঞা সুচেতন,
লহ এই বিরহের সান্ত্বনা-সম্বল।"

১৯

পাদুকা লইয়া প্রিয়া উঠিলা তখন;
প্রণমিয়া ধীরে ধীরে বারেক পরশি' শিরে
চুম্বিয়া বুকের 'পরে করিলা ধারণ;
আর না কিবিয়া চায়, রাজরাজেশ্বরী প্রায়
উচ্চ জয়ধ্বনি-মাঝে পশিলা ভবন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ; ১৩০৫।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। "পুত্র-যজ্ঞ" একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। লেখক বোধ করি নূতন ব্রতী। "জুতা-আবিষ্কার" একটি অদ্ভুত ও উদ্ভট রচনা;—লেখকের বিদ্রূপবচনার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, কবির চেষ্টা 'কমিক' বটে! "শিক্ষাপ্রণালী" প্রবন্ধে পদে পদে লেখকের চিন্তাশীলতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, লেখক বিস্তারিতভাবে তাহার আলোচনা করিয়া সাধারণকে উপকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কার একান্ত আবশ্যক। লেখক ত প্রবন্ধে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু এখন 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে?' "মেঘো জল" প্রবন্ধে লেখক ভাষাতে বিদেশীয় পণ্যের প্রাদুর্ভাব ও দেশীয় শিল্পের অন্তর্ধানের বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সর্ব্বসাধারণের আলোচনীয়। "সাহিত্যের সৌন্দর্য্য" প্রবন্ধে সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা আছে। এই নিবন্ধটির কতকটা 'কবিতা', কতকটা হেঁয়ালি, এবং সমস্তটাই আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। "ত্রিবাঙ্কুর—ভ্রমণকারীর নোট' সুপাঠ্য। "বাঙ্গালা বহুবচন" প্রবন্ধে লেখক আমাদের বহুবচনের উৎপত্তি ও প্রকৃতির অনুসন্ধান করিয়াছেন। "ঢাকা" একটি ভ্রমণকাহিনী—এক বিন্দু ইতিহাস ইহাতে আমেজ আছে।

নব্যভারত। ষোড়শ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ। "কি চাই, কি পাই?" সম্পাদকের রচনা। "নব্যভারত"-সম্পাদক অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, তাঁহার সমস্ত সুখদুঃখের সহিত পাঠকগণের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই, এবং তাঁহার যে কাঁদুনী বাঙ্গবদের হৃদয় বিগলিত করিতে সক্ষম, তাহা সাধারণ-সমাজে নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘশ্বাস সঞ্চার করিতে পারে। তিনি যেখানে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, অপরিচিত লোকের চক্ষে তাহাও যে ঔদ্ধত্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, এমন সম্ভাবনাও সম্পাদকমহাশয়ের চিত্তে উদিত হয় না। সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছেন, "আমরা এই পনের বৎসর কেবল ভূতের ব্যাগার খাটিয়াছি। খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিয়াও যদি কিছু না পাইলাম, তবে আর কি হইল?" দুষ্ট লোকে বলে, "ভূতের ব্যাগার খাটিয়া" তিনি কিছু পাইয়াছেন, বরং লোকে প্রতি বৎসর তাঁহার এই ধরণের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সত্য সত্যই "ভূতের ব্যাগার" দিয়া থাকে। এই প্রলপিতের প্রতিবাদ নিরর্থক ও অনাবশ্যক। "ফাহিয়ানের স্বদেশে প্রত্যাগমন" চিত্তাকর্ষক। আরম্ভে লেখক বলিয়াছেন, "বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ তীর্থদর্শন গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমি চীনদেশ পরিত্যাগ করেন। এসিয়ার মরুভূমি এবং বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থানের চিরনীহারাবৃত দুরারোহ অতিক্রম করিয়া গান্ধার, উদ্যান, এবং ক্ষুদ্রতর আরও কতকগুলি রাজ্যে ক্লেশের পর তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তিব্বত, মধ্য আফ্‌গানিস্থান প্রভৃতি স্থান ভারতবর্ষেরই মত নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব। আফ্‌গানিস্থানের উত্তর প্রান্ত হইতে আরম্ভ নানা স্থানে ফাহিয়ান্ রথযাত্রার উৎসব দেখিয়াছিলেন। মধ্যস্থানে বুদ্ধদেবের তাহার উভয় পার্শ্বেই জন বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি রথোপরি স্থাপিত হইত। পৌরাণিক ধর্ম্মের পুনরুত্থানসময়ে ইহারাই সুভদ্রা, কৃষ্ণ এবং বলরামরূপে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু পাঠক সামুয়েল বীল (Samuel Beal) সাহেব কর্তৃক অনূদিত

হিউয়েন্‌সঙ্গের গ্রন্থে ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত সবিস্তার জানিতে পারিবেন। ফাহিয়ান্ চতুর্দশ বৎসরের পর সমুদ্রপথে ভারতীয় বাণিজ্যপোতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।" শ্রীমনোরঞ্জন গুহ "দেবগৃহে কথোপকথন" প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিবিধ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম "খলিফাদিগের বিবরণ" সংগ্রহ করিতেছেন। এই মসলেম লেখকের বঙ্গ ভাষায় অনুরাগ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গলাই যে বঙ্গদেশবাসীর মাতৃভাষা, এই প্রবন্ধের বিশুদ্ধ রচনায় তাহা সুপ্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "সাহিত্য-সংবাদ" নামটি সুপ্রযুক্ত ও সমর্থ হয় নাই, কিন্তু প্রবন্ধটি বিবিধ সুখপাঠ্য ও কৌতুকাবহ বিষয়ে পূর্ণ। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিসমালোচনায় সূত্রপাত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীপতি রায়ের "বিলাতে বড়দিন" প্রবন্ধটির বিষয় চিত্তাকর্ষক; কিন্তু ভাষা যেমন উদ্ভট, তেমনই অদ্ভুত। বিকৃত, লাঞ্ছিত ও গ্রাম্যতাদোষে দূষিত করিলেই ভাষা সহজ বা সরল হয় না। লেখক পরমনিশ্চিন্তচিত্তে বড়দিন উপলক্ষে বঙ্গভাষার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মুদ্রাদোষ দেখিয়া মনে হয়, বিলাতে বড়দিনের 'প্যাণ্টোমাইম্' দেখিয়া তিনিও মাতৃভাষা লইয়া এই নূতন 'প্যাণ্টোমাইম্' রচনা করিয়াছেন। শ্রীপতি-বাবু দেশে থাকিতে বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের রচনা করিয়া আমাদের আনন্দিত করিতেন; তাঁহার তখনকার ভাষা ত এমন ছিল না। রায় মহাশয়ের মত প্রবীণ লেখকও কি বিলাতে পা দিয়াই মোচাকে "কলাকা ফুল" বলিতে আরম্ভ করিলেন?

বামাবোধিনী। ৩৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; বৈশাখ। "বামাবোধিনী" বিগত পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর বঙ্গীয় নারীসমাজের সেবা করিয়া, এই সংখ্যায় ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। আমরা সহযোগিনীর দীর্ঘজীবন কামনা করি। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বিশেষ অভাব।

বামাবোধিনী। জ্যৈষ্ঠ। "বড়লোক কে?", "অদ্ভুত বৈবনির্য্যাতন, "গ্রাডষ্টোন" প্রভৃতি প্রবন্ধ সুরচিত না হউক, সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। "দেবী কৈলাসকামিনীর জীবনী" পাঠ করিলে পাঠিকাগণ উপকৃত হইবেন। এই গৃহধর্ম্মরতা কর্ত্তব্যপরায়ণা মহিলার সহজ সরল জীবনপ্রণালী আলোচনার যোগ্য।

তত্ত্ববোধিনী। জ্যৈষ্ঠ। "আত্মসংযম", "নববর্ষ উদ্বোধন" প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ দ্বারা এবারকার "তত্ত্ববোধিনী" পরিপূর্ণ। পরিশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রের যন ও "শ্রীমন্মহর্ষিদেবের ব্যাশীতিতমজন্মোৎসবে"র স্পৃহনীয় ও মহনীয় "তত্ত্ব" প্রকাশিত হায়, বর্ষীয়সী "তত্ত্ববোধিনীর" পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা ও এখনকার ঘোর দুর্দ্দশার কথা দুঃখের অবধি থাকে না।

ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ। "ত্রিমূর্ত্তি" একটি দার্শনিক প্রবন্ধ। বন্ধটিতে লেখক বলেন, "ধর্ম্ম স্মরণ করিবার জন্যই পাঠীগণিতে 'যোগ-কষা।" আমরা তাহা জানিতাম না। এখনও ছেলেরা "ক—য়ে কৃষ্ণ গ—য়ে পেখে বটে, কিন্তু তাহা যে ধর্ম্মশিক্ষার রূপান্তর, পাষণ্ড আমরা তাহাও নাই। প্রহ্লাদ "ক—য়ে কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, কথক তাঁহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সমুদায় বর্ণশিক্ষার্থী হিন্দুর ছেলে পাঠশালে "ক" দেখিয়াই "কৃষ্ণ" স্মরণ করিয়া বনপ্রস্থানে উদ্যত হইবে, সে দিন আমাদেরও পাততাড়ি গুটাইতে হইবে ভাবিয়া, আমরা এখনই কৃষ্ণস্মরণ করিতেছি।

উৎসাহ। দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র "পুণ্যাহ" নামক ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও আলোচ্য। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "সন্ন্যাসী" কৌতূহলের

উদ্দীপক। "হেমের অনধিকার" শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের রচিত একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির কোনও বিশেষত্ব নাই; আমাদের ভাল লাগিল না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সে আমার জননীরে" একটি সদ্ভাবপূর্ণ গান। বৈশাখ মাসের "উৎসাহে" আর একটু মাধুর্য্য আছে। "উৎসাহের" সমালোচক "প্রদীপে" প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "সঙ্গিনী" গল্পের ভাষার ভুল ধরিয়া বলিয়াছেন, "এগুলি অবশ্যই সুশিক্ষিত সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া দিতে পারিতেন।" ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাবিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ নাই। কিন্তু সমালোচক মহাশয় স্বয়ং "ভারতীর" সমালোচনাস্থলে লিখিয়াছেন,—"নারী তাঁহারই পদতলগতা গললগ্নীকৃতবাসা সাচ্ছাদিতা সালঙ্কৃতা" ইত্যাদি। বোধ করি, শেষ তিনটি শব্দকে রক্ষা করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন ব্যাকরণ নাই। অন্যকে বিনামূল্যে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে 'নিজের চক্ষায় তেল দিলে' ভাল হইত না?

উৎসাহ। জ্যৈষ্ঠ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি গান—"ভিখারী"। কবিবর কি সম্প্রতি কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি অভিমান করিয়া হেঁয়ালি-উপদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ বিচিত্র অমর সঙ্গীতে বঙ্গভূমির কবিকুঞ্জ মুখরিত, তাঁহার সঙ্গীত-শিল্পের কি এই ক্রমবিকাশ? স্বাক্ষরের স্থলে রবীন্দ্র বাবুর নাম না থাকিলে, গানটি রবীন্দ্র বাবুর রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না। শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্রশেঠের "রাজা রামানন্দ রায়" অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশধর রায় "ভূগর্ভের" পরিচয় দিয়াছেন। নববর্ষে "উৎসাহের" উন্নতির আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, "যথা পূর্ব্বং তথা পরম্।"

হিন্দু পত্রিকা। বৈশাখ। এই সংখ্যায় "হিন্দু পত্রিকা"র পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইল। "ভাষাপরিচ্ছেদ" দুই তিন পৃষ্ঠামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এত অল্প মাত্রায় প্রকাশিত হইলে কত দিনে শেষ হইবে? "হিরণ্ময় পুরুষ", "মায়াবাদ" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি আলোচনার যোগ্য।

হিন্দু-পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ। "বিধবার অনুতাপ" একটি পদ্য; এক জন বিষয়ী পদ্যে অনুতাপ বা নাকি সুরে ক্রন্দন করিতেছেন! "হিন্দু-পত্রিকা"র এ বিড়ম্বনা কেন? "পরিব্রাজক সূক্তমালা"য় সুখতত্ত্বনিরূপণের চেষ্টা আছে।

ধর্ম্ম-প্রচারক। ২১শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ। বহুকাল পরে অন্নপূর্ণার চিত্র-সম্বলিত "ধর্ম্ম-প্রচারক" দেখিয়া কৃষ্ণানন্দ স্বামীকে মনে পড়িল। স্বামীজি চূর্ণ হইয়া যান, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান এখনও বিদ্যমান। এই সংখ্যায় "যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা"র অন্তর্ব্যভিচারবিষয়ক দণ্ডের ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। সেকলে এখন এ বিষয়ে মনু হারীতাদির স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং ব্যভিচারবিশেষে শতপণাদি দণ্ড বিলুপ্ত ও তৎপরিবর্ত্তে নূতন শাস্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা "ধর্ম্ম-প্রচারকে" নাই। তবে এখন আর এই কুৎসিত বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনায় ফল কি?

তত্ত্বমঞ্জরী। দ্বিতীয় ভাগ; প্রথম সংখ্যা। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ করা তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য।" মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ দেবকে যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের মতের ঐক্য হইবার কিন্তু পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী সকলের পক্ষেই পথ্য, সে বিষয়ে

তত্ত্বমঞ্জরী। দ্বিতীয় সংখ্যা। এই সংখ্যায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব" প্রবন্ধে দেবের বিষয়বিতৃষ্ণার পরিচায়ক দুই একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা। বৈশাখ। এই সংখ্যায় এই সাম্প্রদায়িক পত্রের সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত ও অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রের, বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের ও বৈষ্ণব সাহিত্যের

প্রচারের জন্য, এই পত্রের অভ্যুদয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রকাশের যোগ্যতার আমাদের সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার প্রভাবে বৈষ্ণব সাহিত্য যে যথেষ্ট উপকৃত, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। "বাসুদেব ঘোষের পদাবলী", "উড়িয়া ভাষায় গৌরসঙ্গীত", "শ্রীখণ্ডের রঘুরাম দাস" প্রভৃতি প্রবন্ধের আলোচনায় প্রাচীনকাব্যরসপিপাসু পাঠক তৃপ্ত হইবেন।

সৎসঙ্গ। পঞ্চম ভাগ, বৈশাখ; জ্যৈষ্ঠ। "সৎসঙ্গ" পূর্ব্বে বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হইত। মধ্যে বহু দিন "সৎসঙ্গের" দর্শন পাই নাই। এক্ষণে বীরভূম জেলার কীর্ণাহার গ্রাম হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। প্রথম সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের একান্ত অভাব। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ "রামকেলী" পাঠযোগ্য; গ্রামবিশেষের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় "বীরভূম" প্রবন্ধে উক্ত জেলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচলিত গল্প ও প্রবাদে প্রবন্ধের কলেবর পরিপূর্ণ না করিয়া, ঐতিহাসিক তত্ত্বের নির্ণয়ে অধিকতর মনোযোগী হইলে প্রবন্ধটি আরও মনোজ্ঞ হইতে পারে। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত "বোমা" নামক একখানি তথাকথিত প্রহসনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "হিন্দুয়ানি"র প্রচার করিতেছেন। এই পরম হিন্দু সমালোচক বঙ্গসমাজে ও বঙ্গসাহিত্যে "সীতা" ভিন্ন আর কিছু দেখিতে চান না:—দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গসমাজে যে সীতার সঙ্গে শূর্পণখাও আছে, তাহাও তাঁহার ধর্ম্মদৃষ্টের অগোচর। ইঁহার মতে, বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত নারীচরিত্রই সীতার ছাঁচে ঢালা চাই; নহিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর। বঙ্কিম বাবুর চিত্রিত "কমলা", "শৈবলিনী" প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্র দেখিয়া ইনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। গোবিন্দ বাবু অন্যত্র 'রুদ্রাক্ষমালা'র অনুসন্ধান করিবেন। বঙ্কিম বাবু তাঁহাদের জন্য তাঁহার মুক্তার মালা গাঁথিয়া যান নাই।

প্রতিনিধি। তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। বৈশাখ; জ্যৈষ্ঠ। দুই বৎসর প্রকাশিত হইবার পর "উত্তরক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি" নামক একখানি কাগজ বন্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে তাহাই "প্রতিনিধি" নামে পুনঃপ্রচারিত হইতেছে। প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্তের রচিত "শ্রীচৈতন্যের কবিত্ব" প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। লেখক বলেন, "গোস্বামী প্রভুগণের নিকট শুনা যায়, মহাপ্রভুর রচিত 'শ্রীগৌরচরিত্র' তাঁহার বাল্যকালের গ্রন্থ।" সময়ে সময়ে চৈতন্যদেব সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকরচনা করিতেন; প্রবন্ধলেখক মধ্যেও দুই চারিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপসংহারে লেখক বলেন, "তিনি 'শিক্ষাষ্টকং' নামে আটটি শ্লোক লোকশিক্ষার জন্য রচনা করিয়াছিলেন। * * শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব নীলাচলবাসকালে অধিকাংশ সময় কাব্যরসাস্বাদনে অতিবাহিত করিতেন। মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তখনই তাহা ছন্দোবদ্ধে গ্রথিত করিয়া পারিষদ ও অনুচরগণকে শুনাইতেন। * * বোধ হয় এই সময়েই শ্রীভাগবতাষ্টকং, শ্রীকিশোরাষ্টকং, শ্রীবিশ্বমোহনাষ্টকং, শ্রীবিষ্ণুনৃত্যাষ্টকং, শ্রীপ্রেমরসায়নং, শ্রীরাধারসসুধানিধি, শ্রীজগন্নাথাষ্টকং, শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তরশত নাম প্রভৃতি কবিতা তাঁহার শ্রীমুখারবৃন্দ (শ্রীমুখারবিন্দ?) বিনিঃসৃত হইয়াছিল।"

বীণাপাণি। পঞ্চম খণ্ড; প্রথম সংখ্যা। "সীতানাম বাঘ" শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের রচিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। সীতানাম সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, আলোচ্য প্রবন্ধে তদতিরিক্ত কোনও অভিনব বিষয়ের প্রসঙ্গ নাই। তবে এ পুনরুক্তি কেন?

বীণাপাণি। দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের "মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য" ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" আদ্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। "বীণাপাণি" আবার তাহা পুনঃপ্রচারিত করিতেছেন কেন?

পুণ্য। ফাল্গুন ও চৈত্র। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "যৌবন-বিবাহ" আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দক্ষিণ দিক" প্রবন্ধটি গবেষণাপূর্ণ। শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তানসেনের বিবাহ" সুপাঠ্য। লেখক এইরূপে ক্রমে ক্রমে তানসেনের জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ করিলে, তাঁহার চিরস্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সনেশু" ভাষাতত্ত্বের একদেশের আংশিক আলোচনা। "কলপথে কাশীযাত্রা" একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত;—যদিও রচনায় শিল্পচাতুর্য্য নাই,—কিন্তু বিষয়টি অভিনব,—কৌতুকাবহ। পরিমার্জ্জনবৃদ্ধি করিলে মন্দ হয় না। "পুণ্যে" তিন চারিখানি চিত্র আছে; আমরা চিত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ; কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে মনে হয়, একখানিও সাধারণের চিত্তবিনোদন করিতে পারিবে না।

মুকুল। চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ। নববর্ষে মুকুলের সমুজ্জ্বল বেশ ও সুন্দর শ্রী দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বিচারপতি সিরাজীলাথ গুপ্ত ও লোকান্তরিত সৈয়দ মোহম্মদ, এই দুই জনের চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে। উভয়ের জীবনচরিত হইতে 'মুকুলের' বালকগণ শিক্ষালাভ করিবে। "বাঙ্গালীর বীরত্ব" প্রবন্ধে ডাকার শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও তাঁহার বাঘের সহিত খেলার সচিত্র বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবন্ধটি পড়িয়া বালক পাঠকগণের সহিত বয়স্কেরাও আনন্দ লাভ করিবেন। "কাজের ছেলে" নামক সচিত্র কবিতাটি বেশ হইয়াছে। "পশুবুদ্ধি" প্রবন্ধটি শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য; কিন্তু ভাষা সুখবোধ্য নহে। আশা করি, "মুকুল" উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অভাব মোচন করিতে পারিবে।

নিক্ষা। প্রথম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা। চৈত্র। এখানি ক্ষুদ্র পত্র—প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দেখি নাই, এবং এই চৈত্র সংখ্যার পর আর পাই নাই। বোধ হয়, এই পত্রিকাখানি শিক্ষার্থী ছাত্রগণের জন্য কল্পিত। "শিক্ষা"র প্রবন্ধের দৈন্য দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি।

নির্ম্মাল্য। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ। ভবানীপুর হইতে নূতন প্রকাশিত হইতেছে। সুপাঠ্য প্রবন্ধের যেমন অভাব, কবিতার তেমনই প্রাদুর্ভাব। "ভরাসিহারী মুখোপাধ্যায়" একটি কবিতা, অগ্রজের স্মরণার্থ "ভবসুন্দর" শ্রীযুক্ত হরকুমার মুখোপাধ্যায় "মেজো দাদা গো আমার" সুর ধরিয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছেন। যেখানে মৃতের নাম সংযুক্ত, সেখানে স্বভাবতঃই সমালোচনা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা নীরবে এই কবিতার অত্যাচার সহ্য করিলাম। কিন্তু রমণীমোহন বসুর ধৃষ্টতা ও নীচতা অমার্জ্জনীয়। এই ব্যক্তি বঙ্কিম বাবুর একটি কবিতার কিয়দংশ নকল করিয়া "প্রিয়তমের প্রতি" শিরোনাম দিয়া নিজের রচনা বলিয়া মুদ্রিত করিয়াছে। এমন 'দিনে ডাকাতি' প্রায় দেখা যায় না।

প্রদীপ। বৈশাখ। "বিদায়" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি গান। গানটির ধুয়া—'সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' 'বাঁধন ছিঁড়িবার' আগেও তদুপলক্ষে গান বাঁধিতে হয়—কবিজননী বাঙ্গভূমির এমনই সরস বাস্তবতা। শ্রীমতী রাধামণি দেবীর "শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি" গল্পটি মন্দ নহে। "রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের" চিত্রখানি সুন্দর; জীবনবৃত্তান্ত যদিও অসম্পূর্ণ, তথাপি সুপাঠ্য।

প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "নবদ্বীপ" নামক কবিতাটিতে কবিত্বের সহিত বিদ্রূপ মিশ্রিত করিবার চেষ্টা আছে। কবির চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে, মনে হয় না। "আমাদের স্কুলের ছেলেরা" শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসীর রচিত, আলোচনার যোগ্য। "সর সৈয়দ আহম্মদ খাঁ" প্রবন্ধটি পাঠ্যযোগ্য। চিত্রখানিও মন্দ নহে।

প্রমীলা নাগ।

ভানুমতী।

৩।—অনাথা।

কয়েক দিন হইতে বড়ই গরম পড়িতেছিল। শরৎকালে এমন গ্রীষ্ম কেহ কখনও অনুভব করে নাই। সে উত্তাপও কেমন এক রকমের। প্রকৃতির কেমন এক প্রকার নির্ব্বাত নিষ্কম্প ভাব। বসুন্ধরা যেন কি এক প্রকার সূক্ষ্ম প্রস্বেদ বাষ্পাবগুণ্ঠিতা। সমুদ্রে সামান্য হিল্লোলমাত্র লক্ষিত হইতেছিল না। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিবার সময়ে, অনাথনাথ যেন স্থানে স্থানে গন্ধকের গন্ধ পাইয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে মেঘ হইতেছিল। বেলা প্রহরাতীত হইলে সমুদ্রগর্ভ হইতে যেন ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পর মেঘ উঠিতে লাগিল। এবং কেমন ঝিক ঝিক করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল। তিনি সেই ঋতুনুচিত গ্রীষ্ম অনুভব করিবারই একটি দুর্য্যোগের আশঙ্কা করিতেছিলেন। এখন এই মেঘ দেখিয়া তাঁহার আশঙ্কা বদ্ধমূল হইল। অতএব এই মেঘের গতিক না বুঝিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবেন না, স্থির করিয়া, তিনি এক জন ভৃত্যের দ্বারা সেই বালিকা ও শিশুটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেদেনী নৌকায় ফিরিয়া ইতিমধ্যে তাহার মধুময় চরিত্রের আর একটি পালা অভিনয় করিতেছিল। অনাথনাথ ভানুমতীকে ২৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। আরও কিছু বেশী চাহিতে বেদেনী তাহাকে অপূর্ব্ব মুখ-ভঙ্গী করিয়া, এবং তাহার কোটরস্থ চক্ষু ঠারিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিল। বালিকা [illegible] করুণ স্নেহদৃষ্টিতে অনাথনাথের মুখের দিকে চাহিয়া হাত পাতিয়া [illegible], সে ইঙ্গিত লক্ষ্য করে নাই, কিংবা তাহার অর্থ বুঝে নাই। এই [illegible]নৌকায় ফিরিয়া সে আর এক প্রস্থ মার খাইয়াছে। বেদেনী,—[illegible] দেখিলি না বাবুটি বোকা। ॥৹ গণ্ডার জায়গায় ২৲ টাকা দিল, আবার ২৲ টাকা বকসিস্। চাহিলে আরও কিছু দিত। বোকা বাজি দেখিয়া চখের জল ফেলে ?" এই বলিয়া তিনি আবার [illegible]ন। বালিকা চক্ষু মুছিয়া শিশুটির হাত ধরিয়া ধান্য আনিতে বাজারে যাইতেছিল, এমন সময় ডাক পড়িল। বেদেনীর মেজাজের আগুনে যেন জল পড়িল। সে বুঝিল, বোকা বাবুটির কাছে আরও কিছু পাওয়া যাইবে। তখন আদরে বালিকাকে বলিল,—"না! তোরা যা। আমি বাজার করিতে যাই-

তেছি, কিন্তু বাবু হইতে আরও ২টি টাকা না লইয়া ফিরিস না। বাবু বড়লোক।"

বালক বালিকার সজল চক্ষু যেন আনন্দে হাসিল। তাহারা দুই জনে বাবুর বড় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখে যে করুণা, যে দয়া ও যে স্নেহ দেখিয়াছিল, এমন তাহারা দেখে নাই। এমন স্নেহপূর্ণ মধুর কথা তাহারা শুনে নাই। তাহারা আবার তাঁহাকে দেখিবে, আবার তাঁহার কথা শুনিবে, অতএব তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বজরার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার বহুমূল্য সজ্জায় প্রথম তাহাদের চক্ষে ধাঁধা লাগিল। অনাথনাথ তাহাদের গায়ে হাত দিয়া কতই আদর করিলেন। তাহার পর তাঁহার স্ত্রী,—তাহারা ভাবিল, "ইনি কি মানুষ?" তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপ্রতিমা। মাতৃস্নেহ যেন তাঁহার মুখ হইতে জ্যোৎস্নার মত ঝরিতেছে। এমন সুন্দরী, এমন স্নেহশীলা, তাহারা কখনও দেখে নাই। তিনি তাহাদিগকে একেবারে বুকে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। দরিদ্র বোদর ছেলে মেয়েকে এত দূর দয়া, এত দূর স্নেহ কি মানুষে করিতে পারে? তাহার পর তাঁহাদের একটি পুত্র,—সেটি কি ছেলে, না শরৎকালে প্রভাতকিরণমণ্ডিত কুসুমরাশি? তাহার সেই আয়ত চক্ষু, সরল স্নেহ-ভরা মুখ এবং সর্ব্বশেষ তাহার সেই মধুর কথা! সে তাহার পিতার একটি ক্ষুদ্র প্রতিচিত্রের মত। সে একেবারে ছুটিয়া আসিয়া বালিকার গলা জড়াইয়া তাহার কোলে বসিয়া কত মধুমাখা কথায় তাহার বাজির প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার নাম অমিয়। উভয়ের একই বয়স। শীঘ্র উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। অনাথনাথের পুত্রের খেলার ভাণ্ডার খুলিয়া গেল। দুই শিশু পরিচিত বন্ধুর মত খেলিতে লাগিল। শিশুর মত সরল সমদর্শী বা যোগীও নন। তাই বুঝি মহর্ষি খৃষ্ট বলিয়াছেন,—

"দেও ওই শিশুদের আসিতে নিকটে মম।
স্বর্গ রাজ্য তাহাদের, যারা শিশুদের সম।"

নৌকাতে নানাবিধ খাদ্য ছিল। অনাথনাথের পত্নী বড় খাওয়াইলেন। তাঁহাদের দুজনের দয়া তাঁহাদের জমিদারিতে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রজাদিগকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। তাহাদের সুখে সুখী, তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতেন, এবং দুঃখের উপশম করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। প্রজারা তাঁহাদিগকে দেবতার মত পূজা করিত।

এই দরিদ্র দেশে প্রজা-ভূম্যধিকারীর এই সম্পর্ক নিয়ম ছিল। এখন জটিল আইন ও আইন-ব্যবসায়ীদের কল্যাণে তাহার ব্যতিক্রম হইয়া উঠিলেও, এখনও দুই এক স্থানে, বিশেষতঃ বুনিয়াদি জমিদারে, দৃষ্ট হয়।

বালক বালিকা আহার করিলে অনাথনাথ বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি ?"

উত্তর। ভানুমতী।

প্রশ্ন। তোমার অন্য কোন নাম নাই ?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। এই বেদে কি তোমার পিতা ?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তোমার পিতা তবে কে ?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তোমার মাতা কে ?

উত্তর। জানি না।

বালিকা অধোমুখে অতিশয় করুণ বিষণ্ণ ভাবে উত্তর দিতেছিল।

প্রশ্ন। তুমি কোথায় ইহাদের সহিত মিলিত হইলে ?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তুমি কেন ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইলে ?

উত্তর। অদৃষ্ট।

অনাথনাথ শুনিলেন, বালিকা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার শেষ প্রশ্নের [illegible] দিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নে বালিকার মর্ম্মস্থলে আঘাত [illegible]ছ, এবং তাহার মনে গভীর শোকের সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার মুখ [illegible]ল। তাঁহার পত্নীর নয়ন সজল হইল। অনাথনাথ আর তাহার [illegible]বার চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে একটি গান গাইতে বলিলেন, [illegible]রমোনিয়মের কাছে গিয়া বসিলেন।

[illegible]কি গাইব বাবা ?

[illegible]মি কি কীর্ত্তন জান মা ?

[illegible]নি।

[illegible]বাবা সম্বোধনে অনাথনাথের কর্ণে, এবং তাঁহার মা সম্বোধনে [illegible]যেন অমৃত সঞ্চারিত হইল। দুটি প্রাণ যেন সেই অমৃতের

সঙ্গে দ্রবীভূত মিশ্রিত হইয়া গেল। বালিকা হারমোনিয়মের সঙ্গে অতি কোমল করুণ কণ্ঠে স্থানীয় কবি ত্রিপুরাচরণ রায়ের একটি গীত গাইতে লাগিল,—

১

বাছারে জীবন জুড়ানে! এস বস কাছে!
বেঁধেছি ধড়া চূড়া,
ও বাপ! গোঠের বেলা ব'যে গেছে।

২

বেণুর স্বরে ডাকছে বলাই,
আয় আয় আয়রে কানাই,
তুই বিনে যে যায় না রে গাই!
তোর পানে চেয়ে আছে।

৩

বাছারে! তোর মার মাথা খা,
গহিন বনে যাস্‌নে একা।
তুই বিনে প্রাণ যায় না রাখা,
তোর মুখ দেখে বাঁচে।

মাতৃপ্রেমের উচ্ছ্বাসে অনাথনাথের পত্নীর নয়ন অশ্রুজলে ছল ছল করিতে লাগিল। অনাথনাথ বলিলেন, "তুমি মা পদাবলী জান?"

উত্তর। জানি।

হারমোনিয়মে মধুর পদাবলীর প্রাণদ্রবকরী সুর বাজিয়া উঠিল। বালিকা তাহার সঙ্গে কণ্ঠ আরও কোমল, আরও করুণ করিয়া, গাইতে লাগিল,

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল। ইত্যাদি।

এবার অনাথনাথের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। গীত শেষে আত্মহারা হইয়া বজরার গবাক্ষপথে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া এ গীত যে প্রেমের উচ্ছ্বাস, সে অনন্ত প্রেম-সমুদ্র যেন তাঁহার তুলিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার সরলা পত্নী পদ

প্রেমের ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার মাতৃপ্রাণে মাতৃপ্রেমের সরল ভাব প্রীতি প্রদান করিত। তিনি বলিলেন, "মা! তুই শ্যামা বিষয়ের গান জানিস?" বালিকা এক একবার তাঁহার মাতৃপ্রেমপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, এক একবার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, গাইতে লাগিল,—

মা! আমি তোর কি করেছি?
শুধু তোরে জনম ভরে মা বলে মা ডেকেছি।
চিরজীবন পাষাণীরে!
ভাসালি আঁখি-নীরে,
চিরজীবন দুখানলে দহেছি।
আঁধার দেখে তরাসেতে
চাহিলাম তোর কোলে যেতে,
আমায়ে ত কোলে তুলে নিলি না;—
মা হারা শিশুটির মত,
কেঁদে বেড়াই অবিরত,
নয়নের জল মুছায়ে ত দিলি না,—
সন্তানেরে ব্যথা দিয়ে,
যদি মা, তোর জুড়ায় হিয়ে,
ভাল ভাল তাই তবে হোক, অনেক দুঃখ সয়েছি।

বালিকা তাহার করুণ কণ্ঠে চিত্তদ্রবকরী মূর্চ্ছনা খেলাইয়া তাঁহার মুখের দিকে কাতর ছল ছল বিস্মিত নয়নে চাহিয়া "মা" বলিয়া গাইতে ছিল। উত্তরা অনাথের পত্নীর হৃদয় মাতৃপ্রেমোচ্ছ্বাসে আকুল হইল। তাঁহার ফুল্ল-করিয়া সন্নিভ কপোল বাহিয়া দুই প্রেমধারা বহিতে লাগিল। গীত শেষ গম্ভীর হুঁ ন ছুটিয়া গিয়া বালিকাকে বক্ষে লইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "মা! পরিচয় লই মা। আমি তোকে বুকে বুকে রাখিব, তোকে মেয়ের মত রাখিব, এবং নিজে ছাড়িয়া যাইতে পারিবি না।" বালিকাও কাঁদিতে লাগিল।

বালিকা। রও অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বেদে শিশুটিও সজল চক্ষে অনাথ। বলিল,—"মা! তুমি দিদিকে লইয়া যাও। দিদির বড় দুঃখ। উত্তর। জমাদারে।"

বালিকার মাথা অনাথনাথের পত্নীর বুকে। বালিকা শিশুটিকে বক্ষে বালিকার কর্ণে হীরে গোপাল! তুই আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবি?"

উত্তর। পারিব। তুমি ত আর মার খাইবে না। এই মা যে এমন করিয়া তোমায় আদর করিবে।"

অনাথনাথের শিশুও এমন সময়ে গোপালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া ও সস্নেহে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল,—

"গোপালও যাইবে, আমার সঙ্গে খেলিবে, আমাকে বাজি দেখাইবে। আমিও তোমাকে গোপালের মত আদর করিব। কেমন দিদি! যাইবে? বল, যাইবে!"

বালিকা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ বহুবার চুম্বন করিল এবং তাহার চক্ষের জলে সে ক্ষুদ্র মুখখানি সিক্ত গোলাপ ফুলটির মত করিয়া তুলিল।

অনাথনাথের পত্নী আবার বলিলেন—"সত্যি মা! তুই যাবি?"

বালিকা অঞ্চলে নয়নের জল মুছিয়া বলিল, "মা"—সেই মা সম্বোধনে কি মধুরতা, কি প্রাণের আবেগই ঢালিল। বলিল, মা! এমন করুণাময় দেবদেবীতুল্য পিতা মাতা পাইব, তাঁহাদের চরণ সেবা করিব, অভাগিনীর পক্ষে ততোধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে? কিন্তু মা, এই অন্ধ পিতার ও পাগলী মাতার উপায় কি হইবে? তাহাদিগকে এ সাগরে ভাসাইয়া কেমন করিয়া যাইব?

অনাথনাথ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"কি! বাজিকর অন্ধ!"

বালিকা বলিল, "অন্ধ। অভ্যাসবশতঃ তিনি এমন কঠিন বাজি সকল এমন সুচারুরূপে করেন।"

৪—রণরঙ্গিণী।

দ্বিতীয় প্রহর বেলা। আকাশমণ্ডল
ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ ঘোরতর,
উঠিতেছে সিন্ধুগর্ভ হইতে উত্তাল
মেঘের পশ্চাতে মেঘ; মহাদৈত্য মত,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতেছে বেগে।
মহাকালী প্রকৃতির যেন মহাসেনা
ছুটিয়াছে মহারবে প্রচণ্ড বিক্রমে।
কি যেন ভীষণ যুদ্ধ বিপ্লব ভীষণ
আসন্ন করিতে বিশ্ব দলিত পেষিত!

অল্প অল্প বৃষ্টিধারা ; থাকিয়া থাকিয়া
সবেগে বহিছে বায়ু উড়াইয়া ধরা ;
ছুটাইয়া বেগে সিন্ধুগর্ভে ঘোরতর
কৃষ্ণমেঘছায়াচ্ছন্ন তরঙ্গের পর
তরঙ্গ বিশালতর লহরে লহরে।
স্তম্ভিতা প্রকৃতি-বক্ষে কি যেন উচ্ছ্বাস.
ঘোর বিশ্বসংহারক হইতে নির্গত
চাহিতেছে মহাবাতে মহা বরিষণে,
সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গে, ভীষণ গর্জ্জনে।

অমিয়কে কোলে লইয়া অনাথনাথের পত্নী একটি গবাক্ষের কাছে বসিয়া বিস্তৃতনয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। অনাথনাথও বিস্তৃতনয়নে অধোমুখে গম্ভীরভাবে বজরার বক্ষে ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতেছিলেন, ং থাকিয়া থাকিয়া গবাক্ষপথে চাহিয়া, পত্নীর সঙ্গে কি গুরুতর পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই যে প্রকৃতির সেই ভীষণ ভাব অবলোকন কি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা বোধ হইল না। বজরা যে তরঙ্গাঘাতে টলিতেছিল, সেই টলন যে তাঁহারা অনুভব করিতেছিলেন, কি সেই তরঙ্গাঘাত যে তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, এমন বোধ হইতেছিল না। শিশু অমিয়ও যেন তাহার কিছুই বুঝিতেছে না। সে কেবল তাহার জননীর চিবুক ধরিয়া একবার তাঁহাকে বলিতেছিল, "হাঁ মা! উহাদিগকে আমাদের সঙ্গে লইয়া চল।" অন্যমনস্কা জননীর কাছে কোনও উত্তর না পাইয়া আবার স্বভাবে তাহার পিতাকে বলিতেছিল, "হাঁ বাবা! তুমি উহাদের সঙ্গে ন, উহাদের বড় দুঃখ।" কিন্তু কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন? অজ্ঞাত- একটি বালিকাকে লইয়া গিয়া কি করিবেন? সে কি তাহার ন ছাড়িয়া অন্য জীবন গ্রহণ করিবে? তাঁহারা কি তাহাকে পারিবেন? বালিকাটিই বা কে? তাঁহারাও এই বিষয়েই হইতেছিলেন। প্রকৃতির বক্ষের মত তাঁহাদের হৃদয়ও কি এক চ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। সেই রুদ্ধ উচ্ছ্বাস যেন অশ্রুতে এবং আবেগতরঙ্গময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইতে চেষ্টা পাইতেছিল। শেষে একটি পরামর্শ স্থির করিয়া সেই বেদে ও তাহার প্রেমময়ী ভার্য্যাকে ডাকাইলেন। তখন দর্শকগণ চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্রতীরে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই।

বেদে প্রৌঢ়, দেখিতে যেন ভালমানুষ; আর বেদেনী তাহার ঠিক বিপরীত। তাহার গোবরে বর্ণ, স্থূল অঙ্গ, চক্ষু কোটরস্থ, নাসিকা বিপুল, কিন্তু অগ্রভাগের উপর দিয়া যেন কি একটা বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। মুখের এমনি এক বিকট ভঙ্গী যে, বজরার মধ্যে অমিয় তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া তাহার মায়ের কোলে লুকাইল।

অনাথনাথ বেদেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভানুমতী কি তোমার মেয়ে?"

সে উত্তর করিল, "না।"

বাবু ডাকিয়াছেন শুনিয়া, বেদেনী তাঁহার প্রতি বড় প্রসন্না হইয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, বোকা বাবুটির তাহার ছেলে মেয়ের উপর একটা ভালবাসা হইয়াছে। তাহার সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণবুদ্ধি। অনাথনাথের প্রশ্নমাত্রই সে বুঝিতে পারিল যে, ভানুমতীর উপর অনাথনাথের বিশেষ চক্ষু পড়িয়াছে, এবং তিনি তাহাকে কোনরূপ বিশেষ আনুকূল্য করিবেন। সে যদি তাহার কন্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারে, কিংবা তাহার উপর কোনরূপ বিশেষ অধিকার দেখাইতে না পারে, তবে সে সেই আনুকূল্যের ভাগ পাইবে না। অতএব সে বেদের উত্তরে মহা চটিয়া গেল। তাহার মেজাজটা স্বভাবতই পঞ্চমে বাঁধা থাকে, উহা একেবারে সপ্তমে উঠিল। সে সেই অপূর্ব্ব নাসুনাসিক স্বরে তাহার অযোগ্য স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আহাম্মকের কথা শুন! তোর মেয়ে নয় ত কার মেয়ে রে?" তার পর অনাথনাথের পালা। সে তাঁহার দিকে তাহার বিকট মুখ ফিরাইয়া এবং তাঁহার একটা বিকট ভঙ্গী করিয়া বলিল, "আমার মেয়ে নহে ত কি তোমার মেয়ে? তোমার কথা শুনে যে গা জ্বালা করে।" তাহার পর আবার হতভাগ্য স্বামীর পালা—"কাণা না হ'লে কি কথা বলে?" তাহার পর সে বুঝিল যে, কেবল তিরস্কার করিলে বা করিবেন না। 'আহম্মক' স্বামীর উত্তরটা কাটাইয়া দিতে হইবে বলিল, "বাবু! তুমি ইহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ও কিছুই নাই, তাতে আবার কাণা। এই যে চোখ দেখছ, এতে কি পায় না। আমি হাড় কালী করিয়া, খাটিয়া, উহাকে খাওয়া উহার চলে। ও 'না' বলিল কেন, তা জান? মেয়েটি আমার পূর্ব্ব তাই ওর মেয়ে নয় বলিয়াছে।" তখন আবার স্তম্ভিত স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ওকে আপনার মেয়ে বলিতে যেন ওঁর লজ্জা হয়, পোড়া কপাল আমার! আমি এমন কাণার হাতেই পড়িয়াছি। আমার শরীরটা জ্বলিয়া

কাল হইয়া গেল।" ক্রমে সানুনাসিক স্বর বর্দ্ধিত হইয়া কৃত্রিম রোদনে পরিণত হইল, এবং অঞ্চলের দ্বারা কোটরস্থ চক্ষু দুটি মার্জ্জিত হইতে লাগিল।

অনাথনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কই, মেয়েটি ত তোমাদের মেয়ে—বলিল না। সে ত বলিল, তাহার মা বাপ কে, সে জানে না।"

একেবারে শিমুলস্তূপে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বেদেনী ক্রোধে অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কি! সেও আমার মেয়ে বলিয়া বলে নাই! তাবও আমাকে মা বলিতে লজ্জাবোধ হয়, পোড়ার মুখী! আমি আসি, তুই কোন্ বাদশাজাদী, আমি এখনই বাঁটার চোটে পরিচয় লইব।"

রমণীরত্ন উঠিয়া যাইতেছিলেন, অনাথনাথ যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বভাবের সহিত বলিলেন, "যাইও না, ব'স! তুমি সকাল হইতে মেয়েটিকে দু'বার মারিয়াছ।"

সেই কণ্ঠ শুনিয়া ও সেই কর্ত্তৃত্বভাবাপন্ন মুখ দেখিয়া, সে কিছু ভীত হইল, এবং বসিয়া বলিল, "মারিব না? মারিব না? এমন পোড়াকপালী মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলাম। আমাকে যেখানে সেখানে গাল খাওয়ায়—ওর জন্যে আমার যেখানে সেখানে গঞ্জনা।" বেদেনী সানুনাসিক স্বরে কাঁদিতে লাগিল, এবং চক্ষু মুছিতে লাগিল।

অনাথনাথের পত্নী মনে করিলেন, যথার্থিনী যে পোড়াকপালী, তাহার আর সন্দেহ নাই। এমন দেবীতুল্য মেয়ে না হ'লে এমন পাপিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে?

কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া অনাথনাথ আবার সেইরূপ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার মেয়ে হউক, আর যার মেয়ে হউক, মেয়েটিকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি আমার বড় স্নেহ হইয়াছে। মেয়েটিকে আমাকে দিতে হইবে; তোমরা টাকা চাও টাকা দিব, জায়গা চাও, আমার এ জমিদারীতে জায়গা দিব। বাড়ী ঘর করিয়া দিব,—তোমরা যাহাতে আর এ ব্যবসা না করিয়া, এক জন ভাল গৃহস্থের মত থাকিতে পার।"

বেদে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে মেয়েটিকে বড় ভালবাসিত! অনাথনাথ জমিদার। তিনি মেয়েটিকে যখন এরূপ করিয়া চাহিতেছেন, তখন তাহাকে কত সুখেই রাখিবেন! তাহার নিজেরও বাড়ী, ঘর, জায়গা জমী করিয়া দিবেন। অন্ধের প্রতি ইহার অপেক্ষা আর কি

হইতে পারে? সে আনন্দে অধীর হইল, এবং কৃতজ্ঞতাসূচক গদ গদ কণ্ঠে বলিল,—"অন্ধ ভিখারীর প্রতি বাবুর এই দয়া! বাবুকে ঈশ্বর আরও বড়মানুষ করুন! বাবুর সোনার কলম, রূপার দোয়াত হউক!" তাহার আর বাক্য সরিল না।

বেদেনীও হাতে চাঁদ পাইল। সে বাবুটিকে আরও বোকা সাব্যস্ত করিল। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, এ চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ, সোণার চাঁদ করিতে হইবে। "সে রুক্ষ কণ্ঠে বলিল,—ভাল দয়া! আমার পেটের মেয়েটি, আমার সাত রাজার ধনটি, এঁকে দিব, আর উনি আমাকে একটা ঘর আর একটু জমী দিবেন। কাজ নাই ওঁর দয়ায়। আমরা গরিব মানুষ, গতর খাটাইয়া খাইব। আমার মেয়ে থাকিলে আমি বাজি করিয়া কত টাকা পাইব! আমি লাখ টাকা পাইলেও আমার মেয়ে দিব না।" এই বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল।

অনাথনাথ বুঝিলেন, এ সহজ পাত্রী নহে। তাহার সঙ্গে শিষ্টালাপে চলিবে না। তখন তিনি চক্ষু রাঙ্গা করিয়া ক্রোধাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "বটে! তবে আমি তোকে লাখ টাকা খাওয়াইতেছি। তোর মত পাপিষ্ঠার এরূপ কন্যা কখনও হইতে পারে না। ভানুমতী আমাকে নিজে বলিয়াছে, তাহার পিতা মাতা নাই। আমি তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইব।"

বেদেনী এত ক্ষণে বুঝিল, লোকটা তত বোকা নহে। আরও বুঝিল যে, গতিকটা ভাল নহে। আর ভানুমতীকে তাহার কন্যা বলিলে চলিবে না। তখন সে পটপরিবর্ত্তন করিয়া বড় প্রসন্নমুখে বলিল, "বাবু আপনি বড়লোক; আপনি রাগ করিবেন না। আসল কথা—মেয়েটি বড় সুন্দরী দেখিয়া বাজি শিখাইবার জন্যে অনেক টাকা দিয়া এক জন বৈরাগীর কাছ থেকে আমার পূর্ব্ব স্বামী কিনিয়া লইয়াছিল। আমার টাকার কি হইবে?"

অ। কত টাকা?

বে। ছের টাকা।

অ। কত?

বে। ৫০০৲ টাকা।

অ। বেশ কথা; আমি তাহা দিব।

বে। তার পর তাহাকে এই ২০ বৎসর খাওয়াইয়াছি,—পরাইয়াছি। আমার সে খরচের টাকা কে দিবে?

অনাথনাথ এবার এতটুকু হাসিলেন; কারণ মেয়েটির বয়স ১৫।১৬ বৎসরের বেশী হইতে পারে না। তথাপি তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাও আমি দিব।"

বে। তার পর এই ২০ বৎসর তাহাকে বাজি শিখাইয়াছি। আমার সে টাকা কোথায় পাইব?

অনাথনাথ তাহার জন্যেও টাকা দিতে স্বীকার করিলেন।

বে। তার পর সে আমাদের সঙ্গে থাকিয়া বাজি করিলে—সে আরও ৩০ বৎসর বাজি করিতে পারিবে,—সে টাকাটা একবার হিসাব করিয়া দেখ।

অনাথনাথ তাও একটা হিসাব করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

বে। তার পর এ সব টাকা আমাকে দিতে হইবে। তাহার উপর অন্ধকে দয়া করিয়া তুমি যেরূপ বাড়ী ঘর ও জায়গা জমী দিবে বলিয়াছ, তাহা তো দিবেই।

এত ক্ষণে এ পাপিষ্ঠার প্রাপ্য তালিকার শেষ হইল দেখিয়া, অনাথনাথ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহার বক্ষ হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল; কারণ তিনি বালিকাকে, এই পিশাচীর হস্ত হইতে, যেরূপে হউক, উদ্ধার করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

এমন সময়ে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সমুদ্র ও আকাশ ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। বাজরা উলট পালট হইতে লাগিল। আকাশে বিকটাকার ঘনকৃষ্ণ মেঘ-খণ্ডের পর ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড ভীষণ বেগে ছুটিতেছে। মধ্যে মধ্যে মেঘবিচ্ছেদে আকাশ দেখা যাইতেছে। আকাশের সেই নীলকৃষ্ণ বিচিত্র আকৃতি এবং ঝড়ের ঘূর্ণ্যমান-ভাব লক্ষ্য করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন যে,—একটা ভীষণ ঘূর্ণবাত্যা (cyclone), যাহা তিনি ২।৩ দিবস যাবৎ আশঙ্কা করিতেছিলেন, আগতপ্রায়। তিনি ব্যস্ত হইলেন; এবং কাল উপস্থিত কথার একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাদিগকে টাকা, বাড়ী ও জমি দিবেন বলিয়া, বেদেনীকে বিদায় করিয়া বলিলেন,—"ঝড় বেশী হইলে তোমরা আমার কাছারীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিও।" তাহারা চলিয়া গেলে, তিনি তাঁহার বজরার বন্ধনাদি দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে শুনিলেন যে, বালিকা তাহার নৌকায় বসিয়া আকাশ-সমুদ্রের সম্মিলনের দিকে চাহিয়া—আর এক জন স্থানীয় কবির রচিত একটি গীত গাইতেছে—

১

কি ভীষণ রণে, হের ত্রিভুবনে,
নাচে কালী রণরঙ্গিণী !
কালী বল, কালী বল,
নাচে কাল-বক্ষে কাল-কামিনী ;
নাচে কালী কাল-কলনী।

২

নিশ্চল পুরুষ বক্ষেতে তামসী
নাচিছে প্রকৃতি, করে ধ্বংস-আসি,
ছিন্ন শির, কি রুধির
পরে শ্যাম অঙ্গ শ্যাম-অবনী।

৩

দুই কর লয়, দুই বরাভয়,
—লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,—
সদা শিব, ঊর্দ্ধগ্রীব,
হের ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

৪

প্রকৃতি উলঙ্গ মাতা বিবসনা,
ললাটে অনল, অঙ্গার-বরণা,
চারি ভুজ, ত্রিনয়ন,
ও মা! ধ্বংসরূপে সর্ব্বব্যাপিনী।

৫

জরা ব্যাধি আদি বিকৃতা কিঙ্করী,
নাচে রণ-রঙ্গে ধ্বংস-সহচরী,
অট্ট হাস, কি উল্লাস,
ঘোর শ্মশান নৃমুণ্ডমালিনী।

৬

জন্মে চণ্ড মুণ্ড সৃষ্টি-বিবর্ত্তনে,
রক্তে পশুবীজ রক্তবীজ সনে,
কদাকার, দুরাচার
নাশি, সৃজিয়ে মানব, জননি!

৭

ঘোর অমানিশি, হৃদে ওমা আসি
নাচ রক্তবীজ—কাম ক্রোধ গ্রাসি,
চণ্ড—ক্রোধ, মুণ্ড দেব,
নাশি, কর, সুর-রাজ্য অবনী।

৫—ঝড়।

অপরাহ্ণ ৩টা হইতে প্রকৃত ঘূর্ণবাত্যা (Cyclone) বহিতে আরম্ভ হইল। ঝড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া থাকিয়া থাকিয়া একপ বেগে বহিতে লাগিল, এবং তরঙ্গে অনাথনাথের বজরা তীরে এরূপ আহত হইতে লাগিল যে, আর উহাতে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী কাছারি-বাটীতে যাইবেন, স্থির করিলেন; কিন্তু যাইবেন কিরূপে? একপ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে যে, বজরা হইতে মুখ বাহির করিবার সাধ্য নাই। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ঝড়ে বজরার গবাক্ষ উড়াইয়া নিতে লাগিল, এবং ভীষণ বিক্রমে ঝড় বজরার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সম্মুখে বসন বিছানা যাহা পাইলেন, তাহার দ্বারা তাঁহারা স্ত্রীকে আবৃত করিয়া ও আপনি ক্রোড়স্থ শিশু পুত্র সহ আবৃত হইয়া বজরা হইতে অতি কষ্টে অবতীর্ণ হইলেন, এবং কাছারির দিকে চলিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বাম হস্তে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্তু সাধ্য কি, এক পা অগ্রসর হইবেন? ঝড় বেগে তাঁহাদিগকে এক দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। গায়ের আবরণ ও চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা বন্দুকের গুলির মত শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহারা কাঁপিতে লাগিলেন, কাঁদিতে লাগিলেন, শেষে চলিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। সিন্ধুগর্জ্জনে ও ঝটিকাগর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের বোধ হইল, যেন মহাবিক্রমে ধরা প্লাবিত করিতে সিন্ধু ঘোর গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই —এই ৩টা ৩৷৷০ টার সময়ই,—প্রায় চারিদিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। অবিরল বৃষ্টিধারায় যে ক্ষীণালোক আছে, তাহাতেও কিছুই দেখিতে দিতেছে না। তাঁহার ভৃত্য ও মাঝিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে

ধরিল, এবং জড়াইয়া লইয়া হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে জড়-পদার্থের মত লইয়া চলিল। কাছারি, গ্রাম, পাহাড়, সমুদ্র, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বৃষ্টি এরূপ বেগে পড়িতেছিল যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য ছিল না। চক্ষে যেন কঙ্কর প্রবিষ্ট হইতেছে, ঝড়ের বেগে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা কেবল গর্জ্জনমাত্র লক্ষ্য করিয়া এবং উহা পশ্চাতে রাখিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার কাছারি-বাটী সমুদ্রের তীরে বলিলেও চলে। তথাপি ঝড়ের বেগে ঘুরিয়া, ফিরিয়া, পড়িয়া, উঠিয়া, প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে, তিনি মৃতবৎ পত্নীপুত্র সহ কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ আরও শুকাইয়া গেল। কাছারির গৃহ সকল নরনারী ও শিশুতে কোলাহল ও ক্রন্দনধ্বনিতে এরূপ পরিপূর্ণ যে, সেখানে দাঁড়াইবার স্থান নাই, কথা কহিবার সাধ্য নাই। তিনি বুঝিলেন যে, প্রজাদের ঘর বাড়ী সকলই পড়িয়া গিয়াছে। তাহারাও তাঁহার মত অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কাছারিতে আশ্রয় লইয়াছে। অনাথনাথকে দেখিয়া তাহারা সকলেই প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল, "বাবা! বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের কি উপায় হইবে?" কেহ বলিতেছিল,—"ওরে বাড়ী ঘর যাক্, এখন জান্ থাকিলে হয়।" কেহ—"আমার ছেলে কোথায় গেল," কেহ বা—"মেয়ে কোথায় গেল"—কেহ বা "আমার বুড়া মা বাপ কোথায় গেল"—বলিয়া হাহাকার করিয়া কাছারি হইতে তাহাদের অন্বেষণে উন্মত্তের মত ছুটিয়া যাইতেছে। অনাথনাথের কাছারি ও ছোট ছোট ঘর সকল পড়িয়া গিয়াছে। কেবল কয়েকখানি বড় ঘর আছে, কিন্তু ঝড়ের প্রত্যেক আঘাতে সশব্দে এরূপ কম্পিত হইতেছে যে, তাহাও যে বহুক্ষণ থাকিবে, এমন বোধ হইল না। অনাথনাথ পত্নীপুত্র সহ আর্দ্র বসনাদি ত্যাগ করিয়া ভৃত্যদিগের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া একখানি তক্তপোষের উপর বসিলেন। প্রজাদিগের এই দুরবস্থা দেখিয়া তখন তিনি আপনার বিপদ ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম ভাবনা হইল, সেই অনাথা বালিকা ভানুমতীর জন্যে। তিনি বজরা ত্যাগ করিবার সময়ে বেদেদিগকেও কাছারিতে আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সকল ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করাইয়া তাহাদের কোনও খবর পাইলেন না। তিনি সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা যদি কেহ সেই বেদেদের কি তাহাদের পুত্রকন্যা দুটিকে এখানে আনিতে পার, আমি ১০০৲ টাকা

পুরস্কার দিব।" কেহই সাহস করিল না। এক জন বলিল—"কর্ত্তা! তাহারা কি এতক্ষণ আছে? কোন্ কালে সে ছোটো নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে।" তিনি ক্রমে পুরস্কারের অঙ্ক বাড়াইলেন। কিন্তু সকলে নীরবে শুনিল। তিনি তখন নিজে যাইতে চাহিলেন। তাঁহাকে তাহারা বলে ধরিয়া রাখিল। বলিল,—"কর্ত্তা কি পাগল হইলেন? কোথাকার বেদে, তাহাদের জন্যে আপনার প্রাণটা দিবেন?" তিনি প্রকৃতই আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের ছাড়াইয়া, তাঁহার পত্নী পুত্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া, ছুটিলেন; কিন্তু গৃহের প্রাঙ্গনেই ঝড়ের বেগে এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলেন যে, আর চলিবার শক্তি রহিল না। তাঁহাকে আবার তাঁহার ভৃত্য ও প্রজারা ধরিয়া গৃহে আনিয়া বসন পরিবর্ত্তন করাইল। তিনি বসিয়া, উহাদের কি হইল, কাছারি হইতে দূরবর্ত্তী প্রজাদের কি হইল, ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু ৫টার সময় ঝড় ও বৃষ্টির বেগ এরূপ বর্দ্ধিত হইল, এমন অন্ধকার হইয়া উঠিল যে, তাঁহার কণ্ঠ শোকে রুদ্ধ হইল।

ঘোর অন্ধকার, ঘোরা নিশীথিনী,
যেন অপরাহ্ণ হইল আমার;
অভ্রান্ত কালের অভ্রান্ত গতিতে
যেন ঘোর ভ্রান্তি হইল সঞ্চার।
ঘোর গরজন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ভৈরব বিক্রমে ঝটিকা ঘূর্ণিত;
রহিয়া রহিয়া, আসিছে ধাইছে,
আঘাতে পৃথিবী করিয়া কম্পিত।
ভীষণ আঘাত সহিতে না পারি,
হইতেছে যেন ঘন ভূকম্পন;
ঘোর হুহুঙ্কার, ঝড় বৃষ্টি মিলি,
ধরাধ্বংসকারী করিতেছে রণ।
ঝড়ের গর্জ্জন, সিন্ধু-আস্ফালন,
কি ঘোর আরাব উঠিছে ভাসি!
যেন ঘোরারাবী, মহারৌদ্রী কালী,
নাচিছে তাণ্ডব ঘোর অট্টহাসি।

ঝলকে ঝলকে, সে ভীষণ হাসি,
ঝলসি বিদ্যুতে জলদ-নীলিমা,
ভাসে তবে স্তরে, ঘোর কৃষ্ণাকাশে,
দেখাইয়া কিবা ধ্বংসমূর্ত্তি ভীমা।
সমুদ্রের গর্ভে, উঠিছে জ্বলিয়া,
বাড়বাগ্নি মত অনলরাশি;
রুদ্ধ ক্রোধানল, বক্ষ বিদারিয়া,
বসুধার যেন উঠিছে ভাসি।
সে ভীম আলোকে, বক্ষে জলধির,
কি মহাবিপ্লব দেখায় ভীষণ;
পর্ব্বত-প্রতিম, কি তরঙ্গমালা,
করিছে ফেনিল সিন্ধু বিলোড়ন!
ঝটিকার সনে, যেন মহাসিন্ধু,
মাতিয়াছে মহা প্রলয় আহবে;
অসংখ্য কামান, বজ্র সংখ্যাতীত,
গর্জ্জিতেছে যেন অবিরাম রবে।
উচ্চ গৃহাবলী, মহা মহীরুহ,
পড়িছে ভাঙ্গিয়া তৃণবৃষ্টি মত;
পড়িছে অসংখ্য, রথ রথী যেন,
ভৌতিক সংগ্রামে হইয়া হত।
কোথাও পতিত গৃহ, গৃহস্থিত
অনলে হঠাৎ উঠিছে জ্বলিয়া;
করিছে ঝটিকা, কি কৌতুকক্রীড়া,
অগ্নিশিখা মেঘে মেঘে মাখাইয়া।
ঘন ঘন ঘোর, ঝটিকা-গর্জ্জন,
শুণিধারা মত বৃষ্টিবরিষণ;
ঘন ভূকম্পন, মেঘ স্তরে স্তরে,
ঘন ঘন স্থায়ী বিদ্যুৎস্ফুরণ;
মেঘে তরঙ্গিত অগ্নি ঘোরাকাশে,
অগ্নি নীলাম্বুধি-গর্ভে তরঙ্গিত;

গৃহের পতন, বৃক্ষ-উৎপাটন,
ভৈরব আরাবে দিক বিলোড়িত।

আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। কালি কালীপূজা। অনাথনাথের কর্ণে ভানুমতীর সেই গীত যেন কি এক ভীম কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—

"কি ভীষণরণে, দেখ ত্রিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী।"

তাঁহার বোধ হইল, যেন সেই মহামেঘপ্রভা সৃষ্টি-সংহারিণী ধ্বংসরূপিণী মহাশক্তি সৃষ্টি সংহার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন। সেই ঘোর অন্ধকার তাঁহারই বর্ণ। সেই ঝটিকা তাঁহারই গতি ও নৃত্য। ঝটিকার রহিয়া রহিয়া সেই ভীষণাঘাত তাঁহারই অসিপ্রহার। তাঁহারই পদদলনে সিন্ধু বিলোড়িত হইয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। মেঘস্তরে যে আলোক দেখা যাইতেছে, উহা তাঁহার নেত্রানল, এবং বারিধারা তাঁহারই লোলজিহ্বাবিগলিত রুধিরধারা। অনাথনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, ঘূর্ণবাত্যায় সহস্র সহস্র লোক, সংহারকারিণীর গ্রাসে পতিত হইবা তাঁহাকে রুধিরপ্লাবিতা নরমুণ্ডমালিনী সাজাইতেছে। সমুদ্রে ও আকাশে আলোকরাশি দেখিয়া সকলের মনে সমধিক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ আলোক কিসের, কেহই স্থির করিতে পারিতেছিল না। কয়েক দিবস যাবৎ যেরূপ দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল, অনাথনাথ যেরূপ গন্ধকের গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন, এখনও ঝটিকা যেরূপ গন্ধকের গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল, তাহাতে তাঁহার বোধ হইল, ভূগর্ভস্থ গৈরিকাগ্নি সমুদ্রে নির্গত হইতেছে। আকাশেও তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রজ্বলিত গুহাগ্নিতে মেঘমালা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হইতেছে। স্থানে স্থানে যেন বিদ্যুদালোকে মেঘস্তর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিতেছে, এবং ঝটিকার ভীষণ ক্রীড়া ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। ৫টার সময় হইতে ঘোরতর অন্ধকার হইয়াছিল। ৬টার সময়ে ঠিক যেন অমাবস্যার নিশীথের মত অন্ধকার হইল; এবং দক্ষিণ দিক হইতে এরূপ ভীষণ বেগে ঝড় বহিতে লাগিল যে, আর তাঁহাদের ঘরে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল। যে কাছারি-ঘরে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য বৃক্ষের ২০০ খুঁটি ছিল। কিন্তু তথাপি গৃহখানি প্রত্যেক আঘাতে মড় মড় শব্দে কাঁপিতে লাগিল। প্রত্যেক আঘাতের পর ঝটিকা আবার ঘুরিয়া আসিয়া, যেন বল সঞ্চয় করিতে একটু বিরাম লইয়া, আবার সমধিক বিক্রমে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে। যেন থাকিয়া থাকিয়া শত সহস্র মত্ত বারণ গৃহের দক্ষিণ দিকে

এক সঙ্গে আক্রমণ করিতেছে। বাঁশের নিবিড় দৃঢ় বেড়া ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলির মত বৃষ্টির ফোঁটা তাঁহাদের গায়ে পড়িতে লাগিল, এবং গৃহে জলপূর্ণ করিয়া ফেলিল। দারুণ শীতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া কাঁপিতে লাগিল। শিশু পুত্রটির জন্যে তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। কিন্তু ঘর যেরূপ কাঁপিতেছে এবং প্রত্যেক আঘাতে পড়-পড় হইতেছে,—দক্ষিণ দিকে যেন শত সহস্র কামানের গোলা বর্ষিত হইতেছে,—অনাথনাথ আর এ ঘরে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে অন্যগৃহস্থিত লোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। অন্য দুই একখানি ঘর, যাহা এতক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও পড়িয়া গেল। তখনই এই ঘরের লোকও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "ঘর পড়িতেছে, ঘর পড়িতেছে, বাবু! বাহির হউন!" এবং জনতা পরস্পরকে দলিত করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিল। কত লোক পড়িয়া গেল, তাহাদের উপর দিয়া কত লোক চলিয়া গেল।

অনাথনাথ পুত্রটিকে বুকে লইয়া ও পত্নীকে বাম করে জড়াইয়া বহির্গত হইলেন, আর তখনই ঝড়ে ২০০ বৃহৎ কাঠের খুঁটি মধ্যভাগে তৃণবৎ ভাঙ্গিয়া গৃহখানি ভূতলশায়ী করিল। কয়েক জন ঘর চাপা পড়িয়া মরিল; কয়েক জন মৃত্যুমুখে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সে আর্ত্তনাদ ঝড়ে উড়িয়া গেল, কেহ শুনিল না। আর শুনিবেই বা কে? ঝটিকার ও সিন্ধুর মিশ্রিত ভৈরব নিনাদে পৃথিবী যেন কাঁপিতেছে, বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারাও "হা ঈশ্বর! হা আল্লা!" রবে আর্ত্তনাদ করিতেছে। কিন্তু কার আর্ত্তনাদ কে শুনে? তখন সকলেই আত্মরক্ষার জন্যে, আত্মীয়রক্ষার জন্যে ব্যাকুল। এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; বৃষ্টিধারাও এরূপ বেগে পড়িতেছে যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য নাই; শরীরের অস্থিতে পর্য্যন্ত যেন সে ধারা প্রবেশ করিতেছে, এবং দারুণ শীতসঞ্চার করিতেছে। তাহাতে আবার রহিয়া রহিয়া শিলাবৃষ্টিও হইতেছে। লোকে পতিত বৃক্ষের ডালের নীচে, পতিত গৃহের চালের নীচে, যে যেখানে পারিল আশ্রয় লইল। অনাথনাথও সপরিবারে একখানি চালের নীচে গেলেন, এবং পুত্রটিকে বুকে লইয়া পতিপত্নী সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন এরূপ গাঢ় অন্ধকার যে, হস্ত প্রসারিত করিলেও দেখা যাইতেছিল না। কেবল অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া হাতড়াইয়া, পতিত

চালের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কেবল কখন কখন সমুদ্রগর্ভে সেই ভীষণ অগ্নিশিখা, কখন কখন স্থায়ী বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত, ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তরমাত্র দেখা যাইতেছিল, এবং সেই আলোকে ভীষণ সংহারক্রীড়া নেত্রগোচর হইয়া হৃদয়ে আরও ভীতি সঞ্চারিত হইতেছিল। পতিপত্নী উভয়ে জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া কেবল শিশুটিকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবানকে ডাকিতেছিলেন।

রাত্রি অনুমান এক প্রহরের সময়ে সমুদ্র যেন ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর, এবং নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। তখন অনাথনাথ প্রথম হইতে যে সমুদ্রপ্লাবনের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাঁহার সেই আশঙ্কা আরও গুরুতর হইল। ঝড় তখন পশ্চিমসমুদ্রের দিক হইতে বহিতেছে বুঝিয়া, সে আশঙ্কায় তাঁহার কণ্ঠ তালুকা শুকাইয়া গেল। এ আশঙ্কা মনে উদিত হইবামাত্রই চারি দিকে লোকেরা "গর্গি! গর্গি!" বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং "চালে উঠ! গাছে উঠ!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনাথনাথও পত্নী পুত্রকে লইয়া একটা চালের উপর উঠিলেন, এবং তখনই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি প্রকাণ্ড সমুদ্রতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাদিগকে গুরুতর আঘাত করিয়া মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল; এবং চালাখানি সেই সঙ্গে ভাসাইয়া নিল। অনাথনাথ একখানি উড়ানি দ্বারা তাঁহার পত্নী পুত্রকে আপনার দেহের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত পরে দ্বিতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া সে চালাখানি উল্টাইয়া দিল, এবং তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া ভীষণ বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। অনাথনাথ খুব বলিষ্ঠ পুরুষ ও সন্তরণপটু ছিলেন। জলরাশির উপর ভাসিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই লক্ষ্মী-স্বরূপা পতিপ্রাণা পত্নী নাই। তরঙ্গে উড়ানি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় যেন ঝটিকা অপেক্ষাও বিরাট শব্দ করিয়া বিদীর্ণ হইল; তিনি ডুবিয়া গেলেন। আবার যখন উঠিলেন, তখন একখানি কাষ্ঠ বেগে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার বক্ষঃস্থ পুত্রটিকে ভীষণ আঘাত করিল। আঘাতে উভয়ে চীৎকার করিলেন। সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ঝড়ে ভাসিয়া গেল। তিনি বামহস্তে পুত্রকে ধরিয়া সন্তরণ করিতেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ হস্তে ও বক্ষে এরূপ ব্যথা অনুভব করিলেন যে, পুত্রকে ও আপনাকে রক্ষা করিবার আশা তিনি ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহেও যেন মূর্চ্ছা সঞ্চারিত হইতেছিল। তিনি সেই অর্দ্ধমূর্চ্ছিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"কেহ যদি

আমার পুত্রটিকে রক্ষা কর, আমার সমস্ত বিষয় তাহাকে দিব।" এমন সময়ে দৈববাণীর মত তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল,—"বাবা! ভয় নাই, তুমি মাকে রক্ষা কর। আমি অমিয়কে রক্ষা করিব।" অনাথনাথ কেবল বলিলেন,—"মা! তুই কে? তুই কি সত্যই 'কমলে কামিনী দুর্গা'?" এমন সময়ে কর্দ্দমময় তৃতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আহত করিল। নাকে মুখে কর্দ্দমাক্ত জল প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ফেলিল। অনাথনাথ মূর্চ্ছিত হইলেন।

হেমাদ্রি।

হেমাদ্রি অভিপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তিনি "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" নামক অতিবিস্তীর্ণ স্মৃতিগ্রন্থ সংগৃহীত করেন। এই প্রশস্ত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সমগ্র প্রতিলিপি ভারতবর্ষের কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সুবিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহে নানাবিধ বিষয় অতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হেমাদ্রির পূর্ব্বতন অসংখ্য স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থ হইতে নানা স্থল প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরা চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির বিভিন্ন অংশ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। ব্রত, দান, কাল, শ্রাদ্ধ, তীর্থ, মোক্ষ ও পরিশিষ্ট নামে এই সকল খণ্ড পরিচিত। কাল ও শ্রাদ্ধের বিষয় পরিশিষ্ট খণ্ডেই বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই পরিশিষ্টখণ্ডে দেব ও প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ও বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের প্রথম ভাগে ব্রত, দ্বিতীয় ভাগে দান, তৃতীয় ভাগে তীর্থ ও চতুর্থ ভাগে মোক্ষ, বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে। *

"চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" ভিন্ন হেমাদ্রি "মুগ্ধবোধ"-কার বোপদেবের প্রণীত "মুক্তাফল" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থের টীকা এবং বাগ্‌ভটের "আয়ুর্ব্বেদরসায়ন"-নামক বৈদ্যকপুস্তকের ভাষ্য রচনা করেন, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

* Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Dekkan", P. 89.
Dr. Mittra's Notice of Sanskrit Mss, III. 349.
Proceedings of Asiatic Society of Bengal for 1884, p. 20.

কলিকাতার সুবিখ্যাত এসিয়াটিক সোসাইটীর অর্থব্যয়ে চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'দানখণ্ড' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক, স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণির প্রতি এই গ্রন্থের সম্পাদনভার অর্পিত হয়। 'দানখণ্ড' ও 'ব্রতখণ্ডের' অধিকাংশ প্রচারিত হইবার পর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তদনন্তর ইহার সম্পাদকতার ভার পণ্ডিত রামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রতি ন্যস্ত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রতখণ্ড' সমাপ্ত করিয়া, তাঁহারা 'পরিশিষ্টখণ্ডের' প্রকাশ আরম্ভ করেন। অদ্যাপি এই তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই।

হেমাদ্রি দক্ষিণাপথের অন্তর্গত দেবগিরি নগরে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবগিরির যাদববংশীয় মহারাজ কৃষ্ণদেব, মহাদেব ও রামচন্দ্র দেবের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির 'ব্রতখণ্ডের' আরম্ভে তিনি যাদববংশীয় নরপতিদিগের বিস্তারিত বিবরণ প্রদানপূর্ব্বক 'পরিশিষ্টখণ্ডের' আরম্ভে আত্মপরিচয় বর্ণিত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

বংশো হিমাংশোর্যযাতেঃ প্রসিদ্ধো যস্মিন্ স রাজা যদুরাবিবাসীৎ।
বভুব যস্মিন্নসুরাবতারভারাপহারায় পুরা মুরারিঃ ॥ ৩ ॥
বংশে তস্মিন্ কংসনিধ্বংসনস্য কৌণীপালো 'ভিল্লমঃ' প্রাদুরাসীৎ।
উদ্দামদর্পরিপুসর্পবিহঙ্গরাজঃ শ্রীভিল্লমাদবনিপোঽজনি 'জৈত্রপালঃ' ॥ ৪ ॥
তস্মাদভূদভিনবস্মরচারুমূর্ত্তিঃ কীর্ত্তেঃ পদং জগতি 'সিংহণদেব'-ভূপঃ।
অভবদবনিপালো 'জৈতুগি'র্নাম তস্মাৎ অসমসমরধীমদ্বেষিভূপালকালঃ ॥ ৭ ॥
স মহীপালো জনগাম্বভূব 'কৃষ্ণং মহাদেব'-মহীপতিং চ।
হিত্বায় লোকস্য যথা পয়োধিশ্চিন্তামণিং কৌস্তুভমপ্যুদারং ॥ ৮ ॥
অথ প্রভাবাতিশয়েন লব্ধং বিভজ্য লোকাদ্বিতীয়াধিপত্যং।
ত্রিবিষ্টপং শাসতি কৃষ্ণভূপে ভুবং মহাদেবনৃপাঃ প্রশাস্তি ॥ ১২ ॥
আসে মণ্ডিতদণ্ডকাপরিসরঃ শ্রী-সেউণাখ্যঃ পরং
দেশঃ পেশলবেশভূষণ-বচোমাধুর্য্য-ধুর্য্যাকৃতিঃ।
তস্মিন্ দেবগিরিঃ পুরী বিজয়তে ত্রৈলোক্যসারশ্রিয়াং
বিশ্রান্তিঃ সুরশালিশৈলশিখরস্পর্দ্ধিষু-সৌধাবলিঃ ॥ ১৯ ॥
জগৎত্রয়ীগীতগুণপ্রশস্তিঃ শাস্তা সমস্তাবনিমণ্ডলস্য।
শ্রীমানিমাশঙ্করবাজধানীং সোঽয়ং মহাদেবনৃপো বিভর্ত্তি ॥ ২০ ॥
যা সম্পৎ তদিদং যশো বলমিদং সোঽয়ং প্রতাপো মহান্

একৈকং পৃথিবীভৃতো ভুবি মহাদেবস্য লোকোত্তরং।
যস্য শ্রীকৃষ্ণরাধিণঃ স্বয়মযং হেমাদ্রিসূরিঃ পুরঃ
প্রৌঢ়প্রাতিভ-বর্ণমান-বিলসদ্-বংশো ভৃশং শোভতে ॥ ২২ ॥

ভগবান চন্দ্রমা হইতে যদুবংশ উদ্ভূত হয়। চন্দ্রের পর বুধ, পুরূরবা, আয়ু, নহুষ, যযাতি ও যদু যথাক্রমে পৈতৃক রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। এই যদু হইতে যদুবংশ আবির্ভূত হয়। যদুবংশ প্রথমতঃ মথুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে গুজরাটের অন্তর্গত দ্বারাবতী নগরীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ সুবাহু। তিনি আপন চারি পুত্রের মধ্যে স্বরাজ্য বিভক্ত করিয়া লোকান্তরিত হন। সুবাহুর দ্বিতীয় পুত্র দৃঢ়প্রহার দক্ষিণাপথের আধিপত্য লাভ করিয়া, শ্রীনগরে রাজধানী সংস্থাপিত করেন। এই দৃঢ়প্রহার দেবগিরির যাদববংশের আদিপুরুষ। দৃঢ়প্রহারের পুত্র সেউনচন্দ্রের নাম অনুসারে, তাঁহার শাসিত রাজ্য সেউনদেশ নামে পরিচিত হয়। নাসিক হইতে দেবগিরি পর্য্যন্ত সেউনদেশ বিস্তারিত ছিল।

এই সেউনচন্দ্রের একবিংশতিম অধস্তন পুরুষ ভিল্লম। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে (১১০৯ শকাব্দে) মহারাজ ভিল্লমের দ্বারা দেবগিরি নগরী দণ্ডকারণ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দেবগিরিতে আপনার রাজধানীর সংস্থাপন করেন। দৃঢ়প্রহার হইতে ভিল্লম পর্য্যন্ত ত্রয়োবিংশতি জন যাদববংশীয় নরপতির নাম স্বরচিত ব্রতখণ্ডের আরম্ভে হেমাদ্রি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়া, ভিল্লমের ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রহারের আবির্ভাবকাল পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, অনুমান ৭৪০ খৃষ্টাব্দে যাদববংশ দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রাজী, যাদববংশীয় একখানি তাম্রশাসনের প্রথম বিবরণ প্রকাশ করেন।* ইহা ৯৯১ শকাব্দে (১০৬৯ খৃঃ) যাদবরাজ দ্বিতীয় সেউনচন্দ্রের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। এই শাসনপত্র হইতে জানা যায় যে, দৃঢ়প্রহার চন্দ্রাদিত্যপুরে রাজত্ব করিতেন। ইহা এক্ষণে চান্দোর নামে পরিচিত, এবং বর্ত্তমান নাসিক জেলায় অবস্থিত। ব্রতখণ্ডের উল্লিখিত 'শ্রীনগরী' তাম্রশাসনে 'চন্দ্রাদিত্যপুর' নামে বর্ণিত হইয়াছে। যাদবরাজ দ্বিতীয় সেউনচন্দ্রের সাহায্যে পরমর্দ্দিদেব কল্যানগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। চালুক্য সম্রাট দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল দেব ১০৭৬—

* Indian Antiquary for 1883 XII, 109—125.

১১২৬ খৃষ্টাব্দে (৯৯৮—১০৪৮ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কল্যাণ নগরে রাজত্ব করেন। এই চালুক্য সম্রাট বিক্রমাদিত্য কাশ্মীরের প্রমাণিক ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে পরমর্দ্দিদেব নামে বর্ণিত হইয়াছেন। কাশ্মীরী পণ্ডিত বিল্হণ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রভুর কীর্ত্তি-কাহিনী 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি কাশ্মীর-নরপতি কলসদেব ও অনন্তদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

কাশ্মীরেভ্যো বিনির্যাতং রাজ্ঞঃ কলসভূপতেঃ।
বিদ্যাপতিং যং কর্ণাটচক্রে পর্মাড়িভূপতিঃ ॥—রাজতরঙ্গিণী; ৭—১৩৫।

সম্রাট বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৬ খৃঃ) পরমর্দ্দিদেব নামে হেমাদ্রির গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছেন।

সমুদ্ধৃতো যেন মহাভুজেন দ্বিষাং বিমর্দ্দাৎ পরমর্দ্দিদেবঃ।
আস্থাপি চালুক্যকুলপ্রদীপঃ কল্যাণরাজ্যোঽপি স এব যেন ॥—ব্রতখণ্ড।

পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সেউনচন্দ্রের প্রপৌত্র মল্লুগি। এই মল্লুগির পৌত্র গোবিন্দরাজ সম্ভবতঃ মনুসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। মল্লুগির পুত্র ভিল্লমের রাজত্বকাল হইতে দেবগিরির আধিপত্য সবিশেষ বিস্তারিত হয়। ভিল্লমের পৌত্র সিংহণের অধিকার সমগ্র দক্ষিণাপথে প্রসারিত হয়। এই সিংহণের পৌত্র মহাদেবের মন্ত্রী হেমাদ্রি "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি"র রচনা করেন। ব্রতখণ্ডের উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টরূপে তাহার উপলব্ধি হইতেছে।

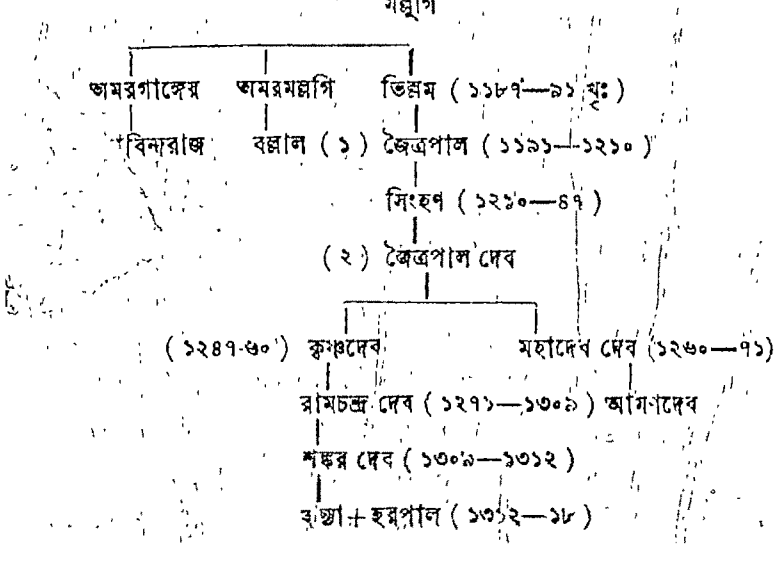

মহারাজ মহাদেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র আমণদেব পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আমণদেবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র রামচন্দ্রদেব দেবগিরির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই রামচন্দ্রদেব দক্ষিণাপথের যাদববংশীয় শেষ হিন্দু সম্রাট। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন খিলজী অষ্ট সহস্র মুসলমান সেনা সহ অতর্কিতভাবে দেবগিরির অভিমুখে ধাবিত হন। রামচন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বহুমূল্য উপহারপ্রদানে বিজেতা আলাউদ্দিনের সন্তোষসাধনে বাধ্য হন। দিল্লীশ্বরকে কন্যাদানে সম্মত হইয়া, রামচন্দ্রদেব বিজয়ী মুসলমান সেনাপতির হস্ত হইতে অক্ষতশরীরে নিষ্কৃতি পান। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে রাজা রামচন্দ্রদেব দিল্লীশ্বরের বার্ষিক করপ্রেরণে বিরত হন। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ত্রিংশৎ সহস্র সেনার সহিত আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করেন। রাজা রামচন্দ্রদেব পরাজিত হইয়া, বন্দিভাবে দিল্লীতে নীত হন। ছয় মাস পরে কারামুক্ত হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অনুমতি পান। তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীশ্বরকে বৎসর বৎসর রীতিমত কর দিতে থাকেন।

১৩০৯ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র শঙ্কর দেব দিল্লীতে করপ্রেরণে বিরত থাকেন। ১৩১২ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি মালিক কাফুর পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ করেন। শঙ্করদেব যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দেবগিরি দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়, এবং তাহার শাসনার্থ মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

১৩১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর, তাঁহার সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে শঙ্করদেবের ভগিনীপতি হরপাল দেব দেবগিরি হইতে মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে দূরীভূত করিয়া হিন্দু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩১৭ খৃঃ দিল্লীশ্বর মুবারিক তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে হরপাল বন্দী হন। মুসলমান সম্রাটের আদেশে বিদ্রোহী হরপালের চর্ম্ম উত্তোলিত হইয়া, অতিনৃশংসভাবে তাঁহার বধকার্য্য সম্পাদিত হয়। এইরূপে দক্ষিণাপথে হিন্দুসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া, মুসলমান অধিকার প্রসারিত হয়।

মন্ত্রিবর হেমাদ্রি চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির পরিশেষখণ্ডের আরম্ভে বিস্তারিতভাবে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে আপনার প্রভু মহারাজ

মহাদেবের পিতা ও পিতামহের উল্লেখ করিয়া, আপনার বংশের পরিচয় দিয়াছেন। বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে হেমাদ্রির জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কামদেব। হেমাদ্রি বাসুদেবের পৌত্র ও বামনদেবের প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি স্বয়ং মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অতিবদান্য, ধার্ম্মিক ও সাহসী ছিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। প্রত্যহ তাঁহার গৃহে বহুতর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইতেন। ব্রাহ্মণভোজন না করাইয়া তিনি কখনও জল গ্রহণ করিতেন না। তিনি মহারাজ মহাদেবের করণেশ্বর (প্রধান মন্ত্রীর) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে অত্যন্ত মান্য করিতেন। নিম্নে চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির পরিশেষ খণ্ডের আরম্ভ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

সিন্ধ্বণাদভবৎ প্রৌঢ়প্রতাপানল-দুর্জ্জয়ঃ। তনুজো বিজিতারাতির্জৈত্রপাল ইতীরিতঃ॥
তস্মাদপি মহাদেবঃ পালিতাশেষভূতলঃ। বিজিতাশেষদিক্‌চক্রো বিক্রমৈকরসোঽভবৎ॥
ভূপেন তেনাথ কৃতোঽধিনাথঃ স্ফারশ্রিয়া শ্রীকরণে মনস্বী।
হেমাদ্রিনামাস্ত চ বর্ণ্যমানং বংশং সমাকর্ণয়তি প্রকাশং॥
স্বাধ্যায়াধ্যয়নপ্রবীণ-ধষণীগীর্ব্বাণচূড়ামণিঃ
বংশে বৎসমুনের্মনোহরগুণগ্রামাভিরামাকৃতিঃ।
জজ্ঞে বামনসংজ্ঞকো বলিকথাগাথাসমুন্মীলিত-
প্রত্যগ্রাপ্রতিমপ্রভাবরুচিরাং যঃ প্রাপ লক্ষ্মীং পরাং॥
স প্রাসূত সুতং নবোজ্জ্বলকলাসম্ভারগোষ্ঠীমদং
হৃতস্ফীতগলোদগলন্নবরস-প্রহ্লাদি-বেদোদয়ং।
পুণ্যাবর্ত্তনসর্গসজ্জনমনঃসন্তোষবর্ষাহ্রদং
শশ্বদ্দেবরহস্যবস্তুবসিকং শ্রীবাসুদেবাহ্বয়ং॥
পীতশ্রাদ্ধভিনবসুধা-সোদরালাপলীলঃ
[illegible]রপ্রববধিষণা-জোবিতাশেষলোকঃ।
[illegible]চং ভ্যথতি ন গুরা কাপি যঃ শকটেঽপি
[illegible]ঃ সুকৃতরসিকো নাগতঃ কামদেবঃ॥
তস্মাদ্ বিস্ময়নীয়পুণ্যচরিতো হেমাদ্রিনামাজনি
প্রত্যগ্রাপ্রতিমপ্রভাবরুচিরসদ্-বিদ্যোদয়শ্রীনিধিঃ।
যোঽসৌ সর্ব্বকলাবিশারদশিরোরত্নাঙ্কুরো ভাস্বরঃ
সর্ব্বশ্রীকরণেশ্বরো নৃপমহাদেবস্য মান্যোঽভবৎ॥
জ্ঞাতুং নীতিবহুত্বমস্য শুকতাং যত্নেহতে শিষ্যতাং
নূনং সোঽপি বৃহস্পতিঃ স চ কবির্যত্নেন সংপূজতে।

সোঽয়ং চিত্রচরিত্রমাত্মসদৃশৈর্মন্ত্রী শ্রচূড়ামণিঃ
হেমাদ্রির্নিনায় বিস্ময়রসং কং ধীরধুর্যং নরং।
শাস্ত্রং তেন সমস্তবার্ত্তিনিঃশেষবার্ত্তিনির্বর্ত্তকং।
গ্রন্থিতঞ্চ চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিসমাহ্বয়ং॥
ইহানুপূর্ব্বেণ নিনির্ম্মিতানি পঞ্চ প্রপঞ্চেন চ খণ্ডকানি।
ব্রতেষু দানেষু চ তীর্থসার্থে মোক্ষে চ সেহেঽথ তথার্থজাতে॥
বহূনি শাস্ত্রাণি বিমৃশ্য রচ্যতে শ্রাদ্ধস্য করোঽয়মতিপ্রযত্নতঃ।
ইহোপনেয়ঃ সহসা ন কেনচিৎ দোষো ভবীয়ানপি বুদ্ধিশালিনা॥
দানে দানবপুঙ্গবং বলিমথ দ্বৈপায়নং ব্যাসুয়ে
র্ব্বন্দ্যপাদযমুনীংস্তপসি যঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষে গুরং।
সোঽয়ং গোরভতে পযোধিতনয়াশেষেশ্বরং সংস্মরন্
হেমাদ্রির্নিহিতং প্রযোগমধুনা শ্রাদ্ধস্য বক্তুং ধীঃ॥—পরিশেষখণ্ড।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, হেমাদ্রি দেবগিরির মহারাজ মহাদেবদেব, আমণদেব ও রামচন্দ্রদেবের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৬০—১৩০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই তিন জন নরপতি দেবগিরিতে রাজত্ব করেন। ইহা হইতে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেবগিরি নগরে ব্রাহ্মণকুলে হেমাদ্রির জন্ম হয়। হেমাদ্রির ন্যায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা দেবগিরির যাদববংশীয় নৃপতিদিগের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় সংস্কৃতবিৎ উইলসন সাহেব হেমাদ্রিকে দেবগিরির অধীশ্বর বলিয়া অনুমান করেন। তদনুসারে স্বসম্পাদিত 'দানখণ্ডে'র সংস্কৃত ভূমিকায় পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি হেমাদ্রিকে প্রথমতঃ দেবগিরির নরপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পরে তিনি আ সংশোধিত করেন। উইলসন সাহেবের ভ্রান্ত মতের প্রতি নির্ভর ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথম ভাগে, অধুনা স্বর্গগত, বিজ্ঞোৎসাহী ড দাস সেন, হেমাদ্রিকে দেবগিরির অধিপতি বলিয়া পরিচিত ক পুস্তকের তৃতীয় ভাগে তিনি নিজের ভ্রম পরিত্যাগ করিতে বা রামদাস বাবু কালিদাসাদি অন্যান্য গ্রন্থকারের ন্যায় হেমাদ্রির সম্বন্ধেও নি রূপে কোনও কথা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। 'মুক্তাফল'-নামক গ্রন্থের পরিচয়প্রদানকালে, ডাক্তর মিত্র, হেমাদ্রিকে দেবগিরির রাজা বলিয়া ভ্রমক্রমে নির্দ্দেশ করেন। ডাক্তর জলি সাহেব হেমাদ্রিকে মহাদেবের প্রধান মন্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু হেমাদ্রির সময়নির্ণয়ে ডাক্তর জলি ভ্রমে পতিত

হইয়াছেন। তাঁহার মতে, হেমাদ্রি ১২৫০ খৃষ্টাব্দে চতুর্বর্গচিন্তামণির রচনা করেন। পরিশেষ খণ্ডের অন্তর্গত 'কালনির্ণয়' নামক অংশের একখানি ১৪০২ শকাব্দের (১৪৮০ খৃঃ) লিখিত প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে; ইহা নাগরাক্ষরে লিখিত। ইহা হইতে হেমাদ্রির অধস্তন সময় জানা যাইতেছে।

মহারাজ মহাদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র দেবের (১২৭১—১৩০৯ খৃঃ) সময়ে হেমাদ্রি বোপদেবের প্রণীত মুক্তাফলের টীকার রচনা করেন। এই রামচন্দ্র-দেব ইতিহাসে রামরাজ নামে পরিচিত হইয়াছেন। হেমাদ্রির প্রণীত এই টীকার নাম "কৈবল্যদীপিকা"। ইহাতে তিনি বোপদেব গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের ও ভক্তিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন,—

"শ্রীবোপদেবস্য নিবেশ্য পানাং স্বয়ন্তি তে তে ভুবি বাগ্‌বিলাসাঃ।
বিকুণ্ঠা যেষু স্বয়মীশ্বরোঽপি সর্ব্বজ্ঞশব্দং সমবৈতি কৃচ্ছ্রঃ॥
তেন মুক্তাফলং তেনে যত্নোঽমনুগৃহতা।
তত্র টীকাং যথাবুদ্ধি কুর্ব্বে কৈবল্যদীপিকাং॥
হেমাদ্রিঃ কটকে চক্রে শ্রীরামস্য বেশ্মনি॥

ইতি শ্রীমৎপ্রৌঢ়প্রতাপচক্রবর্ত্তি-মহারাজাধিরাজ-সৌমবংশোদ্ভব-রামরাজমন্ত্রিবর্য্য-হেমাদ্রি-দেববিরচিতা-মুক্তাফলটীকা সমাপ্তা।—কৈবল্যদীপিকা। *

হেমাদ্রির সমসাময়িক বোপদেব গোস্বামী দেবগিরির রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন। এই বোপদেব "মুগ্ধবোধ" নামক সুবিখ্যাত ব্যাকরণের রচনা করেন। ভবিষ্যতে বোপদেবের বিবরণ পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

কুশীনগর।

কুশীনগর কোথায়? যেখানে ভগবান শাক্যসিংহ নির্ব্বাণনগরীতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেখানে অশীতিপরবৃদ্ধ বুদ্ধ বিশাল দুই শালতরুর মধ্যে রোরুদ্যমান শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা উপসেবিত হইয়া অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সে কুশীনগর কোথায়? যে স্থানে বহু শতাব্দী পরে পরমসৌগত মহারাজ অশোক প্রকাণ্ড এক নির্ব্বাণস্তূপ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং পরে যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চীন, ব্রহ্ম, তিব্বত, শ্যাম, মলয় প্রভৃতি

* Dr. R. L. Mittra's Notice of Sanskrit Mss.—IV. 67.

ছোট গল্পে মৌলিকতা ও আন্তরিকতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা বাস্তবাদর্শপ্রিয়তার আধিক্য হেতু পাপের প্রত্যেক পৈশাচিক খুঁটিনাটির বর্ণনা করেন, যাঁহাদের বর্ণিত চরিত্র পাপের পূতিগন্ধময়,—তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবার কোনও কথা আছে কি? সে সকল "Dyspeptic pessimist" এর বাস্তবাদর্শপ্রিয়তা রোগবিশেষের এই বিষয়ের বিচারকালে জর্জ গিসিংএর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ফ্রান্সে এখন বাস্তবাদর্শপ্রিয়তার বিকৃতাংশ অনাবৃত। গিদে মোপাসাঁ যাহা এই পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোপাসাঁর জীবনে বিষাদপ্রবণতার অভিসম্পাত ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে আপনার রচিত পথ আপনার পক্ষে সুগম ও অপরের পক্ষে আলোকোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাই যাঁহারা ছোট গল্প-রচনায় তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহারা সকল হইতে পারিতেছেন না।

সাধারণতঃ যুবকগণই অধিক বিষাদপ্রবণ। তাই যুবক লেখকদিগের রচনায় বিষাদের অন্তঃসলিল প্রবাহ প্রবহমান থাকে। যৌবনের পর সংসারে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইয়া লেখকদিগের রচনা বাঁটি হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অনেক সময় তাহাতে অভাব দৃষ্ট হয়, তাহাতে তেজ দেখা যায় না।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

সুমেরু-সন্ধান।

সুমেরু প্রদেশ এখনও আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহার চিরতুষারাবৃত আবাসে মানবের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় নাই। আজিনি পূর্ব্বে ন্যান্সেন সুমেরু প্রদেশে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট পিয়ারী বিগত দ্বাদশ বৎসরে চারি বার সুমেরু-সন্ধানে গমন করিয়া, সুমেরু প্রদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানের নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের (Northward over the 'Great Ice') বর্ণনা অবলম্বন করিয়া আমরা সুমেরু প্রদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের উপহার প্রদান করিতেছি।

ধরণীর উচ্চাবচ বক্ষে সুমেরু প্রদেশের তুষার ও বরফের বিলম্বিত হার গ্রীনল্যাণ্ড সদৃশ মণিস্বরূপ। সেখানে বৈষম্যবৈচিত্র্যে বিস্মিত হইতে হয়। তথায় সন্ধ্যারাত্র সূর্য্যোদয় হয়, আবার দিবাভিসারে নৈশান্ধকার ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। সেখানে গগনচুম্বী গ্রীনল্যাণ্ড।

মণ্ডল প্রধান দেশের আকাশের মত আবার সেখানে চিরতুষার-ব্যাপ্তি। সেখানে কোনও কোনও গিরিশৃঙ্গ প্রাচীনকালীন অগ্ন্যুৎপাত-চিহ্ন বর্ত্তমান, আবার কোনও কোনও পর্ব্বত চিরতুষারমুকুটে মণ্ডিত। গ্রীনল্যাণ্ডের বহির্ভাগ চিরতুষারসমাচ্ছন্ন—দৈর্ঘ্যে প্রায় বারশত মাইল ও প্রস্থে প্রায় ষষ্ঠশত মাইল। এই তুষারমরুর তুলনায় সাহারার মরুভূমি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এখানে জীব নাই,—উদ্ভিদ নাই—এক কণা বালুকা নাই। সেই বরফবিস্তারের মধ্যে কেবল তিনটি জিনিস পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, দিগন্ত-প্রসারিত তুষারাচ্ছন্ন ভূমি, অন্তহীন নীল নভোমণ্ডল, আর রক্তাভ তপন। এই নগণ্য প্রদেশে পিয়ারী ও তাঁহার পত্নী প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া নানা জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছেন। অবিচ্ছিন্ন তুষারবিস্তৃতদর্শন সুমেরু প্রদেশে উপনীত হওয়াই তাঁহাদের অভিলাষ। সেই তুষারাচ্ছন্ন সমতল ভূমিতে কোথাও কোনও অসমতা লক্ষিত হয় না। যেন কোনও দানব শিল্পী সেই তুষাররাশি লইয়া একখানি সুবৃহৎ খণ্ডে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে।

হইয়াছেন। তাঁহার মতে, হেমাদ্রি ১২৫০ খৃষ্টাব্দে চতুর্বর্গচিন্তামণির রচনা করেন। পরিশেষ খণ্ডের অন্তর্গত 'কালনির্ণয়' নামক অংশের একখানি ১৪০২ শকাব্দের (১৪৮০ খৃঃ) লিখিত প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে; ইহা নাগরাক্ষরে লিখিত। ইহা হইতে হেমাদ্রির অধস্তন সময় জানা যাইতেছে।

মহারাজ মহাদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র দেবের (১২৭১—১৩০৯ খৃঃ) সময়ে হেমাদ্রি বোপদেবের প্রণীত মুক্তাফলের টীকার রচনা করেন। এই রামচন্দ্র-দেব ইতিহাসে রামরাজ নামে পরিচিত হইয়াছেন। হেমাদ্রির প্রণীত এই টীকার নাম "কৈবল্যদীপিকা"। ইহাতে তিনি বোপদেব গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের ও তর্কশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন,—

"শ্রীবোপদেবস্য নিরেগুণানাং জয়ন্তি তে তে ভুবি বাগ্‌বিলাসাঃ।
বিকুণ্ঠ্য যেষু স্মরমীশ্বরোঽপি সর্ব্বজ্ঞশঙ্কাং সমবৈতি ক্ষয়ং॥
তেন মুক্তাফলং তেন যল্লোকমনুগৃহ্নতা।
তত্র টীকাং যথাবুদ্ধি কুর্ব্বে কৈবল্যদীপিকাং॥
হেমাদ্রিঃ ফটকে চক্রে রামরাজস্য শাসনে॥

ইতি শ্রীমৎপ্রৌঢ়প্রতাপচক্রবর্ত্তি-মহারাজাধিরাজ-সোমবংশোদ্ভব-রামরাজমন্ত্রিবর্য্য-হেমাদ্রি-দেববিরচিতা-মুক্তাফলটীকা সমাপ্তা।—কৈবল্যদীপিকা। *

হেমাদ্রির সমসাময়িক বোপদেব গোস্বামী দেবগিরির রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন। এই বোপদেব "মুগ্ধবোধ"-নামক সুবিখ্যাত ব্যাকরণের রচনা করেন। ভবিষ্যতে বোপদেবের বিবরণ পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

কুশীনগর।

কুশীনগর কোথায়? যেখানে ভগবান শাক্যসিংহ নির্ব্বাণনগরীতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেখানে অশীতিপরবৃদ্ধ বুদ্ধ বিশাল দুই শালতরুর মধ্যে রোরুদ্যমান শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা উপসেবিত হইয়া অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সে কুশীনগর কোথায়? যে স্থানে বহু শতাব্দী পরে পরমসৌগত মহারাজ অশোক প্রকাণ্ড এক নির্ব্বাণস্তূপ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং পরে যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চীন, ব্রহ্ম, তিব্বত, শ্যাম, মলয় প্রভৃতি

* Dr. R. L. Mittra's Notice of Sanskrit Mss.—IV. 67.

দূরবর্ত্তী দেশদেশান্তর হইতে ভগবানের অন্ত্যলীলাস্থলদর্শনার্থ সমুপাগত শত শত ভক্তের ভক্তি প্রীতি আকর্ষণ করিত, সে কুশীনগর কোথায়?

এখন সে স্থল নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। মহারাজ আশোক প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ যে নির্ব্বাণস্তূপ ও বিহারাদি নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে,—নির্ণয় করিবার আদৌ উপায় নাই। সে বিশাল স্তূপ, বোধ হয়, কালের করাল কবলে গ্রস্ত হইয়াছে; কতক ভগ্ন হইয়াছে; কতক মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়াছে; কতক নিবিড় দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া ভীষণ হিংস্র জন্তুর লীলাভূমি হইয়াছে!

কিন্তু সে ভগ্নস্তূপরাশিই বা কোথায়? এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; এখনও পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ। এখনও দেশদেশান্তর হইতে ভক্ত সৌগতগণ ভগবানের লীলাস্থল পুণ্যভূমি ভারতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু কোথায় তাঁহাদের ইষ্টদেবের সমাধিশয্যা, কেহই তাহা জানেন না। কেহই জানে না,—"কোথায় জগতের চক্ষুঃ" শেষ নিদ্রায় মুদিত হইয়াছিল, কোথায় ভারতের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছিল।

ভারতবাসিগণ এ পর্য্যন্ত আপনাদের পূর্ব্বতন জাতীয় গৌরবরক্ষার্থ প্রাণপণ চেষ্টা করেন নাই। আমরা কেবল ভারতের ভূতপূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া মৌখিক বিলাপ পরিতাপ করি; কিন্তু যাহাতে পূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহের পুনরুদ্ধার হয়, তজ্জন্য আমরা কেহই সামান্যমাত্র শ্রম ও স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিখি নাই। এক জন সহৃদয় ইংরাজ ঐতিহাসিক এ জন্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, "ইংলণ্ডের প্রত্যেক পল্লীর ইতিহাস আছে; কিন্তু সমগ্র গ্রেট্ ব্রিটেন অপেক্ষা কত গুণ বৃহৎ যে ভারতবর্ষ, তাহার ইতিহাস নাই।" * বস্তুতঃ, পূর্ব্বকীর্ত্তির পুনরুদ্ধারে ইংরাজেরা যেরূপ অকাতরে যত্ন, স্বার্থত্যাগ ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহা এ দেশের লোকের অনুকরণস্থল। তাহার শতাংশের একাংশও যদি ভারতবাসীর হইত, তবে এত দিনে ভারতের সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হইত। এ প্রবন্ধেও যে মহানুভব বিদেশীর অদম্য উৎসাহ ও বিপুল স্বার্থত্যাগের কথা বর্ণিত হইবে, তাঁহার দৃষ্টান্তও ভারতীয়গণের সম্যক অনুকরণীয়।

প্রথমে কুশীনগরের দিকে ইউরোপীয়দের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আমরা ইউরোপীয়দের নিকট প্রত্নতত্ত্বের বিষয় শিখিয়া গুরুমারা টীকা লিখিয়া আমা-

* Sir W. W. Hunter,

দের অন্ধ আত্মাভিমানকে যতই স্ফীত করি না কেন, এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কোনও দেশীয়ই পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারে অগ্রণী নহেন। যাহা হউক, বলিতেছিলাম যে, কুশীনগরের উপর ইংরাজের দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু দৃষ্টি পড়িলে কি হইবে? নির্ব্বাণনগরীর চিহ্ন যে কোথাও নাই। এত বড় বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যেও কুশীনগরের নামমাত্র নাই। পালি সাহিত্যে ভগবানের নির্ব্বাণ লীলা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পালি সাহিত্যেও তাহার কোনও ঠিকানা মিলিল না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্, পণ্ডিত ও মনীষিগণ হতাশ হইলেন।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ষ্যানিস্লে জুলিয়েঁ হিউঅ্যেন্থসাঙ্গ নামক এক ভারতপর্য্যটক চৈনিক পরিব্রাজকের নাম শুনিতে পাইলেন। তিনিও আরও শুনিলেন যে, তিনি নাকি চীনভাষায় ভারতপরিভ্রমণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া, এই অদম্য-উদ্যমশীল ফরাসী পণ্ডিত চীনভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। আজ কাল চীনভাষার আলোচনা সহজ হইয়াছে; লণ্ডন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষার শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। কিন্তু জুলিয়েঁর সময়ে চীন ভাষা শিখিবার পথ এত সুগম ছিল না। বিশেষতঃ, যে ভাষার বর্ণমালা শিক্ষার্থীর বিভীষিকাস্থল, অল্প সময়ের মধ্যে সেই দুরূহতম ভাষা আয়ত্ত করিয়া কিরূপে এই অধ্যবসায়শীল পণ্ডিত নিজ ভাষায় উক্ত ভ্রমণপুস্তকের অনুবাদ করিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে, তমসাচ্ছন্ন ভারতের ইতিহাস-গুহা আলোকিত হইয়া উঠিল। এতকাল গাঢ়তম অন্ধকারে যে সব পুরাতত্ত্ব নিহিত ছিল, এই ভ্রমণকারীর ইতিহাসে প্রাত সূর্য্যের আভায় তাহা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই অমূল্য গ্রন্থের সন্ধান পাইয়া, পুরাবিদেরা, ঐতিহাসিকেরা, মনীষীরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

এই অনুরাগী উৎসাহশীল প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কেবল পাঠ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; দলে দলে পরিব্রাজক-বর্ণিত পথে ভারতের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারে ও অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। অনেক স্থলে হিওএন্থসাঙ্গ-বর্ণিত যে সমস্ত নগরীর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইল। ভারত গভর্মেণ্টও সাতিশয় উদারতার সহিত এই পণ্ডিতদের সাহায্যের জন্য 'আর্কিওলজিকাল সর্ভে' নামক বিভাগের সৃষ্টি করিলেন। ভারতের প্রাচীন নগরীসমূহের বর্ত্তমান অবস্থার নির্ণয়, প্রাচীন ভগ্ন ও ভগ্নপ্রায় স্থাপত্য কীর্ত্তিগুলির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি এই বিভাগের কার্য্য

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। জেনারেল্ কনিংহাম এই বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। যদিও এই বিভাগের পণ্ডিতগণের গবেষণায় অনেক ভ্রম ঘটিয়াছে, তথাপি এই সকল ভ্রমও ক্ষমার্হ; কারণ, মনুষ্যজ্ঞানে ভ্রমই স্বাভাবিক। যাঁহারা এই বিভাগের প্রকাশিত 'আর্কিওলজিকাল সর্ভে রিপোর্টস্' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভারতের পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকদের পক্ষে, এই পত্রে প্রকাশিত রত্নরাজি কি অমূল্য।

যে জেনারেল্ কনিংহাম্ এই বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেন, তিনি নিজে যেমন পণ্ডিত, তেমনই অধ্যবসায়শীল। নিজের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে সহকারীদিগকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন; ইঁহাদের কেমন অদম্য উৎসাহ, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার একজন সহকারীর দৃষ্টান্তে তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রমাণিত হইবে। চীন পরিব্রাজকের বর্ণিত সৌন্দর্য্যললামভূতা গয়া, বারাণসী, মথুরা প্রভৃতি চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু ভগবানের লীলাস্থল কপিলাবস্তু বৈশালী, শ্রাবস্তী, কুশীনগর ইত্যাদি নির্ণয় করিবার কোনও উপায় হইল না। একে পরিব্রাজক চৈনিক মাপ "লী"তে দূরত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, কত "লী"তে মাইল গণ্য হইবে, পণ্ডিতদের মধ্যে তাহা লইয়া অনেক বিচার হইল। শেষে সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে, ৩ "লী"তে এক মাইল গণনা করা হউক। তাহার পর আবার এই গণনায় হিউএন্থ্সাঙ্গ-বর্ণিত স্থান সকল যথাযথ নির্ণীত হইল না। যেখানে পর্ব্বত বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে বিশাল নগরী; যেখানে নগরের বর্ণনা, সেখানে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র; যেখানে অতলস্পর্শ নদীর বর্ণনা আছে, সেখানে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ পরিলক্ষিত হইল। এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হওয়াতে, এই মনীষিগণ বিচার করিয়া দেখিলেন যে, পরিব্রাজক পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন; তিনি কিছু ম্যাপের সরলরেখা ধরিয়া ভ্রমণ করিবার সুবিধা পান নাই। অনেক স্থলে ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কালের মহিমায় অনেক মার্গ লুপ্ত হইয়াছে; আবার অনেক নূতন মার্গও তৎস্থানে প্রস্তুত হইয়াছে; অনেক নগরী জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়াছে; অনেক আবার নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্নতা হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাহাতে বুদ্ধের শেষলীলাস্থল নির্ণীত হয় না।

তাঁহারা কিন্তু নিরাশ হইলেন না। দ্বিগুণতর উৎসাহে তাঁহারা অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় অন্ধকারে যেন কিঞ্চিৎ আলোক মিলিল! যাঁহারা ভগবানের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ছোট গল্প।

ইতিপূর্ব্বে রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিংএর কথায় আমরা ছোট গল্প সম্বন্ধে বলিয়াছি—"কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোট গল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনার বর্ণনার চেষ্টা করে। একখানা উপন্যাসে হয় ত সে ক্ষুদ্র ঘটনাটা কয়েক ছত্রমাত্র অধিকার করিতে পারে; ছোট গল্পে তাহাই পাঁচ সাত পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া বসে। চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে 'বুল্‌সআই' লণ্ঠনের আলোক যেমন এক স্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুন সকল খুঁটি নাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোট গল্প-রচনার কৌশল তেমনই জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে। সেই চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে একটা স্থানের উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নাও হইতে পারে; কিন্তু তাহাই সেই লণ্ঠনের আলোকের কার্য্য। তেমনই বিচিত্র সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ, উত্থানপতন, সংঘাতময় জীবনের একটা ছোট ঘটনা অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে; কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্য দান করাই গল্পরচনাকৌশলের কার্য্য।"

সম্প্রতি "সাইন্‌টিফিক মেগুরী" পত্রে মিষ্টার ওয়েড্‌মোর ছোট গল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্রবন্ধারম্ভেই লেখক বলিয়াছেন যে, অল্প দিন হইল, কোনও প্রসিদ্ধ পরিহাসরসিক বলিয়াছিলেন,—জীবনের রঙ্গমঞ্চে যাহার বিস্তৃতমনোরথ, তাহারাই নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে বিশেষ প্রশংসিত হয়। এক জন সংবাদপত্রসেবক বলিয়াছেন,—পাঠকগণ বিদ্যা চাহে না; লিখিত বিষয়ে লেখকের বিদ্যা যত অল্প, তাঁহার রচনা পাঠকসমাজে তত অধিক সমাদৃত হইয়া থাকে। প্যাকারেও এক স্থানে বলিয়াছেন, ছোট গল্প ও উপন্যাস।

পঞ্চাশোর্দ্ধ আর কাহারও প্রণয়ঘটিত উপন্যাস রচনা করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, তত দিনে এ বিষয়ে ব্যাপারে তাঁহার কিছু অধিক অভিজ্ঞতা জন্মে। এ হিসাবে দেখিতে গেলে, যাঁহারা উপন্যাসরচনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারাই ছোট-গল্প-রচনায় সিদ্ধহস্ত হইবেন। কথাটা কি ঠিক? কখনই নহে। সাহিত্য-হিসাবে ছোট গল্প উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র বিনিষ। ছোট গল্প নানা প্রকারের হইতে পারে। একটা কোনও বৃত্তান্ত, একটা পল্লী গল্প, একটা চরিত্রবিবৃতি, একটা অদ্ভুত বৃত্তান্ত, একটা বর্ণনা, একটা ব্যবসায়ীর দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া ছোট পারে। কিন্তু ছোট গল্প আর যাহাই হউক, উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মহাকাব্য, এতদুভয়ে যত প্রভেদ, ছোট গল্প ও উপন্যাস, এতদুভয়েও ত না বুঝিতেই অনেক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ছোট গল্পের রচনা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন— দুই প্রকার রচনায় প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়াই তাঁহা বলেন। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদিগেরই যখন এমন ভ্র

এরূপ ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যাহারা সাহিত্যশিল্পবিচারে অক্ষম,—তাঁহাদিগের বিশ্বাস,—উপন্যাস কেবল শ্রান্তি দূর করিবার জন্যই রচিত, তাঁহারা যে সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মূল্য বুঝিতে পারিবেন না, ইহা একরূপ নিশ্চিত। যাঁহারা উপন্যাসপাঠকালে চিত্রিত চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল উপন্যাসের আখ্যানবস্তু (Plot) পাঠ করেন, তাঁহারা কিছুতেই ছোট গল্পের প্রশংসা করিতে পারিবেন না—তাঁহারা সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন না।

উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পে অধিক বৈচিত্র্য-বিকাশ সম্ভব। উপন্যাসের রচনাপ্রণালী-গুলি ছোট গল্পে ব্যবহৃত হইতেই পারে—তদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি রচনাপ্রণালী আছে, যাহা উপন্যাসের উপযোগী না হইলেও, ছোট গল্পে প্রযোজ্য। প্রথমে আমরা উপন্যাসে ও ছোট গল্পে সাধারণতঃ ব্যবহৃত রচনাপ্রণালীর উল্লেখ করিব। সাধারণতঃ অনুসৃত এই প্রণালীতে লেখক বর্ণিতবিষয়াতিরিক্ত তৃতীয় ব্যক্তির মত রচনা করেন। অস্মদ্দেশে

রচনাপ্রণালী।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর এক প্রকার রচনাপ্রণালীও অনেক সময় উপন্যাসে ও ছোট গল্পে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সে প্রণালীতে লেখক বর্ণিত চরিত্র সকলের মধ্যে এক জন হইয়া বর্ণনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা"র উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিষয়বিশেষে নিপুণ লেখকের হস্তে এই রচনাপ্রণালী বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পেই এই রচনাপ্রণালী অধিকতর সহজে প্রয়োগ করা যায়। ডিকেন্সের মত পাকা লেখকও কেবল David Copperfield গ্রন্থে এই রচনাপ্রণালী ব্যবহার করিয়া সফল হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই রচনাপ্রণালীর প্রয়োগে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষমতাবিশিষ্ট লেখকগণ এই রচনাপ্রণালী ব্যবহার করিতে গিয়া কেবল গ্রন্থের নায়ক বা নায়িকার প্রশংসায় গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া থাকেন। উপন্যাসে ও ছোট গল্পে আর এক প্রকার রচনাপ্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহাতে গল্পের বিষয়ীভূত চরিত্র সকলের পত্রে গল্পাংশ বিবৃত হয়। সুতরাং উপন্যাসে এ প্রণালী অনেক সময় বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়;—এই প্রণালী ছোট গল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে লেখকদিগের পত্রে প্রত্যেকের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হয়। অস্মদ্দেশীয় সাহিত্যে বোধ করি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে "সাহিত্যে" প্রকাশিত "প্রাইভেট্ টিউটার" নামক গল্পই এইরূপ প্রণালীর সর্ব্বপ্রথম * ও * * * রচনা। অনেক সময় এই তিন প্রকার রচনাপ্রণালী মিশ্রিত করা হইয়া থাকে, তবে সেই মিশ্রণোৎপন্ন রচনাপ্রণালী উপন্যাসেরই বিশেষ উপযোগী। কেবল কথাবার্ত্তাতেও ছোট গল্প রচিত পারে। কিন্তু সেরূপ রচনাপ্রণালীর অনুসরণ করিলে, নাটকের নিয়মাধীন হইতে হয়; টকের বিশেষ সুবিধা আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল কথাবার্ত্তায় গল্প শেষ কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ডায়েরী হইতে উদ্ধৃতাংশের আকারেও হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে লেখকের যেমন অনন্যতার আবশ্যক, পাঠকেরও আবশ্যক। যে পাঠক একবারমাত্র চক্ষু বুলাইয়া পাঠ শেষ হইল মনে ডায়েরীর আকারে লিখিত ছোট গল্প প্রীতিপ্রদ হইবে না।

দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অধুনালুপ্ত "প্রবাহ" নামক নামক পত্রে রচিত একটি দীর্ঘ গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত। শেষ আর কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল কি না,—বলিতে দক।

ছোট গল্পে যেখানে কথাবার্ত্তা প্রচলিত করিলেও চলে, সেখানেও অনেক সিদ্ধহস্ত লেখক কথাবার্ত্তা পরিহার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলজাকের ছোট গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর ছোট গল্পে শিল্পের চিত্তাকর্ষকতা ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে, সন্দিহানে আর সন্দেহমাত্র নাই। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, অন্য সকল লেখকের ন্যায় ছোট গল্পও লেখকের প্রতিভার উপর নির্ভর করে। ডোডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছোট গল্পটির কথাই ধরা যাউক। সেটির আখ্যানবস্তু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গল্পের দুই পার্শ্বে দুইটি পান্থনিবাস—একটি কোলাহলহীন, বিষাদময়; অপরটি শব্দমুখরিত, গতিশীল। প্রাচীন পান্থনিবাসের অধিকারী নূতন পান্থনিবাসে তাঁহারই পুরাতন অতিথিদিগের সহিত আমোদে মত্ত—ব্যবসা চালাইয়া নূতন পান্থনিবাসের কর্ত্তার মাথায় মুগ্ধ। আর গল্পের অপর পার্শ্বে কোলাহলহীন পুরাতন পান্থনিবাসে এক জন পরিত্যক্তা রমণী শূন্যহৃদয়ে শূন্য আলয়ে দিন কাটাইতেছে। তাহার অন্তর্ভাবনয় জীবনে আর বিন্দুমাত্র আলোকবিকাশ নাই। এই গল্পটিতে ডোডের রচনাকৌশল কি মধুর, কি করুণ, কি হৃদয়স্পর্শী!

ছোট গল্পে স্বভাববর্ণনা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত; ঔপন্যাসিক উদ্ভিদ-তাহার পক্ষে প্রত্যেক খুঁটিনাটি দেখা অনাবশ্যক।

এ পক্ষে সংক্ষেপের বিশেষ প্রকাশ বিশেষ আবশ্যক। ভাগিল হইতে ব্রাউনিং পর্য্যন্ত সাহিত্য-শিল্পিগণ এ কথা ভুলেন নাই। ছোট গল্পে ইহা আরও আবশ্যক।

সংক্ষেপ।

ছোট গল্পে যেখানে কথোপকথন ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রত্যেক কথার বিশেষ উপযোগিতা থাকা চাই। উপন্যাসে দুইটা বাজে কথা ব্যবহার করা চলে—ছোট গল্পে তাহা নিষিদ্ধ। সাধারণ পাঠক হয় ত সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারিবেন না; কিন্তু সমালোচক, শিল্পীর চক্ষে তাহা বড় বাড়িয়াই পড়িবে। সেই জন্য ছোট গল্প ধীরে ধীরে রচনা করা ও বহুবার সংশোধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ উপন্যাসেই হউক, আর ছোট গল্পেই হউক, কথোপকথন ব্যবহার করা বড় সহজ নহে। হাস্যরসের অবতারণার সময় বরং কথোপকথন ব্যবহার করা চলে; কারণ, হাস্যরসের অবতারণায় দুই একটি বাজে বকুনিও অসঙ্গত নহে। কিন্তু গম্ভীর বিষয়ের অবতারণায় অনেক সময় কথোপকথনব্যবহারে রচনার সৌন্দর্য্য হানি হইয়া থাকে।

নাটকের মত ছোট গল্পেও প্রতি ছত্র দর্শকের বা পাঠকের মনে বিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তবে নাটকে যে প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হইলে হয়, ছোট গল্পে সে ভাবও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল-স্থায়ী হওয়া একান্ত আবশ্যক। আবার এক হিসাবে নাটককারের অসুবিধা অধিক; কারণ, দর্শকদিগের মধ্যে সকল প্রকারের লোক থাকে, তাঁহাকে সকল দর্শকের মনস্তুষ্টিবিধান করিতে হয়। ছোট গল্পের লেখককে তাহা করিতে হয় না। তিনি ইচ্ছা করিলে কেবল সুশিক্ষিত পাঠকের জন্য রচনা করিতে পারেন।

নাটক ও ছোট গল্প।

আজ কাল অনেক লেখক রচনাকৌশলের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া থাকেন, তাহা ভাল ভিন্ন মন্দ নহে; কারণ, সাহিত্যে কোনও রচনা স্থায়ী করিতে হইলে, তাহা সুলিখিত হওয়া আবশ্যক। রচনাকৌশলও সাহিত্য-শিল্পের একটা প্রধান অঙ্গ। তবে যাঁহারা কবির বাহির দিয়া ভাবদেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভাবের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে গিয়া রচনা ঘেনাইয়া অতিশয় বিস্তৃত করিয়া ফেলেন,—তাঁহারা প্রকৃত শিল্পীর রচনা-কৌশলে অনভিজ্ঞ।

ছোট গল্পে মৌলিকতা ও আন্তরিকতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা বাস্তবাদর্শপ্রিয়তার আধিক্য হেতু পাপের প্রত্যেক পৈশাচিক খুঁটিনাটির বর্ণনা করেন, যাঁহাদের বর্ণিত চরিত্র পাপের পূতিগন্ধময়,—তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবার কোনও কথা আছে কি? সে সকল "Dyspeptic pessimist"এর বাস্তবাদর্শপ্রিয়তা রোগবিশেষ। এই বিষয়ের বিচারকালে স্বর্গীয় গিসিংএর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ফ্রান্সে এখন বাস্তবাদর্শপ্রিয়তার বিকৃতাংশ অনাদৃত। গীদে মোপাসাঁ যাহাকে এই নূতন পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোপাসাঁর জীবনে বিষাদপ্রবণতার অতিমাত্রা ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে আপনার রচিত পথ আপনার পক্ষে সুগম ও অপরের পক্ষে আলোকোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাই যাঁহারা ছোট গল্প-রচনায় তাঁহার অনুকরণ করিতেছেন, তাঁহারা সকল হইতে পারিতেছেন না।

সাধারণতঃ যুবকগণই অধিক বিষাদপ্রবণ। তাই যুবক লেখকদিগের রচনায় বিষাদের অন্তঃসলিল প্রবাহ প্রবহমান থাকে। যৌবনের পর সংসার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইলে লেখকদিগের রচনা খাঁটি হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু অনেক সময় তাহাতে রসের অভাব দৃষ্ট হয়, তাহাতে তেজ দেখা যায় না।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

সুমেরু-সন্ধান।

সুমেরু প্রদেশ এখনও আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহার চিরতুষার-বেষ্টিত আবাসে মানবের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় না। অল্পদিন পূর্ব্বে নান্‌সেন সুমেরু প্রদেশে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট পিয়ারী বিগত দ্বাদশ বৎসরে চারি বার সুমেরু-সন্ধানে গমন করিয়া, সুমেরু প্রদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানের নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের (Northward over the 'Great Ice') বর্ণনা অবলম্বন করিয়া আমরা সুমেরু প্রদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি।

গ্রীনল্যাণ্ড।

ধরণীর উচ্চাবচ বক্ষে সুমেরু প্রদেশের তুষার ও বরফের বিলম্বিত হার গ্রীনল্যাণ্ড সুন্দর মণিস্বরূপ। সেখানে বৈষম্যবৈচিত্র্যে বিশ্বিত হইতে হয়। তথায় মধ্যরাত্রে সূর্য্যোদয় হয়, আবার দিবাভাগেও নৈশান্ধকার ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। সেখানে গগনস্পর্শী তুষারপ্রধান দেশের আকাশের রঙ, আবার সেখানে চিরতুষার-ব্যাপ্তি। সেখানেও কোনও গিরিগাত্রে প্রাচীনকালীন অগ্ন্যুৎপাত-চিহ্ন বর্ত্তমান, আবার কোনও কোনও পর্ব্বত চিরতুষারমুকুটে শোভিত। গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যভাগ চির তুষারসমাচ্ছন্ন—দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বাদশ শত মাইল ও প্রস্থে প্রায় ষষ্টিশত মাইল। এই তুষারময়ত্ব তুলনায় সাহারার মরুভূমি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এখানে জীব নাই,—উদ্ভিদ নাই—এককণা বালুকাও নাই। সেই বরফ-রাজ্যের মধ্যে কেবল তিনটি জিনিস পরিলক্ষিত হয়, দিগন্তপ্রসারিত তুষারাচ্ছন্ন ভূমি, অন্তহীন নীল নভোমণ্ডল, আর মেরুশীতল সূর্য্য। এই রহস্যময় প্রদেশে পিয়ারী ও তাঁহার পত্নী প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া নানা জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছেন। ক্ষুদ্রিনের ঘাতপ্রতিঘাতবিহীন সুমেরু প্রদেশে উপনীত হওয়াই তাঁহাদের অভিপ্রায়। সেই তুষারাচ্ছন্ন সমতল ভূমিতে কোথাও কোনও অসমতা লক্ষিত হয় না। যেন কোনও শিল্পী সেই তুষাররাশি লইয়া একখানি সমতল রঙে পরিণত করিয়া দিয়াছে।

এই তুষারদেশে গ্রীষ্মকালে চারি মাস কাল সূর্য্যাস্ত হয় না। সাধারণতঃ দক্ষিণ ভাগে সূর্য্যকর দেখা উদয়, এ দেশে মেঘহীন আকাশে সূর্য্যকর সেইরূপ উজ্জ্বল। কিন্তু বরফে প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্যকর এত তীব্র হইয়া উঠে যে, গ্রীষ্মকালে কেহ পথ চলিতে আরম্ভ করিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অন্ধ হইয়া পড়িবে—আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। নিত্য যাইতে হইলে চক্ষের উপর কিছু বাঁধিতে হয়—নহিলে কেবল চক্ষে পত্রে আলোকের প্রতিরোধ হয় না। আবার যখন আকাশে মেঘোদয় হয়, তখন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্য নাই, আকাশ নাই, বৃক্ষ নাই, চন্দ্রমা নাই—সবই একাকার। চারি দিকে কেবল ধূসর প্রভাব-বিস্তার। এই তুষারদেশে যখন বায়ু বহিতে আরম্ভ করে, তখন তুষাররাশি ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতে থাকে। তখন চারি দিক ভ্রাম্যমাণ তুষারে পূর্ণ হইয়া যায়, নিশ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকর হইয়া উঠে।

আলোকের প্রতিরোধ।

তুষারদেশের তুষাররাশি বিদূরিত হইবার কোনও উপায় না থাকিলে, তুষারস্তূপ ক্রমে অসহ্য অধিক হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে যেখানে যেমন তুষাররাশি উৎপন্ন হয়, তেমনই আবার তুষাররাশি নির্গতও হইয়া যায়;—নানা কারণে এই তুষাররাশি জলস্রোতে হইতে দূরে যাইয়া পড়ে, এবং সলিলে পরিণত হয়।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, হিমতুষারদেশেও মানব কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। এই বিপদসঙ্কুল দেশে ইহারা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়াও জীবিত থাকে। ইহারা সকল গণিয়া কেবল দুই শত তিপ্পান্ন জন মাত্র। ইহাদের না আছে শাসনপ্রণালী; না আছে ধর্ম্ম; না আছে মুদ্রা; না আছে মূল্যবোধ; না আছে লিখিত ভাষা, না আছে কোনও সম্পত্তি; কেবল আছে কিছু পরিধেয়, আর আছে কয়খানি অস্ত্র। ইহারা ঘরবাড়ী না বাঁধিয়াই যাযাবর ও বক্রপান করিয়া জীবনযাত্রা করে, এবং হিমাদির চক্ষু পরিধান করিয়া গুঙের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে। দেখিলে বোধ হয়, যেন ইতর প্রাণিগণের সহিত ইহাদিগের কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা বিশেষ বুদ্ধিমান। শিশুর পক্ষে চন্দ্রপ্রাপ্তির আশা যেমন, ইহাদের পক্ষে এরখণ্ড কাঠ পাইবার আশাও তেমনই দুরাশামাত্র। এক জন এস্কিমো একখণ্ড কাঠের জন্য লেখককে তাহার কুকুর, "স্লেজ" শকট, —সকলই দিতে চাহিয়াছিল। আর এক জন একখানি ক্ষুরিকার জন্য লেখককে তাহার পত্নী ও দুইটি সন্তান দিতে চাহিয়াছিল। একটি স্ত্রীলোক একটি সূচের জন্য তাহাকে তাহার সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিল।

এস্কিমো জাতি।

ইহারা ব্যবহারে শিশুর ন্যায় সরল, আহার বিহারে পশুর মত; কিন্তু ক্ষুধা, শ্রম ও শীত সহ্য করিতে ইহাদের সমকক্ষ নাই।

লেখকের মতে, এস্কিমোগণ মঙ্গোলীয়ান;—তাহারা সম্ভবতঃ বাইবিরিয়া হইতে হেরপ্রদেশে আসিয়াছিল। তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনও স্মৃতি সংস্কার নাই;—কেবল তাহাদের বিশ্বাস, তাহারা আরও উত্তর হইতে আসিয়াছিল। ইহাদিগের কোনও শাসনপ্রণালী নাই। প্রত্যেকেই স্বীয় পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। যাহার যেখানে ইচ্ছা, বাস করিতে পারে। কেহ নীল অপেক্ষা কুষ্ঠতর কোনও জীব মারিতে পারিলে, তাহা তাহার নিজ সম্পত্তি, নহিলে তাহা সাধারণের সম্পত্তি। তথাপি লোকে পরস্পরকে যথা সময় সাহায্য করিয়া থাকে।

আমাদের মাপকাঠির সঙ্গে ইহাদিগের নীতির মাপকাঠি আদৌ ঠিক নহে। ইহাদের ব্যবহারে পত্নী একটা সম্পত্তিমাত্র—ইচ্ছামত পত্নী বিক্রয়, বদল, আদান প্রদান, এমন কি, দা-

দেওয়াও চলে। ডোজ, ব "স্নেহ" শকটের যেমন আদর, শাস্ত্রীর আদরও সেইরূপ। তবে ইহারা শিশুদিগের প্রতি ও স্ববিবাদিগের প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কোনরূপ বিবাহপ্রথা নাই। শৈশবেই বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে; বাগ্‌দত্তা বালিকা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, দলের কোনও বিপত্নীক তাহাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করে; তাহার পর বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, আপনার বাগ্‌দত্তা বালিকাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করে। বিবাহের পর প্রথম দুই এক বৎসর যুবকযুবতী প্রায়ই বহুবার পত্নীর ও পতির পরিবর্ত্তন করে—যেন ঠেট চাহিতেছে, ঠিক সেইটি পাইতেছে না। তাহার পর স্থির হইয়া সংসারী হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস বড় অদ্ভুত রকমের। ইহারা ভাল ভূত ও মন্দ ভূতে বিশ্বাস করে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ইহাদিগের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোনও তথ্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কিঙ্কর সেনের গড়।

জনপ্রবাদমূলক গল্প।

অনেক দিনের কথা, বোধ হয়, দেড়াই শত কি তিন শত বৎসর হইবে,—তখন মুসলমানের গৌরব-রবি ভারতের মধ্যাকাশে শোভা পাইতেছিল,—হুগলীর নিকট একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বাস করিতেন। কোনও কারণে হুগলীর ফৌজদার তাঁহার উপর বিরক্ত হওয়াতে, তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। হতভাগ্য বেচারা একটি শিশুপুত্র ও স্ত্রীকে লইয়া একেবারে পথের ভিখারী হইলে কেহ কেহ তাঁহাকে পরামর্শ দিল যে, নবাব-সরকারে একবার ফৌজদারের বিপক্ষে জানাইতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু নিরুপায় কায়স্থসন্তান নীরবে আপনার কপালে হাত দিয়া বলিতেন, "যদি বিচারপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে এমন স্থানে দাঁড়াইব যে, যাঁহার বিচারের উপর আর কেহ বিচার করিবার থাকিবে না।" সকলে মনে করিত, তিনি বাদশাহকে জানাইবার কল্পনা করিয়াছেন। কেন না, তখন দেশের লোকের মোটা কণ্ঠে ধ্বনিত হইত,—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" ফলতঃ, দরিদ্র, পীড়িত কায়স্থসন্তান অল্পদিনের মধ্যেই অনাথা পত্নীকে অনাথা করিয়া জগদীশ্বরের সিংহাসনের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ ইহসংসার ত্যাগ করাতে তাঁহার আর দিল্লীশ্বরের নিকট জানাইবার সুবিধা হইল না। ইহার পর প্রায় ১২। ১৩ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

১

হুগলীর দক্ষিণে চন্দননগর নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, অতি সামান্য একখানি তৃণাচ্ছাদিত কুটীরের সম্মুখে বসিয়া, একজন দ্বাবিংশবর্ষীয় তরুণ

যুবা যজ্ঞোপবীত ওষ্ঠাধিত বার্ত্তাকু বৃক্ষের গোড়ায় বাস পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময় দূরে তাঁহার কর্ণে শব্দ হইল,—"মাছ নিবি গো!"

যুবকও উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "কি মাছ—নিয়ে আয় না দেখি—"

ক্ষণ কাল পরে এক কৃষ্ণবর্ণা স্থূলকলেবরা ধীবরপত্নী সগর্ব্ব অথচ সভয় সহকারে কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "কে মাছ নেবে গো! এস না।"

যুবক উঠিয়া গিয়া এক পয়সার মাছ লইয়া বলিল, "একটা পাতা এনে পয়সা নিয়ে যাস্, মা এখন স্নান করিতে গিয়াছেন।"

ধীবরপত্নী প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরে বলিল,—"দেখো বাছা, যেন আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু বলে ভাঁড়াভাঁড়ি করো না।"

মৎস্যবিক্রয়কারিণী চলিয়া গেল।

ক্ষণ কাল পরে যুবক দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, মাতা আর্দ্রবসনে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছেন। মাতা, পুত্রকে তত বলাতে ও উদ্যানে কর্ম্ম করিতে দেখিয়া, স্নেহমিশ্রিত রোষে বলিলেন,—

"কিঙ্কর! বেলা হ'ল, যা' না, স্নান করে আসনা। রাত্তির দিন গাছের গোড়ায় জল বসে কি হবে, যা যা, বেলা অনেক হয়েছে।"

"মা! গাছগুলাকে একবার বেগুন ধরিতে আরম্ভ হ'লে ছয় মাসের তরকারি এবে বারে ঘরে বাঁধা থাকবে। এক পয়সার মাছ নিয়েছি—মাছের ঝোল রাঁধ,—আমি স্নান করে আসি।"

কিঙ্কর, (যুবকের নাম কালীকিঙ্কর, কি রামকিঙ্কর, যা হয় একটা কিছু হইবে, মা এবং প্রতিবাসিবর্গ তাঁহাকে কিঙ্কর বা কিঙ্কর সেন বলিয়াই ডাকিতেন,) ত্বরিত্র রচিয়া হাত পা ধুইয়া স্নানে গমন করিলেন; যাইবার সময় মাতাকে মাছের দামের কথা কিছু বলিয়া গেলেন না।

মাতা যথাকথিত মাছের ঝোল রাঁধিয়া ভাত চড়াইয়া দিয়া কুটীরের দ্বারে বসিয়া বসিয়া অন্যমনে বোধ হয় আপনার অতীত চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় সেই মৎস্যবিক্রয়কারিণী আসিয়া উচ্চস্বরে বলিল, "মাছের পয়সা দাও।"

কিঙ্করের মাতা অন্যমনস্কা ছিলেন। হঠাৎ ধীবর-রমণীর কর্কশকণ্ঠে চমকিতা হইয়া বলিলেন,—"কি গা?"

কিন্তু পূর্ব্ব-একখানা কলহপ্রিয়া রমণীর নাহিত তাহারা বেশ এক পালা হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য ধীবরপত্নী গণ্ডগোল চড়িয়া ছিল; এক্ষণে কিঙ্করের

মাকে গল্প করিতে দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, এবং অতিশয় পরুষস্বরে কহিল, "কি গা? জান না? ন্যাকা আর কি! যেটা মাছ কিনে নবাবী করেন, আর মাগী দাম দেবার বেলা ন্যাকা হ'ন! কি গা?"

"কিঙ্কর মাছ কিনেছে, তা আমায় ত কিছু বলে যায়নি; তা' জেলেবউ! রাগ করিস কেন, আজ হাতে পয়সা নাই, আর একদিন আসিস, পয়সা নিয়ে যাস্। আজ কাছে একটি পয়সা ছিল, একজন কাণা ভিক্ষা চাইলে—তাই তাকে দিয়ে এসেছি; তা, আর একদিন আসিস্।"

অন্য দিন হইলে ধীবর-রমণী এই কথাতেই হয় ত চলিয়া যাইত, কিন্তু আজ পূর্ব্ব হইতেই সে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছিল; সুতরাং কিঙ্করের মাতার কোনও কথা কানে তুলিল না; হাত নাড়িয়া বলিল,—

"দান করে এসছ, খয়রাত করে এসেছ, বেশ করেছ। আমি ত আর চখের মাথা খেয়ে তোমার কাছে ভিক্ষা করতে আসিনি, আমার পাওনা পয়সা দাও, না হলে মাছ ফিরিয়ে দাও। দুবের এক না নিয়ে যদি আমি উঠি, তবে আমি জেলের মেয়ে নই।"

"মাছ কোথায় পাব? সে সে রেঁধে ফেলেছি।"

"সেই রাঁধা মাছই নিয়ে যাব।"

অনেক কাকুতি মিনতির পর যখন কিঙ্করের মাতা কিছুতেই ধীবরপত্নীর মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন (পাঠক! অনন্তর মনে করিয়া হাসিবেন না) বাস্তবিকই ঝোল হইতে মাছগুলি আনিয়া ধীবররমণীকে দিতে গেলেন। তখনও মনে মনে ভরসা ছিল, বাস্তবিক রাঁধা মাছ লইবে কি? কিন্তু ধীবরপত্নী অম্লানবদনে প্রাঙ্গণস্থ কদলীবৃক্ষ হইতে যখন একটু পত্র ছিন্ন করিয়া লইয়া মাছ লইতে অগ্রসর হইল, তখন কিঙ্করের মাতার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু তিনি ধীবরপত্নীকে এই দুর্ব্বলতা দেখিতে দিলেন না। ধীবরপত্নী মাছগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

যথাসময়ে কিঙ্কর স্নানাহ্নিক করিয়া আসিয়া আহারে বসিলেন। মাতা নীরবে ভাত ও মাছশূন্য মাছের ঝোল দিলেন। কিঙ্কর ভাত খাইতে খাইতে মাছের কথা জিজ্ঞাসা করিলে মাতা আর থাকিতে পারিলেন না; গলদশ্রুলোচনে ধীবরপত্নীর বৃত্তান্ত সমস্ত বলিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিঙ্কর শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয়দমনের অভ্যাস ছিল। তিনি ক্রোধ দমন করিয়া সহাস্যে বলিলেন,

"মা! এ ত বড় মজা। আমাদের পয়সা দিতে হ'ল না, অথচ মাছের ঝোল খাওয়া হ'ল। আর যে জেলে মাগীরও রাঁধতে হ'ল না। মাঝে থেকে রাঁধা মাছ পেয়ে গেল। একটা জেলেনীর সঙ্গে এই রকম বন্দোবস্ত করিলে মন্দ হয় না; রোজ রোজ মাছের ঝোল খাওয়া হয়!"

মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া এত দুঃখেও একবার হাসিলেন।

কিঙ্করের আহার সমাপ্ত হইল, মাতার আজ আর আহার হইবে না; কারণ, আজ একাদশী। মধ্যাহ্নে মাতাপুত্রে অনেক কথা হইল। কিঙ্করের ইচ্ছা, বিদেশে গিয়া কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু মাতা কোন্ প্রাণে ছাড়িয়া দিবেন? যে আট বৎসরের পিতৃহীন শিশুকে তিনি একাকিনী পিতা ও মাতা উভয়ের স্নেহে বুকে রাখিয়া বাইশ বৎসরের করিয়াছেন, আজ কোন প্রাণে ছার পয়সার জন্য সেই পুত্রকে বিদেশে পাঠাইবেন? যদি বিদেশে বাছার পীড়া হয়, তাহা হইলে কি হইবে? কে বাছার মাথার শিওরে বসিয়া একমনে গায়ে হাত বুলাইবে? যাহার চাঁদ-মুখে স্বর্গগত স্বামীর প্রতিকৃতি দেখিয়া তিনি জ্বলন্ত অগ্নিতে কথঞ্চিৎ শান্তিবারিসেচনে সক্ষম হইয়াছিলেন; সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে প্রিয়তমকে অনন্ত বিরহরজনীতে ক্ষণমাত্র বিদ্যুদালোকস্বরূপ পাইয়া আবার স্বপ্নভঙ্গে গাঢ়তর অন্ধকার দেখিয়া যে প্রাণের বাছাকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিতেন; আজ কোন প্রাণে সেই কিঙ্করকে, সেই অন্ধের নয়ন, দরিদ্রের মান, সম্পদের স্বাস্থ্য ও বিপদের আশাকে—প্রবাসে পাঠাইবেন? অন্যে পাবে পাঠাক, তিনি ত কিছুতেই পারিবেন না।

কিন্তু অবশেষে তিনিও পারিলেন। বুঝিলেন, জননীর অতিরিক্ত স্নেহ-অনেক সময় পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি অঙ্কুর-অবস্থাতেই ভাসিয়া যায়; নিজে পাষাণে বুক বাঁধিয়া অগত্যা কিঙ্করকে যাইতে দিতে সম্মত নি জানিতেন, হুগলীর ফৌজদার জীবিত থাকিতে কিঙ্করের ই হইবে না। সুতরাং তিনি কিঙ্করকে যাইতে দিবেন প্রতিশ্রুত দিন প্রভাতে কিঙ্কর যাত্রা করিবেন, স্থির হইল।

সময় আমরা দেখিতে পাই, আমাদের একটা অবশ্য-পালনীয় অবাধে আমাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়, আমরা কিছুই জানিতে না; আবার অকস্মাৎ সামান্য কোনও ঘটনায় আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্যটা যেন একেবারে আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। কিঙ্কর বাইশ

বৎসরের হইয়াছেন, কিন্তু কখনও যে তাঁহাকে মাতার স্নেহময় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর সংসার-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, কি মাতা, কি পুত্র, কাহারও মনে তাহা উদিত হয় নাই। কোন রকমে কায়ক্লেশে উদরান্নের সংস্থান হইলেই যেন তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, যাবশ্যকর্ত্তব্য ব্যাপার সিদ্ধ হইল, মনে করিতেন। আজ ধীরপত্নীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে কিঙ্কর অকস্মাৎ জানিতে পারিলেন যে, সংসারটা কেবল মাতার স্নেহের আচ্ছাদনে, বনচ্ছায়ার অন্তরাল-প্রবাহিণী নির্ঝরিণীর ন্যায় নিঃশব্দে প্রবাহিত হয় না; মধ্যে মধ্যে দারিদ্র্যের ভীষণ শৈলে প্রতিহত হইয়া বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠে। আজ জানিতে পারিলেন যে, এই জনাকীর্ণা বসুন্ধরার ক্রোড়ে কেবল তাঁহারা দুই জন মাতাপুত্র ব্যতীত আরও বহুসংখ্য নরনারী বাস করে; এবং সহস্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ, সংঘর্ষ, অনিবার্য্য। ধনবল থাকিলে এই কঠিন সংঘর্ষ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও হইতে পারে।

সমস্ত দিন কিঙ্করের যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। উদ্যোগই বা কত? দুইখানি বস্ত্র ক্ষার-জলে সিদ্ধ করিয়া মাতা উত্তমরূপে প্রক্ষালিত করিয়া দিলেন। দারিদ্র্যে পতিত হইয়া মাতাপুত্রে বড় কাহারও সংস্রব রাখিতেন না; সুতরাং বড় অধিকসংখ্যক প্রতিবাসীর নিকট বিদায় লইতে হইল না। শুনিতে পাই, অনেক বিধবার না কি একাদশীর রাত্রি আর প্রভাত হয় না। কিন্তু কিঙ্করের মাতার সেই রাত্রি মুহূর্ত্তমধ্যে শেষ হইল। প্রত্যূষে মাতার স্নেহাশ্রু ও আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত হইয়া, মাতৃচরণে প্রণামপূর্ব্বক "মধুসূদন! মধুসূদন!" স্মরণ করিতে করিতে কিঙ্কর কুটীর ত্যাগ করিল। পুত্র চক্ষের অন্তরাল হইবামাত্র জননী দুই হস্তে হৃদয় চাপিয়া কুটীরের ভিতর উপুড় হইয়া পড়িয়া অশ্রুজলে ধরণী সিক্ত করিলেন। হায়! স্নেহময়ী মনে করিলেন, বুঝি অশ্রুজলে কঠিন মৃত্তিকা করিয়া দিলে বাছার পদে নিষ্ঠুর ধরণী আর আঘাত করিতে পারিবে না! বাছার পায়ে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না!

২

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। মাতা এই সুদীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে বারমাত্র পুত্রের সংবাদ পাইয়াছেন। তখন এক পয়সার পোষ্ট-কার্ড ছিল না; দুই পয়সার টিকিট ছিল না। দূরত্ব-অনুসারে ডাকের খরচের ন্যূনা-

ধিক্য হইত। তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ পাঠাইতে হইলে, অন্ততঃ পঞ্চাশৎ মুদ্রা ব্যয় করিতে হইত।

মাতা প্রথম সংবাদ পাইলেন, কিঙ্কর বর্দ্ধমানে গিয়া রাজ-সরকারে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বড় সুবিধা করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পত্র পাটনা হইতে, এবং প্রায়ই ঐ মর্ম্মে লিখিত। শেষ পত্র পাইলেন, কিঙ্কর দিল্লীতে গিয়া এক জন বৈশ্য সওদাগরের তরফে পাঁচ টাকা বেতনে মুহুরী নিযুক্ত হইয়াছেন। সংবাদ পাইয়া মাতার নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল।

ভীষণ দারিদ্র্যে প্রতিপালিত হওয়ায় কিঙ্কর বড় ধৈর্য্যশালী ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও শারীরিক অঙ্গসৌষ্ঠবও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি স্বীয় প্রভুর বড় প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। এমন কি, উভয়ে ভিন্ন বর্ণের না হইলে, প্রভুর একমাত্র কন্যা মনিয়ার পাণিগ্রহণও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না।

* * * * *

বাদশাহের জন্মতিথি নরোজা উপলক্ষে আজ সমস্ত দিল্লী একটি সুরঞ্জিত নাট্যশালা বলিয়া বোধ হইতেছে। চারি দিকে কেবল আমোদ, কেবল প্রমোদ, কেবল রহস্য, কেবল কলহাস্য, কেবল আতর গোলাপ, ফুলের মালা, পানের দোনা। এমন কি, আজ রাজধানীমধ্যে কাহারও উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিবার হুকুম নাই।

কিঙ্করের প্রভুর বাটী লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌয়ের গায়িকা ও নর্ত্তকীরা সেই জন্য আজ নরোজা উপলক্ষে লক্ষ্ণৌয়ের প্রধানা গায়িকা আসিয়া কিঙ্করের প্রভুর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছে। আজ রাত্রে তাহার প্রাসাদে তাহার 'মুজরা' হইবে। এ নৃত্যসভায় কিঙ্কর

রাজবাটীর প্রাঙ্গণে স্থানে স্থানে অনেকগুলি এক জন ওমরাও বা উজীর এক একটি সভা যাহার নৃত্য গীতে পরিতুষ্ট হইবেন, সে আশ নৃত্যসভার অধ্যক্ষও বাদশাহের সুনজরে পতিত

সন্ধ্যার পর বাদশাহ হীরক মুক্তা মাণিকে কিংখাপে সজ্জিত হইয়া, অনুচর-পরিবৃত বাসবের অপর নৃত্যসভায় গমন করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে

"কেয়াবাৎ" "হাজার রূপেয়া" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া নর্ত্তকীদিগকে আপ্যায়িত ও পুরস্কৃত করিতেছেন। অন্য বিশেষ নিয়ম, পুরস্কার-ধ্বনি উচ্চারিত হইবামাত্র গায়িকা সেই মুহূর্ত্তে প্রস্থান হইতেছে। এইরূপে সম্রাট ক্রমে ক্রমে মতিজানের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিঙ্করের প্রভু বৈদ্য সওদাগর এই সভার অধ্যক্ষ। বাদশাহকে দেখিবামাত্র তিনি নত জানু হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বাদশাহ কিয়ৎক্ষণ মতিজানের গীত শ্রবণ করিয়া, তাঁহারই উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত নিকটস্থ সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন। সওদাগর ও গায়িকা উভয়েই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

যখন মতিজান বাদশাহের পদতলে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইয়া জয়-জয়ন্তী আলাপ করিতে লাগিল, তখন সঙ্গীতরসজ্ঞ সম্রাটের নয়নদ্বয় হইতে দর দর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল; সমবেত সভ্যমণ্ডলী সকলেই রুদ্ধনিশ্বাসে সেই অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতসুধা পান করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে কোনও প্রশংসাবাদ নাই। জয়জয়ন্তীর পর মতিজান "মধুবেণ সম্পরেৎ" ভাবিয়া খাম্বাজ ধরিল। সম্রাটের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, জয়জয়ন্তীর পর খাম্বাজ, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে যেন কোনও চিরবাঞ্ছিতের যুগযুগান্তরব্যাপী বিরহবেদনার অপনোদন করিয়া প্রিয়তমের সম্মিলন করিয়া দিল। বাদশাহ উন্মাদভরে উঠিয়া আপনার কণ্ঠহার মোচন করিয়া স্বয়ং গায়িকার গলদেশে দিয়া দিলেন, এবং নিকটস্থ অনুচরকে বলিলেন, "লাখেরাজ হাজার।"

সভ্যমণ্ডলী ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন; মহামূল্য কণ্ঠহার, তার

লাখেরাজ!

হাজার বিঘার দানপত্র লিখিয়া দিলেন, বাদশাহও

ক্ষর করিয়া দিলেন।

গৃহ-ভবনে, মতিজান স্বীয় অভাবনীয় শুভাদৃষ্টের

ন সময় কিঙ্কর গিয়া মতিজানকে যথাবিহিত

হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আরও চারি

ইল। কিঙ্কর মতিজানকে বলিলেন,

বাদশাহের পাঞ্জা দেখি নাই; তোমার দানপত্র

কি প্রকার।"

দশাহের পাঞ্জা-যুক্ত দানপত্র বাহির করিয়া কিঙ্করের

তাহা দেখিয়া একে একে সকলেরই হস্তে এক এক-

বার দেখিতে দিলেন। অবশেষে কিঙ্কর পুনরায় সেই দানপত্র লইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সহসা লেখনী লইয়া কি দুই চারিটি কথা দানপত্রে লিখিয়া দিলেন। এক জন দর্শক ভিন্ন আর কেহই তাহা দেখিতে পাইল না।

যে দর্শক কিঙ্করের এই কার্য্য দেখিল, সে এক জন উজীরের অনুচর। তাহার প্রভু কর্ত্তৃক আনীতা গায়িকা বাদশাহের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই, সেই জন্য তাহারা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সে অনতিবিলম্বে গিয়া সমস্ত ব্যাপার স্বীয় প্রভুর নিকট বর্ণনা করিল।

যথাসময়ে এই ব্যাপার বাদশাহের কর্ণগোচর হইল। "অধিকন্তু, "বাদশাহী দানপত্রের উপর কলম চালে, এমন বেয়াদবও আছে।" এই বাক্যে বাদশাহ কিছু অপমান জ্ঞান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ দস্তুর মত সওদাগর, মতিজ্ঞান ও কিঙ্করকে তলব হইল। কি জন্য তলব, কেহ কিছুই জানে না। অনেকে মনে করিলেন যে, বাদশাহ আবার বোধ হয় মতিজ্ঞানের সঙ্গীত শ্রবণ করিবেন, সেই জন্য এই এত্তেলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে সওদাগরের ডাক হইবে কেন? বিশেষতঃ কিঙ্করের সহিত বাদশাহের কখনও চাক্ষুষ সন্দর্শন পর্য্যন্ত ঘটে নাই; এমন কি, কিঙ্করের অস্তিত্বও বাদশাহ অবগত নহেন; তবে কেন অকস্মাৎ অসময়ে এই রাজ-আহ্বান?

কুশাগ্রধী কিঙ্কর যেন কতকটা বুঝিতে পারিলেন। বাদশাহী দানপত্রে নিজের দুই একটি শব্দযোজনা ভিন্ন বাদশাহের সহিত তাঁহার কোনও সূত্রে কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। সুতরাং সেই সূত্র লইয়া যাওয়া উচিত, এই বিবেচনায় মতিজ্ঞানকে দানপত্র লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

নপত্র লইয়া যথাসময়ে তিন জনে সম্রাটের পস্থিত হইবা-
শাহ একেবারে বলিলেন, "সেই দা আনিয়াছ?"
অতি বিনীতভাবে দানপত্র প্র লিলেন,
এত সাহস, কে এত বেয়াদব উপর কলম

ই জানেন না, সুতরাং নীরব; স্তম্ভিত! কিঙ্কর
ইয়া বলিলেন,
! এই ভৃত্য বেয়াদবি করিয়াছে, আমার প্রভু বা
তাঁহারা নিরপরাধ।"
কিসের,—"জল্লাদ!"

সভাস্থ সকলের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সওদাগর ও বাইজি ভয়ে মৃতপ্রায় হইলেন। কিঙ্কর সাহসে ভর করিয়া কহিলেন,

জাঁহাপনা! প্রাণ দিব, তাহাতে ভয় পাই না। কিন্তু আমার দোষের বিচার হউক; অগ্রে দানপত্রে বাজদৃষ্টি পতিত হউক, পরে যদি বিচারে প্রাণদণ্ড হয়, সহাস্যে রাজ-ইচ্ছা সম্পাদন করিব।"

যুবকের সাহসে বাদশাহ বিস্মিত হইলেন, এবং দানপত্র উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, বাদশাহী পাঞ্জার উপর লেখা আছে,—

"বেগর্ তক্তা জাফ্রাণ।" *

সম্রাট দৃষ্টিমাত্রই উহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রধান উজীরের সহিত কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সভাসদ্‌গণ বাদশাহের মুখমণ্ডলে সন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। বাদশাহ ক্ষণে ক্ষণে কিঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রধান উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

"জাঁহাপনার প্রসাদে, আমি জাঁহাপনার রাজ্য সুদূর বঙ্গদেশে হুগলীর নিকটে বাস করি।"

"শোন বাঙ্গালী! তোমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও দূরদর্শিতা দেখিয়া বাদশাহ পরম প্রীত হইয়াছেন। তিনি তোমার বেয়াদবী মাফ্ করিলেন, অধিকন্তু তোমায় পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করেন। তুমি কি পুরস্কার ইচ্ছা কর?"

কিঙ্কর আনন্দে হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া রহিলেন, পরে কথঞ্চিৎ সংবিত প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,

"জাঁহাপনার [illegible] সেবক বাদশাহের অনুগ্রহে আমি স্বধর্ম্মে ও স্বদেশে থাকিয়া বাদশাহের [illegible] জীবন উৎসর্গ করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে করি।"

উজীর [illegible] কাল পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "বাদশাহের অনুগ্রহে [illegible] প্রদেশের ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হও। তোমাকে কর্ত্তব্য [illegible] উপযুক্ত করুন।"

---

* অর্থাৎ, রাজসিংহাসন বা রাজবাটী, এবং জাফরাণ-ক্ষেত্র ভিন্ন সিংহাসন ও জাফরাণ=জাফরাণ ক্ষেত্র। সমস্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহা ও কাশ্মীরের জাফরাণ ক্ষেত্র, এই দুই স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] কের কো[illegible] অথবা উভয়েরই কিছু কিছু প্রার্থনা বিশেষ [illegible] করিয়া কিঙ্কর এই পদটি নি[illegible]

সভাস্থ সকলে রাজাদেশের এই অকস্মাৎ শুভ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কিঙ্কর নীরবে বাদশাহের পদতলে পতিত হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

* * * * *

সুদূর বঙ্গদেশে হুগলীর দক্ষিণে সেই ক্ষুদ্র চন্দননগরের তৃণকুটীরের দাওয়ায় বসিয়া, এক জন প্রাচীনা চরকায় সূতা কাটিতেছিলেন। রমণী বয়সে প্রাচীনা না হইলেও, তাঁহার জীর্ণ শীর্ণ দেহে বার্দ্ধক্যের প্রায় সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছিল। নীরবে অনেকক্ষণ সুতা কাটিয়া রমণী জীর্ণ অঞ্চলে নয়ন মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

"বাছাকে আজ প্রায় তিন বৎসর দেখি নাই, তবুও বেঁচে আছি? মাগো!—"

এমন সময় কুটীরের পার্শ্বে পদধ্বনি হইল। রমণী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয় গোরু আসিতেছে; পরক্ষণে দেখিতে পাইলেন, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া এক জন যুবা ও তাঁহার পশ্চাতে কয়েক জন অনুচর। রমণীর নয়ন, বোধ হয়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কিছু হীনজ্যোতি হইয়াছিল, তাই লোক দেখিয়াই বলিলেন,

"কে গা?—"

নিমেষমধ্যে যুবা বৃদ্ধা জননীর চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন,

"মা মা! আমি তোমার কিঙ্কর।"

তার পর, সেই একাদশীর ভীষণ বিদায়-রজনী, আর এই মধুর সম্মিলনের কথা!

* * * *

সেন যেখানে স্বীয় আবাস নির্ম্মাণ করাইয়া চতুর্দ্দিক পরিখাবদ্ধ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানকে লোকে আজিও "কিঙ্কর সেনের গড়" বলে। গড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

সাহিত্য-পঞ্জী।

কোন গ্রহ হৈল রাজা, কেবা মন্ত্রিবর,
বঙ্গ-সাহিত্যের পাঁজী; কহ, পূর্ব্বধর।

বাঙ্গালা সাহিত্যের তরী বা তৃণ, বহু স্রোতে, বহুবিধ বাতাসে, বহু বন্দরে, উজান ও ভাটি ভাসিয়া, এই ১৩০৫ সালে কোন পোর্টে আসিয়া পৌঁছিয়াছে? তরী বা তৃণ কোন 'পাণি'তে আসিয়া পড়িয়াছে? তের শত পাঁচের পোর্ট-তত্ত্ব ও পাণি-মাহাত্ম্য কি?—পঞ্জীফল কি? পঞ্জিকাকর্ত্তাদিগের কাছে প্রথম প্রশ্ন এই।

তরী, তৃণ, তৃণতরী, তৃণের তরী, বা তৃণ হইতে পরিণত, বিবর্ত্তিত, বর্দ্ধিত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ তরণী! অথবা, ইহার কিছুই নয়;—ইহা কেবল রূপক?

রূপক কি কেবল বসাত্মক? আঁশেই 'রিয়ালিটি'র খাঁটি বস্তুত্ব-ব্যঞ্জক নয়? শুষ্কই কি কেবল বৈজ্ঞানিক, সরস বৈজ্ঞানিক কি হইতে নাই?

তথাচ বলি, তরী অথবা তৃণ, 'শুলুফ' অথবা শৈবাল, বাঙ্গালা সাহিত্য—বাঙ্গালা ভাষা। দীন ভাবে বলিলে এবং ক্ষীণ করিয়া বলিলে তৃণ—শৈবাল। শ্রদ্ধা করিয়া, সম্ভ্রম রাখিয়া, বা সোহাগ ঢালিয়া বলিলে, তরী—তরণী। অর্থ উভয় দিকেই আসলকেই দেখায়। রূপক 'রিয়ালে'র ব্যত্যয় নয়। রূপক রিয়ালেরই মেদ মাংস-অস্থি-শিরা-শোণিত-গন্ধ-রস-যুক্ত রূপ। কেবল রূপ নয়; রূপক আসলের অত্যন্ত-অভিব্যক্ত আত্মা!

শুষ্ক, সিক্ত, সবুজ, যেমনই হউক, তৃণ তৃণই বটে। বাঙ্গালা সাহিত্য যদি তৃণ বা শৈবাল বল, তবে, তাহা না হয় সিক্ত এবং সবুজ এবং বল।

বিস্তর, তরণী নানানতর। জাহাজও তরণী, ডিঙ্গিও তাই। পিনা[illegible] বোট, বজরা, বালাম, গহ, সোড়ঙ্গা, গামপ্রান, শুলুফ [illegible]নার তরণী! বৃহৎ, অতি বৃহৎ, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি [illegible] বের ও বিস্তর। তামার, লোহার, কাঠের, বাঁ[illegible] দেখি সোণার তরীতে কখনও চড়ি নাই [illegible] কিন্তু, তাহা, স্বপ্নভূমে ও সোহাগের চুমে নি[illegible] ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, মহৎ, অতিমহৎ তরণী। মাল[illegible]

ভাবের জন্য, বস্তুর অভাবে, ব্যালাষ্ট-পূর্ণ তরীও জলপ্রবাহে ও কাল-প্রবাহে চলে। প্রয়োজনীয় পণ্য-পূর্ণ তরীর ন্যায়, প্যাসেঞ্জারী নৌকাও কত! হেটো নৌকা, ঘেটো নৌকা, গহনার নৌকা বিদ্যমান। "বাবু বৈদ্যবাটী, নৈহাটী" নৌকা তোমরা দেখিয়াছ। পশা, ভরমুজ, কচু, কাঁচকলা, তরী তরকারীর তরণীও তরঙ্গবক্ষে বহিয়া আসে। যে নৌকা হইতে জেলেরা জলে বায়, তাহাও বিস্তর ও বহুতর। বৈদ্যুতিক পোত হইয়াছে কি না, জানা নাই। কিন্তু বাষ্পীয় তরী বহু আকারে বিদ্যমান। এখন শ্রীমতীকে কোন শ্রেণী-ভুক্ত করিবে?

আমাদের বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যকে 'গুলুফ' বলা মন্দ নয়। গুলুফ বিলাতি জাহাজ অপেক্ষা ছোট এবং দেশী বড় কিস্তি অপেক্ষা বড়। গুলুফ সুন্দর, সুদৃশ্য ও সম্ভ্রান্ত। গুলুফ শান্ত, অথচ বীর্য্যবন্ত। গুলুফ, হালে ও পালে চলে; কাপ্তেন, কর্ণধার, কুলি, খালাসী বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন লোকে তাহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে। গুলুফ বেদম বোঝাই যায়, বড় বড় সমুদ্র বহিয়া বাণিজ্যার্থ বিদেশে যায়, ব্রহ্মে, চীনে, জাপানে যায়; বিলাতে মার্কিণেও মনে করিলে, যাইতে পারে। গুলুফ সময়ে সময়ে, বিলাতি জাহাজের সঙ্গেও টক্কর দেয়; দেশী ও বিলাতি মাল গর্ভে পুরিয়া, বড় বড় বাহির দরিয়া পাড়ী দিয়া আসে। গুলুফের চাল্ চটুল চঞ্চলও নয়, অতি মন্থরে মৃতও নয়, গম্ভীরে দ্রুত। পরন্তু, গুলুফ খাঁটী হিন্দুও নয়, শাফ খাবনিকও নয়; দুয়েতেই মিশ্রিত। তার, উহা আদৌ বিদেশী বাহন নয়, বিশুদ্ধ দেশী বস্তু। গুলুফ খাস বাঙ্গলার খাঁটী বাঙ্গালী বাহন ও বাঙ্গালীর বাঙ্গলা হাতের গঠন। গুলুফ চাটগাঁয়ের গৌরব।

কিন্তু চাটগাঁয়ের নাম শুনিয়াই যে তুমি চমকিয়াছ, আর চোখ টিপিতেছ? চাবা নাই! কিন্তু, চমকান কেন; মাথা চুলকানই বা কেন; চোখ টেপা-টিপিই বা কিসের জন্য? চক্ষু খুলিয়া দেখিলেই হয়; চক্ষু মুদিয়া চিন্তা করিলেও চলে। চাটগাঁ, বাঙ্গালা সাহিত্যে, বাঙ্গালার কোনও গাঁয়েরই কম নয়। চাটগাঁ, একই নিশ্বাসে, পুরাতনে ও নূতনে, প্রায় কাহনখানেক কবির নাম করিতে পারে,—যাঁহাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী, এবং যাঁহাদের মধ্যে দেশ-বিদেশবিখ্যাত অনেকগুলি। চাটগাঁয়ের নৈসর্গিক গঠন, সমুদ্র, পর্ব্বত, বন, মানুষকে স্বভাবতঃ কবি করিয়া দেয়। তাই বুঝি বা "বাইশ কবি"র একত্র কোলাকুলি। কর্ণফুলীর জলের ভিতর হইতে কবিতা-কুমুদিনী উঁকি ঝুঁকি মারে,

জলের তরঙ্গে ক্রীড়া করে। বাবু, চাটগাঁ শুনিয়া, মাথা চুলকাইও না, মুচকি হাসিও না। সবিশেষ না জান, সাহিত্যের কোনও একখানা পাঁজি খুলিয়া দেখ। ওলুফ-শিল্পের মত সাহিত্য-শিল্পেও চাটগাঁ গরীয়সী।

তা, চাটগাঁয়ের সাহিত্য সম্প্রতি সমালোচ্য নয়; চাটগাঁয়ের ওলুফের বিষয়ই বক্তব্য। অতএব তাহাতেই আবার ফিরে আসি।

ওলুফে, সেকালের আটচালা চণ্ডীমণ্ডপের সাবেক চাল আছে; আবার একালের হাল 'বল্‌রুমে'র চটক চাকচিক্য, লাস বিলাস বাহারও বেশ আছে। গাঙ্খালা গাড়ু, গামছা, তেলের বাটী, তামাকের গুল, চণ্ডীমণ্ডপের আধ-ময়লা বৃত্তি এবং 'দোবজা'র মত, পরদা-'পাটিসন'-বেষ্টিত 'বাথ্‌রুমের' তোয়ালে, সাবান, এসেন্স-শিশি, এবং আয়না 'ফনি' * আছে। সেই জন্যই ওলুফ বাঙ্গালা সাহিত্যের সুযোগ্য বাহন, বা স্বয়ংই সেই সাহিত্য। কেন না, তাহা গুদাম ও ক্যাবিন, কম্বল ও কেদেরা, গাড়ু ও বদনা, গায়ত্রী ও নেমাজ, নিরামিষ হবিষ্য ও খানা ডিনারের,—অপিচ, গুড়ুক ও সিগারের স্বদেশীয় ও সমীচীন সংমিশ্রণ। ফলতঃ, বাঙ্গালীর সাহিত্যটিকে ষোল আনা একটি এসেন্স-শিশি করিলে চলে না; কেবলমাত্র একখানি 'ফ্যাঙ্কনেবল্ ক্যাবিন' করিলেও কুলায় না। তাহার গৃহে, গুদামে, বা গর্ভে, দুবি দ্রব্যের খুবই বেশী দরকার হয়। শ্রীমতীর অঙ্গে সময়ে সময়ে পাকাপালার রঙ্গীন পেড়ে শাড়ী, এবং সীমন্তে সর্ব্বদাই অন্ততঃ এক বিন্দু সিন্দুর না থাকিলে, তাঁহাতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গৃহস্থালীর সম্ভ্রান্ত মহিলার ভাব থাকে না। 'বিবিয়ানী 'ব্রেসলেট' দিতে পার, বড়ই ভাল। কিন্তু বাজু বালা বাউটী ও শাঁখা সিন্দুর কাড়িয়া লইয়া নেক্‌লেস-বিলাসিনী বিধবা সাজান কর্ত্তব্য হয় না। সিন্দুরহীন কালী পেড়েতে, বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালিনীতে বড় কুৎসিত ভাব আসিয়া পড়ে। ফলতঃ, অস্মদ্দেশীয় সাহিত্যে স্বভাবতই কতকটা আটচালার ও পাকশালার ভাব থাকাই চাই, নহিলে তাহাকে বাঙ্গালা বলিয়া এবং বাঙ্গালীর বলিয়া চেনাই যায় না; তাহাতে বাঙ্গালী ভদ্র সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ততা পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা সাহিত্যে, নিছক 'বল্‌রুম্' বা বাবুয়ানী বৈঠকখানা, বাঁধা হুঁকা, বেলফুল, উলঙ্গ বেণী ও বায়োস্কোপ বসন হইলে, নিছক কোচ কেদেরা, কাচের বাসন ও গাড়ির উপর ধরধপে জাজিম হইলে যে ভাব আসিয়া পড়ে, তাহা বলিতে নাই। বাঙ্গালীর প্রণয়িনী বা পত্নী পৃথিবীতে জন্মিয়া কেবলমাত্র

* ফনি বা 'হনি'—(চাটগাঁয়ে) টিনের বাক্স।

পাক করিবে আর এ সব করিবে, পুষ্পবাস লইলেই পতিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত, চান্দ্রায়ণ ও মস্তকমুণ্ডনের যোগ্য হইবে,—ইহা যাহারা বলিতেছে বলুক, আমরা বলি না। কৃষ্ণ কুন্তল, কৃষ্ণ কবরী, কুসুমগুচ্ছে কুসুমমালায় সদাই শোভিত দেখিতে চাই। চাই কি, পাকগৃহেও তবি-তরকারির সঙ্গে, এক কুসুমের নিশ্বাসে অপর কুসুমের নিশ্বাস মিশুক, উভয়ের পবিত্রতায় ও সবলতায় সংসারধর্ম্ম সার্থক হউক, বাঙ্গালা সাহিত্য সঞ্জীব হউক। বস্তুতঃ বাঙ্গালিনীতেই সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রস্ফুটিত হওয়া প্রয়োজন। নহিলে আর কোথাও তাহা প্রকৃত প্রস্ফুটিত হইবে না। বলিবে, "এটা বিষম বিলাতি ভাব?" তুমি, বুঝিতে পার না, তাই এমন কথা বল। কাস্তে হাতে আছে, ঘাস কেটে ঘর বোঝাই কর। কাব্য কবিতা, সাহিত্য সমাজ ও সংসারধর্ম্ম সম্বন্ধে মিছা প্রলাপ বকিও না। কাব্য-রাজ্যে প্রবেশ করিতে উদার নির্লোভ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ভাবুক ব্রাহ্মণ হওয়া প্রয়োজন। বামুনের পৈতা ও বেণের চিন্তা লইয়া তথায় যাওয়া যায় না। কাব্য-রাজ্য পার হইয়া ধর্ম্ম-রাজ্যে পৌঁছিতে হয়। উভয়ের একই দ্বার।

কাব্য সাহিত্যের অসম্মান করিতে বসি নাই। কখনকাল উত্তীর্ণ হইবার পর সিন্দূরহীন কালাপেড়েতে আর কবিতা থাকে না। বাঙ্গালীর গৃহে তাহা বেজায় বিসদৃশ ভাব। তাহা বিলাতি কবিতা হইতে পারে, কিন্তু কদাচ বাঙ্গালা কবিতা নয়। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে তাহা যেমন অসম্ভ্রমকর, বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালা কবিতায়ও তাহা তেমনই কুৎসিত ও কলঙ্কের ছবি। বিদেশিনীর সীমন্তেও বঙ্গীয় সিন্দূর না দিয়া, তুমি তাহাকে সাহিত্য-সঙ্গিনী করিতে পার না। করিলে তোমার বাঙ্গালিত্ব যায়; বিদেশিনীরও অসম্মান হয়। তোমরা নামহীন ইতরের স্তরে নামিয়া পড়; তাহারই মধ্যে মিশিয়া যাও।

কেবল বাঙ্গালা কবিতাই বাঙ্গালা সাহিত্য নয়। সাহিত্যে কবিতা, অকবিতা, কুসুম কণ্টক, হাড় মাস, মিছরী মরিচ, সব জিনিসই থাকে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর সম্ভ্রম দিয়া সম্মান করিয়া বলিতে হইলে, তাহাকে 'শুলুক' বলাই শ্রেয়। সাহিত্যটির সব দিকের শরীর-গঠন গড়পড়তা একত্র লইয়া আদর করিয়াই আমরা তাঁকে শুলুক বলিতেছিলাম নহিলে, শ্রীমতী সর্ব্বত্রই যে শুলুক, তা নয়।

ইনি ইদানীং নানা দিকে নানা আবারের তরণী। এক সহরের মধ্যেই

ইহাঁর আঠারো রকমের আকার। ভবানীপুর, সিঁদিরপুর অঞ্চলে এক-রকমের আকার; শোভাবাজার নাগবাজার অঞ্চলে আর এক রকমের। এক হিংপুর বোডেই, হয় ত চৌদ্দ রকমের। বোড়াসাঁকোর মেড়ের মাথায় এক মূর্ত্তি, গলির ভিতর সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের রূপ। পাথুরেঘাটায় আবার পৃথক আকার; বিডন ষ্ট্রীটে ও বটতলার বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ। তার পর, কলুটোলা, কপালীটোলা অঞ্চলে আর কত রকম ঢঙ্। কর্ণওয়ালিসে কলেজ-ষ্ট্রীটে আবার (বটতলারই মত) রকম বিরকমের ঢপ ও ঢঙ্ যাইয়া চালোয়া মিশিয়াছে।

শ্রীমতী কোথাও সৌধপুরে ঝাঁকাও পাল্কী—পাল্কীর পরে মাছরাঙ্গা রঙ্গের মিহি পাল। কোথাও মহাজনী নৌকা—রসিক নেয়ে—নামাবলীর হাল্। কোথাও চটুল চঞ্চল, একহারা অতিক্রত লাল ডিঙ্গি। কোথাও অতিমন্থরগতি বা একান্তগতিহীন গড়ুর গহ্। 'শঙ্করী-কবকরায়তে'র সামনেই যেন আজন্ম-জঠর পাষাণশৈল ঠাকুরাণী কোথাও পুরাণ কাঠামে নবীন ঠাট। কোথাও জাপান-বার্ণিসে শিমুল কাঠ। কোথাও বিল্বপত্রী পতাকায় বেল্লিকের বোট। কোথায়ও বিবিয়ানি বাজরো—টুকটুকে ঠোঁট। কোথাও ফুলের তরী—ফিরিঙ্গি দাঁড়ী। কোথাও তিন তুলসী, কোসাকুশী ও কুশাসনে আধ-ঢাকা পিঁয়াজ রশুনের নৌকা—নেয়ে ওঁড়ী। শ্রীমতী কোথাও সাতাইশ শতপদী সরিষার ভরা, যেন অহিফেনের নেশায় নজর ফেলিয়া নিয়তই চক্ষু মুদিয়া আছেন। আবার, কোথাও, তাড়ীবোঝাই হেটো নৌকায় বত্রিশ দাঁড় বাহিয়া সারিগানের বাহার উড়াইতে উড়াইতে উধাও ছুটিয়াছেন। কোথাও ইহাঁর ভগ্ন কিস্তিতে ধর্ম্ম খেয়া। কোথাও বাণিজ্যের বাতাস বুঝিয়া মাল ও প্যাসেঞ্জার নেয়া। সাহিত্য-তরী কোথাও খাল-অঞ্চলের 'খাজনা খেটে'। কোথাও বা বাঙ্গাল মাঝীর 'নাও'; কোথাও বাবুভেয়ের ময়ূরপঙ্খী ভাউলে। কোথায়ও নেছুনীবেষ্টিত মাছের ডিঙ্গি। কোথাও শুঁটকী-মাছ-বেচাই গাধাবোট। সমস্ত স্বরূপগুলি লইয়া আমরা শ্রীমতী সাহিত্য-তরীকে 'শুসুফ' বলিতে সাহসী হইয়াছি।

এ সবই চিত্ত রূপক। রূপক না রাখিতে চাও, রগড়াইয়া ফেল; নিঙ্গড়াইয়া লও। তাহাতেও নারাজ নহি।

কিন্তু, সেই রূপকেই আবার পৌনঃপুনিক প্রশ্ন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তরী,—বাঙ্গালা ভাষার তরী, কোন্ তীর হইতে প্রথম নামিয়াছিল? সেটি কি

নিবেশী অধিবাসী হইয়া বাঙ্গাল বা বাঙ্গালী হইলেন। অতি উত্তম কথা। কিন্তু গঙ্গারাঢ় গৌড়াদি গোটা দেশগুলা বাঙ্গালা হয় কেন, এবং সেই দেশগুলার সমস্ত লোকগুলা বাঙ্গালী হয় কেন?—যদি বাঙ্গালই বাঙ্গালী, আর পূর্ব্ব-বঙ্গই বাঙ্গাল? বঙ্গ ও বাঙ্গাল যদি এতই ঘৃণিত ও নিন্দিত, তবে গঙ্গাতীরের ও পশ্চিমের পাঁচ সাত গণ্ডা পৃথক পৃথক প্রদেশ সটান বঙ্গ ও বাঙ্গালী হইয়া পড়ে কেন? যখন,—

"বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু।"

তখন এ দুর্গতি কেন, এবং দুর্গতির পরেও এত দৌরাত্ম্য কেন? বাঙ্গাল যদি মনুষ্যই নয়, তবে একই টানে এত কোটী মনুষ্য—সভ্য সুমার্জ্জিত মনুষ্য, অমনুষ্য বা অবুদ্ধ বাঙ্গাল, অর্থাৎ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়া, তখনই আবার বাঙ্গালকে দু' পা দিয়া থেঁতলায় কেন? এ কি বিসদৃশ ব্যাপার!

বলিবে, বিশুদ্ধ সংস্কৃত-ওয়ালারা ও পুণ্যশ্লোক প্রাকৃতভাষীরা বাঙ্গালাতে আসিয়াই বাঙ্গালী হইয়াছে, আপনাদের ভাষার ঐশ্বর্য্য দিয়া বাঙ্গলা ভাষা বানাইয়াছে, অথবা অসভ্য বাঙ্গালকে আপনাদের সভ্য ভাষা দিয়াছে; বাঙ্গালকে বিজিত বশীভূত করিয়াছে, জ্ঞানবান বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মশীল করিবার জন্য, সে কালি হইতে এ কাল পর্য্যন্ত কত পাঠ পড়াইয়াছে, তথাপি বাঙ্গাল সবিশেষ শোধরাইতে পারে নাই। অতএব উক্ত সংস্কৃতের সুসভ্য ও প্রাকৃতের পরিমার্জ্জিত পয়গম্বরগণ—পয়গম্বগণের বংশধরগণ, বঙ্গে বাস-ঘনিত বাঙ্গালী হইয়া গেলেও, বাঙ্গালার পূর্ব্বাধিবাসী বর্ব্বরদিগকে ও সেই বর্ব্বরদের বংশধরদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও ঘৃণা লাঞ্ছনা করিবেন বই কি?

সেই ত কথা।

এ উক্তিতে যুক্তির একটা মহা আড়ম্বর ও আওয়াজ থাকিলেও, আসল কাণ্ডখানা বুঝাইতে কিন্তু আটকে যায়। কৈফিয়তটাতে ও দিকে কুলায় না। ফলতঃ, তুমি ঐ উক্তি করিতেই পার না। কেন না, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, তাম্রলিপ্তি, গঙ্গারাঢ় গৌড়াদি যখন পৃথক পৃথক প্রদেশই হইল, তখন তাহার অধিবাসীরা পৌণ্ড্রী, গঙ্গারাঢ়ী ও গৌড়ী না হইয়া বাঙ্গালী 'কহলায়' কেন, বাঙ্গাল ও তখনকার বাঙ্গালী যদি এতই হেয়,—এতই অশ্রদ্ধেয় হয়?

বঙ্গ কোথায় ছিল? বাঙ্গাল কাহারা? আসল বাঙ্গাল, আদিম বাঙ্গাল কই? তাহাদের কেহই কি এখন একটিও নাই? তাহারা কি ক্রমে ধ্বংস

নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে। অথবা সভ্য উপনিবেশীদের অঙ্গে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে?

পশ্চিম বঙ্গ ও মধ্য বঙ্গের বাঙ্গালীর বিবেচনায় এখন যাঁহারা বাঙ্গাল, তাঁহারাও দেখিতেছি বাঙ্গাল-বিদ্বেষ্টা। ইহার তাৎপর্য্য কি? বাঙ্গাল কে?

পূর্ব্ব-বঙ্গের অতিপ্রান্ত সীমায় বসিয়া ইহা লেখা যাইতেছে। এখানে "বাঙ্গাল" কথাটার খুবই চলন। মুটে মজুর, চাষা ও মুর্খরাই বাঙ্গাল বলিয়া গণিত। অথচ তাহাদিগকেই বা বিশুদ্ধ বাঙ্গাল বলি কেমন করিয়া? কারণ, এখানকার অধিবাসী, মুসলমান ও মগ। হিন্দু, শূদ্র, বৈদ্য, ব্রাহ্মণগণ উপনিবেশী। এখন বল, ইহাদের মধ্যে বাঙ্গাল্ কে? মগ মগই। ব্রহ্মের অধিবাসী; এখানে উপনিবেশী। অতএব নিশ্চয়ই বাঙ্গাল নয়—বাঙ্গালীও নয়। ইহাদের কথাও বাঙ্গালা নয়, কিছুই বাঙ্গালা নয়। তার পর, মগকে যেমন, মুসলমানকেও প্রায় তেমনই কখনও বাঙ্গাল বা বাঙ্গালী বলিতে পার না। মগ ও মুসলমান জাতীয় উপাধিই অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিতেছে যে, তাহারা, অর্থাৎ তাহাদের অতিদূর পূর্ব্বপুরুষেরা, বঙ্গদেশবাসী নয়; সুতরাং তাহারা (এক্ষণে কৃত্রিম বাঙ্গাল হইলেও) অকৃত্রিম বাঙ্গালই নয়। মগেরা বাঙ্গালা বলে না। মুসলমানেরা বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা বা বাঙ্গালে কথা কহে বটে,—কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বাঙ্গালী বা বাঙ্গাল একের বা দুয়ের কিছুই নয়—হইতেই পারে না। ইহারা উভয়ই উপনিবেশীদের বংশাবলী। হিন্দুরাও তাই, অগ্রেই বলিয়াছি। এখন বল, যে বাঙ্গালের উপর বাঙ্গালের বিদ্রূপ এবং বিদ্বেষ, সে বাঙ্গাল কই—সে বাঙ্গাল কাহারা—সে বাঙ্গাল কোথায়?

এ অঞ্চলে "কৃষ্ণনগরী" বলিয়া এক আধ-ইতর শ্রেণীর হিন্দু তাহাদের জল চলে না, হুঁকা চলে। বামুনেও তাহাদের হুঁকা গুড়ুক কুঁকে। কৃষ্ণনগরীরাও আসল বাঙ্গাল নয়, তাহারা বিশিষ্ট উপনিবেশী। তাহাদের সুদূর পূর্ব্বপিতামহেরা গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়াছিল বলিয়াই তাহারা কৃষ্ণনগরী। "ধরণী-ঈশ্বর" কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণনগর হইতে কৃষ্ণনগরীরা উঠিয়া আসিয়া আগে যাইয়া উপনিবাস পাতিয়াছিল আরাকানে। কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগরীরা কোন জাতি ছিল, জানি না। তখনি জল-চল হিন্দু ছিল। কিন্তু, আরাকানে আসিয়া "বৃষলত্ব" পাইয়াছিল; বোধ হয়, কিছু ব্রহ্মীকৃত হইয়াছিল; শুনি শূকর খাইয়াছিল। ক্রমে

মন্দাকিনীতীর,—হিন্দুতীর্থ, সভ্য-সলিলে, শুভ্র সৈকত, অথবা অন্য পর্ব্বতের অসভ্য অজ্ঞাত কালাপাণির কুৎসিত বেলাভূমি! আর্য্য পিতামহগণের পবিত্র যজ্ঞোপবীতগ্রন্থ কৃষ্ণসার সারাদিন ত, অথবা বর্ব্বরের নগ্ন শূকরের পাল অষ্টপ্রহর পালে পালে চরিত? বা, সংস্কৃতের স্বর্গ হইতে প্রাকৃতের পূত পুণ্য পীযূষপ্রবাহে, সটান ছিল, অথবা বন্য বানরের কচকচি কিচিমিচি হইতে ক্রমে ক্রমে া, সংস্কৃতের সহবাসে, সাধে এবং সোহাগে, সভ্য ভব্য সম্পদ-হইয়াছে? ঠাকুরাণীর রূপে, লাবণ্যে, রসে, রুচিতে ও নানান জাতির, নানারকম বর্ণের, বর্ণসঙ্করের, অপসদের, অসুর, কিন্নর, কিরাত র, অনেকানেক যবন, ম্লেচ্ছ ও কর মস্তের সঙ্করাৎ-সঙ্কর বর্ণের শাসন-াঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, সর্ব্বপ্রথম কোন্ জীবের জিহ্বা-নি জন্মিয়াছিলেন, বা জাগিয়া উঠিয়াছিলেন? শ্রীমতী অদিতির বা হিতা? পুলহপুত্রী, অথবা প্রজাপতির পৌত্রী, কিংবা কর্দ্দম কন্যা? পা-সম্ভূতা আজকার বাঙ্গ-সাহিত্যের বিবি বঙ্গভাষা?

ঠাকুরেরা উত্তরকুরু হইতে বঙ্গভাষা মুখে করিয়া বঙ্গে আসিয়া-া বঙ্গে আসিয়া বঙ্গভাষাকে পাইয়াছিলেন? বলা বাহুল্য বাঙ্গালিনী নে, প্রলোভনে ও প্রণয়বচনে পড়িয়া, বশীভূতা, আত্মবিস্মৃতা, স্বগোত্রবর্জ্জিতা হইয়াছিল,—বিদেশীর বিক্রমে বন্দিনী, বৈরুবে াসে বিচরিতা হইয়া, বাঙ্গালিনী, বিদেশীর গৃহের দাসী হইয়াছিল, মার্জ্জিতা, সজ্জিতা, নিরন্তরবর্জ্জিতা, অনুলোমবিবাহিতা হইয়াছিল, নলী বিদেশীর বিদেশ হইতে আনীতা, বেদমন্ত্রে বিবাহিতা বৈধ পত্নিকাকার! এখনে এই সোয়ালের জবাব।

ভাষার বীজ বাঙ্গালায় জন্মিয়াছিল, বাঙ্গালাতেই ছিল, অথবা ত আসিয়াছিল? বাঙ্গালা বলিতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী নয়, তাহা , স্বীকারই করিলাম। বিহার ও উড়িষ্যা বাদ দিয়া কেবল 'লোয়ার প্রভিন্সেস্' রাখিলাম; তাহা হইতেও আবার বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ 'ডিভিসন' বাহির করিয়া দিলাম। সাঁওতাল পরগণাও দিলাম। তবুও কি আদি বাঙ্গালা, প্রাইমেরি বাঙ্গালী পাইব না! পাইবই বা কিরূপে? পশ্চিম বাঙ্গালা ছিল গৌড়বর্দ্ধন,—পূর্ব্ববাঙ্গালা ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ। তবে বঙ্গ কই? বাঙ্গালী কে তখন ছিল? রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বীরভূম,

নদীয়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, জঙ্গল-মহল, রামগড়, পাচেটী, পা
ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রকৃত বাঙ্গালা, প্রথম বাঙ্গলা, ২
নয়। পশ্চাৎ বাঙ্গলা হইয়াছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষও বাঙ্গলা নয়; তাহ
আসাম। পশ্চিমেও নয়, পূর্ব্বেও নয়, উত্তরেও নয়, দক্ষিণেও
অগ্নি, নৈঋত, বায়ুতেও নয়, অধোতেও নয়, ঊর্দ্ধতেও নয়, বঙ্গ
ছিলেন কোথায়? সে বঙ্গ ছিল তবে এ-বঙ্গের কোন অঙ্গে?

সুন্দরী কি তবে ছিলেনই না? অথবা ছিলেন কেবলমাত্র নামে
ছিলেন কেবল চাটগাঁয়ে, চাঁদপুরে, কুমিল্লায়, ত্রিপুরায়, আর ঢাকা
না, শুনি পূর্ব্ব-বঙ্গেই নাকি ছিল খাঁটী বঙ্গ, বিশুদ্ধ বঙ্গ। সেটা অব
জ্যোতিষের পশ্চিমে বটে। কিন্তু, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদি তবে বঙ্গ হইল কেন
হইলই বা কবে? কেবল বাঙ্গালরাই যদি খাঁটি বাঙ্গালী, তবে বা
বাঙ্গালী কেন? চাটগাঁ বা চাটগেঁয়েরা ত বাঙ্গাল, বদ্ধ বাঙ্গাল। কিন্তু
শান্তিপুরে পশ্চিমে সোহুরেদেরই মত চাটগেঁয়েরাও বাঙ্গালকে বাঙ্গাল
বিদ্রূপ করে; বরং বেশী রকম করে। চাটগাঁয়ে যে সব বাঙ্গালী
পুরুষেরও বেশী বাস, যাঁরা নিজে তথাকথিত বাঙ্গালের বাঙ্গাল,
বাঙ্গালকে উঠিতে বসিতে বেত্রাঘাত করেন। একি রহস্য! চ
কালের প্রবাদবাক্য,—

"কি বললো বাঙ্গালবে, বুঝতে নারে টাবে ঠুরে,
দু চার লাথি পৈলে ঘারে, তবে বাঙ্গালে বুঝতে পারে।"

এ কি বিভ্রাট! চাটগেঁয়েরা এই রূপে বাঙ্গালের বুকে মুখে লা
বলা বাহুল্য, পশ্চিমে বাঙ্গালী, বাঙ্গালের প্রতি এতটা বীভৎস ব্য
না। কিন্তু, কথা এই যে, চট্টলীরাই যখন বাঙ্গালকে এমনই ক
করেন, তখন বাঙ্গাল কে, আর বাঙ্গালের উপর এই অত্যাচারই
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, যে সব চট্টলীদের সময় হইতে উল্লি
বাক্য চলিত হইয়াছে, তাঁহারা খাঁটী চট্টলী নহেন, পশ্চিম-বঙ্গ—পৌ
রাঢ়, গৌড়াদি প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া চট্টলে বাসবাস করিয়াছিলেন, এবং
আদিম চট্টলীদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া লাথি মারিতেছিলেন। ভাল, তাহাই যেন
হইল। এবং ইহাও যেন বুঝাইল যে, পৌণ্ড্র গৌড়াদির লোক চট্টলে উপ-

* চট্টগ্রামের প্রবাদপুস্তক। চট্টগ্রাম জিলার বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে. ডি. এণ্ডারসন্
কর্ত্তৃক সংকলিত। ১৮৯৭।

তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। ক্রমে সে বংশের কতক চাটগাঁয়ে চলিয়া আসে। মহীষখালী দ্বীপে ও অন্যান্য স্থানে আড্ডা করে। শুনি, সেখানেও না কি ইহারা সেকালে শূকর আহার করিত। কিন্তু, এখন আর করে না। এখন ইহারা বেশ ঝরঝরে, খরখরে হিঁদু। এদের রামুন আছে;—বৈদিক মন্ত্রে এদের পূজা পাঠ হয়; বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সংস্কার হয়। পোরইকোরার বিশিষ্ট বৈদ্য-বংশ রায়-কানুনগো বাবুদের বদান্যতায় এদের হুঁকা চলিয়াছে। চাটগাঁয়ের হুঁকায় হিঁদুয়ানি রাখে না। এই অত্যুপাদেয় শ্রান্তিহর শান্তিহর আরাম-আয়েস-আরাম্য-দায়ক, দেবপ্রলোভনীয় দ্রব্যটি তথায় সার্ব্বজনিক, সার্ব্বজাতিক। ইহা অবশ্যই উদারতার পরাকাষ্ঠা। এই পেয় পদার্থে প্রভেদ নাই। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, শূদ্র, নবশাখ, সকলেরই একই 'ডাবা'। তাহার স্বর্গ-সুখ-দায়ক ছিদ্রে ভ্রূমালঙ্কার ও নরসুন্দর একত্র চঞ্চু স্পৃষ্ট করিয়া সুধা পান করে। জল-চল হিন্দু সজল হুক্কা ভরিয়া মুসলমানের হস্তে দেয়। মুসলমানের মুখ-স্পৃষ্ট হুক্কা স্পর্শ করিয়া তাহা পুনঃপুনঃ প্রস্তুত করিয়া দেয়। এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান! চাটগাঁয়ে হুঁকা—চল, আর সচল দধি। মুসলমানের পাতা ও মথা দধিতে ব্রাহ্মণভোজনও হয়। এই দুইটি দ্রব্য ব্যতীত চাটগেঁয়েরা গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়ারও গোঁড়া। কিন্তু, আমরা, অজ্ঞাতে, বিষয়ের বহির্দ্বার হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি। বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত কৃষ্ণনগরীয়াও বাঙ্গাল নয়। পুরাতন ভূগোল-পরিচয়ানুসারে তাহারাও পশ্চিমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনী বটে; কেন না, নদীয়া কৃষ্ণনগর হইতে তাহারা উঠিয়া আসিয়াছিল।

তবে বাঙ্গাল্ কে? বাঙ্গাল কোথায়? পূর্ব্ব বঙ্গই যদি পুরাতন বাঙ্গালা নয়, তাহার পূর্ব্বাধিবাসী বিশুদ্ধ বাঙ্গাল্ ত একজনও খুঁজিয়া পাই না।

বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা কথা কহিলেই বাঙ্গাল হয় না। পশ্চিমে বাঙ্গালীদের সেটা বুঝিবার ভুল। এ ভুল—এই বিষম ভুল, বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—ইহা আশ্চর্য্য বটে!

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। "ডিটেক্‌টিভ্" নামক ক্ষুদ্র গল্পটির আখ্যানবস্তু সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর। বিষয়নির্ব্বাচনে ও ঘটনার সমাবেশে বিশেষ নিপুণতার পরিচয় নাই। লেখকের লিপিকুশলতার অভাবে বর্ণিত ঘটনাগুলি নিতান্ত খাপছাড়া ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। গঠনকৌশল এমন দুর্ব্বল যে, বর্ণিত ঘটনাপরম্পরায় দুই তিনটি স্তর অতিক্রম করিলেই পাঠকের সম্মুখ হইতে গল্পটির রহস্য-যবনিকা সহসা অপসৃত হইয়া যায়, এবং তাহার ফলে অকালে পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহের অবসান হইয়া থাকে। বোধ হয়, লেখক নূতন ব্রতী। তিনি আখ্যানবস্তুর রহস্যরক্ষায় ও গল্পগঠনে বিফল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষা ও বচনভঙ্গী প্রশংসনীয়। অল্প পরিসরের মধ্যে ডিটেক্‌টিভের সনিষ্ক প্রকৃতি সফলতাসহকারে চিত্রিত হইয়াছে। মন্মথর চরিত্রও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ঘটনাবিন্যাসের দোষে তাহার আদ্যোপান্তে সঙ্গতি নাই। যে অতিসাবধান আত্মসংযত মন্মথ বুদ্ধিকৌশলে প্রতি পদে চতুর গোয়েন্দার অনুসন্ধান বিফল ও কৌতূহল উদ্দীপিত করিতেছে, সেই মন্মথ ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া আপনার প্রণয়দেবতার সাক্ষাৎলাভের যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিল, তাহা গল্পটির উপসংহারের পক্ষে আবশ্যক হইলেও, মন্মথ-চরিত্রের সহিত আদৌ তাহার সামঞ্জস্য নাই। এই সকল ত্রুটির অতিক্রম করিতে পারিলে, লেখক ভবিষ্যতে সফলতা লাভ করিবেন। "বর্ষামঙ্গল" একটি উৎকৃষ্ট মনোরম কবিতা। কবি সুনিপুণ তুলিকায়, উজ্জ্বলকোমল বর্ণরাগে, প্রাবৃট-লক্ষ্মীর 'স্নিগ্ধসজল' ঘনশ্যামল শ্রী চিত্রফলকে প্রতিফলিত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে কত যুগযুগান্তের বিগত বর্ষার গাথা কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে থাকে, সংস্কৃত-কাব্যকাহিনীর প্রাবৃট-ঘনচ্ছায়া সুখস্বপ্নের মত হৃদয় আচ্ছন্ন করে। আমরা কবিতাটির অধিকাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে।
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে;
নিখিল চিত্ত-হরষা,
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা!

"কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা!
ঘনতমতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক কঙ্কণ রসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা!
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।

"আম মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুলকুটীরে, আয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ পাতায় নব গীত কর রচনা,
মেঘমল্লার রাগিণী!
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী।

"স্নিগ্ধাঞ্জল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশা প্রহর অচল অলস আবেশে
শশিতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী
কোথা তোরা পুরকামিনী।
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী;
সুপ্তশয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী।

'যুথী পরিমল আসিতে গগন ভরিবে,
ডাকিবে দাদুরী তমালকুঞ্জ তিমিরে,
জাগো সহচরী অভিসারিকা নিশি ঘোরা,
নীপ-বনে বীর মুরলী!
পুলক পরাগ ঝরিবে সকলে ফুলেতে
অধরে মধুর নিবন ঝুলকে অধরে,
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধ কুন্তলা!

"প্রথমেতে বর্ষা আসেছে নবীনা ধরণী,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা,
ছুটিছে পবনে নবসজল বন-বীথিকা!
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
রচিয়া তুলিছে মন্ত্রমন্দির গভীরে
শতেক যুগের গীতিকা!
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা।

"আমার ছাত্রাবস্থা" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বীয় ছাত্রাবস্থা ও তদানীন্তন শিক্ষাপদ্ধতির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নানাবিধ ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ ও অতিশয় চিত্তাকর্ষক। বৃদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় সরলহৃদয়ে সহাস্য মুখে উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"এইরূপ মংস ও তমসাচ্ছন্নাবস্থা হইতে আমাদিগের সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা মনে করিতাম।" যে শিক্ষায় সভ্যতা সম্বন্ধে এমন 'সর্বনেশে' সংস্কারের বীজ অন্তর্নিহিত থাকে, তাহার কোথাও কোনও অসম্পূর্ণতা ছিল, মনে করিলে কারণ আছে; কিন্তু সেই শিক্ষা হইতেই রাজনারায়ণ বসুর মত নির্ভীক সত্যানুরাগী ও স্বদেশানুরাগী সাহসী চরিত্রবান পুরুষের উৎপত্তি, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন হয় ত সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ শিক্ষিত সমাজের চক্ষে বিকৃতভাবে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু এইরূপ সত্য অনুরাগ ও আত্মানুসন্ধানের দৃষ্টান্ত অধুনাতন 'শিক্ষিত সমাজে' আদর্শস্থলে গণ্য হইতে পারে। "পটবস্ত্র" প্রবন্ধে বাঙ্গলার বিলুপ্ত বেশ-বাসিতোর অতীত ইতিহাস ও তাহার পুনরুদ্ধারের উপায় বিবৃত হইয়াছে। আশা করি, এই প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের অবধান আকৃষ্ট হইবে। "আমাটার প্রাণিতত্ত্ববিৎ" প্রবন্ধে দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ হড্‌সন সাহেবের লিখিত 'দি প্লাটার প্রাণিতত্ত্বসহায়ী' এবং 'পাটাগোনিয়ায় অলস পর্যটন' নামক* গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয় বিবৃত সংগৃহীত হইয়াছে। লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন, 'হায়! আমরা বৈরাগ্যমন্ত্রে পুরুষানুক্রমে দীক্ষিত, 'মানুষকেই মানুষ জ্ঞান করি না, তা গোরু মোষ পশু পক্ষী তৃণ গুল্ম কত সামান্য।" বাঙ্গালী-চরিত্রে অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির অভাব, তাহা সর্বজনবিদিত সত্য;—কিন্তু সে বিষয়ে 'বৈরাগ্যমন্ত্র' বেচারীর কতখানি দায়িত্ব, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ভারতীয় ত্রিপিটকের প্রচারিত 'বৈরাগ্য-মন্ত্র' ভারতসন্তানের চরিত্রে কি কি বিশেষত্বের উৎপাদন করিয়াছে, এবং তাহা হিতকর না অহিতকর, লেখক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এই নিগূঢ় বিষয়ের বিচার বা সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল যে বিহ্ন সমধুর বচনবিন্যাসের 'রসান' দিয়া, 'বৈরাগ্য-মন্ত্রের' শক্তি ভ্রুকুটী করিয়াছেন যে সকল বিষয় মানবের ধর্মসংস্কারের সহিত সম্পৃক্ত, তাহা লইয়া এরূপতর ছেলেখেলা না করিলেই শোভন হয়। "ব্রিটিশ গায়েনার কুলি" সুখপাঠ্য। "বারিষ্টার" একটি [illegible]। চিত্রকর যাঁকিতে পারেন, কিন্তু চিত্র-বস্তুর নির্বাচনে তাঁহার তত পটুত্বের পরিচয় পাইলাম না। বারিষ্টারের দাবিয়া ও তজ্জন্য তাহার লাঞ্ছনা লইয়া লেখক যে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। দারিদ্র্যের মধ্যে যে দুঃখগর্ব বড়মানুষীর জ্ঞান দেখা যায়, তাহা বরং বিদ্রূপের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু দারিদ্র্যের স্নেহ, লাঞ্ছনা ও অভাবের ভীষণ লাঞ্ছনা বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইলে, নিতান্ত নিষ্ঠুর আক্রমণ-রূপে প্রতীয়মান হয়।

মুকুল। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। "মাডস্টোন" পেনসিলে ছয়খানি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। প্রবন্ধটির ভাষা ও রচনাভঙ্গী বালকদের উপযোগিনী নহে। 'মাছো আনা' একটি সুখপাঠ্য চিত্র।

প্রবন্ধ। "ডক্টর মুলারের" জীবনচরিত বিশদাকার। "আপেয়গিরিদর্শন" একটি ক্ষুদ্র রচনা, কিন্তু সুপাঠ্য ও মনোরম। "পুষ্পময়ী" একটি মিষ্ট উপকথা।

উৎসাহ। আষাঢ়। "মাতার আহ্বান" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। রবীন্দ্র বাবু আজকাল স্বরচিত কবিতায় স্বদেশের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল ও কবিতা সার্থক হউক। "হেষ্টিংসের শিবানন্দিনী" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের' রচিত। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিশ্ববচনা" ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কারের "নীল", এই দুইটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

সৎসঙ্গ। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের রচিত "বীরভূমি" প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট হইতেছে। ভূ-প্রদক্ষিণ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেনের "হিন্দুধর্ম্ম" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। লেখক নিজে যদিও 'গোঁড়ামী' পরিহার করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনিও 'গোঁড়ামী'র সমর্থন করেন না।

স্বাস্থ্য। আষাঢ়। আমরা দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দেখি নাই। "স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ", "ছেলের অসুখ ও মাতার জ্ঞাতব্য", "মুদ্ধ" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিবিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পূর্ণ ও উপযোগী। "রোগযোগ ও টীকার ফলাফল" সময়োপযোগী। আশা করি, "স্বাস্থ্য" ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

হিন্দু-পত্রিকা। আষাঢ়। "ভক্তিতত্ত্বের প্রচার" ও "হিন্দু ও আর্য্য", প্রবন্ধ দুইটি পাঠযোগ্য। সম্পাদক এবার "গীতাদাস" নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের ভাষা আর একটু সহজ হইলে ক্ষতি কি?

নির্ম্মাল্য। আষাঢ়। 'বাঙ্গালার নাহ' প্রবন্ধটির বিষয়গুণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, কিন্তু লিখন-চাতুর্য্য বিষয়ের অভাববশতঃ নিরাশ হইতে হয়। লেখক 'বাঙ্গে বহুতা' পরিত্যাগ করিয়া ঘটনাসংগ্রহে অবহিত হইলে, প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য হইতে পারে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের "অভিমান" ইতিহাসিক কবিতাটি সুরচিত, কিন্তু নিরাশার অন্ধকারে কাতরতা সমাবৃত।

কোহিনুর। প্রথম খণ্ড; প্রথম সংখ্যা। আষাঢ়। "আমাদের নিবেদনে" প্রকাশ,—"হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতায় অনাথাশ্রমের সাহায্যার্থ 'কোহিনুর' প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। উদ্দেশ্য মহান্; আশা করি, সম্পাদক সফল হইবেন। হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাম্য বস্তু; যিনি এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণেও সিদ্ধিলাভ করিবেন, তিনি উভয় জাতির আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই। "মাইকেল ও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা" ও "মোসলেম সমাজ-সংস্কার" প্রভৃতি প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট না হউক, পাঠযোগ্য। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে অধিকতর অবহিত ও উদ্যোগের কৃতকার্য্য হইবেন।

শুভ। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। "স্ত্রী-শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর "প্রাকৃত মহারাষ্ট্র" প্রবন্ধে মহারাষ্ট্র দেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেউস্কর মহাশয়ের লিপিকৌশলে ও গবেষণাগুণে "প্রাকৃত মহারাষ্ট্র" উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'কর্ম্মবীর গ্লাডষ্টোন্' প্রবন্ধটি সুপাঠ্য। গ্লাডষ্টোনের জীবনী যেমনি হোক্ না কেন, কিন্তু যথাযথ হয় নাই। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "আমিষ ভোজন" প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। লেখক বলেন, "তিন দিক হইতে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শরীর-রক্ষার কথা, বিজ্ঞানের বিষয়; পরের কথা অর্থশাস্ত্রের বিষয়, তার পর ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা।" এই তিন পক্ষে বিচার নিষ্পন্ন করিয়া উপসংহারে

লেখক বলিয়াছেন,—"মনুষ্য অভাবে প্রকৃতির নিয়মে জীবরক্ষার জন্য চিরকাল পশুমাংস ভোজন করিয়া আসিতেছে। ইহাতে এক হিসাবে অধর্ম নাই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সকল মনুষ্যের মতই নিরামিষাশী ছিলেন; কেন না তাহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, তাহাই মানবের প্রাচীন ধর্ম। দেবতার প্রীতির জন্য পশুবলি হইত; পৃথিবীর সর্বত্রই এই ইতিহাস; একেশ্বরবাদী ইহুদীরাও যে [illegible] বিবিধ প্রাণি হত্যা করিত। এই ব্যাপার বৈদিক যজ্ঞে হিংসা ব্যবহার। শস্যপূর্ণ ভারতভূমিতে কৃষিব্যাপৃতপ্রাণ আর্যদিগের আয় তেমন জীবহিংসার প্রয়োজন হয় নাই"; জীবের প্রতি দয়াবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশে বিলম্ব হইয়াছিল; অধ্যবৃত্তি অন্তঃকরণে নূতন ভাবের উদ্বোধন করিয়া আসিতে পারে, মনু; বিজ্ঞানবলে একদিন এমন বলিষ্ঠ হইবে যেদিন আর নিষ্ঠুর হিংসার প্রয়োজন হইবে না, সেদিন সমগ্র পৃথিবীতে অহিংসা পরমধর্ম বলিয়া গৃহীত হইবে। এখনও মনুষ্যের সে অবস্থা হয় নাই। মনুষ্যকে জ্ঞানাভাবে ও শক্তির অভাবে অদ্যাপি প্রাচীন হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছে। অতীতের প্রতি উক্তিপরায়ণ মনুষ্য হিংসাবৃত্তির সমর্থনে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ নিন্দা প্রবৃত্ত হয়েন নাই। নূতন ধর্মকে আপনার সহিত সমতা করিয়াছেন। কিন্তু [illegible] ন প্রকৃতিকর্তৃক বঞ্চিত দুর্বল দুর্ধর্ষ মানবকে এই পরমধর্মের উপদেশ দেওয়া [illegible] গত্যা মনুসংহিতাভাবের সহিতই বিরচিত হয়,—

'প্রকৃতিরেষা ভূতানাং নিয়তিস্তু মহাফলা।'

"হেমেন্দ্রপ্রসাদ পরমহংস বাবা" শ্রীমতী উমাপদ্মী দেবীর রচিত। লেখিকা এই প্রবন্ধে পাঠক পুত্রের সুপ্রসিদ্ধ পরমহংসী বাবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনবৃত্ত সঙ্কলিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মতত্ত্ব। তৃতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা। আষাঢ়। "হেগেলের ভেদাভেদবাদ", 'মুক্তি ও অনন্ত উন্নতি" সাময়িকপত্রের উপযোগী। এই সংখ্যায় শঙ্করাচার্যকৃত অপরোক্ষানুভূতির বঙ্গানুবাদের সূচনা করিয়া সম্পাদক মহাশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। সম্পূর্ণ হইলে এই অনুবাদ আমাদের উপকারে আসিবে। এই সংখ্যায় 'The Presupposition of Psychology" নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা বাঙ্গালে ইংরাজী প্রবন্ধ কেন?

প্রদীপ। আষাঢ়। "বঙ্গবুৎসল রবিবর্মচন্দ্র" শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর রচনা। বঙ্কিমবাবুর লোকপ্রসিদ্ধ, তাঁহার কাহিনী তেমন সর্বজনবিদিত নয়। বঙ্কিমের জীবনের কথা আমরা এত অল্প জানি যে, বঙ্কিম-প্রসঙ্গের কণামাত্রও আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। এ ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বক্তা, তাঁহার মুখে বঙ্কিম-কাহিনী শুনিয়া নারায়ণ নিবেদকের তৃপ্তি হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুর ও চন্দ্রনাথ বাবুর চিত্র আছে। চিত্র দু'খানি ভাল হয় নাই। "সবজ" শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের রচিত ঐতিহাসিক সন্দর্ভ; এই সংখ্যায় সূত্রপাত হইয়াছে। "ঐতিহাসিক সমালোচন, সম্বন্ধে দুকথা" শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের লিখিত। [illegible] প্রবন্ধটি প্রযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কৃত 'ঐতিহাসিকসমালোচনে'র প্রতিবাদ। তৃতীয় [illegible] লেখক বলিতেছেন, "সোণার তরী পাঠে আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই আমি [illegible] বিবৃত করিয়াছি।" এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। রমণী বাবু অনায়াসে 'নিজের [illegible] ছাগল ল্যাজের দিকে কাটিতে' পারেন, তাহাতে কাহার কি আপত্তি? কিন্তু লেখক নিজের [illegible] অধিকার সম্ভোগ করেন, অন্যকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে [illegible] সমালোচন ধর্মও মানিতে চাহেন। 'সোণার তরী' সম্বন্ধে লেখকের মনেতে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহার ভিন্ন [illegible] করিয়া বিস্তার করেন "কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর "হিংসিং ছুট" নামক কবিতাটি পড়িয়া, "ঐতিহাসিক" সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ গুপ্তের মনে যে ভাবের উদ্রেক [illegible]

হইয়াছিল, তাহা রমণী বাবুর মতে "বিদ্রূপ মাত্র"। রবীন্দ্র বাবুর কবিতা সম্বন্ধে রমণী বাবুর সহিত যাঁহাদের মতভেদ হয়, তাঁহাদিগকে "ইহার মর্ম্মগ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন"। সাহিত্য সম্বন্ধে এমন কোন বিধি নাই, যাহার বলে সমালোচক কবি রমণীমোহন মল্লিক, মুনিনাথের কত পাপ্তাড়ি দিয়া বোমার্ধিক কবিতে হইবে। রমণী বাবু "জিজ্ঞাসু" এই কথা মন্তব্যকের প্রতি যথেষ্ট বিদ্রূপ করিয়াছেন। 'সাহিত্য-সম্পাদক সম্বন্ধে তিনি যাহা কহিয়াছেন,—সাহিত্য-সম্পাদকগণ সাধারণ পরিচিত হইতে অভিলাষী, তাঁহারাই যখন নাটকের একপ একটা কবিতার অবতারণা করিতে পারেন;" ইত্যাদি। লেখক কোন্ সূত্রে অবগত হইলেন যে এই প্রবন্ধের "সাহিত্য-সম্পাদক সাধারণ-সমাজপতি" বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষী, ত্রিবিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষিত ছাত্রকে, এক জন অপরিচিত ভদ্র লোককে গালি দিবার জন্য মিথ্যা কথার ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। এই শিষ্টাচার ও সৌজন্য তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বাবুর কাব্য, না উহার নিজের সমাজ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? ইহার দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, সাহিত্য-সম্পাদক একটি সরল কবিতার অর্থবিদ্রূপ করিয়াছেন। আমরা প্রবন্ধটি পুনর্ব্বার পড়িয়া দেখিলাম, এবং এখনও যাহা "প্রেম ভুলে যখন মানুষে ওল মধুর মুরলী বাজে, মন অন্যকে থাকিতে বল স্বপ্নকাননে চলিতচরণী ধীরে, নিতান্তই হাস্যরসের উদ্দীপক"—বলিয়া রমণী বাবু এই সমালোচনার মর্ম্মোদ্ঘাটনে তত অধিক নয়। লেখক মূর্খ স্তম্ভনাথের বিবিধ বচন হইতে বিবিধ অংশ উদ্ধৃত করিয়া, রবীন্দ্রনাথের রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখক আশা করেন, তাঁহার মত সকলেই রসগ্রহণের লিখিত দিনু ও বিকর্ণ ঘর্ঘরে ভাষান্তর বেদনাকে বলিয়া অনুভব করিবে। বিধু বাবু গাহিয়াছিলেন,—"তোমাই তুলনা তুমি ও মরকতস্থলে," এবং যেমন বলা পূজে গঙ্গাজলে।" মনস্তোষে তেমনই রবীন্দ্রনাথের অন্য কবিতা দিয়া তাঁহার এই রচনার সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত যে সর্ব্ব-বাদিসম্মত না হইতে পারে, সে সম্বন্ধে যে পৃথিবীতে অনেক বিভিন্ন মত বিদ্যমান,—রবীন্দ্রবাবুর অবলম্বিত বা প্রচারিত মতের বিরুদ্ধ মত যে অন্য সমালোচকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এ বিষয়ে রমণীবাবু সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি হেমন্তপ্রসাদের আরোপিত দোষের নিরাসার্থে যুক্তির অবতারণা করেন নাই,—প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবু অভিমতমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর অভিমত রমণীবাবুর নিকট প্রমাণ ও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে—অন্যের পক্ষে নহে। এই সহজ সত্যটুকু রমণীবাবুর মস্তিষ্কে আজো উদিত হয় নাই, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। চৈতালি সম্বন্ধে নিজের মত একান্তে বাধিয়াই অনাদিগের বলা যাইতে পারে, রমণী বাবু-কৃত প্রতিবাদের ভিতি নাই। তিনি বলিয়াছেন, "চৈতালির ত্রুটিসকল রমণীমোহনী আমার উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতার বহির্ভূত"। লেখককে এ কথা কহে। লেখক পরে বলিয়াছেন,—"এ দেশে রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার তবনও সম্যক্ত আদর হয় নাই"। বস্তুতঃ রবীন্দ্রবাবুর ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য না হইলেও তাহা প্রতিভার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে।" লেখকের এই উক্তির মধ্যেও অনেকটা সত্য আছে। নতুবা "চৈতালি" সমালোচনায় এমন যুক্তিসম্পর্কশূন্য ভক্তিমাত্রসম্বল প্রতিবাদ আমাদিগের দেখিতে হইত না। রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার বক্তব্যপ্রকাশের জন্য শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বৌদ্ধ নৈতিক সেনাপতিত্বে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব, স্থির করিতে পারিতেছি না।

ভগবান! রবীন্দ্রনাথকে এমন ভক্তের কবল হইতে রক্ষা কর।

কবিতাকুঞ্জ।

কুতূহল।

নবীন প্রভাতে আজি কানন ভবনে
শুনি তোরে শুধু মোর পড়িছে স্মরণে
বিজন যমুনা-তটে তমালের ছায়
রাখালের সে বিরহ-বিধুরা বালায়;
শ্রাবণ গগন সম নীল নবঘনে
আঁখি মাঝে ছেয়েছিলি প্রেমের স্বপনে;
বসুধি সুবাস সম বেদনা ভরল
ঢেকে দিয়েছিলি যা'র মায়ের অঞ্চল;
নিভৃতে হৃদয় দাহী অনলের প্রায়
প্রাণ যা'র জ্বেলেছিলি বিভস-তৃষায়:—
হায় কোথা সে কিশোরী? কোথা সে
কিশোর?
কোথা যা ব্রজের কুঞ্জ রজনী উজোর?
শুধু সে বিরহ-ব্যথা বজ্রের সমান
পলে পলে হানে আজি জগতের প্রাণ।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বর্ষান্তে।

আজ মনে পড়ে সেই হৃদয়-আকাশে
ধীরে ধীরে ফুটেছিল নবীন প্রণয়,
পূর্ণিমা নিশিতে সেই দক্ষিণা বাতাস,
প্রাণে জেগেছিল কত আশা, কত ত্রাস!
তা'র পরে কত দিন গিয়াছে বহিয়া,
সুখে দুখে দু'জনার কেটেছে জীবন,
সে প্রেম তরীতে আজ বেয়ে মিলাইয়া
তাই সে দিনের স্মৃতি হয়েছে স্বপন।
আজ প্রাণে চেয়ে দেখি মরু চারিধার,
কিবলু বসিয়া কাঁদে হৃদয়-শ্মশানে;
সে প্রেম, সে সুখ, আশা, কিছু নাহি আর,
কেবলি জাগিছে শুধু কাতর পরাণে—
আর কিছু নাহি,—ছিল সে দিন যেমন
তাই সুধা আনিয়াছে প্রেমের মরণ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মৃত্যু।

নাড়া নাহি শব্দ নাহি আঁধার রজনী;
আজি মনে হয় মৃত্যু বুঝিবা এমনি!—
অন্তিম জীবনের সায়াহ্ন-গগনে,
ঘন কৃষ্ণ পক্ষ মেলি মুদিত নয়নে
শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-ঘ্রাণ বিহীন
আসিবে মরণ-নিশা! ম্লানজ্যোতি ক্ষীণ
নিভে যাবে আশিতায়! নিস্তব্ধতি সাথে
ডুবে যাবে প্রাণ-দীপ!—অসীম নিশিতে
পড়ে রবে সাড়াখানি! তীব্র-উজ্জ্বলে
নিশির স্নিগ্ধ সুখ কার আঁখিজলে
ভাসিবে মরমে ফুটি টেব নাহি পাবে!
অতলের তলে কোথা হতে কোথা যাবে!—
স্বপ্ন হতে মৃত্যু, তার পরে জাগরণ
কাল-পারাবারে পুনঃ হইবে কখন!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ কথা।

আর কেন?—মরণের রথে
আমি মাত্র দাঁড়ায়েছি এসে,
তুমি সুখে জিবে যাও ঘরে,
আমি যাই অজানিত দেশে।
আর কেন দেখাতেছ সখি,
ও আনন—ম্লান পরশন,
পাছে ভুলি মরিবার সুখ,
তাই ভয়ে দুর্বল অন্তর।
দেবী তুমি ফিরে যাও ঘরে,
সেথা তোমা-তরে কত মুখে,
অধমের ভীষণ শ্মশান
দাঁড়ায়ে দেখিবে কেন বুকে?
এত দিন বাসন্তী সন্ধ্যায়—
সে যে আরও বহুদিন গেছে,
এইখানে এস ধীরে ধীরে,
অমনি কমল মিঠি ফেলে।
এইখানে রেখ পা দু'খানি,
ভূ লুটায়ে পড়িবে আঁচল,
অভাগার চিতা-রজঃ মাঝে,
দিও দুই ফোঁটা আঁখিজল।
জগতে তা জানিবে না কেহ,
কেবলি জানিবে অশ্রুরাশি;
তারে—সেই চিতাভস্ম প্রাণ
পুলকে হইবে অবিনাশী।

শ্রীমানকুমারী বসু।

নদীতীরে।

দুরন্ত-শিশুর মত খেলা-অবসানে
সুখাবেশে লেগেছে যেন বিশাল তটিনী।
শোভিছে গগনে মেঘ-বিচিত্র বিরাগে;
বিরস বিরেছে নীড়ে, স্তব্ধ কলধ্বনি।
আজ বায়ু চলিতেছে বহিছে সুধীরে,
ঝরিছে শিশির বৃক্ষ হ'তে ঝরে বারিধারা।
নবমীর অর্দ্ধচাঁদ আকাশ উপরে,
একটি তারকা হায়! হারায়ে আপনা।
তীর পানে সন্ধ্যালোক আসিছে ধাইয়ে,
তার তরু-শিরে স্পর্শে নীল মেঘরাশি।
মহানদী কিছু দূরে গিয়াছে মিশিয়ে,
তটিনী গগনে যেন দোঁহে যায় মিশি-মিশি।
একাকী দাঁড়ায়ে কূলে ভিজে আঁখিকুল,
স্মরণে জাগিছে কত মোহময় ভুল।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কোকিল।

১

কেনে তুই পরী-পাখী, উঠিলি কুহরি?
শুধু তোরি তানে,
সমস্ত-আনন্দ-জল- ঢি যেন ঝরিয়া
প্রকৃতির প্রাণে।
নতাব-তামল কায়,
পুলক-পরিবে ছায়,
ফুল আঁখি মেলি চারু-চোরি মুখ পানে।

২

সুষুপ্তাতুর প্রাণ নব-নব নূতন
উঠে কহ যদি,
ধরার সৌন্দর্য্য যেন উঠি অমিয়ার
হয় সুমধুর!
মলিল-প্লাবন সম
কল স্বর নিরুপম
ছাপি বন, প্রবণের-তৃষা করে দূর।

৩

দক্ষিণ-বাতাস বহে ফুল গন্ধ নিয়ে,
নিশি ভোর ভোর,
কুমুদ-কুমুদ-খোলা উষার স্বপনে
মৃদু ঘুম-ঘোর।
আধ-আধ শিশু-ঠোঁটে
কি সুখ-হাসিটি ফোটে
শিশুরে বকুল-ভালে 'দুই' উঠে তোর।

রৌদ্র-পীত তপ্ত-মাঠে চরিতেছে গাভী,
দ্বিপ্রহর বেলা,
বসিয়া বাঁধের ধারে অশথ-তলায়
রাখাল একেলা;
কোথা হ'তে কুহু তান
উদাসিল তার প্রাণ,
বাঁশীতে ধরিল সুর ভুলে সব খেলা।

মুকুলিত-আম্রবনচ্ছায়াযিন বাটে
গ্রামপথ দিয়ে
জলকে নারীর মেলা চলে যায় কাঁখে
কলসীটি নিয়ে;
সহসা আড়াল থেকে,
কি কুহু উঠিল ডেকে;
থমকে ফেলে সে বালা আপনা হারিয়ে।

বিজন ব্রহ্মরাতে সুপ্ত চন্দ্রালোকে,
মুক্ত বাতায়নে,
মধীন প্রেমিক দুটি বাঁধা বাহুপাশে
মিলন-শয়নে;
অই মৃদু কুহু কুহু
এনে দেয় মুহু মুহু
কি সুখ-সুধার নেশা দোঁহারি নয়নে।

গান সাথে বয়ে যাবে শত শত পাখী,
চিরদিন ধরি,
প্রকৃতি চাবে না কারে, তবে শুধু বুকি
তোরে বুকে করি।
তুই সত্য নিত্য ধ্রুব,
সঙ্গীত রাজ্যের রবি,
বাঁধা নিখিলের গীতি কুহু সুরে তোরি।

শ্রীনিনু কুমারী ধর।

মানবের সুখ।

জ্যোতিষ্কের ক্ষীণ আলো সম
মানবের সুখ এ ধরায়,
অন্ধকারে আলো করি ক্ষণ,
একবার অমনি মিলায়।
অন্ধকারে সেই আলো সম
কেহ ফিরে তারি পানে হায়,
আঁখি মুদে মোহের তন্দ্রায়
কেহ পরে করে হায় হায়!

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসাক।

শ্রীযুগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শিশু-প্রকৃতি।

মানব-প্রকৃতির রহস্য কি জটিল! যতই আমরা সভ্য ও উন্নত হইতেছি, ততই যেন দুর্বল ও অসহায় হইয়া পড়িতেছি। বাহ্য প্রকৃতিকে যতই করায়ত্ত করিতেছি, শরীর ও মানব প্রকৃতি ততই যেন দীন হীন হইতেছে। যখন বনে বনে ধনুর্বাণহস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, তখন প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল; তখন প্রকৃতি যেন স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এখন প্রকৃতিকে আমার অধীন করিতে যাইয়া প্রকৃতির সে স্নেহ যেন হারাইয়াছি, প্রকৃতি আমার বিমাতা হইয়া বসিয়াছেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট আগে পিতৃস্থানীয় ছিলেন, এখন অংশেন করিয়া যেন তাঁহার বিদ্বেষ্টিতে পড়িয়াছি।

আগে জল বায়ুর পরিবর্ত্তনের সহিত আমার প্রকৃতির এত সংগ্রাম ছিল না। ক্ষুধা তৃষ্ণার এত কাতর হইতে হইত না, রোগের সংখ্যা এত ছিল না, প্রখরতা এত তীব্র হইত না। তখন কোমল হস্তে প্রকৃতি আমাদিগে পালন করিয়াছিলেন। যতই বসনের বিচিত্রতা, অশনের মাধুর্য্য, ঔষধের সংখ্যা বাড়িতেছে, ততই কঠোরতর হস্তে প্রকৃতি আমাদের শাসন করিতেছেন। যখন অসহায় হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়দেশে শরণ লইয়াছিলাম, তখন প্রকৃতির অনুগ্রহের সীমা ছিল না; এখন সাম্য মৈত্র স্বাধীনতা স্থাপন করিতে গিয়া, যাহা ছিল, তাহা হারাইয়াছি; যাহা ছিল না, তাহাও পাইলাম না।

স্বাবলম্বনের উৎকর্ষে মানব-সন্তান জীবমণ্ডলীর শিরোমণি, কিন্তু সদ্যোজাত মানবশিশুর ন্যায় অসহায় অবস্থায় আর কোনও জীব-সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া সংসারসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না। আহারও শীত-বাত-নিবারণের উপযোগী আচ্ছাদনে দেহ আচ্ছাদিত থাকে; কেহ আত্মরক্ষার উপযোগী আয়ুধ লইয়া জন্মগ্রহণ করে; জীবনরক্ষার উপযোগী আহারসঞ্চয়ের শক্তি অনেকের থাকে; টিকটিকী ডিম্ব হইতে বাহির হইয়া, মশক-জন্ম লাভ করিলেই, আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যশিশুর মত নিরাবৃত নিরাচ্ছাদন নিঃশক্তি আর কেহ নহে। পৈতৃক মানস শক্তির পরিমাণে নিকৃষ্ট জীবে সামান্য হইলেও, নিকৃষ্ট জীবশিশু পৈতৃক শক্তির যথেষ্ট সঙ্গে লইয়া

অনুগ্রহণ করিতে পারে। পিতৃপ্রাপ্ত মানস শক্তির তুলনায়, স্বোপার্জ্জিত মানস শক্তি নিকৃষ্ট জীবের সামান্য। মানবশিশুর অনুরূপ। তাহার দেহগ্রহণের সময় মস্তিষ্ককোষের জ্ঞানোদ্দীপন সম্যক্ সম্পূর্ণ; যেন হাতুড়ির গৃহ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসঞ্চালনের শক্তি নামমাত্র; চর্ম্ম কোমল; শীত-বাত-নিবারণের উপযোগী লোমাবরণ অকিঞ্চিৎকর; নয়নস্থাদি আবৃত নগ্ন; মাতার স্তন পান করিবার শক্তি না দিয়াই বিধাতা তাহাকে প্রেরণ করেন। এমন অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থায় কোন পিতা শিশুসন্তানকে নিম্নশ্রেণী পাঠাইতে পারেন? নিকৃষ্ট জীব-সন্তান সংসারসংগ্রামের উপযুক্ত শিক্ষা ও শক্তিলাভের জন্য, পিতা মাতার আশ্রয়ে সামান্যকাল অতিবাহিত করে; মানবকুমার বহুকাল দীর্ঘকাল অতি যত্নে পালিত পোষিত শিক্ষিত না হইলে, কৈশোরে ভবলীলার উত্থাপন করে। সদ্যোজাত মানবশিশুর উপস্থিত মূল্যে কেহ কুক্কুর-শাবক বিনিময় করিতে না। মানবকুমার নিতান্ত অসহায় বলিয়াই জননীর হৃদয়ে এত স্নেহ, দেহে এত প্রভূত শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে। পিতা মাতা উভয়ে তাই সমবেত যত্নে এত দীর্ঘকাল সন্তানের পালন পোষণ করেন। নিকৃষ্ট জীবে কেহ অত প্রেম করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়; পশুদের সন্তানপালনে মাতার সহায়তার তুলনায় পিতার সাহায্য সামান্য; পক্ষীদের উভয়ের সাহায্য সমান, কিন্তু অনতিদীর্ঘ কালস্থায়ী। এত দীর্ঘকালস্থায়ী, এত অতুলপরিমাণ স্নেহ দম্পতির হৃদয়ে সঞ্চিত না হইলে, মানবসমাজের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা ছিল না।

দম্পতির অতুল স্নেহে আত্মপুত্তলিকা জীবরাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারে না। অসহায় মানবশিশু কি বলে কালক্রমে জীবরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করে, অনুসরণে অতীব আনন্দ। বুঝি কর্ম্মে অন্ধকার প্রোথিত সূত্র-পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর মূল, অপরিব্যক্ত কদাকার দেহ, চিত্রপ্রায় নির্জ্জীব এবং পল্লব, তাহা হইতে কি করিয়া মনোমোহন সৌরভ কুসুমের জন্ম হয়, সে কুসুমে অনুপম সৌরভ কোথা হইতে সঞ্চারিত হয়, অনুসরণে উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদের কি অতুল আনন্দ! তাহাপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর নাসপিণ্ডে ত্রিভুবন-ধারণক্ষম মহাশক্তিসম্পন্ন মানব হৃদয় কোথা হইতে মানবকুমার সংগ্রহ করে, অনুসরণে কাহার না আনন্দ হইবে?

মনুষ্যের পিতৃক্রমাগত যাবতীয় শক্তি পশু পক্ষীর প্রায়োজন শক্তির ন্যায় সদ্যোবিকসিত না হইলেও, পরিণামে ন্যূন নহে। পক্ষান্তরে, স্বোপার্জ্জিত শক্তি সদ্যোনিরীক্ষিত হইলেও পরিমাণে অসামান্য, এবং মানবশিশুর মানস শক্তির

ক্রমবিকাশ অসীম অথচ আয়াসসাধ্য, ধীরগতি, অথচ পরিণামমঙ্গল হইলেও, মানব ও জীবের মানসশক্তির প্রকারভেদ নাই। এ সকল কথা মানবপ্রকৃতি দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থে সম্যক আলোচিত হইয়াছে। শিশুপ্রকৃতির বিশেষত্ব এবং ক্রমোন্মেষের প্রকরণ কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

সকল দেশেই একটি কুসংস্কার প্রচারিত আছে যে, অসভ্যজাতি বড় সবল, সত্যবাদী ও প্রফুল্ল। অসভ্য প্রকৃতির সন্তোষাভাব সন্তান, সুতরাং অনাবিল ও নিষ্কলঙ্ক। সভ্যতা কৃত্রিম; মানবপ্রকৃতি বিকৃত, অঙ্গহীন, বা কলঙ্কিত করিয়া ফেলে। এই কুসংস্কার শিশুপ্রকৃতি সম্বন্ধেও যথেষ্ট প্রচারিত। শিশুরা সাধু, সবল, সত্যবাদী, শান্ত, বিনীত, কৃতজ্ঞ, কোমলহৃদয়, জিতেন্দ্রিয়। শিশুরা দেবত্বসম্পন্ন, দেবপ্রকৃতি। পৃথিবীর ধূলা কাদার তাহাদের অনাবিল, স্বচ্ছ, প্রকৃতি কলঙ্কিত ও মলিন হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীর সংসর্গ ও দৃষ্টান্তে তাহাদের পতন বটে। আদি পিতামাতা দেবতা হইতে অভিন্ন। জ্ঞানপিপাসা ও সভ্যতাপ্রয়াস তাহাদিগকে স্বর্গচ্যুত করে। অতীতের তিমিরময় গর্ভে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত। শিশুপূজা নানা দেশে প্রচলিত। বালগোপালের প্রতিকৃতি, বালখৃষ্ট, বালকের মুখে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিবার চেষ্টা, শত শত জাতিতে দীপ্যমান; জগতের বাল্যইতিহাস কনকপটে চিত্রিত। মানব যদি চিরদিন বালক থাকিত, তবে জগতে বিবাদ বা অশান্তি, পাপ বা প্রলোভন, কিছুই থাকিত না। পুতুল লইয়া খেলা করিয়া নন্দগোপালের ন্যায় নাচিয়া খেলিয়া দিন কাটিয়া যাইত। সকালে খেলা, দুপুরে খেলা, সন্ধ্যায় খেলা; সন্ধ্যার আঁধারে খেলা, আর খেলা যায় না, দেহ অবসন্ন, তবু খেলিবার বাসনার বিরতি নাই, তাই ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানে বলিতাম,—

"যারে রজনি তুই মরিয়া,
আমরা যতেক ভাই, হইলাম ঠাঁই ঠাঁই,
যারে রজনি! তুই মরিয়া।"

মান বা বিরহ, গোষ্ঠের মত মনোজ্ঞ কেহই নহে। ব্যাবৃত্তি পরিমাণে মনুষ্য শ্রেষ্ঠভাব। শৈশবে মানবসন্তানকে পূর্ব্বগত সকল জীবের জীবলীলার অভিনয় করিতে হয়। জীব-পর্য্যায়ে যে যত নিম্নে, তাহার পূর্ব্বগত জীব-শ্রেণী তত অল্প; মৎস্যস্থিতকে শৈশবে যত জীবলীলার অভিনয় করিতে হয়, সর্পশিশুকে তাহার অপেক্ষা অধিক করিতে হয়। মনুষ্য জীবশ্রেষ্ঠ, এ জন্য মনুষ্য-শিশুর পূর্ব্বগত জীবশ্রেণী অনেক অধিক। একাণু হইতে আরম্ভ করিয়া নবমর্কট পর্য্যন্ত সমস্ত

জীব-পর্য্যায়ের জীবলীলা তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে। সুতরাং মনুষ্য-শিশুর অসহায় শৈশবকাল দীর্ঘতম হইয়া পড়ে।

এই অসহায় শিশু মানবসন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য জননীকে যাদৃশ যত্ন লইতে হয়, অন্য কোন প্রাণীর তেমন করিতে হয় না। কবিরা বলিয়া দীর্ঘতম অসহায় শৈশবে লালন-পালন হেতু নর-জননীর স্নেহ মমতা যাদৃশী সুপুষ্টি লাভ করিয়াছে, এমন আর কোন জীবের নহে। মনুষ্য শৈশবের দীর্ঘতার হ্রাস হইলে, বাৎসল্যের উৎকর্ষ হীন হইত। সুতরাং দীর্ঘশৈশবের অসহায়তা নরজাতির অবশ্যম্ভাবী ও কল্যাণকর।

শিশুপ্রকৃতির বিচিত্রতা সাধারণতঃ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। শিশুমাত্র সরল, শিশুমাত্র হাস্যময়, শিশুমাত্র অতি বিশ্বাসী ও সাধু, এই প্রকারের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের অন্তর্নিহিত। প্রথম চক্ষে সকলে বড় প্রতিভাত হয়, অসাধারণ প্রতিভাও হয়তো সব সাহেবের চেহারা এক রকম, এজন্য কাছারীতে সাহেব অপরাধীকে সনাক্ত করিতে এত গোলযোগ হয়। সাহেব সব পাতাগুলি একরকমই, এ ভ্রম অবিবেচনার ফল। অভিনিবেশ-সহকারে পরীক্ষিত হইলে স্পষ্ট হইবে যে, একই বৃক্ষের কোন দুইটি পত্র অবিকল নহে, অল্পাধিক বিশেষত্ব প্রত্যেকের আছে। শিশুমাত্র এই ভ্রম যাঁহাকে নিত্য অভিনিবেশসহকারে প্রতিধাবন করিতে হয়, সেই জননী জানেন, তাঁহার দুইটি সন্তানের শৈশবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বৃদ্ধি, হাব, ভাবের বিশেষত্ব কিরূপ। বস্তুতঃ, একই দম্পতির কোন দুইটি শিশু একরূপ নহে। সুতরাং শিশুমাত্রকে সমভাবাপন্ন ভাবনা করা ভ্রমসঙ্কুল।

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে আর একটি ভ্রম আছে। সদ্যোজাত শিশুর দেহ যেমন নিরলঙ্ক, নির্ম্মল, আমরা তাহার বিকাশশূন্য মনে, তাহা দেখিয়া মনে করি, তাহার মনটি ভেমনি নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পিশুষ্ক। অনেক ব্যক্তি মনে করেন, সদ্যোজাতশিশুর মনটি একখানি পরিষ্কার সাদা কাগজের মত, একটি আঁচড়ও পড়ে নাই। এই জন্য শিশুমাত্রকে সমভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়। মানসিক অবস্থার সংঘর্ষণে যত দিনে ভিন্নরূপে ব্যবহৃত না হয়, তত দিনে সেইরূপে ব্যবহৃত, বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হওয়া দীর্ঘকালসাপেক্ষ, এইজন্য অনেকে বলিয়া, শিশুমাত্রকে সমাবস্থ কল্পনা করা হয়।

কিন্তু সদ্যোজাত শিশুপ্রকৃতি নববস্ত্রের ন্যায় নির্ম্মল, চাঁচড়শূন্য নহে। কাগজখানি দেখিতে সাদা বটে, কিন্তু তাহাতে কালীতে ডুবিবার সকলই লিখা

আছে; আগুনের তাতে তাতাইয়া লইলে দেখিবে, তাহার সকলই মিথ্যা, নূতন কথা লিখিবার জায়গা অতি অল্পই খালি আছে।

আমাদের সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিত ও পৈতৃক। বাহিরের বৈঠকখানা আমি নূতন তৈয়ার করাইয়াছি বটে, কিন্তু অন্দরের সেই পুরাতন দুটা কোঠাও আমার পৈতৃক সম্পত্তি। পৈতৃক ভিটায় আমি নূতন দালান, নূতন বাগান নির্ম্মাণ করি। দেহের অস্থিমাংস পৈতৃক, আর মন, সেটা কি স্বোপার্জ্জিত? অস্থিমাংসের সহিত শিশু পৈতৃক মানসিক প্রকৃতি উত্তরাধিকার করিয়া থাকে। দৈহিক ব্যাধি ও বলের ন্যায় পিতার মানসিক দোষগুণ, জ্ঞান বুদ্ধি, পৈতৃক দূরদর্শন, কর্ষিত চিত্তবৃত্তি, শিশু উত্তরাধিকার করে। বিন্দুমেয় বীজমধ্যে বিশাল বটবৃক্ষের বৃক্ষত্ব যেমন নিহিত থাকে, বে হরকোষ ও গৌরীকোষের সম্মিলনে মানব-শিশু উৎপন্ন হয়, সেই দুইটি কোষ মধ্যে দুইটি পরিবারের লক্ষ লক্ষ পুরুষের গুণ দোষ সন্নিহিত থাকে। শিশুপ্রকৃতি লক্ষ পরিবারের অব্যাবৃত যুগফল। আলো তাপ ওৎসার পাইলে, বীজনব্যস্থ বৃক্ষত্ব বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। শিক্ষা, সংসর্গ ও অবস্থার সম্মিলনে, লক্ষ পরিবারের প্রাপ্ত-ধন কালে প্রকাশ হইয়া পড়ে: পরিবারে শিক্ষা, বিদ্যালয়ে শিক্ষা, সমাজে শিক্ষা, অবস্থায় শিক্ষা, এ সকল শিক্ষা মূল প্রকৃতি কিছু বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। কিন্তু মৌলিক প্রকৃতির ধ্বংস হইবার উপায় নাই। তথাপি "জাতিমাহাত্ম্যং"। বিভিন্ন বংশ ধনসান শিশু-প্রকৃতি বিচিত্র হইবেই হইবে—কোন দুইটি শিশু সম্পূর্ণরূপে সমাবস্থ হইতে পারে না। বাঙ্গালীমাত্র মিথ্যাবাদী, এ কথা বলা যেমন যুক্তিবিরুদ্ধ, শিশুমাত্র সরল বা সাধু, এ কথা বলাও তেমনি অযথা। তবে সাধারণ-প্রকৃতি দেখিয়া কোন একটি দোষগুণ বা লক্ষণ আরোপ করিতে হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

আশ্চর্য্য বৃষ্টি। (সচিত্র)

সময় সময় সংবাদপত্রে মসী-বৃষ্টি, রক্ত-বৃষ্টি, চন্দন-বৃষ্টি ও হরিদ্রা-জল-বৃষ্টির কথা পাঠ করা যায়। অতি অল্প দিবস হইল, নদীয়ার কোন কোন গ্রামে চন্দন-বৃষ্টি হইয়াছিল; গত বৎসর নেপালের কোন কোন স্থানে রক্ত-বৃষ্টি

হইয়াছিল। এই প্রকার অসাধারণ বর্ষণে সাধারণ লোকে ভাবী জলপ্লবের আশঙ্কায় চিন্তিত হয়। কিন্তু সে চিন্তা অমূলক।

১৮৬২ ও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে চারি বার মসী-বৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম বৃষ্টি ১৮৬৯ অব্দের ১৪ই জানুয়ারি হয়। রভারেণ্ড জে. রাই তাহার "The Scottish Black Rain-showers of 1862 and 1863" নামক প্রবন্ধে এই আশ্চর্য্য বৃষ্টি-চতুষ্টয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৪ই জানুয়ারি প্রাতে সাড়ে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত আকাশ নির্ম্মল ছিল। নয়টার সময় গগন মেঘময় হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধূমময় ভয়ঙ্কর মেঘ ঘনঘটা করিয়া সমুদ্রের দিক হইতে আসিল। এবং দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই বারি-ধারায় অধিকাংশ মসীময়। প্রায় দুই শত বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই অদ্ভুত বৃষ্টি হইয়াছিল। রজকেরা বস্ত্র শুকাইতে দিয়াছিল; তাহাতে এরূপ কালীর দাগ লাগিয়াছিল যে, অতিশয় উত্তপ্ত জলে ধৌত করিয়া তবে কোন মতে সেই মসী-চিহ্ন তিরোহিত হয়। বস্ত্রে গন্ধকের গন্ধ হইয়াছিল। এক জন ফটোগ্রাফার এই বৃষ্টির জল ব্যবহার করায়, তাহার ফটোগ্রাফ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় মসী-বৃষ্টি ১লা মে কারলিউক নামক স্থানে, তৃতীয় বৃষ্টি ২০শে সেন্লুস্ নামক স্থানে, এবং চতুর্থ বৃষ্টি ১৮৬৩ অব্দের ২৮শে অক্টোবর পুনরায় সেন্লুস্ নামক স্থানে পতিত হইয়াছিল। এই সকল বৃষ্টির পর সাগরতীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ডও পতিত হইয়াছিল। এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব্ব বায়ু প্রবহমান ছিল। অধ্যাপক চার্লস্ টমলিন্সন্ অনুমান করেন যে, ভিসুবিয়স-গিরি-প্রক্ষিপ্ত ধূম ও শিলাখণ্ড বায়ুবেগে স্কটলণ্ডে আনীত হইয়া, বৃষ্টির কালে সাধারণ বারি-বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অনুমানের বিশেষ কারণও আছে। কারণ, ১৮৬২ সালের ১০ই জানুয়ারি ভিসুবিয়স ধূম উদ্গীরণ করে; এবং প্রথম বৃষ্টি ১৪ই জানুয়ারি পতিত হয়। পুনরায়, ২৮শে এপ্রেলের প্রত্যূষকালে উক্ত আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে; ইহার তিন দিন পরে কারলিউকে বৃষ্টি হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ বৃষ্টির পূর্ব্বে আর কোথাও কোনও অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল কি না, জানা যায় নাই।

ইউরোপের নানা স্থানে কখন কখন লোহিতবর্ণ বৃষ্টির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই জলেও গন্ধকের গন্ধ থাকে। জর্ম্মনীতে কখন একবার এইরূপ বৃষ্টি হয়, তখন অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল যে, রক্তই বৃষ্টি হইতেছে। কেহ কেহ

মনে করেন, কুঁজের প্রয়াগ-বটমূলে উপরে উঠিয়া পড়িবার সময় ইহা হয়ে মিশ্রিত হইয়া উহাদের বিস্তার করে। ইহা কতদূর সঙ্গত, তাহা বলা যায় না। কারণ, যে পাথর ভেদে দুধের পরাগ আকাশের দূরদেশে উত্থিত হয়, তাহার ভেদে সমস্ত পুষ্প মৃত্তিকাতে হইয়া তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প দূরে উঠিতে পারে। কিন্তু পুষ্পবৃষ্টি গল্পে ও পৌরাণিক কাহিনীতেই শুনিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষ দেখা যায় নাই।

১৮৪৩ অব্দের ১লা নবেম্বর প্যারি নগরে অগ্নিবৃষ্টি হয়; বৃষ্টি মৃত্তিকা স্পর্শ করিবামাত্র ধূম ও অগ্নি নির্গত হইয়া চলে কম্বেরায়ের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণিত করিয়াছিল। ১৮৪৮ অব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর অলডিরিয়াতে যে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, সেই সময় দুই এক বিন্দু বারি কেরোসিন গলিত হইয়া উহাকে দীপ্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮৩৬ অব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার দশ ক্রোশ দক্ষিণে মৃত্তিকা-সংযুক্ত বৃষ্টি হয়। ঐ বৎসর মে মাসে এলাহাবাদের নিকটও কৃষ্ণ নীলের বর্ষণ হইয়াছিল। Hasted's History of Kent নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ইসেক্সে নামক প্রদেশে আকাশ হইতে কৃষ্ণ মৃত্তিকা পতিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও অনেক বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থকারের গ্রন্থে এই প্রকার মৃত্তিকা বৃষ্টির কথা পাঠ করা যায়।

মৃত্তিকা ও কেক-বৃষ্টিই বা না হইবে কেন? নরওয়ে দেশে একবার মুক্তা-বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। কেক-বৃষ্টির কথা French Academy নামক ফরাসীস্ বিজ্ঞান-সমিতির পত্রে পাঠ করা গিয়াছে। ১৮৩৩ অব্দের আগষ্ট মাসে ফ্রান্সের নানা স্থানে কেক-বৃষ্টি হইয়াছিল। লোকের মস্তকের উপর, পৃষ্ঠদেশে, বস্ত্রের মধ্যে, রমণীগণের গাউনের ভিতর খুঁজিয়া খুঁজিয়া কেক বাহির করিতে হইয়াছিল।

রাষিয়ার অন্তঃপাতী কেভ্ নামক জেলায়, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর কীট-বৃষ্টির কথা Journal de St. Petersburg নামক পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

বিলাতের Royal Society'র ১৬৬১ অব্দের ৬৩শে জুন তারিখের মিনিটে যে প্রকার বৃষ্টির উল্লেখ আছে, তাহা মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইলে একপ্রকার ভালই হয়। উল্লিখিত আছে যে, ওয়ারিক নগর হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী টর্ব্রুক নামক গ্রামে এক প্রকার শস্য-বৃষ্টি হইয়াছিল; সেই শস্য অনেকটা

গোধূমের নমুনা। স্যার হেন্‌রী পাকারিজের পুত্র মিঃ হেন্‌রী পাকারিজ, নভঃস্থলাগত এই শস্যের সামান্য পরিমাণ লইয়া আসিয়া ইংলণ্ডেশ্বরকে উপহার দিয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলোকন করিয়া ও উহার কাহিনী শুনিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন যে, বাইবেলোক্ত মিহদী-শিবিরে ম্যানা-বৃষ্টি অমূলক নহে।

স্বভাবতঃ প্রীতিব্যঞ্জক এই সকল অসাধারণ বৃষ্টির কারণ সম্যকরূপে নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা, শিশু জল-বায়ু-বিজ্ঞানের এখনও হয় নাই। নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল কারণ সচরাচর নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে;—

(১) ঘূর্ণি-বায়ু ও জলস্তম্ভ। (৩) বায়ুর উপাদান।

(২) কীটাণু ও উদ্ভিদাণু। (৪) আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ।

(১) বিপরীত গতিবিশিষ্ট বেগবান্ বায়ুপ্রবাহ পরস্পর সম্মিলিত হইলে ঘূর্ণি-বায়ু উৎপন্ন হয়। বায়ুপ্রবাহদ্বয়ের গতি ও বেগ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে করিতে দুই প্রধান গতির সৃষ্টি করে—আবর্ত্তন ও ভ্রমণ। প্রথম গতির ফলে ঘূর্ণন; কুম্ভকারের চক্রবৎ তীব্র বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভঞ্জন মৃৎসংলগ্ন কত দ্রব্য লইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হয়। কোন কোন সময় এমন বলশালী ঘূর্ণিবায়ু সংঘটিত হয়, যাহার বলে ভূপৃষ্ঠের অনেক ভারশালী দ্রব্যও গগনে উঠিয়া থাকে। দ্বিতীয় গতির ফলে ঘূর্ণিবায়ু এক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান না করিয়া, তথা হইতে অন্য স্থানে গমন করে; সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠোত্তোলিত দ্রব্যরাজি লইয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। জলের উপর যাইয়া উপস্থিত হইলে, জল ও জলচর জীবকুল ও তৎকলতা পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া আকাশপথে ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া যায়। বজ্রাঘাত প্রভৃতি বিবিধ কারণে ঘূর্ণিবায়ুর ধ্বংস হইলে তৎসহ-উত্থিত দ্রব্যরাশি আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়। ঘূর্ণিবায়ুর ধ্বংস হইবার সময় আকাশের বায়ু-প্রবাহ সেই ঊর্দ্ধোত্থিত সামগ্রীনিচয় দূর দেশে লইয়া যায়; এবং বৃষ্টির সময় বৃষ্টি-কণিকার সহিত মিলন-নিবন্ধন উপযুক্ত গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাবে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়া আইসে। যদিও কীট-পতঙ্গ বা মীন-শম্বুক, অথবা জলরাশী তরুকণা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তবে সেই সেই সামগ্রীর বৃষ্টি হইয়া থাকে। বায়ুস্তরে দীর্ঘকাল অবস্থানবশতঃ সেই সকল দ্রব্যের বর্ণ ও আকারের বিভিন্নতা হইতে পারে; কাহারও কাহারও জীবনাশও বিচিত্র নহে। মানুষ ঊর্দ্ধে উঠিলেই শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে; 'অন্যে পরে কা কথা?'

উত্থিত ধূলিকণা পতনোন্মুখ বারিকণায় সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বচ্ছ জলকে

কিন্তু করিয়া মনী বাবুকে আর করিয়াছিলেন। আমরা বলে করি, মসী-বৃষ্টি হইল—মসী-বৃষ্টি হইল। অবিরত পরিয়া ধূলিমুষ্টি বারি-কণার সহিত মিশিয়া পতিত হইলে আমরা মনে করি যে, চন্দন-বৃষ্টি হইল।

(২) ধূর্ত-বাবু নিজেদের পর আকাশ-পথে ভাসিতে ভাসিতে কীটাণু লাভ-লোভিকা আশ্রয় করিলেও উহারে যে বিষয় করিতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের কত গুপ্তরোগীর জন্য এই কীটাণু ও উদ্ভিদাণুর জন্ম বিষয় ও বিশ্রী। উক্ত-গগনে যেখানে সেখানে যে কীটাণু ও উদ্ভিদাণু জন্মিতে পারে না, তাহা নহে। তাহাদিগের অনেকের গঠন ও আকার এরূপ যে, যে কারণে ক্ষুদ্র জল-কণা মেঘরূপে আকাশে বিচরণ করে, সেই কারণে তাহারাও পৃথিবীর আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া কিয়ৎকাল গগনমার্গে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে।

(৩) বায়ুতে যে কেবল অঙ্গারজান, উদ্জান ও বকজারজান আছে, তাহা নহে। প্রাচ্য পণ্ডিতগণের অধ্যবসায় ও উদ্যম দিন দিন নব নব উপাদানের আবিষ্কার করিতেছে। আড়িতশক্তির বলে বিচ্ছিন্ন বায়বীয় উপাদান কণার সহিত সম্মিলনে উহার অসাধারণত্ব উৎপাদন করিতে একেবারেই যে পারে না, তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?

(৪) আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ ধূমরেখা কত ধূমপ্রণালী আকাশপথে বিমিশ্র করিয়া দেয়; সেই সকল সামগ্রী বায়ুপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বৃষ্টির জল-কণায় মিশিতে পারে। নির্ঝর জলকণার সহিত বৃক্ষকরাদি প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া উহাকে বিবিধ-গুণ-সম্পন্ন ধাতবজলে পরিণত করিতে পারে। ঘন-সন্নিবেশিত জলকণা দীপ্তিশালিনী হয়; গন্ধক-মিশ্রিত বারিতে উহা ধাতুর অনুভূত হয়।

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

ভাদুমতী।

৬—রণক্ষেত্রে।

সাত বারিয়া অবাধে দেখিল, ও কাহাকে ভড়াইয়া ধরিল। তাহার উপর মুতবৎ পড়িয়া আছেন। তিনি সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। ধীরে উঠিয়া কাঠখণ্ডের উপর বসিলেন। বস্ত্র-পরিধান করিয়া দেখিলেন,

কর্দ্দমাহত দৃষ্টভূমি। এদিকে সমুদ্রের না সমুদ্রগর্ভস্থ কোনও চড়াভূমি? তখন আকাশ নির্ম্মল। সেই ঘনঘটার চিহ্নমাত্র নাই। কোথাও কোথাও দুই এক খণ্ড মেঘ নীল সমুদ্রের চড়ার মত দেখা যাইতেছে। সেই ঘোর ঘূর্ণবাটিকাও নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া শ্রান্ত পবনদেবের নিশ্বাসের মত এক একবার বাতাস বহিয়া যাইতেছে, এবং তাঁহার আর্দ্র দেহে মৃদু শীতলতা ঢালিতেছে। কৃষ্ণা দ্বাদশী। আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া আছে। নক্ষত্রের অবস্থান অবলোকন করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। চারি দিক শান্ত, স্থির, নীরব, নিশ্চল। অনাথনাথের আবার ভানুমতীর সেই গীত মনে পড়িল,—

"কি ভীষণ রঙ্গে, দেখ ত্রিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী।"

সেই ভীষণ তাণ্ডবনৃত্যের পর এই শান্তি। অনাথনাথ সেই ভীষণ ঝড় ও সেই ভীষণ দৃশ্য সকল তবে কি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন? না;—তিনি উলঙ্গ, পত্নীপ্রহারা, অজ্ঞাত স্থানে নিপতিত ও শীতে কম্পিত; স্বপ্নই বা হইবে কেন? তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায় মা! তোর একি বিচিত্র পটপরিবর্ত্তন! সেই ঘূর্ণবাত্যার পর এই শান্তি! সেই ঘোর অট্টহাসির পর এই মৃদু হাসি! সেই ঘোর উল্লম্ফনের পর এই নিশ্চল ভাব! সেই সৃষ্টি-সংহারিণী মূর্ত্তির পর এই মোহিনী রূপ! হায় মা! তুই আমার সেই পতি-প্রাণা পত্নী এবং পিতৃপ্রাণপ্রতিম শিশু পুত্রকে গ্রাস করিয়া তোর এই মোহিনী শোভা দেখিবার জন্যে কি হতভাগা আমাকে জীবিত রাখিলি!" তিনি এবার উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারিলেন। বহুক্ষণ এরূপ কাঁদিলেন, এবং বহুক্ষণ এরূপ ভাবিলেন। সেই রোদন, সেই চিন্তা, যে কখনও এরূপ পতিত হয় নাই, কেমন করিয়া বুঝিবে? অনেকক্ষণ তাঁহার হৃদয় ঘূর্ণবাত্যা বহিল। অনেকক্ষণ রোদনের পর সেই বাত্যা ও ঝড় হৃদয় কিছু শান্তভাব ধারণ করিলে, তিনি ভাবিলেন, তিনি যেরূপ ছেন, তাঁহার পত্নী ও পুত্রসহ সেই দুর্গতিহারিণী দুর্গারূপিণী ভানুমতী পাইতে পারে। এই ক্ষীণ আশার সঞ্চারে হৃদয়ে হইল। চারি দিকে কতকগুলি চঞ্চল আলোক দেখিলেন। কিসের আলো? এ কি কোনও রূপ ভৌতিক আলোক? তিনি তরঙ্গাভিঘাতে লবণাম্বুকণাবাশি বিমিশ্রিত হইয়া যে অলোক উদ্গীর্ণ করে, সেইরূপ কোনও আলোক এই ঝঞ্ঝাটিকার পর সমুদ্রগর্ভে নিশ্চয় নেত্রে

করিয়া বেড়াইতেছে? কিছুক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে অনাথনাথের বোধ হইল, যেন আলোকের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের ছায়া দেখা যাইতেছে। আরও কিছুক্ষণ দেখিলে তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল, যেন মানুষ আলোক লইয়া কি দেখিতেছে। ক্রমে ক্রমে দূর হইতে যেন মানুষের অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহার মত কি তবে আরও কেহ সমুদ্র-তরঙ্গে ও ঝটিকায় তাড়িত হইয়া আহত অবস্থায় এখানে পতিত আছে? তাহাদের মধ্যে কি তাঁহার পত্নীপুত্র ও সেই অনাথা বালিকা থাকিতে পারে না? এ সন্দেহে তাঁহার শরীরে আরও বল সঞ্চারিত হইল। তিনি সেই উলঙ্গ অবস্থায় সে সকল আলোক লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন। কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহার পায়ে কি যেন ঠেকিল। তিনি অল্প অন্ধকারে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—একটি মৃতমানব-দেহ। এইরূপে পদে পদে মৃত মানব ও গো মহিষ ছাগ, পালিত পশু পক্ষীর দেহ তাঁহার চরণে ঠেকিতে লাগিল। একটি দেহে পা পড়িবামাত্র লোকটি ক্ষীণকণ্ঠে বেদনাব্যঞ্জক চীৎকার করিল। কষ্ট স্ত্রীলোকের। অনাথনাথ চমকিয়া এক পা সরিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" উত্তরে একটি রমণী-নাম শুনিলেন। সে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কোথায়?" অনাথনাথ উত্তর করিলেন,—"বলিতে পারি না।" তখন "হা আল্লা!" বলিয়া রমণী একটি বেদনা-ব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অনাথনাথ তাহাকে উঠিতে বলিলেন। সে আর উত্তর দিল না।—তিনি নিজে বসিয়া তাহাকে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন, সেও তাঁহার মত উলঙ্গা। তাহাকে অতি কষ্টে তুলিয়া বসাইলে সে যেরূপ ভাবে পড়িয়া গেল, তাহাতে অনাথনাথ বুঝিলেন, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে। যাইতে যাইতে কোথাও শিশুর ক্রন্দন, কোথাও রমণীর রোদন, কোথাও পুরুষের আর্ত্তনাদ শুনিতে লাগিলেন। অনাথনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি একটি আলোকের দিকে ছুটিলেন। সে আলোকটি এবং সে আলোকধারীকে আনিয়া তিনি এই আর্ত্তদের কিছু সাহায্য করিতে পারেন কি না, দেখিবেন। কিন্তু আলোকের নিকট গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। দেখিলেন, এক জন মুসলমান একটা বাঁশের "বোঝা" জ্বালাইয়া মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি অপহরণ করিতেছে। এক স্থানে ২।৩ টা লোক একটা কাষ্ঠের সিন্দুক লইয়া টানাটানি করিতেছে। কেহ কেহ থালা, ঘটী, বাটি

---

১ অনেকগুলি মশাল একত্র বাঁধা। এ দেশীয় বৌধা বলে।

ইত্যাদি বা [illegible] কুকুরটি [illegible]। অনাথনাথ বুঝিলেন যে, এই সকল মৃত-দেহ ও দ্রব্য [illegible] সমুদ্র-পুলিনে ভাসিয়া আসিয়াছে, এবং এ নরকঙ্কাল তাহার নিকটস্থ [illegible] বাসী। এই কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কোন গ্রাম?" সে এক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—"কেহ না, তোমার শ্বশুরবাড়ী। এই যে এক খাপরা পড়ে আছে।" এই বলিয়া সে একটা ভগ্নকপাল লইয়া তাহার দিকে ছুটিল, এবং তাহাকে উলঙ্গ করিয়া তাহার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইতে লাগিল। হাতের সোণার বালা খুলিবার জন্য সবলে টানিতে বৃদ্ধাঙ্গুলি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন পাপিষ্ঠা তাহার এক লাথি প্রহার করিয়া তাহাকে ফেলিয়া আবার বালা খুলিতে লাগিল। অনাথনাথ আর সহিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহে মত্ত [illegible] সঞ্চারিত হইল। তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহারই হাতের লাঠি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে আঘাত করিলেন। সে হাতের "বোঝা" ফেলিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহার চীৎকার শুনিয়া আরও অনেক রাক্ষসী তাহার পথ অনুসরণ করিল। অনাথনাথ সেই হতভাগিনীকে [illegible] ডাকিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া বুঝিলেন, হতভাগিনীর [illegible] হইয়াছে। তিনি সেই বোঝার আলোকে খুলিয়া কুড়াইয়া লইয়া তাহার বস্ত্র নিবারণ করিলেন। এবং যাহারা [illegible] করিতেছিল, তাহাদের [illegible] করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি কি [illegible] করিলেন? কেহ সমুদ্রের [illegible] পান করিয়া [illegible] চাহিতেছে। তিনি জল কোথায় পাইবেন? কেহ [illegible] "আমি কোথায়" কেহ "আমার পুত্র কোথায়", কেহ "আমার পতি কোথায়?" তিনি কি উত্তর দিবেন? কেহ উঠিয়া [illegible] বসন চাহিতেছে। তাহারা [illegible] স্থানে যে সকল বসন পড়িয়া আছে, তিনি কুড়াইয়া আনিয়া দিলেন। এক দিকে স্থানে স্থানে এই সাহায্যকার্য্য, অন্য দিকে স্থানে স্থানে জলদস্যুদের আনন্দকোলাহল। [illegible] লইয়া কাড়াকাড়ি, মারামারি। হাতের বোঝা [illegible] কোথায় যাইবেন? কি করিবেন? অনাথনাথ এক [illegible] উপর অবতরণ করিয়া আপনার অবস্থা ভুলিয়া এই হৃদয়-[illegible] দেখিতে লাগিলেন। তখন আসন্ন নিশীথের [illegible] হইতে তাহার মাথায় বাড়িতে লাগিল;—

"কি ভীষণ রণে, দেখিনা নয়নে, নাচে কালী রণ-রঙ্গিণী!"

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হইতে লাগিল। উষার প্রথম আলোকেই সেই ভীষণ রণরঙ্গিণীর সংহারক্রীড়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি একটি পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছেন। শত শত নর-নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ,—মৃত বা অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। সহস্র সহস্র গো মহিষ ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষী, ভগ্ন গৃহ-দ্বার ও গৃহস্থের নানাবিধ সম্পত্তি—সিন্দুক, পালঙ্ক, তৈজসপত্র, কাপড়, বিছানা পড়িয়া আছে। স্থানটি যেন একটি ভীষণ রণ-ক্ষেত্র। রণরঙ্গিণী প্রকৃতি যেন মানুষের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া একটি মহাপ্রলয় সাধিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, সমুদ্র-তরঙ্গ এ পর্য্যন্ত আসিয়া পর্ব্বত-মালায় প্রতিহত হইয়া কূলের পার দিয়া গিয়াছে, এবং পশ্চাতে এই ভীষণ দৃশ্য রাখিয়া গিয়াছে। যত দূর চক্ষে দেখা যাইতেছে, কেবল নর পশু পক্ষীতে এবং ভগ্ন গৃহখণ্ডে ও গৃহস্থিত দ্রব্যাদিতে আচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে তাঁহার মত দুই এক জন নর-নারী স্তম্ভিত অবস্থায় বসিয়া আছে। পশ্চাতে একখানি ঘাটকাদিগের গ্রাম দেখা যাইতেছে। অনাথনাথ উঠিয়া সেই গ্রামের দিকে চলিলেন। দেখিলেন, বৈরাগীর মত একটি লোক কয়েক জন রমণী ও বালক বালিকাকে লইয়া গ্রামের দিকে যাইতেছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজি! এ কোন্ স্থান?" বৈরাগি বলিল,—"বাবা! এ গ্রামের নাম চন্দন। ইহাতে আমার একখানি ক্ষুদ্র আখড়া আছে। গৃহাদি পড়িয়া গিয়াছে। ইহারা সেই স্থান হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। দেখি, যদি চাল তুলিয়া তাহার নীচে আশ্রয় দিয়া ইহাদের জীবন রক্ষা করিতে পারি। হরি হে! তোমার এই লীলা!"

অনাথনাথ বিস্ময়-বিস্ফারিত কণ্ঠে বলিলেন,—"চন্দন!" বাবাজি স্থিরকণ্ঠে কহিলেন—"চন্দন।"

৭—প্রকৃতির কুরুক্ষেত্র।

সুবর্ণদ্বীপ সমুদ্র-তীরে। তাহার পশ্চিমে অনন্ত নীল কেবল দিগন্ত প্রসারিত মহা-পারাবার। তাহার পূর্ব্ব ও উত্তরে বিস্তীর্ণ মহেষ-বালি ও তৃণাচ্ছাদিত দ্বীপ-শ্রেণী। তাহার পূর্ব্বে প্রায় দুই ক্রোশ প্রশস্ত সমুদ্র-খাত এবং তাহার পূর্ব্বতীরে চন্দন-গ্রাম। জোয়ার-প্লাবনী গ্রামের পূর্ব্বে চন্দন-গিরিমালা। অনাথনাথ তবে কি সেই অল্পক্ষণের মধ্যে সমুদ্র তরঙ্গে এত দূর ভাসিয়া আসিয়াছেন? গ্রাম, প্রান্তর, বিশেষতঃ একটি সমুদ্র-খাত—তিনি ভেলার করিয়া ভাসিয়া

আষাঢ়ের তাই তিনি চন্দন নাম শুনিয়া অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন।
প্রায় ১০ ঘ ক্রোশ ব্যবধান কণ্টকাকীর্ণ-সমুদ্র পারে তালিয়া আসিয়া একটা
পাকিস্থানে ন পতিত হইয়া জীবিত থাকা ও সামান্য বিস্ময়ের কথা নহে।
ঐ কি স্বপ্ন ? একি দেবতার অপূর্ব্ব লীলা ? একি আরব্য-উপন্যাস ?
এরূপ অ ঘটনা কি কেহ কখন শুনিয়াছে, না শুনিলে বিশ্বাস করিবে ?
তাঁহার কি ক্ষিপ্ত বিকৃত হইয়াছে ? এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ও সত্য হইতে পারে
না ? ঐ ঐ-সঙ্গে লাগাৎ, তাহার মুখে হাসির রেখা দেখিয়া, কি বিভ্রান্ত হইতেছে—
তাহা কেমন করিয়া হইবে ? ঘটিকা-বিদ্যুত হতভাগ্য মনুষ্যের
দেহেও যে এরূপও দেখা যাইতেছে। সে তাঁহাকেও তাহার আখড়ায়
যাইতে বা ছিল, কিন্তু গ্রামের নাম চন্দন শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে এমন অভি-
ভূত ও অ মনস্ক হইয়াছিলেন যে, তাহার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই।
তিনি আ দেখিলেন, বহুদিবসীয় সহচরের মধ্যে তাঁহার মত এখনও
জীবিত রে আছেন তাঁহার সম্মুখে কেহ একই আত্মীয় স্বজনের অন্বেষণ
করিতেছি তাঁহার মুখে শুনিলেন, তাহারাও তাঁহার মত কেহ মহেষ-
খালি, কেহ মুক্তবন্দিনী, কেহ বহুদূরস্থ জন্মভূমি গ্রাম হইতে আসিয়া আসিয়াছে।
তাঁহাদের ও অদ্ভুত রহস্যের গল্প শুনিলেন। তখন তিনি নীলিমামণ্ডিত
শান্ত শৈল গগনের দিকে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত নয়ন তুলিয়া বলিলেন,—
"কৃপাসিন্ধো বিপদভঞ্জন! তুমি আমাকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছ, আমার
বৃদ্ধা পত্নীকে ও আমার সুকুমার শিশু-সহ-সেই অনাথাকে কি
সেরূপ রক্ষা করিবে না!" দুই নয়ন ধারায় তাঁহার কপোল বহিয়া অজস্রধারা
পড়িতে লা ।

তিনি হাসের অন্বেষণে চলিলেন। রাত্রিতে যে দৃশ্য দেখিয়া-
ছিলেন, উ আকে যাহা আরও কুটতর হইয়াছিল, এখন দিবালোকে তাহার
তাঁহার ছবি বর্ণতর হইয়া চারি দিকে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিলেন,—

"মত দূর যাইতেছে নয়নেত্রে দেখা—
—আনমুদ্র গিরিতল—কানি সন্ধ্যাকালে
ছিন্ন বাদা-জন্য কীর্ণ-লতাতে-প্রান্তরে
আলিঙ্গনরাহুল, ছিন্ন মুশোভিত
পাদপে, পল্লবে, গৃহে, নীল সরোবরে,—
রজনী-বেষ্টিত এ যে—বিস্তীর্ণ ধরণী!

নাহি বাল শিশু, না, আতঙ্কে ভগ্নী দুটি ও,
যত দূর যাইতেছে প্রান্তর, বুকে তু
শবালী! প্রেতভূমি, কোথাও পড়ি
শবের গলিত শব, পূতি, পূতে বৃক্ষ
সম্মুখে শৃগাল শব, দৃঢ়াবদ্ধ পক্ষী!
নরক্তের শস্যক্ষেত্র—ও শোকের রব—
মরি সরি, ভরে ভরে, ভাগ্যশি রীতি!
পক্ষিপক্ষিগণ সহ শব যায় এই
ফীট পতঙ্গের শব, শব ভীত
সহস্রক্ষেত্রে, বরোবরে, পে, প্রান্তরে।
তথাগৃহ-চালে শব, শ ভূতলে,
ভূপাতিত বৃক্ষগণ বসমাবৃত—
কত শব ডালে ডালে, শিকড়ে শিকড়ে!
নরনারী ফল যেন, শিশুগণ ফুল,
বালকের শোচনীয় বিচিত্র বসন
বিজড়িত ডালে ডালে কালের কেতন।
ভাসিতেছে সরোবরে, প্লাবনে পূর্ণিত,
শবরাশি অগণিত, শব অজ্ঞানিত।
শবে ক্ষুদ্র গৃহ, গড় হয়েছে প্লাবিত—
নর, ছাগ, গো, মহিষ, পড়ি স্তরে স্তরে।
সেই দীর্ঘ রাজপথ উত্তরে দক্ষিণে
গিয়াছে বহিয়া ভেদি' এই ধ্বংসভূমি,
করি অবরোধ সেই বন্যার প্লাবন
হইয়াছে সমাচ্ছন্ন শবে ভগ্নিত,
স্থানে যেন মহাস্তম্ভ। রয়েছে পড়িয়া
মহাকালী-বক্ষভ্রষ্ট মুণ্ডমালা মত,—
নাহি ভিন্ন স্থান তাহে নিক্ষেপিতে পদ।
স্থানে স্থানে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য শোকময়!
কোথাও সন্তান বুকে পড়িয়া জননী,
মাতৃবক্ষে শিশুমুখে কোথাও পড়িয়া

শিশুহি চিহ্ন-পাদপের লোল গলায়।
গলায় বসনে দেখা—ও, মুখে মুখ,
পড়িয় মহারণভূমি! পত্নী প্রেমময়ী;
কোথা পরের উপরে! জনকজননী!
কটিসহ্ন পার্শ্বে শব সহ পড়ি
কোথাও ক্ষেত্র এ যৌবি-প্রণয়ি-যুগল।
হায়! এ শব রাশি বাঁচাইতে প্রাণ
প্রেমালিঙ্গনের, ও আপনার প্রাণ
ফিরিয়াছে কি! অনিন্দ্যসুন্দর
যৌবনের প্রেম, রূপ মনোহর
এখনো মৃত্যুর করে নি হরণ।
প্রেম-আলিঙ্গনে যেন রয়েছে নিদ্রিত
যৌবনের সুখ-স্বপ্নে, হৃদয়ে হৃদয়,
মুখে মুখ, বেষ্টি গ্রীবা দুই ভুজলতা।
রমণীর কর্ণনাস্ক দীর্ঘ কেশরাশি
আবরিয়া উভয়ের উরস বদন,
করিতেছে বায়ু যেন লজ্জানিবারণ।
কোথাও মুমূর্ষু জীব মৃত্যুযন্ত্রণায়,
রক্তাক্তজলপানে ঘোর পিপাসায়
করিতেছে ছট্‌ফট্। মৃত্যুমুখে কেহ
পতি, পত্নী, পুত্র তরে করে হাহাকার।
কোথাও বা নরনারী প্রেতমূর্ত্তি মত
নগ্ন, কর্দ্দমাক্ত, শির জানু-মধ্যে রাখি
রয়েছে বসিয়া স্তব্ধ, যেন বজ্রাহত।
কালের কি কুরুক্ষেত্র-নয়ন-নিমিষে
হইয়াছে সংঘটিত, নর-চিন্তাতীত!
মানবের কুরুক্ষেত্র তুলনায় তার
বালকের ক্রীড়াভূমি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর!

অনাথ। এই শোচনীয় চিত্তবিদারক দৃশ্য অতিক্রম করিয়া চলিলেন। কোথায় কি অন্বেষণ করিতেছেন, কিছুই জানেন না। যাইতে যাইতে অন্তর

ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে আসিয়া তাহারা যে যেমন পড়িয়া আছে, তাহা সুড়াইয়া লইয়া নখের নখড়া নিবারণ করিলেন। যাহারা নীচে পড়িয়া মাহারা সাংঘাতিক অবস্থায় হাহাকার করিতেছিল, তাহাদিগকে বহু কষ্টে উদ্ধার করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষুধার্ত্তকে শ্রীভগবানের নাম শুনাইয়া শান্তি দিতে লাগিলেন। জীবিতদিগকে নানারূপ সান্ত্বনার কথা, আশার কথা বলিলেন। কিন্তু ক্ষুধিত ও পিপাসিতকে কি দিবেন? আহার্য্য দ্রব্যাদি কিছু নাই। পানীয় জলও অপ্রাপ্য। অসংখ্য পুষ্করিণী আছে। কিন্তু সমস্তই সমুদ্র-সলিলে প্লাবিত হইয়া ঘোর লবণাক্ত এবং নানাবিধ প্রাণীর মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। স্রোতের পর স্রোত আসিয়া আবাসের কোনও চিহ্নমাত্র নাই। এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে কেহ দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারিবে না,—এ মহানগরীকেল সন্ধ্যাকালে সমৃদ্ধিশালী গ্রামে সজ্জিত ছিল। সেখানে একটি বৃক্ষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না; ঝটিকাবেগে সমস্ত বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে। কোথাও বা এক স্থানের বৃক্ষ অন্য স্থানে, এক গ্রামের বৃক্ষ আর এক গ্রামে উড়িয়া গিয়াছে। কোন্ বৃক্ষ কোথায় ছিল, অনেক স্থানে তাহা স্থির করিবার সাধ্য নাই। গৃহস্থদের বাড়ীর গৃহের চিহ্নমাত্রও নাই;—চাল, বেড়া, খুঁটি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, বাড়ীর ভিত্তি পর্য্যন্ত জলবেগে এরূপ বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, কাহার বাড়ী কোথায় ছিল, তাহাও চিনিবার উপায় নাই। এই সকল গ্রামে অনাথনাথের পরিচিত বহু সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী কাল সন্ধ্যার সময় ধনধান্যে ও বহু পরিবারে পরিপূর্ণ ছিল। আজ প্রাতে সে সকল আবাসের কোথাও বা দু একটা ভগ্ন খুঁটির শেষ ভাগ, কোথাও বা পুষ্করিণীটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। পরিবারের মধ্যে কেহ বা বাড়ীতেই স্থানে স্থানে, কেহ বা বাড়ীর বাহিরে স্থানে স্থানে, জলাশয়ে, গর্ত্তে, মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ বা ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামের শত শত লোকের মধ্যে ২।৩।১০ জন তাঁহার মত দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছে। তাহারা বৃক্ষ ভিন্ন মৃত পত্নী, পুত্র, মাতা পিতাকে লইয়া হাহাকার করিতেছে। সকলেরই মুখ একই কথা—"হা ভগবান!" সকলেই গিয়াছে, আমাকে কেন রাখিলে?" রাশি রাশি অপরিচিত জনের মৃত দেহ কাহার বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হিন্দুর বাড়ী মুসলমানের শবে অশুচি, মুসলমানের বাড়ী হিন্দুর শবে পরিপূর্ণ। এই অপরিচিত লোকদের মধ্যে যাহারা অনাথনাথের মত উদ্ধার পাইয়াছে, তাহাদের কেহ বা ধ্রুবের মধ্যে মাথা দিয়া কেহবা বিষ্ণু

আত্মহারা
নত মস্তক
দিকেছে
ীব জন্তু
রহিয়াছে
অনা
থ আপনার অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। প্রথম কিছু ক্ষণ এই শোকা
বহ দৃশ্য
য়া কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু কত দেখিবেন, কত কাঁদিবেন? দেখিতে
ন আতঙ্ক উপস্থিত হইল ও নয়নের জল অজ্ঞাতে শুকাইয়া গেল।
তপরিচা
ত লোকের মত যথাসাধ্য আর্ত্তের সেবা করিতে করিতে তিনি
সম্বাহীন
বে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।
এই
ষণ শবক্ষেত্রে সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া অনাথনাথ তাঁহার পত্নী
পুত্র ও কে
বালিকাকে জীবিত কি মৃত দেখিতে পাইলেন না। পূর্ব্বাহ্নের পর
মধ্যাহ্ন
সিল, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন আসিল। অপরাহ্নের পর সন্ধ্যার
ছায়ায় সং
ও বেলাভূমি ছাইতেছিল। এ সময়ে তিনি সমুদ্রসৈকতে উপস্থিত
গুছিলেন। সমুদ্রবেলা অবিরাম তরঙ্গাঘাতে অল্প সময় কেবল
চঞ্চল ফে
মালায় শোভিত থাকে। আজি অচঞ্চল শবমালায় যেন মুণ্ডমালী
সাজিয়াছে
নানা জীবজন্তুর অচঞ্চল শবমালার সঙ্গে সচঞ্চল ফেনমালা কি
ভীষণ ক্রী
লা করিতেছে। শবরাশির সঙ্গে এখানেও ভগ্ন গৃহ ও গৃহের
উপকরণ
বং কোথাও ভগ্ন নৌকাখণ্ড সকল পড়িয়া আছে। কাল অপরাহ্নে
যে সমুদ্র
ত অনাথনাথ নানাবিধ অর্ণবযানে খচিত দেখিয়াছিলেন, আজ
তাহা কে
র ভাসমান মৃতদেহে পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার
কর্ণে সেই
তিধ্বনি প্রবেশ করিল,—

"কি ভীষণ রণে দেখ না নয়নে নাচে কালী রণরঙ্গিণী।"

একি তাঁ
র ভ্রান্তি? তিনি ত সমস্ত রাত্রি ভাগ্যমতীর সেই গান শুনিয়াছেন।
ঘোরারাব
র্ণ প্রলয়ের মধ্যে তিনি অবিরাম ঘোরারাবী মহারোদ্রী প্রলয়কারি
ীর সেই
প্রে নয়নে দর্শন করিয়াছেন, হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার
সেই ঘো
ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সমস্ত
রাত্রি সে
গীত শুনিয়াছেন, সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়াছেন। এ নিশ্চয়
তাঁহার ভ্র
ন্ত। কিন্তু আবার তিনি সেই গীত শুনিলেন। ক্রমে যত অগ্রসর
হইতে লা
লেন, ততই স্ফুটতররূপে সেই গীত সমুদ্রনিনাদে মিশ্রিত

বমুনানিলে বাহিত সেই মধুর গাম্ভীর্য্যময় সমবীকণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন সম্মুখে বেদের কুদ্র পাট-গৃহের মত একটি কি যেন দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, ঝটিকার পর কেহ এই ক্ষীণ কুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাঁহার ক্রমে বোধ হইল, সেখান হইতে সেই গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তিনি উর্দ্ধশ্বাসে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

৮—ভগবতী।

আগ্রহ, আনন্দে, সেই আনন্দাশ্রুমিশ্রিত উৎসাহে, তাঁহার হৃদয়ে কি এক নব বলের সঞ্চার হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী হইলে কণ্ঠ যে ভানুমতীর, সে যে গীত গাহিতেছে, তাহার আর সন্দেহ রহিল না। অনাথনাথ দেখিলেন, প্রাঙ্গনের ভাঙ্গা কাগড় ও যষ্টি কুড়াইয়া বালিকা একটি কুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বসিয়া শান্ত, বিষণ্ণ, গভীর, উদাস কণ্ঠে হিন্দোস্তানি এক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া গাহিতেছে—

দুই কর জয়, দুই বরাভয়,
জয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,
নগ্না শিব ঊর্দ্ধগ্রীব,
দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

এই মহা ধ্বংসক্ষেত্রেই ধ্বংসকারিণীর ধ্বংসমূর্ত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যার স্থল। গীত শুনিয়া অনাথনাথের হৃদয় ভক্তিতে অচল হইল। গীত ক্রমে বন্ধ হইল। ক্রমে সমুদ্র-নিনাদে সেই স্বরলহরী মিশিয়া গেল। কিন্তু কর রমণী নীরব; অনাথনাথ চৈতন্যহীন জড়মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"হা দিদি! আমাদের বাড়ীতে যে কালীর পূজা হইয়া থাকে, তুমি তাঁহার এই গীত গাইতেছ? না?"

বালিকা তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "ইঁ দাদা! এ তাঁহারই গীত।"

"কাল যে এ ঝড় হইল, এত লোক মরিল, এ কি সব তিনিই করিলেন?"

"হাঁ ভাই! এ সকল তাঁহারই লীলা।"

শিশু একটি ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি আর একটি গীত গাও। তোমার গান আমার বড় ভাল লাগে।"

বালিকা আদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া আর একটি গান আরম্ভ করিল।

আবার নই [illegible] সেই মাঙ্গাবাগরঞ্জিত মাতৃগর্ভ ভ
সুশীল আ [illegible] সেই করুণ মধুর কণ্ঠ ফুটিল, উঠিল, মিশিল। সেই
সুধাময়ী বী [illegible] নীরব হইলে কেবল সিন্ধুনিনাদ শুনা যাইতেছিল। আর
সকলই নীর [illegible] অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় শিশু-কণ্ঠ তাঁহারই শিশুপুত্র অমি-
য়ের। [illegible] অমিয়ও রক্ষা পাইয়াছে? তিনি জানু পাতিয়া ভূতলে প্রণত হইয়া
গদ্গদস্বরে বলিলেন, "তোর কি অপূর্ব্ব লীলা! তোর ধ্বংস-ক্রীড়ার মহা-
ভীষণত্ব ও [illegible] পঞ্চপুরুষ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে, সেই ঝড়ে তুই এই ক্ষুদ্র শিশুকে
রক্ষা করিয়া [illegible] দয়াময়ী মা!" অনাথনাথ কিছু ক্ষণ এইরূপে জননীর চরণে
আপনার [illegible] স্নেহময় তরঙ্গ-ভক্তিদ্বারা বর্ষণ করিয়া উঠিলেন, এবং তিনি এ সময়ে
তাহাদের [illegible] থে যাইবেন কি না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন।—শিশুর ক্ষীণকণ্ঠে
বুঝিলেন, [illegible] নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিলে
তাহার হৃদ [illegible] যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিবে, দুর্ব্বল হৃদয় তাহা সহিতে পারিবে ত
তিনি এই [illegible] ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শিশু আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—

"দিদি, সত্যসত্যই আমি কালী-মার মুখ দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। কিন্তু
মা বলিলেন তিনিও মা। হাঁ দিদি! তিনি কি সত্যই মা?"

বা। অমিয়! তিনি মা।

শি। তিনি মা হইয়া কেমন করিয়া এমন বড় করিলেন, পশু মানুষ
মারিলেন?

বা। তোমার মা কি তোমার উপর কখন রাগ করেন নাই, কখনও
মারেন নাই? তিনি যেমন ঝড় তুলিয়াছিলেন, এখন আবার কেমন সুস্থির
শান্তভাবটি [illegible] ণ করিয়াছেন! তিনি যেমন এত মানুষ মারিয়াছেন, তেমন
তোমায় র [illegible] করিয়াছেন।

শি। আমাকে ত রক্ষা করিয়াছ তুমি। তুমি কি তবে সেই মা? তুই
যে দিদি [illegible] কালী-মার মত! তুই তেমনই সুন্দর, তোর মুখে তেমনই আদর! তুই
আমাকে [illegible] ত আদর করিবি!

বালিকা আবার প্রেমভরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল, "না ভাই!
তিনি তোমা [illegible] কে রক্ষা না করিলে, আমি পারিতাম না। দেখ নাই, কত ভয়ানক
লোক কত [illegible] ই মরিয়া রহিয়াছে?

শি। না, দিদি, তুই আমার তেমন দিদি নহিস্।

বালিকা গলদশ্রু নয়নে শিশুকে বুকে আঁটিয়া ধরিল, এবং শিশু পুষ্পনির্ম্মিত

দুই ক্ষুদ্র ভুজে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া এলোমিত মুখখানি তাহার স্কন্ধে বক্ষে লুকাইল। বালিকা গর্ব্বভরে কহিল, "ভুই ভাই! মেরে শিশু। তাই দেবী তোরে রক্ষা করিয়াছেন।"

আবার কিছুক্ষণ উভয়ে প্রেমাবেশে অবশ হইয়া নীরব রহিল। বালক-বালিকার হৃদয়ে যে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই বুঝি স্বর্গের মন্দাকিনী-ধারা। উভয়ে নীরব, কেবল সান্ধ্য-অনিল সন্ সন্ রবে জলকল্লোল বহিতে লাগিল। কিছু পরে শিশু আবার কহিল, "দিদি! সমুদ্র সর্ব্বদা কি বলিতেছে?"

বা। অমিয়! আমার পিতা বৈরাগি ছিলেন। তিনি প্রায় বলিতেন, যিনি এ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, পারাবার নিরন্তর তাঁহারই প্রেম-গীত গাইতেছে। সমুদ্র কহিতেছে, আমার যেমন অনন্ত জল, প্রেমময় হরির তেমনি অনন্ত প্রেম। আমার বুকে যেমন কত ঢেউ খেলিতেছে, তাঁহার প্রেমেও সেরূপ কত ঢেউ উঠিতেছে, ফুটিতেছে, পড়িতেছে। তাহাতে এ সুন্দর ভূমি ভেসে যাইতেছে, নাচিতেছে। এ সমুদ্রের কত শক্তি! তাহা দেখিয়াছ, কেমন ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। কত নৌকা, জাহাজ, ঘর বাড়ী, ঘর উড়াইয়া আছাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। সেই হরিরও তেমনি শক্তি। সমুদ্র মাতাকে বলিতেছে—দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র, তোমার শক্তি, তোমার সংসার—কত ক্ষুদ্র! তজ্জন্য সেই প্রেমময়, দীনজনের হরিকে ডাক, তাঁহার ভজনা কর।

অ। সেই হরি কে? আমাদের বাড়ীতে রাসের সময় যাঁহার পূজা হয়?

বা। তা নয়।

অ। সেই প্রহ্লাদ-চরিত্র যাত্রায় যিনি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি?

বা। হাঁ, তিনি।

অ। বড় সুন্দর! কেমন সুন্দর চূড়া! কেমন সুন্দর বাঁশী! তুমি তোমার ভাই গোপালকে কেমন সুন্দর কৃষ্ণ সাজাইয়াছিলে! আমাকে তেমনই করিয়া সাজাইয়া দিবে? আমি তেমনই কৃষ্ণ হইতে পারিব কি? আমার বড় সাধ তেমনই সাজি।

বালিকা ক্ষুণ্ণ ছদ্ম মানে বলিল,—তুমি তাহার অপেক্ষা সুন্দর সাজিতে পারিবে। সে ত তোমার মত সুন্দর, তোমার মত সৌন্দর্য্য ছিল না। সে যে গয়লার ঘরের ছেলে। আমি তোমাকে সুন্দর কৃষ্ণ সাজাইব। ভাই ভগ্নী

...নিলে কেন করেছিল ? ... তুমি যে ... ...—সেই সময়ে ?" এই ধরিয়া যাহা ... ভালো করিয়া বুঝিতে পারেন।

... পড়িয়া গেলেন। সে অনেকক্ষণ ... কি ভাবিল। পরে আস্তে আস্তে নলিনের মুখের ... কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি! ... যে ছেলেদের মত আমার ... ও যাকে ... করিয়াছেন ... কি নাজিরকে কি করে ... পারিবে না, ... দিতে পারিবে না। তাহার ... বুঝিতে পারিয়া বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বাঁ-হাতের ... মুখ ... দিয়া অশ্রু সিক্ত করিতে ... লাগিল। নলিনী বলিল, "ছি ছি ... ! তিনি যাবার সময়ে ... বলে গেছেন। আমি যদি এত ... এই ... ভাবিয়া বুঝা না ডাকিয়া থাকি, তবে ... তিনি এই ... প্রাণপণ ... আমি সমস্ত রাত্রি জেগে ডাকিয়াছি, ... রাখা ও ... রক্ষা করিতে বলিয়াছি। আসিল ! আমরা শীঘ্রই তাহাদের দেখিব। ... আসছে ... ডুবিতে ডুবিতে এখানে আসিবেন।"

... অনাথবাবু ... থাকিতে ... পারিলেন না। তিনি ... ছাদের বহির্ভাগে থাকিয়া ... অভিনবের মত এই ... দৃশ্য যে ... দেখিতেছিলেন। তিনি ... থাকিতে পারিলেন না। ... ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"দি, ... ! তুই ... ডাকিয়াছি, ... তোর ... সেই ... তবে আমাকেও রক্ষা করিবেছস্ ?" ... বালিকা উত্তরে প্রেমানন্দে এক কণ্ঠে ... উঠিল—"বাবা, ... ধনের ... পতিত হইয়া রক্ষা পাব না, সে এই ... মরিবে না। অনাথবাবু ... বক্ষে লইয়া ... ...

হইবামাত্র তাহার ক্ষুদ্র-হৃদয়ের বৈধেয়ি বন্ধন ভাঙ্গিয়া তাহার হৃদয়-দিন্ধুর স্কন্ধ-প্রবাহ অনিবারে ছুটিল। বালক মুখ ঢাকিয়া আকুল হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। অনাথনাথ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"বাবা! যিনি আমাদের তিন জনকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি তোমার পুণ্যপ্রতিমা মাকেও আরও রক্ষা করিয়াছেন। তিনিও শীঘ্র স্বর্গলোক আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন।" বালক আবার কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "উঃ! বুকে কত ব্যথা! বাবা! আমি দিদির কোলে যাইব। হাঁ বাবা! তিনি কে? আমার দিদি? আমাকে ত আমার দিদি রক্ষা করিয়াছে।"

অনাথনাথ শিশুকে আবার বালিকার কোলে দিয়া বলিলেন, "বাবা! তোমার সত্যই দিদি সেই ভগবতী। আমি এমন বালিকা দেখি নাই।"

শিশুর মুখে, তাহার সেই শোকের মধ্যে, মেঘের বিরামে জ্যোৎস্নার মত একটুকু আনন্দ দেখা দিল। সে প্রেমভরে তাহার সরল-নিষ্কলঙ্কহৃদয়ে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বালিকা বার বার সেইরূপ সজল নেত্রে তাহার মুখচুম্বন করিল। শিশু তাহাকে বহুক্ষণ সাক্রাশ্রুনয়নে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্যদেব সমুদ্রগর্ভে রক্তরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছিলেন। সেই অবর্ণনীয়, অননুভবনীয় শোভা বালক অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিল। শিশু জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? ও কি সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে?"

পি। না বাবা! সমুদ্রের অন্য পারেও অনেক দেশ আছে, অনেক লোক আছে। সূর্য্য এখন সে সকল দেশে আলো দিতে যাইতেছেন।

শি। বাবা! মানুষও কি সেইরূপ এক দেশ হইতে আর আর এক দেশে আলো করিতে যায়? আমার মাও কি সেইরূপ আর এক দেশে আলো করিতে গিয়াছে? হাঁ বাবা! আমি সে দেশ দেখিয়াছি। বড় সুন্দর দেশ। আমি দিদির কোলে শুইয়া শুইয়া সে দেশ অনেকবার দেখিয়াছি। সেখানে কেমন জ্যোৎস্না, ফুলবন, কেমন সুগন্ধ!—কেমন সুন্দর ফুলের উপর আমাদের বাড়ীর লক্ষ্মীঠাকুরাণীর মত মা বসিয়া আসিতেছেন। আমাকে "অমিয়! অমিয়!" বলিয়া ডাকিতেছেন! সেই মায়ের প্রহ্লাদের মত কত সুন্দর সুন্দর ছেলে, কত সুরূপ সুন্দর মেয়ে, কেমন ফুলের পোষাক পরিয়া মার চারি দিকে নাচিতেছে, নাচিতেছে! আর মার মাথার উপর রাখা! আমাদের বাড়ীর গ্রামের

সেই কৃষ্ণ বলিয়া কি সুন্দর রাধা বাজাইতেছেন। মা তাহার গলের উপর মাথা রাখিয়া ঐ দেখ কেমন আমার দিকে চাহিতেছেন। মা! মা!

শিশু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে নয়ন মুদ্রিত করিয়া অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় রহিল। অনাথনাথের ও বালিকার মুখ গম্ভীর—বড় গম্ভীর হইল। অনাথনাথ শিশুর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, খুব জ্বর। ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" শিশু "বাবা" বলিয়া অতি ক্ষীণ মৃদু-কণ্ঠে উত্তর দিল, এবং বলিল,—"উঃ! বুকে বড় বেদনা।" অনাথনাথ বুঝিলেন যে, ঝটিকা-প্লাবন সময়ে শিশু বুকে দারুণ আঘাত পাইয়াছে। বালক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার নম্রস্বরে বলিল,—"দিদি! আমার মা আমাকে প্রহ্লাদ বাজাইয়া একটি গান গাহিতেন ও আমাকে গাহিতে শিখাইতেন। তুই সেই গানটি জানিস্? তুই একবার সেই গানটি গাহিবি? আমি উঠিতে পারিতেছিনা, তেমন করিয়া নাচিতে পারিব না। আমিও তোর সঙ্গে গাহিব।" বালিকা তাহার সেই অমৃতময় কণ্ঠে সান্ধ্য নৈশতরঙ্গে অমৃত বিকীর্ণ করিয়া সেই গানটি গাহিতে লাগিল, এবং অবিরত তাহার অশ্রুপূরিত কণ্ঠে সেই সঙ্গে গাহিতে লাগিল।—

"তোর নাম রেখেছি হরিবোলা।
মনের সাধে ও আমার মন খেল না হরিনামের খেলা।"

অনাথনাথ এ গীত অনেকবার শুনিয়াছেন। মাতা পুত্রের এ গীতাভিনয় অনেকবার দেখিয়াছেন। কিন্তু গীতটি এমন মধুর, এমন পবিত্র, এমন প্রাণদ্রবকারী তাহার আর কখনও বোধ হয় নাই। তিনি আচ্ছন্নের ন্যায় হইয়া এই গীত শুনিতে লাগিলেন। গীত ধীরে ধীরে সমাপ্ত হইল। বালিকা নীরব হইলেও শিশু ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে ক্ষুদ্র হাত ক্ষুদ্র তালি দিয়া ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল। তাহার নয়ন মুদ্রিত, মুখ শান্ত,—প্রফুল্লিত কুসুমানন শোভা পাইতেছিল। ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে গীত শেষ হইল। তালি বন্ধ হইল। হাত শ্লথ হইয়া পড়িল। শিশু নীরব হইল; সে তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদতলে চলিয়া গেল। বালিকা ডাকিল,—"দাদা! দাদা!" উত্তর পাইল না। অনাথনাথ ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" উত্তর পাইলেন না। শিশু তাহার মাতৃক্রোড়ে, সেই প্রেমময়ের পদতলে চলিয়া গেল। অনাথনাথ মৃতবৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বালিকাও সে মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে মূর্চ্ছিত হইল। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়—গাঢ়তর হইয়া এই পবিত্র দৃশ্য ঢাকিয়া ফেলিল।

চুণার।

ঔতের বাল বসন্তের মত,—বিরহের পর মিলনের মত, বর্ষাঋতু বঙ্গের কৃষক-জীবনের অনেক দিনের পরে পূর্ণিমা আনয়ন করে। চাকার যেমন গ্রীষ্ম-সময়ে মনে হয়, গ্রীষ্মটা চিরদিন থাকিবে ব্যাপিয়া রহিত, এমনকি শেষই পূজার সময় পাইলে ভ্রূকুটীকুটিলমুখ সহর ছাড়িয়া গ্রামশোভার সর্ব্বাঙ্গে ঘাইতে ইচ্ছা করে। এবার ভাবিয়া স্থির করিলাম, চুণারে যাইব। অবশ্য যাইবার কোন কারণই বাহির—তথাপি এবার যে কথা, সেই কাজ। প্রকাশি ঈদ-ইয়ে-চুণারে উপস্থিত হইলাম।

চুণারে জ্ঞানরঞ্জন অনেকগুলি বাঙ্গালী ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন—সুকুমারমতি ছাত্র। আমাদের বন্ধু—হিমাদ্রিবর্ষীয় যুবক হইতে ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধ, সকলেরই সঙ্গে। কর অভাব ছিল না। কিন্তু তাহাতে আমাদের বিরক্তির লিপ্ত হয় নাই। অবশ্য যিনি ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধ, তিনি সময় সময় আপনার বয়সোপযোগী গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু তাঁহার সাধুচেষ্টা নিতান্তই নিষ্ফল হইত।

বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যদি ধারাবাহিকরূপে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে যাই, তাহা হইলে পাঠকের ধৈর্য্যের পরীক্ষা লইব না; কেবল চুণারের কয়েকখানি চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

অনেক দিন পরে পল্লিতে যাওয়ায় চুণারের সামান্য সামান্য ঘটনা দর্শনেও আমার অতি সুন্দর বোধ হইয়াছিল। চুণারের গঙ্গাতীরবর্ত্তী ঐতিহাসিক প্রস্তরগুলি সায়ং ভ্রমণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এক দিন প্রভাতে আমরা সেই পথে কেল্লার অভিমুখে চলিলাম। পথের বামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবমন্দির সংস্থাপিত। সেগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। তখন নানাবর্ণরঞ্জিত-পুষ্পবিভূষিতা কুলবধূগণ আরতী সমাপনে স্নানান্তে এক এক ঘটী গঙ্গাজল লইয়া একে একে সেই মন্দিরগুলি প্রদক্ষিণ করিতেছে ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে মন্দিরস্থিত দেবমূর্ত্তির মস্তকে "জল চড়াইতেছে", ও ঐ জলধারায় মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেছে। বলা বাহুল্য, তাহারা পবনভক্তিসহকারে ঐ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেছিল। আমি ভাবিলাম, ভক্তিই যদি মুক্তির উপায় হয়, তবে উহাদের বিন্দু পরিমাণের ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী অপেক্ষা ইহাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত সুগম ও সরল। একারণই বোধ হয় আমাদিগের এদেশ সম্বন্ধে বলে যে,

বিশ্বনাথের উপযোগী পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া প্রাতে মন্দিরে সুমধুর কীর্ত্তন-ধ্বনি-সহিত আমাদের প্রার্থনা নিশ্চিত না হইলে ভবি আমাদের অন্নজল নিবেদন গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু ভক্তির ভূষায় আমাদিগকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছে, না অবনতির দিকে অগ্রসর করিতেছে? আমার ভোর হইতে লাগিল। সেবার আমি আর ইরাবতীপ্রদেশে যাই, বহু দিন পূর্ব্বে, প্রাচীনকালের হিন্দু-রাজত্বকালের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এ যেন সেই সময়ের দৃশ্য।

আমার মনে যখন এইরূপ ভাবোদয় হইতেছিল, তখন অকস্মাৎ দুর্গদ্বারদেশের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। গঙ্গাবারি-বিধৌতমূলদেশে একটি অনতি উচ্চ কিন্তু দুরারোহ শৈলশিখরে দুর্গটি নির্ম্মিত। টার্ণারের ভ্রাম্যচিত্রকরও, বোধ করি, এ দুর্গটি অঙ্কিত করিতে ব্যগ্র হইতেন—এমনই স্থানে ইহা নির্ম্মিত। আমার গড়মান্দারণের কথা মনে পড়িল। আমার মনে হইল, কোন অনিন্দ্য সুন্দরী পূর্ব্বকালে এখন বিরহ-বিধুরা দুর্গেশনন্দিনী এই দুর্গাভ্যন্তরে গঙ্গাম্পৃষ্ট কোনও কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া কোন প্রাণবল্লভের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। গঙ্গার তরঙ্গস্পর্শশীতল সমীরণে তাঁহার সুস্নেহকার্য্যবহুল অঞ্চল মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইত, আর তাঁহার গাত্রাভরণভূষিত অঙ্গ হইতে মৃদু গন্ধ উত্থিত হইয়া সমস্ত কক্ষ সৌরভে সুবাসিত করিয়া তুলিত। হায়—চূণারদুর্গ এখন কিনা জেলখানারূপে ব্যবহৃত হইতেছে! উৎসবানন্দের দিনে সেই গীতবাদ্য, দুর্গপ্রাকারে সেই দীপমালা, দুর্গশিরে সেই অনিল-বিকম্পিত কেতন; আপৎকাল সময় দুর্গপ্রাচীরে সশস্ত্র প্রহরীর কোষনিবদ্ধ অসির ঝনৎকার, তাহার কম্পমুক্ত বর্ষার ফলকে সূর্য্যকরের খেলা, সে সকলই এখন অতীতের স্বপ্নে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

আর প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমরা সকলে যাইয়া গঙ্গাতীরে বসিতাম। চারি দিকে দৃশ্য বড় বিমোহন;—সম্মুখে অজস্রবেগীরঘন তরঙ্গময়ী তরল ধারা বহিয়া যাইত, ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দূরত্ব হেতু নীল দেখাইত—তাহার কোলে আরও ঘন নীল; পশ্চাতে সুদূর-প্রসারিত প্রান্তরে সান্ধ্যছায়া ধীরে ধীরে সন্ধকার ঘনাইয়া আসিত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গীতপটু, তাঁহারা গীতিবাদ্য আরম্ভ করিতেন। সেই জনশূন্য নদীতীরে সেই সন্ধ্যাসমীর, আর চারি দিকের সেই মোহন দৃশ্য, যেন কোন স্বপ্নলোকের রচনা বলিয়া বোধ হইত। ১০টা বাজিলে আমরা ক্লিষ্টমনে মুখরিত হৃদয়ে গান বন্ধ করিয়া গৃহে ফিরিতাম।

...পাদ হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে "দুর্গাকোহ" নামক একটি পাহাড়...
...ছে। তাহার একটি মন্দিরের মধ্যে দুর্গামূর্ত্তি সংস্থাপিত। মহাষ্টমীর দিন
...আমরা সেই মন্দির দর্শন করিতে গমন করিলাম। ক্রমে যখন নীল পাহাড়
...সমুজ্জ্বল করিতে পারিল, তখন আমরা পথশ্রম সার্থক বোধ করিতে
...লাগিলাম।

...বিশ্বাস, এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কোনও দস্যু-
...হস্তে এই দেবীর উদ্দেশে এই মন্দিরে কতবলি
...হইয়াছে।

...স্থানে অবস্থিত যে, দূর হইতে তাহার চিহ্ন
...মাত্র
...নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে তবে দেখা যায়।
...পথ নির্দ্দেশ করা লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল,
...সন্দেহ
...নও ভাল পথ নাই। একটী বিস্তৃতপ্রায় নির্ঝরের
...প্রস্তরময় বক্ষের উপর দিয়া যাইতে হয়। বর্ষাকালে সেখানে পথ থাকে কি না
...সন্দেহ। দুই পার্শ্বে ঘন বন। মধ্যে মধ্যে শেফালিকা তরুরাজি, এই তরু-
...শ্রেণীকে অতিক্রম করিয়া শেফালি-বিকীর্ণ বনপথে মন্দিরসমীপে উপনীত হইতে হয়।
...দেখিলেই একটা উপন্যাসবর্ণিত দস্যুদলের উপাসিতা দেবীর মন্দির বলিয়া
...মনে হয়। মন্দিরটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত,—চূড়াবিহীন। মহাষ্টমীর
...দিন বহু লোক সেই প্রাচীন দেবীমূর্ত্তির পূজা করিতে আসিয়াছিল। তাই বুঝিলাম,
...সে দিন সেই বিজন বনে দুই চারিখানা মিষ্টান্নের ও ফলের দোকান বসিয়া-
...ছিল। মন্দিরে আসিয়াই সহসা বিগ্রহ দেখিবার সুবিধা নাই। খানিকটা
...সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আঁকা-বাঁকা পথে মন্দির-দ্বারে উপনীত হইতে হয়। দ্বারটিও
...অদ্ভুত রকমের—একটি মানুষ হামাগুড়ি দিয়া সোজাসুজি সেই দ্বার-পথে
...মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে পারে। তথায় বিগ্রহের দর্শনলাভ হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে
...ঘনান্ধকার। বিগ্রহের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখিলাম; কিন্তু তাহার
...মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনিশ্চিত সুশোলাভের আশায় নিশ্চিত মৃত্যুলাভ
...করিতে সাহস করিল না। এই বিজন বনে নরহত্যার সংঘটন অসম্ভব বলিয়া
...বোধ হয় না।

...মন্দিরের এক জন ভৃত্যের নিকট সংবাদ লইয়া আমরা পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ে
...উঠিলাম। খানিকটা বন পার হইয়া একটী বৃক্ষবিরল স্থানে উপস্থিত হইলাম।
...দেখিলাম, এই পার্ব্বত্যভূমিতে সময়ে সময়ে বন্য বৈচিত্র্যবহুল হরিণের দল ও ময়ূরের
...ঝাঁক দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন এক সাঁওতালিনী স্ত্রীলোক কুশলীয় বটে—বর্ণনীয়
...নহে—আমাদের উপর উঠিলে আমি সেই মন্দির-সংলগ্ন ভগ্ন

সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—নিম্নে তালীবৃক্ষশ্যামল ভূমি বিস্তৃত, তাহার উপর দিয়া "গ্রেণ্ডরোড" চলিয়া গিয়াছে; দূরে তরঙ্গায়িত গঙ্গা রজতহারবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; আর তাহারই কূলে চুণার সহর—যেন বালুকার স্তূপ-মধ্যে; অপর দিকে বিন্ধ্যাচলের বৃক্ষলতাবিহীন ধূসর-কঠিন মহিমা প্রকট করিয়া দণ্ডায়মান। যেন কবিত্বের রাজ্য—যেন স্বপ্নের দেশ!

কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর ক্লান্তদেহে আমরা বন্দি [illegible] বাসিয়া [illegible] নির্ঝরের নির্ম্মল নীরে [illegible] হইল, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলাম [illegible] আছে, সেটি এরূপ ভাবে গ্রথিত যে, দারুণ [illegible] প্রচুর জল সঞ্চিত থাকে। সুতরাং মন্দি [illegible] প্রস্তরনির্ম্মিতকক্ষবাসী [illegible] কখনও জলকষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

আমরা যখন গৃহাভিমুখগামী হইলাম, তখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা যখন সেই প্রখর-প্রভাকর-কিরণতপ্ত তালতরুশ্রেণী-বিহীন প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বাল্যকালে তালতরুপল্লীর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ শ্রান্ত আর্য্যদিগের যে সকল চিত্র লিখিয়াছিলাম, সেই সকল চিত্রের কথা মনে পড়িতে লাগিল। প্রাতঃদেহে বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা গৃহে ফিরিলাম।

ইহার পর দিনই আমরা চুণার ত্যাগ করি।

আত্মাপিনী।

কাশীকান্তের একটি বৃহৎ রঙ্গালয়ের অভিনয় শেষ হইয়া গেল। অভিনয়ের অভিনেতৃগণের ও অভিনেত্রীদিগের সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতে করিতে দর্শকগণ রঙ্গালয় হইতে গ্যাসালোকে আলোকিত, পল্লিকঙ্কুল রাজপথে আসিয়া পড়িল। সেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ইংরাজী-বেশধারী দুই জন বাঙ্গালী যুবক ও অর্দ্ধ-ইংরাজী-বেশধারিণী একজন বাঙ্গালী মহিলা রাজপথে দণ্ডায়মান একখানা ব্রাউণবেরি শকটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহিস পশ্চাদ্ভাগে শকট-দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। তাঁহারা সকলে [illegible] উঠিতেছেন,

এমন সময় অদূরে কে কহিল, "বিবি—যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সে ঐ যায়। ধর ধর, শীঘ্র ধর। যায়, মুখে কাপড় আছে। ভগবানের বিধান দেখ!"

ঘটনাস্থলের পার্শ্বস্থ ঘরের, জীর্ণ খোলার ঘরের নীচে দুই জন ভদ্রলোক পাশের প্রকোষ্ঠে হইতে সেই প্রকাণ্ড রাজসংস্করণ হইয়াছিল। [illegible] তাহার চলনাবিলাসের অভাব ছিল না—হয় ত তাহাই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। এখনও তাহার মুখে রূপের অবশেষ আছে, কিন্তু পাপের ছায়াপাতে লাবণ্য বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। তাহার নিষ্প্রভ নয়ন কোটরগত, তাহাতে শ্রান্তির ভাব বড় পরিস্ফুট। তাহার পার্শ্বেই তাহার একটি কোমল-হৃদয় দাঁড়াইয়া আছে। সে সে উন্মত্তের ন্যায় তাহাদিগের মধ্যে ছিটকে কাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বিবি, যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—সে ঐ যায়। যত পাপ, তত কলঙ্ক আমার; মুখে কাপড় আমার; ভগবানের বিধান দেখ।" ওই পরিবর্ত্তিত বেশের যে স্ত্রীলোকটিকে চিনিতে পারিয়াছিল। বেশপরিবর্ত্তন করিয়া পুলিসের চক্ষে ধূলি দেওয়া গেলেও, কিন্তু তাহার সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে, তাহাকে লুকাইতে পারা যায় না!

অভাগিনীর কথা শুনিয়া তাহারা মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। সে কণ্ঠস্বর যেন সে পূর্ব্বে কোথাও শুনিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। সে তাড়াতাড়ি শকটাভ্যন্তরে উঠিয়া বসিল। গাড়ীর ভিতর ম্লান আলোকে তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে কেহ এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

মহাবীরমে মাথিন নিম্ন মুখার্জ্জি করিলেন, "ওই যে দরজা-বন্ধ-তাগিনী বন্ধ করিয়া প্রকাণ্ড ব্যাপার বাধাইল, পুলিশ কি উহার কোন প্রতিবিধান করিবে না?"

মিস ব্যারিস্টার ভাড়া করিলেন, "ইহাই বর্ত্তমান কালের সভ্যতার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।"

ওকালতী প্রেমিক মিষ্টার মাখিন সে বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না। সে অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিল। বহুদিনপূর্ব্বপরিচিত একখানি কোমল মুখের স্মৃতি তাহার হৃদয়-পার্শ্বে দৃষ্ট একখানি পাপ-সংসর্গ-চিত্রের কথা তাহাকে যন্ত্রণাকর করিয়া তুলিয়াছিল।

মিস্ মুখার্জ্জির গৃহপ্রবেশ-পথেই হীরালালের আবাসগৃহ। অন্য দিন হইলে সে মিস্ মুখার্জ্জিকে গৃহে রাখিয়া বিদায় লইয়া আপনার গৃহে ফিরিত। আজ সে তাহা করিল না; সাময়িক অসুস্থতার ওজর করিয়া আপনার গৃহদ্বারেই শকট হইতে অবতরণ করিল।

মিস্ মুখার্জ্জি বলিলেন,—হীরালালের মুখ বড় গম্ভীর—যেন সে কোন গুরুতর চিন্তায় ক্লিষ্ট।

মিস্ মুখার্জ্জির পিতা একজন সুনামখ্যাত ব্যারিষ্টার। হীরালাল সম্প্রতি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। হীরালালের সহিত মিস্ মুখার্জ্জির বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছে; এখন কেবল বিবাহ-বাধা অর্থাৎ "বেণ্টশিপ" চলিতেছে; পাকাপাকি কিছুই স্থির হয় নাই।

২

সেদিন রাত্রিকালে হীরালাল ঘুমাইতে পারিল না। তাহার কেবল বোধ হইতে লাগিল,—যেন সে শয্যাপার্শ্বে কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছে, যেন কে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। কক্ষের অন্ধকারমধ্যে সে যেন ছায়ার-পার্শ্বে দুই সেই অভাগিনীকে দেখিতে পাইতে লাগিল। হীরালাল উঠিয়া দীপ জ্বালিল—কক্ষের অন্ধকার যেন শ্বাসরোধকারী বলিয়া তাহার অনুভূত হইতেছিল।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর প্রভাতে হীরালাল মাথাধরা বোধ করিতে লাগিল। স্নানাদির পর সে ভাবিল, দিনকতকের জন্য কোথাও বেড়াইয়া আসিবে, তাহা হইলেই এ দুশ্চিন্তা দূর হইয়া যাইবে। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল যে, দিনকতকের জন্য বরাহনগরে মাতুলপুত্র মহিমচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিবে। বাল্যকালে সে মাতুলালয়ে থাকিয়াই বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিল—তাহার পর ইংলণ্ডে প্রবাসকালেও সে মাতুলের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল। সে মহিমচন্দ্রকে লিখিয়াছিল যে, তাহার শরীর অসুস্থ, তজ্জন্য সে দিন-কতক সহর ছাড়িয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবে।

হীরালালের পত্র পাইয়া পর দিবস মহিমচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়ার পর দেখা—মহিমচন্দ্র আসিয়াই ভ্রাতার সহিত কোলাকুলি করিলেন। যেখানে সত্যসত্যই প্রাণের টান থাকে, সেখানে বিদেশীয় লোকে বা বিজাতীয় ভাষায় মনের প্রকৃত ভাব লুকিয়া রাখিতে পারে না।

দুই ভ্রাতায় অনেক কথা হইল। অতীতের কথা, বর্ত্তমানের কথা—নানা-

কথার পর মহিমচন্দ্র বলিলেন, "চল, আজই বাড়ীতে যাইব। বাবা মৃত্যু-শয্যায় তুমি আর আমাদের বাড়ী যাও নাই। মা যে জন্য কত দুঃখ করেন! তুমি যাইবে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তোমার অসুখের কথা শুনিয়া মা বড় চিন্তিতা হইয়াছেন। তোমার অসুখ হইবে না ত হইবে কাহার? ঈশ্বরের উপর কি অত্যাচার নাই বল?"

হীরালাল বলিলেন, "আমার সম্বন্ধে ও কথা বলিও না। শরীরের উপর আমার কোন অত্যাচার নাই।"

মহিমচন্দ্র বলিলেন, "তোমাদের সমস্ত জীবনটাই শরীরের উপর অত্যাচার। উপযুক্ত নিদ্রা হইতে না হইতে শয্যা ত্যাগ করিয়া, কিছু আহার করিয়া রোদ্রে যাকুক আর নাই যাকুক একবার ঘুরিয়া আসিবে; তাহার পর বেলা পড়িতে না পড়িতে 'ভিজিট', 'রিটার্ণ-ভিজিট', ইত্যাদি; ইহার পর বাটীতে ফিরিয়া চোখে-মুখে জল দিয়া সন্ধ্যা হইতে না হইতে 'ইভনিং-পার্টি' প্রভৃতি আছে; ইহার পর আবার রাত্রিতে নাচ, 'পার্টি' প্রভৃতি আছে,—গৃহে ফিরিতে রাত্রি ১টা কি ২টা বাজে। ইহার উপর আবার এক রাশ মাংসভক্ষণ ও মদ্য পান। শরীরে আর কত সহিবে?"

হীরালাল ভ্রাতার কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সেই দিন হীরালাল ভ্রাতার সহিত তাঁহার গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রাসাদোপম গৃহে চলিয়া গেলেন।

মাতুলালয়ে আসিয়া ইংরাজী পোষাকের খোলস ত্যাগ করিয়া হীরালাল বড় আরাম বোধ করিলেন; বহুদিন মাংসাহারের পর বাঙ্গালীর ডালভাত তাঁহার নিকট অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

৩

মহিমচন্দ্র অনেকপ্রকারে—ভ্রাতার স্থায়িবিবাহে চেষ্টিত হইলেও, বরাহনগরে আসিয়া হীরালাল শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। যে দুশ্চিন্তার জন্য তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এখানেও সে চিন্তা হইতে অব্যাহতি ছিল না। চিন্তার স্থান মানব-হৃদয়;—স্থানপরিবর্ত্তনে সকল সময় তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। আবার এখানে তাঁহার দুশ্চিন্তার বিশেষ কারণ ছিল। এখানেই বিনোদিনীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ; এখানেই তিনি সেই সরলা প্রেমিকভক্তার হৃদয়ে প্রেমোদ্রেক করিয়াছিলেন; এখান হইতেই যে তাঁহার আশার গৃহ, পরিজন সকল ত্যাগ করিয়া, পাপ-পথের পথিক হইয়াছিল। এখানে হীরালালের দুশ্চিন্তার বিশেষ কারণ ছিল।

প্রভাতের সমীরণে রীচিভঙ্গবিহীন নদীবক্ষে তরণী বাহিয়া শীকরশীতল সমীরসেবন, সর্ব্বদা ভ্রাতার সহিত মনের সকল কথা, কিছুতেই অভাব বুঝিতে হইতে দুশ্চিন্তার ছায়া-দূর হইত না।

সকালে থাকিলেই তাহার বোধ হইত, যেন সে আহার পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছে। নিশিতে সহসা নিদ্রাভঙ্গে তাহার বোধ হইত, যেন কে প্রীতি-স্নিগ্ধ-ভালবাসা-দীপ্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে চাহিয়া দেখিত—কোথাও কেহ নাই।

হীরালাল দিন দিন শীর্ণকায় হইতে লাগিল; আর তাহার শীর্ণ গণ্ডে চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক দীপ্তি লাভ করিতে লাগিল। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে জীবনের সেই ভীষণ ভ্রমের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিত না। প্রথম নদীতীরে সহসা সেই যৌবন-প্রারম্ভদর্পিতার সহিত সাক্ষাৎ;—হৃদয়ের কোন্ কোণে কোথাও আরও অগ্রসর হইবার জন্য কৌতূহল;—যুবতীর হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার;—সেই জ্যোৎস্নালোকসমুজ্জ্বল নিশিতে যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ;—তাহার জন্য যুবতীর গৃহত্যাগ—সে সকলই তাহার মনে পড়িত। যুবতী তাহার জন্য ধর্ম্মত্যাগ করিবার পর সে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। তাহার পর এত বর্ষ গিয়াছে,—সে ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার আসিয়াছে। তাহার পর—ভয়ানক ঘাতে জীবনটার সেই পার্শ্ববর্ত্তিনী ছায়া ব্যাপ্ত হইল।

এই নূতন স্মৃতি হীরালালের হৃদয়ে ভীষণ যন্ত্রণা জাগাইয়া তুলিত। এই কাঞ্চনজঙ্ঘাই নরক,—মানবের কলঙ্কাস্পৃষ্ট পার্থিবকল্পনার নরক ইহার নিকট তুচ্ছ।

হীরালাল বরাহনগর হইতে পলাইতে চাহিল; ভাবিল, হয় ত অন্যত্র গেলে একটু সুস্থ হইতে পারিবে। কিন্তু যহিমচন্দ্র তাহাকে এত শীঘ্র যাইতে দিতে চাহিলেন না। অগত্যা হীরালাল সেখানেই রহিয়া গেল।

৪

সন্ধ্যা অস্ত গিয়াছে। এখনও নৈশ অন্ধকার চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে নাই। বরাহনগরের প্রান্তে এক জনবিরল পথ দিয়া হীরালাল যাইতেছে। তাহার মনে একটি লোমশ কুকুর নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছে। আমরা আপনার প্রাণে লিপ্ত হইয়াও পাপীকে ঘৃণা করি;—পাপীর মত ঘৃণা করি, পাপকে ঘৃণা করি না, পশুরা বোধ করি পাপকে ঘৃণা করে, কিন্তু তাহারা আমা-

[illegible] —তাহারা অমর।

সেই দিন সন্ধ্যার পর অতিনাথের [illegible] দীর্ঘ ইতিহাস [illegible] দীন বিনোদিনী কেবল ফিস্‌ফিস্‌ করিয়াছে, কেবল কাঁদিয়াছে। পাড়ার লোক উহাতে কোনও সাহায্য করিতে পারে নাই। [illegible] যৌবনপ্রান্তে যে ইতিহাস [illegible] বৎসর ভরিয়া [illegible] দুর্বহ হইয়া [illegible] আসিয়া [illegible] ফিরিবার উপায় নাই; বুঝিল, [illegible] একমাত্র [illegible] —তাহার পরে [illegible] পরিত্রাণের আর উপায় নাই। [illegible] —কিন্তু [illegible] হইবার কেহ না থাকিলে, [illegible] কেহ [illegible] —বিনোদিনীর ফিরিবার পথ নাই।

এ কয় দিন অতিথি আসিয়া [illegible] স্থির করিয়াছিল। যেখানে [illegible] সেখানে আজ সে [illegible] [illegible] প্রান্তে একটি [illegible] তাহার পর [illegible] তুলসীর [illegible] জন্মে। এখনও সে [illegible] [illegible] একজন [illegible] [illegible] নারী হইতেছিল। [illegible] পুরুষ ভয় পাইয়া [illegible] [illegible] হাসিতে হাসিতে [illegible] [illegible] দিতেছিল। দেখিয়া বিনোদিনী কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কর্মহীন নারীজীবনে সন্তানের স্পর্শ [illegible] হয় নাই। [illegible] আসিবার কেহ নাই। তাহার [illegible] [illegible] [illegible] ভাবিবারও [illegible] [illegible] সন্তানের স্নেহস্পর্শলাভের জন্য তাহার [illegible] ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

[illegible] নারী নামে [illegible] হইয়া গেল।

বিনোদিনীও ধীরে ধীরে নারী হইয়া। তাহার [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া তাহার বক্ষে সঞ্চারিত হইয়া [illegible] [illegible] হইল।

[illegible] চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। বিনোদিনী [illegible] [illegible] একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িল।

[illegible] নিশা [illegible] হইয়া। [illegible] [illegible] [illegible] আকাশে উদিত হইয়া [illegible] [illegible] ছড়াইতে লাগিল। [illegible] [illegible] হইতে উঠিয়া বিনোদিনী [illegible]

মধ্য দিবা-আলোক ... নদীতলে যেখানে তাহার পিতামহ ছিল, সেখানে নাই। ... সেখানে আর গৃহ নাই, কেবল ... সেই স্থান নির্দেশ করিয়া দিতেছে। এখন যেখানে অতুল ... গ্রাম সেখানে খাদিল নিয়াছে, সম্মুখে নদী মন্দগতি বহিয়া যাইতেছে, দক্ষিণে ও পশ্চাতে বিস্তৃত প্রান্তরে বিল্বতরু ... উঠিতেছে। সেই ভিটার উপর বসিয়া বিনোদিনী ভাবিতে লাগিল,—এ ত তাহারই জন্ম মাতামহ-মাতামহী মাতৃ-গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন,—কোন্ বিদেশে,—আজীব স্বজনের নিকট হইতে কবে বা জানি তাঁহাদের কি হইয়াছে। সেই পূর্ব্ব ভিটার মৃত্তিকার উপর বসিয়া বিনোদিনী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে তাহার মনের ... বাহির হইয়া বিনোদিনী কাঁদিতে লাগিল। পিতা মাতার সেই সুখময় ... কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। শৈশবের, বালিকা-বয়সের, যৌবনারম্ভের সেই সুখময় জীবনের কথা ভাবিয়া বিনোদিনী ব্যাকুলা হইয়া ... তাহার পর—এই ত্রয়োদশ পাপের জীবনের ইতিবৃত্তের সহিত সেই সুখময় সাম্রাজ্যের কথা তাহার মনে পড়িল। বিনোদিনী শিহরিয়া উঠিল।

বিনোদিনী যুই করে কথা ভাবিতে লাগিল, আর বালিকা-বয়সে একবার স্বামীর মূর্ত্তি তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দিবা জ্যোতিঃ ছটায় বিরাজিত হইয়া উঠিতেছে লাগিল। তাহাকে মৃতা ভাবিয়া একটী শৃগাল তাহার নিকটে আসিতেছে দেখিয়া ... ফিরে পার্শ্বেই কুক্কুরটিকে দেখিয়া চলিয়া গেল।

বিনোদিনী বহুক্ষণ কাঁদিল; কত ক্ষণ কাঁদিয়াছে, তাহা বলিতে পারে না,—চাহিয়া দেখিল, চন্দ্রালোক ম্লান হইয়া আসিতেছে। উঠিয়া বে অদূর-প্রবাহিতা ... নদীর কূলে আসিয়া দাঁড়াইল। কুক্কুরটি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল—সে এখন তাহার চরণে পুচ্ছের লোমশ তনু ঘর্ষণ করিল। বিনোদিনী চাহিয়া দেখিল—সে কুক্কুরের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

কুক্কুরটির দিকে চাহিয়া বিনোদিনী বলিল, "তোকে আর কাহার কাছে রাখিয়া যাইব, ... তোকে ত কেহই দিবে না, তুই আপনার অন্ন হইতে একখানি ... দিয়া লইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইবার মধ্যে একখানি কুড়াইয়া লইয়া অন্নের ছিন্ন অংশ দিয়া কুক্কুরটির পদে বাঁধিয়া দিল। তাহার পর ... তুলিয়া লেজে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। ... একটি বক্র রেখা অঙ্কিত করিয়া চীৎকার করিয়া কুক্কুরটি জলে পড়িল। ... কাঁপিয়া চারি দিকে জল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। ... ভয়ানক নীরবতা ... উঠিল। একবার প্রবল ...

...; তাহার মস্তকের অগ্রভাগ জলের উপর দেখা দিল। তাহার পর ছইজনে মাথা ঘুরিয়া গেল। ক্রমে কয়েকটি বুদ্বুদ উঠিল—কতকগুলি রক্ত কুসুমের দিকে আসিতে আসিতে ক্রমেই বৃহৎ হইতে হইতে মিলাইয়া গেল। নদীস্রোত আবার পূর্ব্বের মত বহিতে লাগিল।

বিনোদিনীর হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে নদীকূলে বসিয়া পড়িল। নদীর তরঙ্গমালা তাহার পদতল স্পর্শ করিতে লাগিল। তখন কাশবনে আশ্বিনের অপরাহ্ণ উৎসব শুরু হইয়া গিয়াছে—নেতে আর অশ্বত্থ আশ্বিনের ক্ষীণ আলোকে অস্তাচলগামী সূর্য্যের রক্তকিরণ-মণ্ডিত মস্তকস্থিত মন্দির-চূড়া জ্বলিতে লাগিল। সেই রক্তচন্দ্রালোকবিভাসিত বিশাশেষে, জন-সমাগমবিহীন প্রান্তরে প্রান্তে নদীতীরে তাহাকে যেন প্রেতলোকবাসিনী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বিনোদিনী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল—শরীরের সমস্ত বল একত্রিত করিয়া বেগে নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িল। চারি দিকে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কতকগুলি বড় বড় তরঙ্গ উঠিয়া নদীর ক্ষুদ্র-সূত্র বীচিমালা ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার পর আবার নদী পূর্ব্বের মত কলকলনাদে বহিতে লাগিল।

৬

পরদিন প্রভাতে মেঘমুক্ত গগনে অম্লানোজ্জ্বল সূর্য্যোদয় হইল। প্রভাতী স্নান-পানের পর হীরালাল ও মহিমচন্দ্র একখানি ছোট নৌকায় গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণে বাহির হইলেন। তরণীর [illegible] উপভোগ-যোগ্য [illegible] শুশ্রূষায় কাটা হইয়াছে। [illegible] কূলে কূলে কলকের গৃহে গোলা পুরু—গৃহস্থ কর্ম্মে নিযুক্তি [illegible] কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। তরণী উজান বহিতে লাগিল।

সহসা মহিমচন্দ্র দেখিলেন, দূরে কি একটা ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি মাঝিদিগকে একটু বেগে নৌকা বাহিতে আদেশ করিলেন। সকলে সেই ভাসমান পদার্থটার দিকে চাহিয়া রহিল। নৌকা একটু অগ্রসর হইলেই বুঝা গেল, সেটা বেগবান্ জলস্রোতে একটি মৃতদেহ ভাসিয়া আসিতেছে। তখন আর একটু অগ্রসর হইলে মহিমচন্দ্র বলিলেন, "স্ত্রীলোক।"

হীরালাল চমকিয়া উঠিল। সে বলিল, "এ নৌকা আর কি হইবে? ফিরিয়া যাই।"

মহিমচন্দ্র বলিলেন, যদি অগ্রসর হইয়া থাকে, তবে হয় ত [illegible]

তখনই গভীর হইল। ধীরে ধীরে গেল বিনোদিনী নত নয়ন তুলে, সে নয়নে এখনও বৈদ্যুতি সৃষ্টি আছে। তাহার মুখ পুনর্বার হইয়া গেল।

একজন বলিল, "এখনও বাঁচিয়া আছে কি?"

মহিন্দ্র বলিলেন, "কেমন আর দেখা যাইতেছে।"

হীরালাল আর থাকিতে পারিল না। তরী হইতে লাফাইয়া পড়িল।

হরচন্দ্র অন্যান্য সকলে ডাকিয়া পড়িলেন।

নবীনচন্দ্র ধরাধরি করিয়া হীরালালকে তীরে তুলিলেন। তখন সকলে মিলিয়া সেই মৃতদেহই তীরে তুলিয়াছিল।

হীরালাল প্রথমে পলাইতে চেষ্টা করিল। অথচ তাহার দৃষ্টি সেই মৃত বিনোদিনীর মৃতদেহের দিকে ছিল। তাহার চোখ যেন বিনোদিনীর শরীর হইতে অতিরিক্ত কাহাকে যেন টানিয়া বাহির করিতে চাহিল।

সে কাঁদিয়া বলিল, "আর দেখিতে পারি না—আর দেখিতে পারি না।"

তখন সকলে মিলিয়া উহাকে ধরিয়া পড়িল। তখন হীরালাল নবীনচন্দ্রের পায়ের নিকট বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আর দেখিতে পারি না—আর দেখিতে পারি না।"

কাব্য-কথা।

ইমার্সন বলিয়াছেন, "There is nothing spiritual in him: he is mere creature of the earth, earthy. He does not wrestle with the great Mystery of existence. In his heart

এই মহাসত্য ও জীবন-সমস্যার কথা যাঁহার অন্তরে-বাহিরে আচ্ছাদিত করিতে পারে না, যিনি ইহাকে নূতন করিয়া মীমাংসা করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হন না, কার্লাইল তাঁহাকে কবি-শ্রেণীমধ্যে উচ্চাসন দিতে প্রস্তুত নহেন। বাস্তবিক, যিনি এই চিরন্তন কবি-প্রতিভার অধিকারী হইয়া কেবল বসন্ত-ভূষিতা বসুন্ধরা আর সেই বসুধানি লইয়া কালাতিপাত করেন, তিনি যে তাঁর শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছেন না, ইহা সুসমালোচকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে কখনও কখনও এরূপ দুই এক জন অসাধারণ সমালোচক দেখা দেন বটে, যাহারা যৌবনের বিলাস-বিহ্বল সমুজ্জ্বল প্রেম সঙ্গীতকেই কাব্যের চরমাদর্শ মনে করেন। মানবের সমগ্র জীবনের সমালোচনাই কবির কার্য। সুতরাং, কি শৈশব, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, প্রকৃত কবির চক্ষে কিছুই উপেক্ষার বিষয় নহে। জীবন যৌবনের বিরোধী নহে, প্রত্যুত চিরযৌবনের সহযোগী। প্রেম-সঙ্গীতের প্রতিও আমাদের বিশেষ কোনও বিরাগ নাই। তবে পর পর উক্তরূপ সমালোচনা দেখিলেই কেমন একটা সন্দেহের উদয় হয়। অবশেষে আমাদের মনে ফরাসী লেখকের সেই প্রসিদ্ধ কথাগুলি জাগিয়া উঠে,—"Clear it is, my good young man, that you are only eighteen; let us hear what you have to say at forty." কার্লাইলের মতানুসরণ পূর্ব্বক আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের কবিদিগের প্রতি একবার পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার প্রয়োগ করিয়া দিতে চাহি। বিদ্যাপতি হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রাচীন কবিকুল আমাদিগকে এ বিষয়ে বড় বেশী সাহায্য করিতে পারেন না। বৈষ্ণব কবিদল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় থাকিলেও মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র যে অনেক স্থলেই অবিমিশ্র জড়তায় পরিপূর্ণ, এ বিষয়ে বোধ হয় সকলেই আমাদের কথায় সায় দিবেন। আর বৈষ্ণব কবিদিগের প্রতি অনুরাগের আধিক্যবশতঃ আমরা তাঁহাদের জড়ভাগ উপেক্ষা করিলেও, কার্লাইল বোধ হয় তাঁহাদের কবিতায় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরই অধিকতর বিকাশ দেখিতে পাইতেন। তাঁহাদের রচনার ভিতর অনেক স্থলে চুম্বন ও শ্লথ-বসনের এত ছড়াছড়ি যে, নীরসতর আধ্যাত্মিকব্যাখ্যাবাদীকেও খড়্গহস্ত মানিতে হয়। তবে, প্রাচীন কবির পক্ষে একটা কথা এখানে বলা যাইতে পারে। কার্লাইল যে আধ্যাত্মিকতা ও জীবনসমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন, সে জিনিষটা আদৌ সেকালের নহে। একালেই তাহার বিকাশ। প্রাচীন কবির দল হয় ত তাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে এ বিষয়ে একরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন, সে হিসাব

জীবন কাব্য। কাব্যকলা তাই কবিদিগকে দেখাইয়া দেয়, উহার সাহায্যমাত্র পাইয়া কবিগণ উহাকে একেবারে বিকল হইয়া যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিবর হেমচন্দ্রের হৃদয়ই আধুনিক যুগের এই জীবন-সমস্যায় আকুল সর্ব্বপ্রথম উদ্বেলিত হইয়া উঠে। হেমচন্দ্রের প্রথম বয়সের "চিন্তাতরঙ্গিণী" হইতে তাঁহার শেষ বয়সের "দশমহাবিদ্যা" পর্য্যন্ত ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন বহুতর খণ্ড কবিতাতেও ইহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার "জীবন-মরীচিকা", "ঈশ্বরে মতি" প্রভৃতি উল্লিখিত হইতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যে সমালোচকগণ যাহাকে "The malady of the age" বলেন, কবির বাঙ্গালী যুবাও সেই পীড়ায় পীড়িত। তরুণবয়স্ক কবি তখন এই নবীন ব্যাধির ঔষধনির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার কাব্যের নায়ককে আত্মহত্যা দ্বারা ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "দশমহাবিদ্যার" কবি আয়ুর্বিধানানুসারে এই কঠোর সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি আশ্বাস দিতেছেন,—

"না হও নিরাশ, ওরে ভক্তিমান!
মোচন আছে রে আপদে।"

[illegible] জননী!
[illegible] এক দিন সে অশেষ
[illegible] আমরা জীবন-যৌবনের
কবি[illegible] সে সাধনে নিরত হই।
ন-সমস্যা। [illegible] তাহা সকলেই স্বীকার
যৌবন [illegible] বিদ্যা"-পাঠে অনেক শিক্ষিত
বাঙ্গালী-যুবক [illegible] আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এ জন্য
আমরা কবিকে আ[illegible] করিতেছি। আশা করি, তাঁহার
অন্যান্য গ্রন্থ সাহিত্য-ভাণ্ডা[illegible]লও, একমাত্র "দশমহাবিদ্যা"
তাঁহাকে চিরদিন বাঙ্গালী পাঠ[illegible]য়া রাখিবে।

হেমচন্দ্রের পর বাঙ্গালা-সাহিত্যে [illegible] ইনি প্রথম জীবনে
যৌবন-মূর্ত্তি লইয়া এত বিব্রত হইয়া পড়িয়া[illegible] বে লেখনীমুখে যৌবন
ও ভোগের কথা ছাড়া আর কোনও কথাই বড় [illegible] যাইত না। তৎপরে
ইনি "পলাশীর যুদ্ধ" ও "রঙ্গমতী" কাব্যে দেশের দুর্দ্দশায় কাঁদিয়া বীণাপাণির

...ভাবে [illegible] ...করেন, সম্প্রতি ইহার নেত্রনীর গতি নিতান্ত
...হইয়াছে। আমাদের ভরসা ছিল যে, নবীন কবির নবীন
...বিবিধ, দুর্লভ, এক অপরূপ ও সমীচীন, মীমাংসা
...পাইব। কিন্তু কবি ইহাদের [illegible] ও প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক
...বিষাদ ও যুক্তিমূলক এত বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বের সমাবেশ করিয়াছেন
...ইহাদের একটা সুসঙ্গত সমন্বয় করিতে পারা যায় না। আসল কথা
...কেবল বলিবার জন্য বলা হইয়াছে। পাঠকবর্গ যদি ইহার প্রমাণ দেখিতে চান
...তবে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহাশয়ের সমালোচনা পাঠ করিবেন।
...পাঠকবর্গের সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হইতে না পারিলেও, আমরা তাঁহার
...যুক্তিকথাটি আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছি। মূল গ্রন্থত্রয়ের আলোচনা করিয়া
...এত বড় মহাশয়ের সমালোচনা দেখিয়া, নবীন বাবুর শেষ বয়সের সাহিত্য-
...স্থান [illegible] কোনও কালে লোকানুরাগ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, সে
...বিষয়ে আমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, কবির বৈষ্ণবক
...কলেজ" বা "প্রভাস" বাঙ্গালী পাঠকের আদরের স্থান প্রাপ্ত না
...পাঠকেরা চিরদিন [illegible] কেবলমাত্র "পলাশীর
...আলেখ্য" [illegible] করিলেন, [illegible] আক্ষেপ করিবেন।

...তিনি এই গ্রন্থত্রয়ে [illegible]
...সকল দেশ ভাগের [illegible]
...এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের [illegible]
...একটা কথা বলা কর্ত্তব্য।
...কবি কবিত্ব মুকুলমালা। [illegible]
...[illegible] পাওয়া যায় বটে, কিন্তু [illegible]
...[illegible] আর সকলে পাওয়া [illegible]
...[illegible] যে নূতন সুর [illegible] তাহাতে [illegible]
...[illegible] ভাসাইয়াছেন [illegible] [illegible] ছিল না। কিন্তু [illegible]
...[illegible] সাধও [illegible] [illegible] আলাইল-উন্নিষিত [illegible]
...[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
...[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
...[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
...[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
...[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
...[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পরাজিত করিয়াছে, কেবল সেই কথাই বলিতেছি। সেখানে তিনি নিজেই নিজের নিকট পরাজিত। নতুবা, অনেক সুকবি যে বিষয়ের সান্নিধ্যে পৃষ্ঠিরা ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তিনি সেখানেও আধ্যাত্মিক তার অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরাজ কবি বায়রণের সমুদ্র-সম্বোধনের সহিত আমাদের কবির "সমুদ্রের প্রতি" শীর্ষক কবিতার তুলনা করা যাইতে পারে। আমারও মনে ক্লেশ-উৎপাদনের ভয়ে দেখাই দৃষ্টান্ত দিলাম না; নহিলে তাহারও অভাব নাই।

আমরা নিম্নে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অস্থিরতার বর্ণনা একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ পাশ ও পাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস,
নাহি জানে কি যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে দুখ,
আপনার মনোমাঝে আপনি যে হারায়েছে দিশা,
বিকারের মরীচিকা-জালে।"

এ কবি যতই করুণ, বড়ই সংস্পর্শী। "The malady of the age" এর এরূপ জীবন্ত ছবি অন্যত্র দুর্লভ। কেবল, "এ পাশ ও পাশ" এই দুইটী ছন্দোহীন কথায় কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ হইয়াছে, স্বীকার করি।

হেমচন্দ্রের ন্যায় তত দূর আশান্বিত না হউন, রবীন্দ্রনাথ একবারে নিরাশ্বাস নহেন। রবীন্দ্রনাথ "আরও কোথা? আরও কত দূর?" অথবা "হবে কি ঘুচিবে দুঃখ-নিশা" এইরূপ প্রশ্নাত্মক বা সন্দেহাত্মক বাক্যে উপসংহার করেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় "মাভৈঃ মাভৈঃ" রবে প্রসারিত করে আমাদের উত্থেলিত হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহার সাহস হয় না। তা' না হউক, তাহারও কবির অভয়-বাণী বড় অল্প উৎসাহপ্রদ নহে,—

"জীবন-কণ্টক-পথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতি দিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্ব্বজনে। তার পর দীর্ঘপথ-শেষে
জীবনের অবসানে ক্লান্ত পদে রক্ত-সিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন প্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে।

দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্ন বদনে যদি হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্ত-কণ্ঠে বরমাল্যখানি,
কর্ম্মপঙ্ক-প্রক্ষালনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখগ্লানি
সর্ব্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
যৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।"

যিনি এরূপ আশার কথা শুনাইতে পারেন, তিনি যে চির-নিগৃহীত বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বায়ুর অস্পৃতা।

আধুনিক সভ্যতার উন্নতি এবং লোক-সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত জীবনী-শক্তিপোষক প্রাকৃতিক ভাণ্ডার ক্রমেই শূন্য হইয়া যাইতেছে। ভূগর্ভস্থ কয়লার আজকাল যে অসম্ভব ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে অপর ব্যবস্থা না হইলে, সম্ভবতঃ ইন্ধনাভাবে অনেক কল-কারখানার কার্য্য অদূর ভবিষ্যতেই স্থগিত রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে অধিক চিন্তার বিষয় কিছুই নাই,—সূর্য্যশক্তির আধারভূত মহিমাময় সূর্য্য শক্তিহীন না হইলে, মানব-বুদ্ধিপ্রভাবে সূর্য্যের দানী শক্তি, অনায়াসেই কয়লার অভাব পূরণ করিতে পারিবে। অধুনা বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ বলিতেছেন, আজকাল বায়ুর যে প্রকার অপব্যবহার হইতেছে, তাহাতে সম্ভবতঃ দূর ভবিষ্যতে, স্বাস্থ্যকর বায়ুর অভাবে, পৃথিবী অস্পৃশ্য হইবে। জগতে বায়ুর ভাণ্ডার ক্ষয়শীল,—এই জন্য এই তথ্যমূলক প্রশ্নটি সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ লর্ড কেল্‌ভিন্ প্রমুখ আচার্য্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

বায়ুর প্রধান উপাদান অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্পই জীবগণের প্রাণ-স্বরূপ। প্রাণিগণ শ্বাসগ্রহণকালে, অক্সিজেন্ বাষ্প শরীরস্থ করিয়া জীবনধারণ করে, এবং প্রশ্বাস কার্য্য দ্বারা কার্ব্বণিক আসিড্ নামক এক বিষাক্ত বাষ্প আকাশস্থ বায়ুতে পরিত্যাগ করে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেও, ঠিক্ এই প্রকার কার্য্য হয়;—অগ্নিসংস্পর্শে বায়ু বিশ্লিষ্ট হইয়া তাহার প্রধান উপাদান অম্লজান বহির্ভোজ্য হইয়া পড়ে,—এবং প্রাণ-বায়ুর পরিবর্ত্তে, অগ্নি উক্ত কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প উদ্গিরণ করে। অক্সিজেনের এই অবিরাম ক্ষয়পূরণের উপায়

আছে,—নচেৎ অল্পকাল মধ্যে জগৎ প্রাণিশূন্য হইত। অতীব ক্ষুদ্র তৃণ হইতে, বিশাল বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ উদ্ভিদ নিয়তই এই ক্ষতিপূরণ করিতেছে। উদ্ভিদগণ তাহাদের শ্বাসযন্ত্র দ্বারা জীবপ্রশ্বাসজাত সেই বিষাক্ত বাষ্প গ্রহণ করে, এবং তাহা হইতে দেহপোষক অঙ্গার নামক পদার্থ স্বশরীরে করিয়া, নির্ম্মল অম্লজান খাদ্য প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করে। এই প্রণালীর বায়ু নির্ম্মলতা রক্ষিত হইতেছে। পণ্ডিতগণ বলিতেছেন,—উদ্ভিদের এই ক্ষতিপূরণ ক্রিয়ার একটা সীমা আছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত ধরাপৃষ্ঠস্থ নানা স্থানের বৃহৎ অরণ্য সকল যেরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে সে সেই শক্তি ক্রমেই লুপ্ত হইয়া আসিতেছে,—তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। পক্ষান্তরে, লোকবৃদ্ধি ও কলকারখানার উপদ্রবে, অঙ্গারীয় ক্রমিক বিস্তার বাড়িয়া চলিতেছে। এই জন্যই পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, দূর ভবিষ্যতে স্বাভাবিক রায়ুর অঙ্গারের বর্ত্তমান মাত্রার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রশ্নটি লইয়া, অনেকদিন অবধি বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি লণ্ড কেল্‌ভিন্ প্রমুখ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সমবেত হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত জীব দ্বারা অম্লজান বাষ্পের কত ক্ষয় হইতেছে, তাহার একটা স্থূল হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে ১৪৪ কোটি লোকের বাস। প্রত্যেক ব্যক্তি শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা অহোরাত্রে প্রায় দেড় পাউণ্ড অম্লজান বাষ্প নষ্ট করে। এই অনুপাতে প্রতিবৎসর কেবল মানবজাতি দ্বারা ৪০ কোটি টন্ অক্সিজেন নষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীতে প্রায় ১০৯ কোটি গবাদি প্রাণী বর্ত্তমান; ইহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্যে, মনুষ্যব্যয়িত অম্লজান অপেক্ষা অনেক অধিক বায়ুক্ষয় হয়। এই হিসাবে প্রতি বৎসর সার্দ্ধ সাতষট্টি কোটি টন্ অম্লজান নষ্ট হইতেছে। কলকারখানার অগ্নি দ্বারা কত অম্লজানের ক্ষয় হয়, তাহারও গণনা হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তিন টন্ পরিমিত পাথুরিয়া কয়লা দগ্ধ করিতে প্রায় আট টন্ অম্লজানের প্রয়োজনতা হয়। সমগ্র জগতে প্রতিবৎসর প্রায় ২৫০ কোটি টন্ কয়লা বা অপর ইন্ধন দগ্ধ হইয়া থাকে,—এই অনুপাতে প্রতিবৎসর অক্সিজেনের সমবেত ক্ষয় প্রায় ৯২৩ কোটি টন্ হইয়া পড়ে। অরণ্যাদি ধ্বংস করায়, অম্লজান-উৎপত্তির যে হ্রাস হইতেছে, তাহা অত্যন্ত অধিক; কিন্তু তাহার একটা স্থূল ইয়ত্তা করাও দুঃসাধ্য। লর্ড কেল্‌ভিন্ বলেন, বায়ুর এই ক্রমিক অম্লতা বৃদ্ধি পাইলে, শীঘ্রই ইহার কুফল ফলিবে—অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বলন ও অরণ্যাদিধ্বংস নিবারিত না হইলে আর রক্ষা নাই।

যমজকৌতুক।

কোন কোন রমণীর গর্ভে একবারে দুইটি শিশুর জন্ম হয়। কখন কখন দুইটিই পুত্র বা কন্যা হয়, কখন একটি পুত্র এবং একটি কন্যা হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভে যমজসন্তানোৎপত্তির কোন বৈজ্ঞানিক কারণ এ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়িত-রূপে নির্ণীত হয় নাই। আমাদের অন্তঃপুরের মধ্যে একটা সাধারণ প্রবাদ এই যে, সতী দুহে স্ত্রীপুরুষ একত্র ভক্ষীভূত হইয়া জন্মান্তরে এজন্যই মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এ-বৃত্তির খণ্ডন কিম্বা ইহার প্রতিবাদ করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের নাই; এবং অন্য দেশের রমণী-সমাজে এরূপ কোন সংস্কার-বৃত্তি আছে কি না, তাহাও আমাদের অবিদিত।

যমজের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। কোন বিদেশী লেখকের রচনা হইতে যমজ-সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কৌতূহলজনক তথ্য সংগ্রহ করিয়া এখানে প্রকাশ করিতেছি।

যমজ সন্তানদ্বয়ের (তা পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক) দৈর্ঘ্য এক পরিমাণের প্রায়ই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অনেক সময়েই দেখা যায়, এক জনের যেমন বৃদ্ধি হয়, শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে, অন্যটিও তাহাতে আক্রান্ত হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ইংলণ্ডের কোন পল্লীতে একবার দুইটি যমজের জন্ম হয়। তন্মধ্যে একটি তাহার পিতার সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিল; কিছু দিন পরে হাম-জ্বর হইয়া সে তিন সপ্তাহকাল শয্যাগত থাকে। তাহার যে ভাই ইংলণ্ডে ছিল, অল্প কাল পরে তাহারও হাম-জ্বর দেখা দিল। যাহা হউক, পরে এই রোগ হইতে উভয়েই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

কয়েক মাস পরে ইংলণ্ডবাসী ভ্রাতাটি মস্তিষ্ক-রোগে আক্রান্ত হইল। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে তাহার অভিভাবক সংবাদ পাইলেন যে, তাহার ভারত-প্রবাসী ভাতারও ঠিক সেই প্রকৃতির মস্তিষ্ক-বিকার হইয়াছে। এই উভয় ভ্রাতার স্বাস্থ্য কোন দিনই ভাল ছিল না; সাত বৎসর পরে অতি রোগে এক দিনেই উভয়ের মৃত্যু হয়।

লেখক বলেন, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যমজভ্রাতাদ্বয়ের উভয়েই সমরোগে আক্রান্ত হইলে, ইহা ত তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তাহাদের পৈতৃক

রোগের কল হইতে পারে, কিন্তু মেঘ না হইলে সন্তানগণের অন্ততঃ বিশ জনের ও তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব নহে।"

লেখক আর দুইটি যমজের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা ভাই বোন। পরস্পরের প্রতি তাহাদের অসাধারণ স্নেহ ছিল। তাহারা উভয়ে যেন এক দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, একজনের যে কোন পীড়া হউক, এমন কি নাখাটি পর্য্যন্ত বসিলে অন্যে নিজের দেহে তাহা অনুভব করিতে পারিত। উভয়ে এক স্থানে বাস করিলেও অন্ততঃ মনে করা যাইত যে, সহানুভূতিবশে এক জন অপরের শরীরে অন্যের অসুখ অনুভব করে। কিন্তু বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তাহাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইত না, এবং তাহারা শতাধিক মাইল ব্যবধানে বাস করিত; তাহাদের মধ্যে যে চিঠিপত্র চলিত, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইত, উভয়ের শরীর এক সময়েই সুস্থ বা অসুস্থ থাকিত। এবং এক-জন অন্যকে প্রায়ই লিখিত, "আজ বোধ করি তোমার শরীর ভাল নাই? আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি এখন আমাকে পত্র লিখিতেছ।"

ভাই লণ্ডনে থাকিত, আর ভগিনীটি কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে বাস করিত। একদিন অপরাহ্নে ভ্রমণে বাহির হইবার সময় ভাই একখানি গাড়ী হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলে। আঘাত এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে, কোন নিকটবর্ত্তী ইসপাতালে তাহাকে কয়েক দিন শয্যাগত থাকিতে হয়। ইতি-মধ্যে তাহার বোনের টেলিগ্রাম, ভাতার অগিনীর নিকট হইতে একখানি পত্র আসে, পত্রখানি সেই দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা লেখা। অন্যান্য কথার পর সে ভাইকে লিখিয়াছে, "জন, তুমি কি বাস্তব কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিতেছ? আজ বিকাল হইতে আমার বামপদে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে, এ বেদনার কোন কারণ অনুমান করিতে পারিতেছি না, ইহা বাত নয় ত?" অবশেষে এই বাতিকারগ্রস্ত পদের বেদনা এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, তাহাকে অগত্যা শয্যাবলম্বন করিতে হইল; ভ্রাতার মঙ্গল আশঙ্কায় তাহার চিত্ত অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেও সে এই আকস্মিক বেদনার জন্য তাহাকে দেখিতে লণ্ডনে আসিতে পারে নাই। যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভ্রাতার আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া নিজের পদের বেদনার কারণ বুঝিতে পারিল; কয়েক দিন পরে উভয়ের বেদ-নাই আরোগ্য হইয়াছিল।

কিন্তু এই যমজদ্বয়ের জীবনের একটি ঘটনা অতীব বিস্ময়জনক। কিন্তু কাল পরে ইসপাতালে ভাইটির মৃত্যু হয়। তখন সকলেই মনে করিল, শীঘ্র হউক

বিস্ময়ে হইত, তাহার ভগিনীও নিশ্চয় মারা পড়িবে। এরূপ ভবিষ্যৎ কারণও ছিল। মাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বালিকার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গেল; এমন কি, তাহার উত্থান-শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। কিন্তু বালিকার মৃত্যু হইল না, সে ক্রমে আরোগ্যলাভ করিল, অবশেষে খুব হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহার বিশ্বাস, জন্মা মৃত্যুর পর তাহার রোগপ্রবণতা ও দুর্ব্বলতা গ্রহণ করিয়া নিজের স্বাস্থ্য এবং বলটুকু দান করিয়া গিয়াছে।

যমজদ্বয়ের আকারের অভিন্নতা চিরপ্রসিদ্ধ। পুত্র ও কন্যা হইলে সুস্পষ্ট প্রভেদের সৌসাদৃশ্যই যথেষ্ট বিস্ময় জনিতে হইতে পারে, কিন্তু উভয়ে যদি পুত্র বা কন্যা হয়, তাহা হইলে তাহাদের আকারগত পার্থক্যের প্রভেদ করা অনেক সময়েই দুষ্কর হইয়া উঠে।

দুইটি যমজ আকারে এরূপ অভিন্ন ছিল যে, তাহাদের পিতামাতারও গোলযোগ বাধিত। তাহাদের স্বরূপনির্ণয়ে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, এ জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র আকার বা বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করান হইত। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইত, এক জন অপর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এবং অতি সামান্য কালো। কিন্তু এই পার্থক্য সহসা কাহারও নজরে পড়িত না, তাই তাহারা দু' ভাই পরস্পরের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সময়ে সময়ে কৌতুক করিত। অন্য লোক দূরের কথা, ইহাতে তাহাদের আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং পিতামাতা পর্য্যন্ত প্রতারিত হইত।

একবার দেড় মাসের জন্য ইহাদের এক জন ম্যাঞ্চেষ্টারে এবং অন্যটি লিভ্‌সে স্থানান্তরিত হয়। একদিন এক জন স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়া দ্বারদেশে সম্মুখেই তাহার যমজ ভ্রাতাকে দেখিতে পায়! দ্বিতীয় ব্যক্তির তখন সেখানে উপস্থিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং দ্বারভ্রমে হয় ত কোন বৃহৎ আঘাতের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া তাহারা উভয়েই যুগপৎ পশ্চাতে হটিয়া যায়!

এই ভ্রাতৃদ্বয় একবার আর এক কীর্ত্তি করিয়াছিল। তাহারা দু জনেই স্বতন্ত্র আফিসে কেরাণীগিরি করিত। এক দিন কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা পরস্পর অদল বদল করিয়া আফিসে গেল; প্রথমে কেহই তাহাদের এই ছলনা ধরিতে পারে নাই, কিন্তু দু জনের হস্তাক্ষর অভিন্ন না হওয়ায়, বিশেষতঃ এক জনের অভ্যস্ত কর্ম্মে অন্যের পারদর্শিতা না থাকায়, অবশেষে তাহারা ধরা পড়িয়া গেল। এই দুইটি প্রতিবন্ধক না থাকিলে, তাহাদের

আফিসের অধ্যক্ষ, স্ত্রীলোক কর্ম্মচারিণী ও খন্দ এই রহস্যের ভেদ করিতে পারিত না।

আর একটীর দুই বমজ যমজ ভগিনী লইয়া বড় গোল হইয়াছিল। তাহাদের উভয়ের মধ্যে আকৃতিগত এরূপ সাদৃশ্য ছিল যে, তাহাদের গর্ভধারিণী পর্য্যন্ত তাহাদের কাহাকে ভুল করিয়া, বসিয়াছিল। এই ভ্রমও অল্প রহস্যজনক নহে।

আট বৎসরের যখন তাহারা কথা কহিতে পারিত না, সেই সময়ে তাহাদের মা তাহাদিগকে ঘরে শয়ন করাইয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছিল। মা ফিরিয়া আসিয়া দেখে, শয্যা হইতে কে তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র চুরী করিয়া লইয়াছে; দেখিয়া সে চোরের সন্ধানে ছুটিল, এ দিকে মেয়ে দুটি উঠিয়া বসিয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। তখন কাহারও দেহে বস্ত্র ছিল না, উভয়ের মুর্ত্তি অভিন্ন, সুতরাং মা ফিরিয়া আসিয়া দু জনের মধ্যে কোন্‌টি কে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু এতদিনও এ ভ্রম নিবারিত হয় নাই।

কিন্তু এখানেই এই 'ভ্রান্তিবিলাসের' শেষ নহে। মনে করুন, এই যাত্রিকদলের একটি নাম 'এলিস'। এলিসকে তাহার কোন আত্মীয় বড় ভাল বাসিতেন; কয়েক বৎসর হইল অষ্ট্রেলিয়ার প্রবাসে এই আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছে; মৃত্যুকালে তিনি এলিসের জন্য কিছু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, এ সম্পত্তি কাহার হস্তগত হইবে? যদি উভয়েই 'আমি এলিস' বলিয়া আদালতে উপস্থিত হন, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে, তাহা নির্ণয় করিতে হাকিমের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে, এবং কোন ব্যারিষ্টারের কূটতর্কে তাঁহার কিছুমাত্র সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সেকালের কাজীর বিচারেও এ রহস্যের নির্ণয় হওয়া কঠিন। লেখক বলেন, এই ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া একখানি উৎকৃষ্ট হাস্যোদ্দীপক প্রহসনের অবতারণা হইতে পারে।

শিশু।

[স্বর্গীয়া প্রমীলা মিত্র-রচিত।]

আঁধার প্রাণের রাশি সরাইয়া সুকোমল করে,
কে তুই নিঝর-ধারা ঢেলে দিলি হৃদয়-কন্দরে ;
অন্ধকার জীবনের সরাইয়া গাঢ় তমোরাশি,
উষার আলোক প্রাণে কে তুই রে জাগাইলি আসি ?
স্নেহ-করে নড়াইয়া, মেহ-সুধা করাইয়া পান,
কে তুই বিধের প্রাণে খুলে দিলি এ নিরুদ্ধ প্রাণ ?
চাহি নি সংসার পানে, নিরাকরি বিরক্তা তাহায়,
তুই আর কথা মাঝে সংসারেতে বাঁধিলি আমায় ?
কি দিয়ে, কি হাসি দিয়ে হাসালি এ বিশুষ্ক জীবন,
কি বলে বাঁধিলি তুই এ আমার উদাসীন মন ?
ওই ক্ষুদ্র মুখে তোর স্বরগের চারু ছবিখানি,
প্রশস্ত ললাট ওই প্রতিভার ধনি অনুমানি।
নয়নে কি চাহনি চারু, চারু মুখে সোহাগের হাসি,
নবনীত রুচি তনু কে বলিবে কেন ভালবাসি ?
কবে কোন্ শুভক্ষণে দুখময় হতাশ জীবনে,
ফুটিলি নক্ষত্র তুই হৃদয়ের আঁধার গগনে !
শীতের দারুণ নিশি পোহাইল কিসে যেন দিয়ে,
নিবিড় কুয়াসা তোর আলোকেতে হয়ে গেল লীন।
পাখী কলরবে করি পরিপূর্ণ অবনী অম্বর,
প্রভাত-আলোক নিয়ে তুই এলি উজলিতে ঘর।
থাক তবে থাক শিশু এ আঁধার বুক উজলিয়া,
ওই মুখ পানে চেয়ে এ সংসার দেখিব চাহিয়া ;
ওই মুখ পানে চেয়ে বিলাইব স্নেহ ভালবাসা,
হৃদয়ে ফুটিবে পুন নির্ব্বাসিত সুখ সুখ আশা।
ও নিঃস্বার্থ স্নেহনীরে ভাসাইয়া এ হৃদয় মন,
ওই চারু মুখখানি বুকে লয়ে ভুলিব জীবন।

মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য।

শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষবৃত্তান্ত।—বঙ্গ পত্রিকা-সমালোচন।

মহারাষ্ট্রসাহিত্যের সংস্কারক, ভক্তপ্রবর ঐশিবকালীন মহাত্মা যে ভোঁসলে বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ভোঁসলে বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মহারাষ্ট্রীয় কবি-লেখকগণ, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ও ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ যাহা লিখিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোনও মহারাষ্ট্রীয় লেখক তৎসমুদয়ের সমালোচন করিয়া কোনও ঐতিহাসিক মীমাংসা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন নাই। এই কারণে, বর্ত্তমান প্রত্নবিদেরা যথেচ্ছ অনুমানের আশ্রয় লইয়া, উক্ত মহারাষ্ট্রবংশের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে যে কিরূপ ভ্রম সংঘটন করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাহা বলিবার নহে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় দুইটী প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিচারের পক্ষ সমর্থনের সমক্ষে স্থাপিত করেন। ঐ প্রবন্ধ দুটী, ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত কোনও ঐতিহাসিক মাসিকপত্রের ৪র্থ ও ৫ম (মাঘ ও ফাল্গুনের) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপাঠে উদ্বুদ্ধ হইয়া অনেক জন মহারাষ্ট্রীয় লেখক ভোঁসলে বংশের আদি বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথমতঃ উক্ত প্রবন্ধের যুক্তিহীনতা, অসঙ্গতি ও ঐতিহাসিক ভ্রান্তির বিষয় পাক্ষিক পত্রিকায় ও তৎপরে কোনও কোনও মাসিকপত্রিকায় কোনও লেখক ঐ পত্রে সমালোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আমরাও ক্রমে যথাক্রমে ঐ সকল আলোচনার মর্ম্ম প্রকটিত করিতেছি।

ভোঁসলে বংশের আদি পুরুষ কে?' এ সম্বন্ধে 'কাশীবিহার সংগ্রহ' নামক পাক্ষিক পত্রিকা-প্রচারক সম্পাদক 'অনারেবল বালজী মোড়ক' যে কয়টি প্রস্তাব সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে,—ভোঁসলে বংশের আদিপুরুষ শিবরাজ ফিতোড়কর (ফিতোড়ের পুলীন্দিরাণী) উদয়পুরে বাস করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল,—১ম রামরাও, ২য় উদয়সিংহ, ৩য় ভীমসিংহ। আবদর বাদশাহের সেনাপতি (শিবাজী) আবদর খাঁর সঙ্গে রামরাও ও উদয়সিংহ যুদ্ধে নিহত হন। তৃতীয় ভীমসিংহ, তদবধি ভূলা উপাধি ধারণ করেন। এই কারণে তাঁহার ভোঁসলে এই উপাধি লাভ হয়।

ভীমসিংহের (ভোঁসলের) বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের নাম-মালিকা এই,—১ম শিবরাজ, ২য় ভীমসিংহ, ৩য় বিজয়ভানু, ৪র্থ খেলকর্ণ, ৫ম জয়কর্ণ, ৬ষ্ঠ মহাদাজী, ৭ম বাবাজী ভোঁসলে, ৮ম মালোজী ভোঁসলে, ৯ম রাজা শাহাজী, ১০ম ছত্রপতি শিবাজী—বঙ্গবাসীকর্ত্তা।"

এই মালিকা পাঠে অনুমিত হওয়া যায়, ভোঁসলে বংশের আদিপুরুষ উদয়পুরে বাস করিতেন, তাঁহার কন্যা ফিতোড়েশ্বর-মহিষী, "পুত্রে ফিতোড়ে তাহার বসতি ছিল," এই বাক্য সূচিত হইতেছে। বুদ্ধবয়সে তিনি যাহা উদয়সিংহকে দেশ ছাড়িয়া, আত্মরক্ষণে যে সাহায্য করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি রাজার বিশ্বস্ত সচিব বা অনুচরবর্গের অন্যতম ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ইহাঁর জন্মি অন্যত্র আছে, কেবল মৃত্যুস্থানই বংশপরিচয় হইতে জানিতে পারা যায় না।

যাই হউক পুরাবৃত্তের [illegible] "ঐতিহাসিক সত্যের" [illegible] বিষয়ীভূত হইয়া একজন প্রসিদ্ধনামা ফরাসীস লেখক কর্ত্তৃক [illegible] উদ্ধৃত হওয়ায়, ইহার সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং সেই কারণেই বোধ করি, ইংরাজ পাঠক ইহার বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। ইহা ছাপা হইবার দশ বৎসর পরে [illegible] (২য়) ইহার রচয়িতার নাম ও তাঁহার [illegible] বিষয়ের ঐতিহাসিক আকর (Authority) [illegible] (৩য়) [illegible] ফরাসী ভাষায় লিখিত এবং [illegible] আপনার মতের [illegible] তদ্ব্যতীত [illegible] ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও [illegible] (৪র্থ) [illegible] (মহারাষ্ট্র) প্রদেশ হইতে শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষের [illegible] সেই দেশপ্রচলিত [illegible] বিষয়ের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাও সহিত [illegible] বলিয়া বোধ হয়। (৫ম) মহারাজ শিবাজীর পিতামহ মালোজী ভোঁসলে [illegible] খ্রীষ্টাব্দে চিতোড় আক্রমণ ও ধ্বংস করেন, ইহাও হাস্যজনক ঐতিহাসিক সত্য। অকবর আবুলফজল চিতোড়-আক্রমণকালে মালোজীর বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর ছিল। কিন্তু [illegible] মুখোপাধ্যায় লেখক বলেন, মালোজীর [illegible] পূর্ব্ববর্ত্তী শিবরাজ আফিদের সহিত [illegible] করিয়াছিলেন। আকবর কর্ত্তৃক চিতোড়-বিজয়ের [illegible] উল্লেখ [illegible] হয়। [illegible] ইতঃপূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ে, মালোজীর [illegible] তাঁহার [illegible] ইতিহাসে [illegible] এই সমুদয় কারণে উক্ত বংশাবলিকার প্রতি বিশ্বাস করা সাধারণ বুদ্ধিমানের পক্ষে [illegible]

[illegible] স্থানে স্থানে [illegible] সহিত [illegible] বাহির আকার [illegible] করিয়াছে। এ [illegible] [illegible] ভিন্ন [illegible] প্রতিপন্ন [illegible] বলিয়া বোধ হয় না। [illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible] অংশবিশেষ পাঠে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একই বীজবংশের ভিন্ন ভিন্ন শাখে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে [illegible] [illegible] [illegible]

করিয়েন। একদিকে রাজপুত ও পার্শ্ববর্ত্তী যে কুমুদ সংঘাম সুসজ্জিত হইল, তাহাতে অশেষ ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়া পদ্মিনীর সহিত ইহস্বাবাসেই শেষ শোণিত চক্ষুগত হইয়া পবিত্র অনল-প্রভাবে ভস্মীভূত হইয়া গেল, রাজপুতগণের ইহা চিরস্মরণীয় মনোহর উচ্চ প্রাসাদমালায় সজ্জিত চিতোড়নগর "হে চিত্রাঙ্গ" হইল। এই ঘটনা ১৩০৩ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হয়।

অন্তর রাণা অজয়সিংহ কৈলওয়াড়ার দুর্গম দুর্গে অবস্থানপূর্ব্বক চিতোড় হইতে বিতাড়িত করিবার আয়োজন ও কৌশল করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে রাণাদিগের পুরাতন শত্রু জৈনধর্ম গুরুসমূহ কৈলওয়াড়া রাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। রাণা অজয় সিংহ সেই ভ্রাতার পুত্র হাম্মিরের সৈন্যসহ সিংহ-জীবনবিসর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার রাজত্বকাল শেষ হয়। জৈনগ্রন্থ ও পূর্ব্বর্ত্ত বিবরণ ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণে হাম্মিরকে রাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা প্রমাণ করিয়া যান।

রাণা অজয়সিংহের পুত্র সজ্জনসিংহ অজ্ঞার অংশে গাইবার জন্য কতকগুলি গ্রামের সনন্দ পাইতে পারেন, এই আশঙ্কায়, তাম্রের তাঁহার নির্ব্বাসনের ভীষণ প্রচার করেন। সজ্জন-সিংহ হাম্মিরের সহিত একত্রিত থাকিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার অন্যত্র প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করা অপেক্ষা স্বাধীন হইয়া, দিগ্বিজয়ে অভিমুখে প্রস্থান করেন। তিনি কালক্রমে তাঁহার বংশে এক অতি প্রসিদ্ধ স্বাধীন রাজবংশ করেন। তিনি বহু বার জাতির হৃদয়ে বিক্রমাদিত্য করিয়া, দিল্লীশ্বরের জিজিয়া যবনদিগের অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষণ প্রদানের জন্য, সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড তাঁহাদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করেন। টড সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, Sujan Singh was the successor of Shivaji, the founder of Satara thrones whose lineage is given in the chronicles of Mewar.

মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তিলেখকদিগের গ্রন্থে, শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষগণের যে বংশাবলী টড সাহেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি পাদটীকায় এইরূপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন,—১। মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ, ২। অজয়সিংহ, ৩। সজ্জনসিংহ, ৪। দশিপঙ্গী, ৫। সিংজী, ৬। ভোরাজী, ৭। দেবরাজ, ৮। উগ্রসেন, ৯। সাহলনী, ১০। পেদ্মনী, ১১। জনকোজী, ১২। রত্নজী, ১৩। নাগাজী, ১৪। নিবাজী যেদ্মাতি, ১৫। ঘিরোবী, ১৬। বাঙ্গাসাম।

মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তিতে বিবৃত ভোসলে বংশের উৎপত্তির এই বিবরণের সহিত মহামহোপাধ্যায় রামরাও চিটনীস-প্রণীত বখরে বর্ণিত বৃত্তান্তের কোথাও সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। সুতরাং তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথাকৃত বা প্রভুবংশের ভুইসাধন ও গৌরব-কল্পনার প্রেরিত; এরূপ সন্দেহ করিবার কোনও কারণ আমরা দেখিতে পাই না। মহামহোপাধ্যায় চিটনীসের মতে, শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষগণের বংশতালিকা এইরূপ—১। মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ, ২। মহারাণা অজয় (সজ্জন) সিংহ, ৩। দিলীপসিংহ, ৪। সিংজিবী (উড়ের বিবরণী ২। ভোরাজী (টডের ভোরাজী)। ৬। দেবরাজজী ৭। ইন্দ্রসেন (টডের উগ্রসেন)। ৮। উগ্রকেশবী, ৯। জগসিংহজী, ১০। ভূমীন্দ্রজী, ১১। ধাপজী, ১২। বরবাটী, ১৩। খলকর্ণ বা খলাজী, (টডের খেলুজী); ১৪। জয়করণ (টডের জনকোজী কি ?) ১৫। সভাজী, ১৬। বাবাজী বা বিবজী, (১৩৩০ খৃঃ জন্ম) ১৭। মালোজী (ছত্রপতি শিবাজীর পিতামহ) ১৫৫২ খৃঃ জন্ম।

বিষ্ণু গোপাল তেড়ে মহাশয়ের গ্রন্থে লিখিত বংশতালিকায় কতিপয় অন্তর ভ্রম রহিয়াছে,

হইয়াছে। এই গ্রন্থে [illegible] নাম পাওয়া যায়, ১। রঘুরাম। মজলসিংহ, ২। দিলীপ সিংহ, ৩। সিংহজী [illegible] ভাণ্ডারী, ৪। [illegible] দেবরাজজী, ৫। খেলকর্ণ, ৬। মালকর্ণ (টডের মালেজী), ৭। ভাক্তাসিংহ, ৮। [illegible] বাজী, ৯। [illegible] মালেজী।

"ভারতবর্ষ"-পত্রের সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া (৩য়-সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—"আমরা সাতারার ছত্রপতিদিগের দপ্তর হইতে দুইখানি বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে প্রতাপসিংহ মহারাজ (১৮০৮ খ্রীঃ—১৮৩৯ খ্রীঃ) কর্তৃক প্রাচীন কাগজপত্র অবলম্বনে পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাতারার মহারাজগণের মধ্যে ইঁহারই সময়ে ইতিহাস-চর্চার নবপ্রণালি আর কেহ অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার লিখিত বংশপত্রিকার একটি অনুলিপি বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রেরিত ও তাঁহাদিগের কর্তৃক প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় বংশপত্রিকাখানি, ১৮৪৮ খৃঃ সাতারারাজ্য কোম্পানী বাহাদুর কর্তৃক বর্তমানভুক্ত হইলে, সাতারার শেষ নরপতির জ্যেষ্ঠা মহিষী শ্রীমতী মহারাণী বাঈ তাঁহা পূর্বপুরুষের আশ্রয়ে ভাবতেশ্বরীর নিকট যে মেমোরিয়াল বা আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত প্রেরিত ছিল।" এই উভয় বংশপত্রিকার মধ্যে দুই-এক স্থলে নামসম্বন্ধে সামান্য ভিন্নতা (তাহাও ইংরাজী বর্ণমালার বিন্যাস-ভেদের ফলিয়া বোধ হয়) ভিন্ন আর কোনও পার্থক্য নাই।" এই দুইটির সম্পাদক মহাশয় মহারাজ প্রতাপসিংহের প্রদত্ত বংশাবলী মনোযোগ করিয়াছেন। এই বংশাবলীর সহিত চিটনীসের ধৃত বংশতালিকার বহুল ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই কারণে আমরা এ স্থলে উক্ত উভয় তালিকার কেবল অনৈক্য-স্থলগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

মহারাজ প্রতাপসিংহের বংশতালিকায় মহারাণা রত্নসিংহের অব্যবহিত পূর্ব পুরুষ সিংহজীকে "বিরাজী", ১৩শ পুরুষ হরপালদেবকে "হরহটজী," ১২শ পুরুষ খেলকর্ণ বা খেলাজীকে "খেলোকি" ও ১৩শ পুরুষ মালকর্ণকে "কর্ণসিংহ" বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম নামটি মহারাজের বংশতালিকায় যেরূপে লিখিত আছে, তাহা বিসংবাদে বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ, উহার সহিত টডের তালিকোক্ত "সিরজী" এই নামের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তাহাড়া, মল্লারি ও চিটনীসের ধৃত দুই "মোড়ী" নামক যে বর্ণমালায় লিখিত, তাহাতে "র" ও "হ" এই দুই বর্ণের মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে, ইহার মুদ্রাঙ্কণকালে "সিরজী" বানান 'সিহজী' বা "সিহর্জী" পঠিত ও মুদ্রিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই বক্তব্য-ও হকারের অতিরিক্ত সাদৃশ্যবশতঃ, 'হরহটজী' স্থানে 'হরহটজী', অথবা 'হরহটজী' স্থানে 'হরহটজী' হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। চিটনীসের 'খেলাজী' অপেক্ষা উক্ত ও প্রভাপসিংহের "খেলোকি" নাম সমধিক বিশুদ্ধ বোধ হয়। ইতঃপূর্বে বি, কু, আচার্য রাজগাওকর নামধারেয়কর্তা যে লেখকের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি সোলাপুরের নিবাসিকল বংশের কোনও পুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক বংশপত্রিকায় "ভাবকর্ণবংশ" নামসংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেও খলাজীর পরিবর্তে "খেলোজী" নামই দৃষ্ট হয়। খেলোজীর অপর নাম যে খেলকর্ণ না হইয়া 'খেলকর' ছিল, তাহা ছিতড় প্রভৃতি ও ৺ মোড়েক মহোদয়ের সংগৃহীত বংশপত্রিকা-দর্শনে প্রতিপন্ন হয়। চিটনীসের ধৃত মালকর্ণকে প্রতাপ সিংহের বংশতালিকায় 'কর্ণসিংহ' বলা হইয়াছে কিন্তু মোড়েক ও ছিতড়, ইঁহাদিগের উভয়ের গ্রন্থেই যখন তৎপরিবর্তে "মালকর্ণ" নামই দৃষ্ট হয়, তখন চিটনীসের তালিকায় উল্লিখিত নামই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয়।

এক্ষণে বংশতালিকার সমালোচনা পরিত্যাগপূর্বক বর্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত ঐতিহাসিক বিবরণেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা যাউক। রাণা রত্নসিংহ হইতে কর্ণসিংহ

...ষষ্ঠ শিবাজীর পুত্র ও চতুর্থ পুরুষ দেবরাজীর মহারাষ্ট্রাভিমুখে গমনের ... বর্ষের পার্থক্য কেন হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব নহে। ঐতিহাসিক জানিতে পারি, ... ১৫১০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সম্ভবতঃ পিতৃরাজ্যাধিকারের ... মানব জন্ম করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন। এই যুদ্ধের পর ... তাঁহার সফলতা লাভ হইয়াছিল। বোধ হয়, আহম্মদ শাহের এই অভিযানের সময়, ... ও মুজফ্ফরের মধ্যস্থানে, ঊনাভি লোহগাঙা প্রদেশ যবনসেনা কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া থাকিবে, এবং সেই উপদ্রবের সময়েই দেবরাজজী দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়া থাকিবেন; তাহার ভ্রাতা এই বনেই গোপনে গমন করেন।

বর্ষকার চিটনীস বলেন, "সেই স্থানীয় পুরাতন ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্র বিদ্যা ... উপদেশ প্রাপ্ত হন।" কিন্তু উভের গ্রন্থে এই প্রসিদ্ধ পুরুষের নাম দৃষ্ট হয় না। তাঁহার মতে দেবরাজজীর পিতার নাম ভোবাজী। দেবনাগরী "ব" ও "স" এই দুই বর্ণের আকৃতিগত সাদৃশ্য বিবেচনা করিলে মনে হয়, উভ মহোদয় হয় ত, মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তিতে লিখিত "ভোসসী" (যদাবংশীয় উচ্চশ্রেণির ভোসালী) স্থানে "ভোবাজী" পাঠ করিয়া থাকিবেন। যে যাহা হউক, দেবরাজের পিতার নাম যে ভোসাজী ছিল, ইহাই আমাদিগের নিকট সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভোসলে শব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি ও বিষ্ণুগোপাল ভিড়ে ও মহারাজ প্রতাপ সিংহ মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত বংশতালিকার দৃষ্টিপাত করিলেও, ভোসাজি নামই বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

মহারাষ্ট্রীয় তালিকার সহিত রাজপুত (টডের) তালিকার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, দেবরাজজীর পরবর্তী পুরুষগণের নামের সম্বন্ধে উভয় বংশতালিকার মধ্যে প্রায় ঐকমত্য নাই। এই অনৈক্যস্থলে কোন্ তালিকার নামাবলী ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য করা উচিত, "আচার্য্য কালসাঙ্কর" বলেন, "দেবরাজজীর পরবর্তী নাম সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় পথপ্রদর্শকের উক্তিই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, দেবরাজ ও তাঁহার বংশধরগণ উত্তর-ভারতের সেই সীমা পরিত্যাগ পূর্বক মহারাষ্ট্রের সুদূর অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিলে, মেওয়াড়ের ভাট-গণের পক্ষে তাঁহাদিগের বংশ-বিবরণ জানা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। পক্ষান্তরে, মহারাষ্ট্রে আসিয়া যাঁহারা নানা স্থানে পাটিলের সনদাদি ক্রয় করিয়া বসতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশানুক্রম বিবরণ কিয়ৎপরিমাণে সংগ্রহ করা মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব বা অসাধ্য নহে।" ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের সময় নানা স্থানের আচারগণের মুখে তত্ত্ব পূর্ব্বকাহিনী ও পুরাতন বংশপত্রিকাদি সংগৃহীত ও তদবলম্বনে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম-তালিকা প্রস্তুত হইয়া তাঁহাদের বাঙ্ময়-দপ্তরে সঞ্চিত হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। ফলতঃ, টডের বংশ-তালিকার প্রথম পাঁচটি নাম যেরূপ বিশুদ্ধ ও ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তৎপরবর্ত্তী পুরুষের নামগুলি সেরূপ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। আচার্য্য কালসাঙ্করের এই উক্তি আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য বোধ হয়। কিন্তু এই প্রবন্ধে তাঁহার প্রবন্ধের তুলনায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তিনি অনুমান করেন, ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের সময়ই মেওয়াড়ের ... প্রশস্তিতে ভোসলে বংশের উৎপত্তিকাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। সেই মহোৎসব-কালে মালপুরানা হইতে অনেক ভাট রায়গড়ে আসিয়া পূর্ব্বক উদয়পুরের রাজবংশের ও ভবৎবংশীয় শিবাজী মহারাজের গুণগ্রাম ও যশোরাশি কীর্ত্তন করিয়া, কিছু পুরস্কার লাভ করিয়া থাকিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। এইরূপ ভাটদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আচার্য্য

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রদেশে যাবতীয় চরিত্রাদি-নির্ণয়ের অনুসন্ধান হিতে ছে। [illegible] উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধে (যুক্তিযুক্ত চিত্তনীয় সিদ্ধান্ত ইতস্ততঃ)। ঐতিহাসিক ও পুরাবৃত্তজ্ঞ অধিকারীর কল্পনাও অনেক স্থানে [illegible]।

কাশীর ৺কর আচার্য্যের ঐ অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত অনেকের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হইলেও, আমরা উহাকে একটী ঘটনা-বিপর্য্য বলিয়া মনে করি। তাঁহারা যদি শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের সময়েই ছত্রপতি-উপাধি ও [illegible] পূর্ব্বকালে পুরন্দরের লোডস্তম্ভ-লিপিতে ভোসলেবংশের উৎপত্তি-কাহিনী-সংবলিত বংশাবলী মুদ্রিত হইয়া দেওয়াগড়ের রাজপ্রশস্তিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে উহা, সমুদ্রে মজ্জমান নাবিকসমূহের সম্পূর্ণ বাহুবলে ক্রমশঃ তীরাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার ন্যায়, দেবরাষ্ট্রের পরবর্ত্তী পুরাবৃত্তের সাধারণ সহিত [illegible] রাজধানীর রাজদরবারের প্রাচীন রাজপত্রাবলম্বনে রচিত বংশাবলীর এক বৈষম্য থাকিলে না। আমরা এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি। শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষদিগের বংশাবলী কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ ভাট্যগণ নিশ্চই হইতে "বকিস" আদায় করিয়াছিল বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। বিশ্বাসরাও, তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী পুরুষ-রাজার পিতা শুভসিতামহের নাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, ইহা আমরা সম্ভবপর মনে করিতে পারি না। শিবাজীর পিতামহের নাম মালোজী ছিল, এ কথা ঐতিহাসিক বলিবার উপায় নাই। তাঁহারা বেরুলের গৌরীমন্দিরের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার বিনিময় শিবাজীর পক্ষপাতী ইংরাজ লেখকগণের "ভক্তামাত্র" বলিয়াও বিশ্বাস করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। এতদ্ভিন্ন এই দুই-জন ইতিহাসে ঐতিহাসিক বীরপুরুষের নাম সম্বন্ধে মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তি-লেখিগণ যে গোলযোগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা বলিয়াছেন, ছত্রপতি শিবাজীর পিতার নাম সজ্জনী ও তাঁহার পিতামহের নাম সজ্জনী (ইতিহাসে রাজা ভোঁসলে)। শিবাজীর পিতা ও পিতামহের নাম সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান একটুকু ঘনিষ্ঠ সংবর্দ্ধনা করিয়া শিবাজীর নিকট হইতে অত "বকসিস" আদায় করিয়াছিল, তাহারা মহারাষ্ট্রীয় দেবরাজগুরু ও শিবাজী ছত্রপতি প্রভৃতির সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিল, এবং যাহার ফলে তাহারা তাঁহাদিগকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। তাহারা যে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক কালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার নিজেরই বংশপত্রিকা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর বোধ হয় না।

এ সম্বন্ধে আর একটু কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক কালে তাঁহার বিরুদ্ধ অভিযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, বারাণসীবিলাসী পণ্ডিত-শিরোমণি গঙ্গাভট্ট এইরূপ মীমাংসা করেন যে, যে-সমস্ত রাজপুত-পরিবার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা "সংকরী" (এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, দাক্ষিণাত্যে "সংকর" শব্দের অর্থ মহারাষ্ট্রবাসিমাত্রকে না বুঝাইয়া ঐ মহারাষ্ট্র-দেশের কেবল মল্লিয়ানাদিকে বুঝাইয়া থাকে) বলিয়াই কথিত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহারা [illegible] দেশের রাজানুমোদিত ছত্রচামরাদি-রাজচিহ্ন-ধারণ ও রাজসিংহাসনাদি লাভের সম্পূর্ণ অধিকারী আছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেকালের অন্যান্য পণ্ডিতগণ যে কোনরূপ প্রতিবাদ বা আপত্তি উত্থাপিত করেন নাই, ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ, জাতি সম্বন্ধে [illegible] তিলমাত্র বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রদান করিবার ক্ষমতা কাহারও অবিদিত নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত রাজপুত-রাজবংশ যে সে সময়ে মহারাষ্ট্রদেশের অধীন ছিলেন, তাহাও নহে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা, বিশেষতঃ মেওয়াড়ের "হিন্দুসূর্য্যের" [illegible] নিয়ম প্রতিপাদ

বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের অনুসন্ধানে এই কোমল কল্পনা অগ্রাহ্য করা ব্যতীত কবিবার উপায়ন্তর কেহ দেখিতে পাইবেন বলিয়া বুঝিতে পারি না। উক্ত মহোদয়গণ যে সকল প্রমাণের উপর অবলম্বন করিয়া শিবাজীর জীবনী রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থই অযথার্থ। মেঁওরাটীপতি রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার পুত্রের আমলের ও তদ্বারা রচনাদি চিতোড়ের রাণা-বংশের সহিত ভোঁসলেগণের সম্বন্ধবিষয়িণী আখ্যায়িকা নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিলে, তদ্বারা রচিত প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে কখনই স্থান প্রাপ্ত হইত না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

ভীমপতি শিবাজী যে ভোঁসলে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যে রাজপুতানার মেবারের ক্ষত্রিয়বংশ হইতে উৎপন্ন, উহা যে চিতোড়ের রাজবংশের বিশুদ্ধ উপবংশ তাহা সে বিষয়ে দেওয়াড়ের ও মহারাষ্ট্রের রাজকুলাচার্যদিগের মধ্যে মতভেদ নাই। এই কারণে ঐ কয়েকটুকু আমরা অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ঐতিহাসিক অস্থি, রাজস্থানস্থিত শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবংশ বর্ত্তমান থাকায় তদ্বারা ভোঁসলেগণের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ইঁহার লিখিত বিবরণীর সহিত মারাঠার মহারাজ ও চিটনীসের বক্ষরিত বংশের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ভিন্নগ্রামী প্রভৃতি কয়েক জন লেখকও ছত্রপতি শিবাজীকে, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপর বিদ্বেষ বশতঃই খাটকান করিয়াছেন। তথাপি অনেক ইংরাজ ইতিহাসলেখক এ বিষয়ে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গ্রিফিন্, ডফ্, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্, বর্ণেল্ টড্, স্কট্ জোনাথন্, কার্ব্ব প্রভৃতি লেখকগণ ভোঁসলে বংশের আদিপুরুষকে উদয়পুরের রাণাবংশের রাণাপুত্র বা যুবরাজপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ইণ্ডিয়ান্ এক্সটেণ্ট্ অফ্ মহারাষ্ট্রিয়ান্ পাওয়ার" গ্রন্থে ভ্রমাত্মক ভাবে এই ভ্রান্তমতের পোষণ করিয়াছি। চলতি ভাষায় ও ভ্রমে পতিত হইয়া সংক্ষেপে কেবল দুই একটি কথা বলিব।

ভোঁসলে বংশজ গ্রন্থকারগণ যাহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ইংরাজ লেখকের উক্তিই বিশ্বাসযোগ্য। তাহার, ইঁহাদের গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অন্যান্য লেখকগণ অপেক্ষা উচ্চ। কুলীন বাঈ অপেক্ষাও কবি জোনাথনের গ্রন্থোক্তি বিশ্বাস্য, কিন্তু তাঁহার বংশাবলিক্রমের ইংরেজীকরণ বানান, বর্ণবিকৃতি আলোচ্য। ফুলেন্ড নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। তত্রত্য ভূপতি মহাশয় নাম শিবাজীর মাতৃকুলের অন্যতম গোত্রপতি (নর্দার) ছিলেন। তিনি সম্প্রতি থাকিয়াতে অতি যাচনা প্রযুক্ত তথায় উপস্থিত নাই। সেই বুদ্ধিমান নরপতির অধীন জনৈক লেখক (মুন্সী) পারস্য ভাষায় উক্ত অভিযানের একটি "ইকীকত" বা বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ নাসের জঙ্গের পৌত্রের নিকট হইতে এই জোনাথন সাহেব সেই গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। এবং উহার ইংরাজী অনুবাদ Aurungzebe Operations in the Deccan নামে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে শিবাজীর বংশবিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—শিবাজীর পিতামহ মালু ভোঁসলা উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের (!) এক অতি আত্মীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খানদেশের সুবেদার খাঁ আজিমোস্সানের অধিনায়ক ছিলেন। আজিমোস্সান তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বিজয়সিংহ যে তিনি ও তাঁহার পিতা পুণার নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামের পাটীলকী ভোগ করেন। তাঁহার চারিটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে মালোজী ও সাহজী ভোঁসলে, এবং তুকোজী ও ত্র্যম্বকজী চাকরী

[illegible] বীকার করিয়া [illegible] পূর্ব্বপুরুষদিগের [illegible] সম্পন্ন করিতে হয়। বাস্তবিকপক্ষে এই ঘটনা ঘটে। [illegible] পিণ্ডদানের [illegible] পাইবে বলিয়া [illegible] গমন করিয়া তীর্থস্থলে পৌরোহিত্য ও কালক্রমে [illegible] সম্পাদন করেন।

এই বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, চিতোড়ের রাজবংশের সঙ্গে শৌর্য্য-পরিবারদ্বয় দুই বিভিন্ন সময়ে [illegible] পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া মহারাষ্ট্রদেশে [illegible] করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ভ্রাতৃপ্রেমিক বিবরণ মেওয়াড়ের রাজকুলাঙ্গার গ্রন্থে বৃথা [illegible] হইতে মহারাণাদিগের যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল, তাহাদিগের সহিত আপনাদিগের অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পরবর্ত্তী কবিগণ ভোঁসলে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। প্রাচীন ভোঁসলগণ খৃঃ ১৪ শতাব্দীর প্রারম্ভে চিতোড় ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। সুতরাং খৃঃ ১৮ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুললাচারের ও [illegible] তাহাদিগের আদিবৃত্তান্ত জনসমাজে বিশেষরূপে [illegible] বংশধরগণ মহারাষ্ট্রদেশে বিশেষ পরিজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনাও [illegible] বিষয় আলোচনা করিতে পারি। পক্ষান্তরে, ছত্রপতি শিবাজীর কার্য্যকলাপে [illegible] মানব প্রতি যে সময়ে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল ও যখনকার [illegible] মহারাষ্ট্রে আসিয়া ভোঁসলে নামে পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের [illegible] সাহিত্যেই সাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ মুসলমান মারাঠাবিদ্বেষী মোগলগণের মধ্যে বিশেষরূপে [illegible] হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন আদি খাঁ ও বুদেলা আক্রমণের [illegible] লেখকের পক্ষে প্রাচীন ও আধুনিক বা ঔরঙ্গজেব কৃত্রিম ভোঁসলে-সম্বন্ধের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল, তাহা জানিবার সম্ভাবনাও কম ছিল। এই সকল কারণে তাঁহারা প্রাচীন ভোঁসলেগণের উৎপত্তির বিবরণ অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত না হইয়া এবং ঐরূপ ভোঁসলেত্বে [illegible] জানে করিয়া, নবাগত ভোঁসলেগণের [illegible] আত্মীয়তা সহিত ছত্রপতি শিবাজী ভোঁসলের আদিপুরুষের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন, ইহাই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব সাতারকর ও কাঁথুপুরকর ভোঁসলেদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বাখরপুরকার বিভিন্নরূপ [illegible] বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব, অথবা বৈদেশিক বুদ্ধিহীন কায়স্থ ও কার্ত্তিকীয় ব্রাহ্মণকুল বর্ণনায় নির্ভর করিয়া নাগপুরকর (ভোঁসলে) ভোঁসলেগণের সহিত ছত্রপতি শিবাজীর ও পিতৃপুরুষগণের [illegible] কল্পনা করা ঐতিহাসিক-বুদ্ধিসঙ্গত, তাহা [illegible] বিবেচনা করিবেন।

উপসংহারকালে একটি বিষয়ের প্রতি আমাদিগের মহারাষ্ট্রীয় ভ্রাতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মহারাষ্ট্রের সাতারা রাজবংশের যাবতীয় মেওয়াড়ের বাপ্পা রাওলের প্রতিষ্ঠিত বংশতরু একটি প্রাচীন ও বিশুদ্ধ-উৎস হইতে সমুদ্ভূত, এ কথা বলেন, স্বীকার্য্য; কিন্তু চিতোড়ের "হিন্দু সূর্য্যগণ" প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশ হইতে নবপ্রসূত, এ কথাও সেইরূপ প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয়ের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যেমন সূর্য্যকিরণের প্রচণ্ড তাপের [illegible] কিছুদিনের জন্য ভাদ্রমাসে মেঘমণ্ডলে বাস করিতে বাধ্য হইয়া সাময়িক শীতল ভাব [illegible] পুনরায় সমুদয়ই নিপতিত হয়, সেইরূপ খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে শালিবাহন বংশের শাসনকালে মহারাষ্ট্রে যে [illegible] হইয়াছিল, তাহার [illegible] মহারাষ্ট্রের বিশেষত্ব-উপাধি-ধারী প্রাচীন রাজবংশ [illegible] হইয়া রাজপুতানা ও চিতোড়ের [illegible] প্রদেশের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা পূর্ব্বক [illegible]

প্রথম, মাতামহ কর্তৃক; এবং দ্বিতীয়তঃ শ্বশুরগৃহে পতিব্রতার প্রতীক্ষায় রাজপুত জাতির একান্তিকভাজনত্ব বিশ্লেষণ করিয়া, কালক্রমে বংশানুক্রমবদ্ধমূল হইবে, মনে পুনরায় দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্রে সমাগত হইল।" ফলতঃ দ্বিতীয় স্তম্ভ জাতিতে যে ব্রহ্মচর্য্য আত্মরক্ষার গ্রন্থ অনেকানেক রাজপুতকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিষ্ঠাতে সেই রাজবংশ আত্মরক্ষণমানসে পুনর্ব্বার প্রাচীন মাতৃভূমির ক্রোড়ে পুনরাবৃত হইয়া নবাসমরে জননীর দুঃখাশ্রু মার্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশবাসবর্গের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

এই মনোরম-প্রসঙ্গের মূলভিত্তি বর্ণনা মহাকবি চাঁদবরদাই চিটনীসের গ্রন্থে পাঠক দেখিতে পাইবেন। এই আখ্যায়িকার সহিত মহারাষ্ট্র ইতিহাসের যদিও সম্বন্ধ আছে বলিয়া, টড্ সাহেব স্বীয় ইতিহাসে উহার সবিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ আখ্যায়িকা নিতান্ত অমূলক বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে; কিন্তু "নজুলা প্রবৃত্তিঃ" এই বাক্যানুসারে ঐ আখ্যায়িকার মূলে কোনও মহার্হ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ, উত্তরভারতের রাজপুতাদের মধ্যে এইরূপ এক একটি প্রবৃত্তি প্রচলিত আছে, দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র জাতিদের হইতে রাজপুতানার অনেক প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। কর্ণেল টেডসাহেব রাজস্থানে প্রবন্ধে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন যে, চিতোরের মহারাণা ব্রহ্মের আদিপুরুষ পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রদেশে গোদাবরী তীরে 'তিলকিতাপট্টন' (ভূগোলের মতে মহারাষ্ট্রের প্রাচীন রাজধানী দেবগিরি বা দৌলতাবাদেরই প্রাচীন নাম 'তিলকিতাপট্টন') নামক নগরের অধিপতি ছিলেন; পরে ১১৯ খ্রিষ্টাব্দে (১১৫ খ্রীঃ অঃ) রাষ্ট্রবিপ্লবকালে কিছু কালমধ্যে গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, শালিবাহনবংশীয় সমরপতি শোভনদেব রাজকবি ও ঐতিহাসিক (১৩০ খ্রীঃ—১৫০ খ্রীঃ অঃ) মহারাষ্ট্র দেশের কবিবংশের বর্ণে-বর্ণে করিবার জন্য গ্রন্থ মহাসমারোহে লিখিত হইয়াছিলেন, সেই সময়কালে] স্বদেশত্যাগী পার্থিক প্রথমতঃ বিন্ধ্যপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া মেওয়াড় আশ্রয় গ্রহণ করেন।"

রাজস্থানের ক্ষত্রিয়কুলের রাজপুতনামের উৎপত্তিবিবরণ টড্ সাহেবের মতে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ ক্ষত্রিয় কুলের অন্তর্গত অনেক রাজপুত পরিবার স্বদেশ মহারাষ্ট্রের দক্ষিণভারতনিবাসী, এম, বি, কতিপয় পরিবার নীলাম্বরী নীরভারিত "মুক্তাউপঠন" (মহারাষ্ট্রপতি শালিবাহনের রাজধানী প্রতিষ্ঠান) নগরের ক্ষত্রিয় বালী ছিলেন। বাইকুট (রাঠোড়) সৈন্য (উড়-প্রোক্ত নোমি) কছবহু, মুসলবাড়, সিলার প্রভৃতি উপাধিধারী, প্রাচীন প্রস্তরলিপিতে বর্ণিত মরাঠা ক্ষত্রিয়কুলসমূহ আমাদের দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং তাঁহাদিগেরই দ্বারা 'সাত' 'বারা' বাই ও কুল' প্রভৃতি শব্দ রাজপুতনার গীত ও রাজপুতগণের মধ্যে প্রচলিত হয়, এরূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। ইউরোপ রাজস্থান ও ডাঃ ভাণ্ডারকরের প্রণীত Early History of Deccan Down to the Mohemedan Conquest গ্রন্থ হইতে সূক্ষ্ম তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিলে, মারাঠা বংশ হইতে রাজপুতানার প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় কুলসকলের উৎপত্তিবিষয়ক প্রবন্ধোক্ত আখ্যায়িকার সত্যতা, যথাপরিমাণে সুনিশ্চিত হইবে।

টেসিতোরিক্ত বলেন, "নজুলা প্রবৃত্তিঃ"। এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনেক ক্ষত্রপুরাণী রাজপুতগণকে বর্ণিত বংশিয় বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের বিবেচনায়, তাদৃশ [যদি টেসিতোরিই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়] কেবল আর্য্যাবর্ত

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

সাহিত্যের।

দেবী কবেরজি।

তাঁহার মতে ইহা সমালোচনার উপযুক্ত নহে। কেননা সেখানে তাঁহার নিজের বিশেষ কোনো ভাবোদ্রেক হয় না। রিমেম্বরেন্স রহস্যে বিখ্যাত লেখকের লিখিত যাহা কিছু পড়িয়াছেন তাহার মধ্যে এই গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রগুলি পড়িতে সুন্দর, চিত্তাকর্ষক পাঠ করা তাহার পক্ষে অধিক রীতিপ্রদ। এই প্রসঙ্গে লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি অভিনয়কে শিল্প বলিয়া মানে করেন কি না? তাহার উত্তরে তিনি বলেন, যদিও অভিনয়কে শিল্প বলা যায়, তাহা হইলেও ইহা বক্তৃতাবিদ্যার অতি অধস্তনস্তরে অবস্থিত। ইহা নিম্নশ্রেণীর সৃষ্টিকার্য; বানরেও মানুষের ভঙ্গি সুন্দর অনুকরণ করিতে পারে। সুতরাং এই অর্থকরণে অভিনেতা আপনাকে বানরের সমশ্রেণীর করে। তিনি বাস্তব জগৎ ভালোবাসেন, কিন্তু অনেকের যা হয়ে থাকে তাঁহার নিকট বড় বিরক্তিকর।

তাঁহার প্রিয় গ্রন্থকার সম্বন্ধে মিস করেলি বলেন, তাঁহার কোন বিশেষ প্রিয় গ্রন্থকার নাই; তবে স্কট ও ডিকেন্স্ তিনি বিশেষ পছন্দ করেন। আধুনিক সমালোচকের ভয় তিনি মনস্তাত্ত্বিক লেখকদিগের দোষ বাহির করিতে ভালবাসেন না। তিনি তাঁহাদের গুণ লইয়াই সন্তুষ্ট। রডিয়ার্ড কিপলিংএর ছোট গল্প তাঁহার ভাল লাগে বটে, কিন্তু তিনি কিপলিংকে—অন্ততঃ এ পর্যন্ত—কবি বলিতে রাজী নহেন। তিনি বলেন, কিপলিং নিজে বলেন যে, তাঁহার কবিতা কেবল ছন্দোবদ্ধ রচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মিস্ করেলি ও সমালোচক।

যিনি করেলির পুস্তকের সমালোচকদিগের সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি প্রথমে তাঁহাদের আক্রমণ করেন নাই। তাঁহারাই প্রথমে চিল ছুড়িয়াছিলেন। কাজেই তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। যখন উঁহার Romance of two Worlds পুস্তক সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিল, তখন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক নাকাবোনে পড়িবার আত্মরিতার তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল ও আশা ছিল—তাঁহারা নবাগতাকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিবেন। কিন্তু হায়, তাঁহার সে বিশ্বাস শীঘ্র নষ্ট হইয়া গেল। সমালোচকেরা তাঁহার পুস্তক পাঠ না করিয়াই, তাহার অতি তীব্র ও বিদ্রূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইল। এইখানে পাঠক, একটু রহস্য দেখুন। ইংলণ্ডে লেখককে সমালোচকদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, আর এ দেশে সমালোচককেই লেখকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়। অবশ্য সাধারণে মনে করে, স্থির ও সহিষ্ণুভাবে অপরের আক্রমণ সহ্য করাই ভদ্রলোকের কর্তব্য। কিন্তু তাঁহার তাহা সহ্য হয় না, তিনি যে মহাবলশালিনী নারী। তিনি তাঁহার আপনার জন্য নহউক, অন্ততঃ নারীজাতির জন্য বাধ্য হইয়া পুস্তকসমালোচককে আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের অনেকে এত নীচমনা ও হীনচরিত্র যে, অনেক সময়ে তাঁহাদের ব্যক্তিগত আক্রমণের যোগ্য নহে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এ কাজ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে একটী মহাস্তুফল ও ফলিয়াছে—জনসাধারণে নীচবুদ্ধিপ্রণোদিত সমালোচকের কার্যপ্রণালী প্রকাশ হইয়াছে। যখন যখন তিনি Sorrows of Satan প্রভৃতি পুস্তকাদির নিন্দাবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন,—সেই বিখ্যাত লেখক—"এই পুস্তকটী সমালোচিত হইবার জন্য কোন সমালোচকের নিকট প্রেরিত হইবে না। যদি কেহ সমালোচনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধারণের ন্যায় ক্রয় করিতে হইবে; অথবা কোন পুস্তকালয় হইতে লইতে হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, তাঁহার আর কোন পুস্তক কখনও সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইবে না। পূর্ব সমালোচনার দেখা গিয়াছে, সমালোচকেরা তাঁহার পুস্তক না পড়িয়া সমালোচনা করেন।

করিবার পুস্তক পাঠাইয়া তাঁহাদিগের সমালোচনা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। প্রকাশক ইহাতে তাঁহার প্রকাশকের অনেক খরচ বাঁচিয়া যাইবে। তিনি বলেন, Barabbas ও Sorrows of Satan, এই দুই গ্রন্থের সমালোচনা অধিক বিক্রীত হইয়াছে। উভয়ের প্রথম সংস্করণ উপর্যুপরি বিক্রয় হইয়াছে, আজও হইতেছে; ইহাদের মধ্যে Barabbas সমালোচিত হইয়াছিল, কিন্তু Sorrows of Satan সমালোচনার পূর্বে প্রেরিত হয় নাই।

আধুনিক লেখকদের সহিত পরিচয়ের কথায় তিনি বলেন—সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার বড় কাহারও সহিত পরিচয় নাই, তবে কথাপ্রসঙ্গে Sir Walter Besant ও অন্যান্য অনেকের সহিত চিঠি লেখালেখি হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত ও উপরিচিত লোকদের মধ্যে কেবল মৃত বাল্জাকই তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ও মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে আমার প্রশংসা করিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

মিস মার্টিন ও আধুনিক লেখকগণ।

আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে মিঃ হিউবার্ট স্পেন্সিনের লেখা আমার বড় ভাল লাগে। তিনি এখন সাধারণের সুপরিচিত নহেন। Sorrows of Satan গ্রন্থের অন্যতম নায়িকা Mavis Clare চরিত্রে আমি আপনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি—এই সমালোচনের মূল Review of Reviews সম্পাদক মিঃ ষ্টেড। মিঃ ষ্টেড পরে আপনার এই ভ্রমের সংশোধন করিয়াছেন। মিঃ ষ্টেড My Contemporaries in Fiction নামক পুস্তকে উক্ত ভ্রমপূর্ণ অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্বে তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। আমি তাঁহার কোন রচনা পড়ি নাই; তিনি যেমন আমার পুস্তক পাঠ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে লিখিয়াছেন, তেমনি ক্লেয়ারের মুখে আমি শিখে, তাঁহার কোন পুস্তক পড়িয়া আমি তাঁহার সম্বন্ধে উক্তরূপ মত প্রকাশ করিতে পারি না; অতি অন্তরঙ্গ পরিচিত বাতীত অন্য কাহারও সম্বন্ধে এরূপ মত প্রকাশ করা নিতান্ত অন্যায়।

মিস করেলি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ হইতে অনেক পত্র পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা দেখিয়া বেশক বিস্মিত হইয়াছিলেন। মিস বলেন,—ইহাদের উত্তর প্রত্যুহ লেখা আমার একটা কাজ হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের জিজ্ঞাসার তিনি বলেন, পত্রগুলি অনেক প্রকারের। ইহাদের কতকগুলি প্রেমপত্র। সেগুলি পড়িবামাত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। অনেকে আপনার জীবনকাহিনী পত্রে বিবৃত করিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। অবশ্য, এই সকল পত্রের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। অনেকে আবার আমার পুস্তকের অনুবাদ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখে। আর এক সম্প্রদায়ের পত্র লেখক আছে, তাহারা বড় বিরক্তিকর। তাহারা আমার স্বাক্ষরের জন্য বড় ব্যগ্র। ইহাদের কিছুতেই ঠাঁইবার যো নাই। আমি অনেক স্বাক্ষরহীন পত্র পাইয়া থাকি। সেগুলি প্রায়ই গালাগালি-পূর্ণ। এই সকল পত্রলেখকদের বিশ্বাস, আমি সবেগে নরকের পথে অগ্রসর হইতেছি। কতকগুলি পত্র আবার বেশ আমোদ প্রদান করে। সে বৎসর গ্রীষ্মকালে যখন আমি স্কটলণ্ডে বাস করিতেছিলাম, তখন কেহ কেহ তাহাকে মৎস্যাদি পাঠাইতে আদেশ করিত। অতি অল্প দিন হইল, কেপকলনি হইতে আমি একখানি পত্র পাইয়াছি, লেখানি এইরূপ,—"প্রিয় মিস্ করেলি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার একখানি পুরাতন বেহালা আমাকে পাঠাইবেন। আমার একখানায়—বিশেষ আবশ্যক আছে, কিন্তু আমার যাতার কিনিয়া দিবার সঙ্গতি নাই; আমি একখানি পুস্তকে আপনার ছবি দেখিয়াছিলাম, তাহাতে একখানি বেহালা ও একটি ছড়ি ছিল। তার পর হইতে আমি মনে করিয়াছি, আপনার নিকট একখানি বেহালা চাহিলে আপনি

মিস করেলি ও তাঁহার পত্রলেখকগণ।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

নবজীবন। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কথা আছে। "সংসার ও সমাজে" শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রবন্ধ। লোকের মতের বিরুদ্ধে কিছু লিখিলে পড়িতে ভাল লাগে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় "ধর্ম্মের পুনর্গঠন" প্রবন্ধটি লিখিয়া সুখের বিষয় করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে কৃষ্ণচরিত্রের যে সমালোচনা আছে, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গদর্শন এ সমালোচনা পড়িয়া সুখী হইবেন। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায় মহাশয় "বিদ্যাপতি ও জয়দেব" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা স্বদেশহিতৈষী নূতন বঙ্গভাষার [illegible] শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের "অমরনাথ যাত্রা" হইতে নিম্নে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

কৌমার্য্য

সেই বাড়িতে কখনও সেই বাড়ীর প্রতিবিধান বা প্রতিবাদ করিতে সাহস করে না।

মেজর সাহেব বলেন যে, ফ্রিজিয়ান জাতির মধ্যে কখনও অবিবাহিত অবস্থায় জীবন যাপন করে না। মাসতিজো জাতির মধ্যে একেইলিথ সাহেব একটিও যুবতী স্ত্রীলোক দেখিতে পান নাই, যাহার বিবাহ হয় নাই। কুমারী কি, আর যুবতী কি, সকলেই পতিযুক্তা। বার্থ সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি অবিবাহিত অবস্থায় পশ্চিম প্রদেশবাসী ভুয়ারগেরা ইহা তাঁহার বিশেষ দোষের কথা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল; প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যে অবিবাহিত থাকিতে পারে, এরূপ কল্পনা তাহাদের ধারণার অতীত। ডাকোটা জাতির সম্বন্ধে প্রেস্কট সাহেব লিখিয়াছেন,—"ইহাদের মধ্যে একটিও অবিবাহিত পুরুষ আমি দেখি নাই ও থাকার কথা শুনি নাই। তাহাদের এরূপ আত্মসম্মান ও স্ত্রীজাতির সম্ভ্রমবোধ আছে যে, তাহারা কেহই অবিবাহিত থাকে না।" আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের অনেক স্ত্রীলোকের বিয়েহনীন, কৌমার্য্য এবং বন্ধ্যা একই কথা। চারুল জাতির সম্বন্ধে আলাগা সাহেব বলেন যে, দাম্পত্য-মিলনের আবশ্যকতা অনুভব করিলেই ইহারা অবিবাহে বিবাহ করে। হুরোণান জাতির পুরুষদিগের মধ্যে যুবক ও অনমর্থ লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সকলেই বিবাহ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পতিবিহীন অবস্থায় থাকে না বলিলেই হয়। বৈধব্য ঘটিলেও কালবিলম্ব না করিয়া পাত্রান্তর গ্রহণ করে। আইরোকোয়াদের সকল বালিকারই অতি অল্প বয়সে বিবাহের কথাবার্তা পাকাপাকি হইয়া যায়, এবং ইতিপূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে অবিবাহিত যোড়শী কখনও দেখা যাইত না। ইউরোপীয় উপনিবেশসংস্থাপনের পর হইতে, ইহাদের এই চিরন্তন প্রথা ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উত্তর কুইন্সল্যাণ্ড নিবাসী অনেক যুবা পুরুষকে বিবাহের জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হয় বটে, কিন্তু কেহই অবিবাহিত থাকে না—অল্প পশ্চাৎ সকলেরই বিবাহ হয়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অবিবাহিত পুরুষ সম্বন্ধে, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই ঘৃণাস্পদ। তাহারা তাহাকে যে নামে অভিহিত করে, তাহার অর্থ—"অসম্পূর্ণ" বা 'নামমাত্র', এবং সমাজে সে ভদ্রলোকের প্রাপ্য সম্ভ্রমশ্রেণীর বহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয়। কাফ্রিদিগের মধ্যে সামাজিক বা গার্হস্থ্য কোন ব্যাপারে অবিবাহিত পুরুষের কোনও কথা চলে না। ত্রিপুরার বিবাহ না করিলে কেহ গণ্যমান্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। সিঙ্গিয়ানের এমনও বিশ্বাস আছে যে, পত্নীহীন অবস্থায়

যাহাতে মৃত্যু হয়, এমনোদ্যোগী লোক দেখিলে তাহাকে প্রতিরোধ করেন।

এখনে বলা হইয়াছে যে, অনেক মানব ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও যৌনসম্বন্ধ নিষেধ করে। এ কথা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম-স্থল যে দেখা যায় নাই, এমন কথা বলা যায় না। ফ্রান্সের জাতির সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ফ্রান্সে এমন অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা চিরকুমারী থাকিয়া পুরুষের সহিত যৌনসম্বন্ধ নিষেধ করে। পক্ষান্তরে, ফ্রান্স, সুইট্‌জারলণ্ড এবং উত্তর আমেরিকার কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন পুরুষকে স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ ধারণ করাইয়া স্ত্রীজনোচিত শিল্প দেওয়া হয়; তাহারাও স্ত্রীজনোচিত বৃত্তি ও চিরযৌবনের ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবিকাপন করে। কিন্তু এরূপ অস্বাভাবিকতার স্থল এত বিরল যে উহাদের মধ্যে না গণিলেও চলে।

মানব মাত্রে ইচ্ছাপূর্ব্বক যৌনসম্বন্ধে বিরত হয় না বটে, কিন্তু স্থল-বিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে যৌবন বা জীবনের কিয়দংশ নিষ্ফলভাবে অতিবাহিত করিতে হয়। যেখানে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানে অনেক লোককে হয় পরিণীত থাকিতে হইবে, নয় ত পাইয়াই আছে। যেখানে মূল্য দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিতে হয়, সেখানে যে মূল্যসংস্থানের জন্য অনেককে স্ত্রীলাভের সুখ আজীবন হইতেই অকালীন কাল অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের। যে অন্ধ সে মূক, যে অচিকিৎস্য-রোগগ্রস্ত, যে অক্ষমণ, যে বিকলেন্দ্রিয়, যে ক্লীব, তাহার বিবাহ হয় না, হওয়া উচিতও নয়। তবে এ সকল কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নয় বলিয়া উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

যে নিয়ম আজ সমাজে, উহা সভ্যতাগর্ব্বী প্রাচীন সমাজেও সেই নিয়মই দেখা যায়। চীন দেশের বিবাহপ্রণালী দেখ। তাহার যে নিষেধ আছে,—বরিষ্ঠ হউক, দুর্দ্দর্শ হউক, মুমূর্ষু হউক, কুরূপ হউক; বরঞ্চ কন্যা হইলেই বিবাহ করিবার জন্য পিতামাতা কর্ত্তৃক পুত্র কন্যা আদিষ্ট হয়। অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে, পিতৃলোকে তাহার বিবাহ দিবার জন্য পিতা মাতা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠেন। বিবাহটা যেন পুত্রের যে, মৃত্যুর পরও বিবাহ [illegible] করিতে [illegible]

[illegible] হয়, তাহাদের [illegible] বিবাহকার্য নিষ্পন্ন [illegible] থাকে।" কৌলের [illegible] বিরুদ্ধে কি ভয়ের আশঙ্কা, মনে হয় দেখি।

কোনদিন বাঙ্গালা অবিবাহিত পুরুষকে কেহ সম্মান করে না। সেইই লোক বলা হইত না, সেখানে অবিবাহিত পুরুষের দাঁড়ান—'ইপাটো'। কথাটা ভেবিয়ে। ফ্রীম ব্রাহ্মণ হইবার পূর্ব—আবশ্যকীয় কথা। পুরুষের সম্বন্ধে এ কথা সাধারণতঃ হওয়া কতটা অবজ্ঞাসূচক, মনে কর দেখি। তবে আর নাই—চতুর্দশ বর্ষ বয়সের বিবাহিত তরুণ, অবিবাহিত প্রবীণকে একটি ভাল প্রণামনিত, আশীষ, প্রহার পর্যন্ত করিবেন, সেই প্রবীণ বাক্যেও তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ নহে। পারস্য দেশে অষ্টাদশবর্ষীয়া বিংশতিবর্ষবয়স্কা স্ত্রীলোককে কখনও কুমারী দেখা যায় না। অধিক ইউরোপীয় পুরুষও দুর্বলচিত্ত হিসাব ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষ একটি স্ত্রীকে না পাওয়াইয়া অবিবাহিত থাকিলে, তাহাকে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমানেরা বিবাহকে অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় বলিয়া বিবেচনা করে।

আমাদের সমাজে, সন্ন্যাসী ব্যতীত আর সকলেরই বিবাহ করা কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ধর্ম। ইহা কেবল বিধিবিহিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপায়ীভূত চুক্তি নহে; ইহা ধর্মের সংস্কার—সর্বপ্রধান সংস্কার; ইহা সমাজের একমাত্র সহায়। শুতরাং আমাদের সমাজে (ব্রাহ্ম ও বিলাত-ফেরতদিগকে ইহার মধ্যে ধরিতেছি না) কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই যে বিশেষ প্রতিবন্ধক ব্যতীত অবিবাহিত থাকে না, ইহা না বলিলেও চলে।

ইউরোপীয় সমাজের একটা কথা এই দাঁড়াইয়াছে যে, ইউরোপে পুরুষ, কি স্ত্রী, অনিচ্ছা বশতঃ পর্যন্ত অবিবাহিত থাকে, কেহ কেহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ববিদ্গণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই অবিবাহের বেগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিবাহের বয়সও বাড়িয়া যাইতেছে, জনসংখ্যা অনুপাতে অবিবাহিতের সংখ্যাও বাড়িতেছে। তবে, নগর অঞ্চলে এই বেগ যেরূপ প্রবল এবং ক্রমে প্রবলতর হইতেছে, পল্লী অঞ্চলে সেরূপ নহে। পল্লী অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে, এবং অবিবাহিতের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম।

পল্লী-সমাজে স্ত্রীলোকে সংসারের সাহায্যকারিণী, গৃহস্থালী রক্ষাই

বাসীরা নিত্যে ইংরেজ—মুরুন, হেন, নীরব, সুতরাং অলস, বস্ত্র ক্রীত প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য্যই তাহারা গৃহস্থে করে। ক্রয়বিক্রয়, কৃষি ক্ষেত্রে স্বামীর সাহায্য করে, গোমেষাদিপালনের ভার প্রধানতঃ কুয়ো নদী হইতে জল আনিয়া স্নানাদি করে। ইউরোপের পল্লীবাসিনীরা সঙ্গীতকুশলী। সেই জন্য তাহারা অবিবাহিতা অবস্থায় থাকে না, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই যৌবনের বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। সেই জন্যই কৃষিজীবী শ্রমজীবিগণ পূর্ব্বাহ্নে বিবাহ, যত অল্প সময়ে পারে, নিরার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাহাদের বিবাহও যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

নগরাঞ্চলেও বিদ্যাপেক্ষা অর্থহীন অপেক্ষা সঙ্গতিশালী লোকেই অধিক। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে সহজেই বুঝা যায়। প্রথমতঃ ইউরোপীয়েরা অত্যধিক ব্যক্তিগত-স্বাধীনতাপ্রিয়; কোন প্রকার বন্ধনে বাঁধা পড়িতে তাহারা মুহূর্ত্তে চাহে না। যে সকল স্থলে বিবাহটা বন্ধনমাত্র নহে, বরং জীবনযাত্রার প্রকৃত উন্নয়ন, সে সকল স্থলে বিবাহবিষয়ে যে লোকের ঘৃণা, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। যে স্থলে ইহা কেবল বন্ধন, সে স্থলে যে লোক বিবাহপরাঙ্মুখ হইবে, ইহা ত পড়িয়াই আছে। অনুঢ়াও চিরকুমারী না বটে, তথাপি ইউরোপে যাহাদিগকে 'ওল্ড মেড্‌স্' বলে, তাহাদিগকে আমরা এই প্রবন্ধে অভদ্রসমাজে না হয় বলিলাম। ইউরোপীয় অভদ্রসমাজের রমণীরা বড় বিলাসপ্রায়ণা—অন্ততঃ আমরা যাহাকে বিলাস বুঝিয়া থাকি, তাহাদের তাহা প্রয়োজনীয়ের মধ্যে। ইহাদিগকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলে তাহারা সহধর্ম্মিণী, সংসারযাত্রার সঙ্গিনী, আনা হয় না; সহবাসিনী আনা হয় মাত্র। ইহারা প্রায়শঃ গৃহের লক্ষ্মী নহে; নরনমন্দিরে অপ্সরো মাত্র। ইহারা আপিসঘরে নবনোলিঙ্গনকার করে না, শোণিত শোষণ করে প্রায়। যাহারা পিতৃগৃহ হইতে যৌতুকস্বরূপ অর্থ লইয়া না আসে, তাহারা ভূতের বোঝা হইয়াই আসে। নূতনত্বের সঙ্গে সঙ্গে রূপ, যৌবনের, মোহ কাটিয়া যায়। তখন ভূতের বোঝাটা বড়ই ভারি বলিয়া বোধ হয়। তাই ইউরোপীয় সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে ইহার জন্য বড় কাতর হাহাকার শুনিতে পাওয়া যায়। ভূতের বোঝা ঘাড়ে করিবার পূর্ব্বে লোকে যদি ইতঃস্ততঃ করিবে, দশ দিন বিবেচনা করিবে, দশ দিন বিলম্ব করিবে, তবে ত জলের মতন পিছাইয়া পড়িলে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

আরও অনেক কারণ আছে। ইউরোপীয়েরা অনেকটা আত্ম-আচ্ছন্ন-

কাম, আমুষঙ্গিক। আপনি আসে পাইব, ভাল পাকিব, ভাল পাকিব, এভৃতি দেখা তাহাদের প্রভাব। অনেক হিন্দুপ্রধান দেশের অধিবাসিনীকে অন্যান্য জন্য আজীবনী হইতেই হইবে—ইহা তাহাদের দোষ বলিতেছি না। সুতরাং ইহাদের জীবনযাত্রানির্ব্বাহে অধিক ব্যয়সাধ্য। বিবাহ করিলে, স্ত্রীকে নিজের পদমর্য্যাদোপযোগি অবস্থায় রাখা আরও ব্যয়সাধ্য। তাহার পর, পুত্র-কন্যাদিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া আরও বহুব্যয়সাধ্য। সুতরাং ইউরোপে দেখা যায় যে, ভদ্রলোকী (Courtship) ও বিবাহের মধ্যে কত বৎসর ইহাও স্ত্রী এবং পুরুষ অনেক দিন অবিবাহিত থাকে। একণ অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য বিবেচনের কাজ। ইউরোপীয় ভদ্রসমাজের বিবাহে যে অধিক বিলম্ব হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

আর একটা গুরুতর কথা আছে। পুরুষ এবং স্ত্রী, উভয়কেই আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিলে, বিবাহব্যাপারে ব্যভিচার ঘটিবেই। শিক্ষিত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই স্ত্রী, কি পুরুষ, আপনার মনের মতন একটী আদর্শ ঠিক করিয়া বসিয়া থাকে—সাধনীর সম্বন্ধে, জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে, সংসার-সুখ সম্বন্ধে, এবং আদর্শ প্রতিমা বসিয়া থাকে। সংসারের হিসাবে, সে কল্পনার আদর্শটী প্রায়ই বড় উচ্চ হইয়া থাকে। উক্ত আদর্শানুরূপ স্ত্রী বা পুরুষ, পৃথিবীতে সুলভ নহে। কাজেই এরূপ সমাজে বিবাহ হইতে বহুবিলম্ব হয়—ইহা বিচিত্র নহে, এবং বোধেই হয় না। ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল, ইউরোপ। আমেরিকার যে লোকেরা ইউরোপীয় জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সেই প্রাচীন কাল হইতে একটী সংস্কার মনুষ্যজাতির মর্ম্মে চলিয়া আসিতেছে। সংস্কারটী এই যে, স্ত্রীপুরুষের শারীরিক মিলন, সুতরাং বিবাহ-প্রথা, যাবপবিত্রতা ও কলুষশূন্য আধার। এরূপ সংস্কার যেমন লক্ষ্যিত হইয়া, তাহার বিচারযুক্ত ও ফল নহে, কিন্তু সংস্কারটী যে মনুষ্যমাত্রে বদ্ধমূল আছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই সংস্কারবশেই যুরোপের অধ্য অধ্যাত্মবাদিগণ প্রচার করিয়াছেন যে, এই কারণেই যিশুখৃষ্টের গর্ভধারিণী কুমারী মরিয়ম যোষিত হইয়াছিলেন। মকলও যে সকল ধর্ম্মপ্রচারের ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধেও বলা যায় যে, এই অস্বাভাবিক নিয়মের মূলে প্রাচীন সংস্কারের কথা বলা যাইতে পারে। উক্ত ধর্ম্মের অধিকাংশ ধর্ম্মযাজকদের উক্ত

এমন কথোপকথন শুনিতে পাই নাই। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়-সেবা দুঃখের কারণ; অতএব ইন্দ্রিয়দমন করা কর্ত্তব্য। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা ধর্ম্মব্যবসায়ী বা সাধারণের পক্ষে বিবাহ ব্যাপারে একেবারেই নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যিশুখৃষ্ট স্বয়ং বহুবিবাহ-পর্য্যন্ত কোথাও নিষেধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্য সেণ্ট্ পল্ বিবাহকে 'অনিবার্য্য অমঙ্গল' বলিয়াই ধরিয়াছেন। তিনি করিন্থিয়ানদিগকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে,—যে আপনার কুমারী কন্যাকে বাগদত্তা করে, সে ভালই করে, কিন্তু যে না করে, সে আরও ভাল কাজ করে। লোকে বলে, যীশুর আগমন-ঘটি দূর হয়। এই কথার ফলে, রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মধ্যে ধর্ম্মযাজক-দিগের মধ্যে বিবাহটা একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছিল। প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া জোর জবরদস্তি দ্বারা মানুষকে ধার্ম্মিক করিতে গেলে যে বিষময় ফল ফলে, ইউরোপের 'মধ্যযুগে'র সন্ন্যাসিনী-আশ্রমের (Nunnery) বৃত্তান্তে তাহা বারুদী উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে পাপচিত্র আঁকিবার প্রবৃত্তি নাই, প্রয়োজনও নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সেক্‌সপীয়র।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

সেক্‌সপীয়র মানবতার কবি,—তাঁহার প্রতিভার যথার্থ অমানুষী কল্পনা কোথায়?

মানবতা কি? এই প্রশ্নের আমরা এইরূপ উত্তর পাইয়াছি। মানব-চরিত্র ও সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে, মানবের বিশাল সমগ্রতা; মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকাণ্ড সমষ্টি। এই মানবভাব নিরাট চিত্র সেক্‌সপীয়রের কল্পনা-দর্পণে যেমনই প্রতিভাত হইয়াছিল; সেই জন্যই তিনি মানবতার কবি।

এ কথা আমরা ক্রমশঃ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। সম্প্রতি এ কথাটি মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেক্‌সপীয়র যদি মানবতার কবি হয়েন, তবে তাঁহার প্রতিভার মূলে যে অমানুষী কল্পনা-শক্তি, এই সিদ্ধান্তই বর্ত্তমান প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য।

সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকাবলীর আলোচনা করিলে স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, চরিত্র চিত্রণে তিনি সুসঙ্গত। যেন হয়, অন্যত্রের তেমন কবিই এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ নহেন। চরিত্রাঙ্কনেই তাঁহার কবিশক্তির পূর্ণ বিকাশ। সেক্‌স্‌পীয়র কি ভাবে মানব-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন?

সেক্‌স্‌পীয়র সৃষ্ট চরিত্রসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে, প্রথমতঃ চমৎকৃত হইতে হয় তাঁহাদের সুসম্পূর্ণতায়। যেন তাঁহার কবিসৃষ্ট বিধিসৃষ্টির সমব্যাপক। যেন কোথাও বিকৃত অপর্য্যাপ্ত অসহীন নহে। মানবতার পূর্ণ প্রতিকৃতি—মস্তিষ্কের দেবত্ব ও পশুত্ব, তাহার ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব, তাহার নীচতা ও উদারতা, তাহার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও অবসাদময় নৈরাশ্য, সংকোচশূন্য আত্মত্যাগ ও আত্মম্ভরী স্বার্থপরতা, বিশ্ববিজয়ী প্রেম ও মোহান্ধ ইন্দ্রিয়পরতা, উন্মুক্ত সরলতা ও মর্ম্মোহন কাপট্য—সমস্তই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। মনুষ্যত্বের কোন অংশ বাদ দেওয়া তিনি সমীচীন ভাবেন নাই। সেই জন্য মানুষকে সকল অবস্থাতেই চিত্রিত করিয়াছেন—মানবের উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, ভাল মন্দ, সকল মূর্ত্তিরই ছবি ফুটাইয়াছেন। তাঁহার চক্ষে কোনটিই পরিত্যাগের যোগ্য নহে। এমন কি, যে মানসিক ব্যাধি, দুর্ব্বলতা বা ব্যামোহের ফল, সেগুলিও সমান সহিত চিত্রিত হইয়াছে। ইহাকেই চরিত্রাঙ্কনের সুসম্পূর্ণতা বলিতেছি।

আর চরিত্র-চিত্র সুসম্পূর্ণ বলিয়াই কোথাও সত্যের অপলাপ হয় নাই। এমন যথাযথ চিত্রণ ভক্ত কবির কাব্যে দুর্লভ। মানব-প্রকৃতি যাহা যেমন, সেক্‌স্‌পীয়র তাহার ঠিক তেমনই ছাঁচ তুলিয়াছেন। কোথাও অতিরঞ্জিত বা বিকৃত বর্ণন করেন নাই। কোথাও একটি রেখারও সংযোগ বা বিয়োগ করেন নাই। তাঁহার সঙ্গ স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ, উহা স্বভাবের অপকর্ষ সাধন নহে। † দর্পণে যেমন মুখের অবিকল প্রতিবিম্ব পড়ে, তাঁহার নাটকে সেইরূপ মানব-প্রকৃতির যথাযথ প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। বস্তুতঃ

---

* He finds in man nothing that he would care to lop off. He accepts nature & finds it beautiful in its entirety. He paints it in its littleness, its deformities, weaknesses, its excesses, its irregularities & in its rages. He exhibits man at his meals, in bed, at play, drunk mad, and sick.

Taine's English Litarature, Vol I. Shakespere.

† He sees things as they are with their ugly & beautiful details by imitative sympathy.

দেহের কোন ব্যাপারই, কেন, কবিই, আঁকিয়া যেতিবার যোগ্য নহে। আননে ঠিক যেমন আছে ঘটে, তার ইউক ভাল ইউক, সাদা ইউক কালো ইউক, উঁচু ইউক নীচু ইউক, সেই ভাবেই তাহাকে যাহিতে চিত্রিত করিতে হইবে। অতএব তাঁহার চরিত্রচিত্রণ যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

আর যথার্থ বলিতে কি তিনি সর্ব্বত্র সুসঙ্গত চরিত্রের অবতারণা করিতে পারেন নাই। অতিরিক্ত আধিকতা, অসঙ্গতি, অস্বাভাবিকতা, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে কোথাও কোথাও লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহার মুখে যে কথা সাজে না, সেক্‌স্‌পীয়র তখন তাহাকে সে কথা বলান। এমন নারী যে কখনও সম্ভবে না, শেক্‌স্‌পীয়র তখন তাহাকে সে কার্য্য করান। প্রত্যেক চরিত্রের যাহা বীজশক্তি—যে ধাতুতে যখন প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চেষ্টা নির্ম্মিত হয়, কল্পনা যখন যাহা যে শেক্‌স্‌পীয়র সেই ধাতুর কণা কণা করিয়া লয়ে, এবং তাহা হইতে প্রতি কথা, প্রতি কার্য্য, প্রতি চেষ্টার কার্য্য-কারণ-ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন। সেই জন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সকল বাস্তব নয়নগোচর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রতিভাত হয়। কবি মধুসূদন রাঘবারি শ্রীরামচন্দ্রের মুখে—

> "সূর্পণখা আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে;
> বুঝনু মায়াবী তুমি ভ্রাতঃ!
> নর্ম্ম যে লতায় সখে হেন বাঘিনীরে।"

ইত্যাদি বাক্য বসাইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস শ্রীরাধাকে মানবীকে পুরুষের প্রেম-উপার্জ্জনী মূর্খা বা অজ্ঞানতায় হাসাইয়াছেন। শেক্‌স্‌পীয়রে আমরা কখন এরূপ অসঙ্গতি দেখিতে পাইব না। যে যেমনটি, শেক্‌স্‌পীয়র তাহাকে ঠিক সেই মত কথা বলান, সেইমত কার্য্য করান, সেইমত চেষ্টায় নিযুক্ত করেন। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে যে সকল অসঙ্গতা অসিদ্ধতার সমাবেশ দেখিতে পাই, বুঝিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সে সমস্তই চরিত্রের সুসঙ্গতিরক্ষার নিমিত্ত।

সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক শ্লারভাইনস এ বিষয়ে লিখিয়াছেন, "লোকে যাহাকে

---

* Numbers of the critics of taste in Shakespeare have turned out to be unwitting touches of character; the esthetic deformities imputed to his poetry have proved the moral deformities of certain of his persons, and what had been denominated a fault has proved to be an excellance.—Gervinus.

সমিলনের উপাদান আছে, অথচ উহাদের প্রত্যেকের চরিত্র-চিত্র পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়াছে। যাহা তাঁহার কাব্যের অঙ্গীভূত নহে, তাহাই তাঁহার চরিত্র-বর্ণনের অনুকূল নৈতিক উপদেশ হইয়াছে। আর যাহা সেই সমিলন হইতে নিঃসৃত হইত, তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সেক্সপীয়রের এই চরিত্রাবলীর আর একটি বিশেষত্ব, তাহাদের বৈচিত্র্য। অপর কোন কবি এত প্রকারের চরিত্র সৃজন করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, এক বিধিসৃষ্ট ভিন্ন আর কোথাও এত বিবিধ বৈচিত্র্য নাই। খাঁসিদাসের দুষ্মন্ত, গুণাঢ্যের অবিমিত্র, একই চরণের নায়ক। মিল্টনের পরভাগে যে সুর, তাহাই তাঁহার প্রতিধ্বনিময়। রাইবার্গের আনেক্ষেড, ফ্রেলেম্বার্গ, গার্ল্ড রিয়র, একই ধাতুর লোক। অথচ সেক্সপীয়র যত বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইটি এক প্রকৃতির ব্যক্তি নহে। প্রত্যেকের ভাব ও লক্ষণেরই নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। ডিবিষয়ে সেক্সপীয়রের কৃতিত্ব এতই অতি, মানব-চরিত্র বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান এতই সূক্ষ্ম ভেদগ্রাহী, তাহার উত্তম প্রমাণ পাই কিং লিয়রে। যাহারা সেক্সপীয়র বেশ ভাল করিয়া নাটক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, তিনি প্রকৃতি ও অবস্থার বিভিন্নতা ও বৈষম্যকে তিনি কেমন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, একই প্রেমবিহ্বলতা বিনাশোন্মুখ আধার ওথেলো ও রিপুর ভীষণতা হইতে কেমন বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন; আর একই পিতৃস্নেহের অবস্থার বৈচিত্র্য ও এডগারকে সমান ভাবে নির্যাতনগ্রস্ত করিয়াও কেমন বিচিত্রভাবে কর্তব্যপথে পরিচালিত করিয়াছেন। এইরূপ সর্বত্র দেখা যায়। অন্য কবিরা একই চরিত্রকে সমান করেন, সেক্সপীয়র একাধারে বৈচিত্র্য ও ঐক্যরক্ষা করেন। শ্লেগেল সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন—সেক্সপীয়রের চরিত্রসৃষ্টিতে পুনরুক্তি দোষ নাই। প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে সমানতা আছে বটে; কিন্তু কোন দুইটি চরিত্রই অবিকল নহে; প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে।*

সাহিত্যগত চরিত্র-চিত্রণ-বিষয়ে যাহা বলা হইল, চিত্রগত ভাব-সমূহের

* There is no repetition among them; though there are some striking family resemblances, yet no two of them are individually alike.

Shakspeare, vol. I. p. 342.

পক্ষপাতিত্বের ঐ অপবাদ নাই। তিনি যেমন ইয়াগোর, তেমনি ডেস্‌ডিমোনার; যেমন লেডি ম্যাক্‌বেথের, তেমনি ডন্‌কানের; যেমন ক্লিওপেট্রার, তেমনি অক্টেভিয়ার সহিত চিত্র দিতে পারিতেন। যে কবিতার আলোচনায় বিষয়ের অভিজ্ঞতা না হইলে ধারণা হয় না, ডেস্‌ডিমোনার প্রতি ওথেলোর অবিশ্বাস, ইমোজেনের প্রতি পশ্চুমাসের অবিশ্বাস, ও হার্মিয়োনির প্রতি লিয়নটিসের অবিশ্বাস—এই তিনে ভয়ঙ্কর প্রভেদ। ম্যাকবেথের লোভ, তৃতীয় রিচার্ডের লোভ ও ইয়াগোর লোভ কত বিভিন্ন; মেকিও মুক্তিমেটের প্রেম, ফার্ডিনন্দ নিকোরাগুর প্রেম, ফ্রেডিরিকের ঔদ্ধত্যের প্রেম এবং হেক্টর সেরসিদার প্রেম কত ভিন্ন ভাবের—এইরূপ অসাধারণ বৃত্তির নিদর্শনও দেখা যায়।

কোন একটি চিত্র ফুটাইতে হইলে, প্রথমে আমার বিষয় আসে, পরে তাহাকে আকর্ষণ করিতে হয়। তবে সেই চিত্রটি ফুটিয়া উঠে। শেক্‌সপীয়রের চিত্রকলকে আমরা যেরূপ উদ্ভাসিত চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি সেই বিভিন্ন চিত্রের প্রতিকৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্রে এত বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাব, নিজে সেই ভাবের সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহার কি বিস্ময়কর অপক্ষপাত ভাব! যে অপক্ষপাতের উদাহরণ (The perfect even handedness of Shakespeare's representations) ক্লিওপেট্রা ও টটেনিয়া এবং মিরন্দা, বটম ও থিসিয়ুস, এবং ক্যালিবেন; ফেলোপিস্ ও হটস্পার এবং ফলস্টেফ; ফোর্ট ইস্টিচ ও ইয়াগো; মিসেস্ কুইকলি ও ভলামনিয়া;—সকলই এক কলমে প্রসূত। সর্ব্বত্র সমান আত্মীয়তা, সমান বীর স্থির প্রশান্ত ভাব! সেইই তাঁহার মহানুভূতির সীমার বহির্ভূত নহে। এডমণ্ড ও ইয়াগোকে ঘৃণা করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন, ইংরাজিতে Tolerate করা যায়, তাহার কতকটা আভাস দেওয়া যায়, মহাকবি সেক্‌সপীয়রের তাহা ভাল লাগিয়াছিল। সেই জন্য যাহাকে নৈতিক ভারতা—অবহিত্থা বলে, শেক্‌সপীয়রে তাহার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরাজ সমালোচক হাজ্‌লিট

With all natures he is kin. From Caliban to Titania Miranda; from Bottom to Theseus Prospero; from Parolles to Hotspur Henry; Ophelia to Isabella; Mrs. Quickly to Volumnia—he ranges with equal power at will—Furnivall.

Shakespeare was the least moral of all writers for morality commonly so called is made up of antipathies; and his talent consisted

[illegible] রবিবাবুর— [illegible] সেকসপীয়র [illegible] [illegible] শাস্ত্রী [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শেক্‌সপীয়রের চরিত্রের মধ্যে বিশেষ একটা বিশেষত্ব আছে, তাহার সম্বন্ধে সকলেই একমত। কিন্তু সেই বিশেষত্ব যে কি, সে সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সমালোচকের বিভিন্ন মত। কোলরিজ বলেন, তিনি নাটকীয় চরিত্রকে ব্যক্তিবিশেষে পরিণত করিয়াছেন। কাহারও মতে তিনি নিজের ভাব অন্যের উপর আরোপ করিয়াছেন। কাহারও মতে তিনি ঘটনার অনুযায়ী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কাহারও মতে তিনি ঘটনার অনুযায়ী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এক মতের সহিত অন্য মতের সামঞ্জস্য নাই বলিয়া, সমালোচকদিগের মীমাংসা দেখিয়া কিছু বুঝা যায় না। নিজ নিজ বুদ্ধি ও শিক্ষা অনুসারে সকলেই এক একটা মত গড়িয়া লইয়াছেন। সেক্‌সপীয়রের চরিত্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই সমালোচকদিগের মধ্যে এত মতভেদ। সেক্‌সপীয়রের চরিত্র-সৃষ্টিতেও ঠিক এইরূপ দেখা যায়। এক শ্রেণীর সমালোচকের মত, তিনি নীরস পাষণ্ড। কেহ বা তাঁহাকে প্রেমরসের এক মস্ত ভুল ভাবেন। কাহারও বিবেচনায় তিনি একটা ঘটনা ঘটাইতে ভালবাসেন। ইতালিতেই, তুরস্কে নয়। আর কেহ বা তাঁহাকে প্রেমের ইন্দ্রজালিক বলিয়া অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়াছেন। এরূপ মতভেদের কারণ, তাঁহার চরিত্রের বহুমুখীনতা। প্রত্যেক সৃষ্টির চরিত্র নিজের ছাঁচে ঢালা হইলেও শেক্‌সপীয়রের চরিত্রকে সকলেই একরকম করিয়া প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন। বোধহয় সেই জন্যই তাঁহার চরিত্র সমালোচনায় সকলেই দুর্বলতার পরিচয় দিতে পারে। অথচ তাঁহার নাটকীয় চরিত্রের অধিকাংশই চরিত্রই কবির নিজের ছাঁচে ঢালা, ইহাও সত্য। তবে কেন তিনি বিভিন্ন চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন? এরূপ বুঝিবেন না যে, সেক্‌সপীয়রের কোন চরিত্রেরই অর্থ নির্দ্দেশ করা যায় না। জগতে যেমন আমরা নরনারীর চরিত্রবৈচিত্র্য, তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝিতে পারি, যে দেশে, যেই বুদ্ধিতে পারি, সেক্‌সপীয়রের সৃষ্টির সম্বন্ধেও সেইরূপ নরনারীর অসদ্ভাব নাই। আমরা জগতে যেমন লক্ষণ দেখিয়া কাহারও চরিত্র নির্ণয় করিতে পারি না, সেক্‌সপীয়রের সৃষ্টির সম্বন্ধেও সেইরূপ আছে। তবে স্বীকার করিব, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের সংখ্যা অল্প।

সেক্‌সপীয়র কি ভাবে তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, আমরা তাহার কতকটা পরিচয় পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি (১) তাঁহার চিত্রে ভুল নাই, বর্ণনার ঔজ্জ্বল্যের, কল্পনার অভাব নাই। (২) তাঁহার চিত্রে চিত্রণ সংযত, ভাষায় (৩) এবং সর্ব্বত্র সুসঙ্গত ও আভাবিক। (৪) তাঁহার চরিত্রগুলি বিবিধ বিচিত্রভাবে পূর্ণ। (৫) এবং তাঁহার চিত্রে আমরা অনেক চরিত্র বিভিন্ন

তাঁহার অসাধারণত্বের পরিচয়স্থল। (৬) সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর সুবুদ্ধি পাণ্ডিত্য এবং গাম্ভীর্য্য উপেক্ষাভাবে বিমিশ্রিত হইয়াছে। (৭) এবং বলিয়া রাখা ভাল যে, তাঁহাতে অসাধারণতা বা নৈতিক উচ্চতার বিশেষত্ব নাই। তিনি সর্ব্বত্র সমান মহানুভূতি-শীল। (৮) তাঁহার দৃষ্ট চরিত্রসমূহ প্রায়শঃ শ্রীযুক্ত নরসাধারণ, এক কথায় তাঁহারা মধ্যম-শ্রেণীয়। (৯) তিনি চরিত্রের বীজমাত্র গ্রহণ করিয়া তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করেন—চরিত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রণয়ন করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠা করেন। (১০) সেই জন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে একটা বিচিত্রতা একটা বিপুলতা একটা হ্রাস বৃদ্ধির ভাব আছে। তাহারা সঙ্কীর্ণ-সীমাবদ্ধ নহে; তাহাদের জীবনের একটা উচ্চ ইতিহাস ও একটা পরিসমাপ্তি আছে। সেক্সপীয়র-কৃত চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে উপরে যে কয়েক সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার যাথার্থ্য অনুভব করিবার জন্য তাঁহার নাটকাবলীর পুনঃ পুনঃ আলোচনা আবশ্যক। তাহা করিলে ঐ সূত্রগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। প্রবন্ধান্তরে আমি কয়েকটি চরিত্রের বিচারে বিশ্লেষ করিয়া ঐ সূত্রসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব।

তখন বোধ হয় সেক্সপীয়রকে 'মানবতার কবি' বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। তিনি কোন্ পাণ্ডিত্যবলে, কি অমানুষীশক্তিপ্রভাবে মানবতার বিরাট ভাব আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং মানবতার বিপুল চিত্র তাঁহার নাটকে প্রতিবিম্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

রাজা বীরবল।

আজ এখানে যাঁহার প্রসঙ্গ করিতেছি, তিনি এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার পাঁচটি নাম আমাদের পরিজ্ঞাত। যথা—(ক) বীরবল; (খ) বীরবর; (গ) মহেশ দাস; (ঘ) ব্রাহ্মণ দাস; (ঙ) কবি-রায়।

প্রথম ও দ্বিতীয়টি প্রকৃতপ্রস্তাবে নাম নয়। উহারা তাঁহার পারিষদিক বল বিক্রমপ্রকাশক ও গুণদ্যোতক সংজ্ঞা—বিশেষণমাত্র। এক প্রকার উপাধি

---

* 'মাসিক' এই আখ্যার প্রবন্ধবর্ত্তী।

† ঐতিহাসিক বদাউনি উক্ত নামেতাঁহাকে নির্দ্দেশিত করিয়াছেন।

[illegible] করিলেও চলিতে পারে। বীরবল্ল [illegible] তাঁহাকেই "বীরবল" অভিধানে সম্বোধন করা যায়, যিনি বীরত্বে বলবান্—গুণবান্। আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে, "বীরবর" এবং "বীরবল" একার্থবোধকও বটে।

সংস্কৃত ভাষা বৈয়াকরণিক নিয়মানুসারে "ব" এবং "ম"—আর, "ড" এবং "ল" অভিন্নার্থ, এই বিশদীকৃত করিয়া

১। "রোম" ২। "লোম" ৩। "ঈড়" ৪। "ঈলে"।

তৃতীয় নামই তাঁহার যথার্থ নাম। চতুর্থ সংজ্ঞা, ভক্তি ও বিনয়ের পরিচয় করিবার জন্য। পঞ্চম বা সর্ব্বশেষ আখ্যার বিষয়, এই প্রবন্ধের উপসংহারে বিবৃত হইবে।

যখন যে নাম উপযোগী ও শ্রুতিসুখজনক বোধ করিব, সেই নামই আমাদের নায়ক উল্লিখিত হইবেন।

এতক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে উপনীত হইতেছি। দেখা যাউক, তিনি কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বিপ্র-বংশে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির [illegible] নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বীরবল, দ্বিজ না হউন, "দ্বিজবন্ধু" বটেন। "দ্বিজবন্ধু" অর্থে কুদেব-বন্ধু—ব্রাহ্মণের বান্ধব নয়। "দ্বিজবন্ধু" প্রাতিস্বিক শব্দ। ইহার অর্থ—পাতিত্যদোষে কলুষিত নিম্ন স্তরের ভূসুর। [illegible] পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহার উৎপত্তি হয়।

ভাটগণ, মধ্য যুগের প্রবাদ্ভবেত্তা। তাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতকারক, ঐতিহাসিক। রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী, প্রধান রাজকর্ম্মচারী, অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত বংশ, কিংবা ভদ্রমহাশয়গণের সঙ্গীত—তান, মান, সুর অর্থে—স্তুতিগীত করাই, ঐ সম্প্রদায়ের লোকের উপজীবিকা। এই সূত্র তাঁহারা তেমন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ নহেন।

কবিতায় বা গীতিকায় গুণবান্ জনগণের যশঃকীর্ত্তন, তাঁহাদের প্রয়াস

---

* "[illegible]-জন্মোক্ত-বাক্যোপভেদঃ"।

† "দ্বিজবন্ধুর" "ক্রিয়ার" প্রবণ, গঠন ও পাঠনে রক্ষিত। ঐ নহেচ্ছি অধিকার তাঁহাদের নাই। প্রমাণ,—

"স্ত্রী-সূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ॥" ভাগবত।

আর্য্য। [১] মহাত্মা মহম্মদের এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়াছিলেন। কাশ্মীরের সর্ব্বত্র বীরবল ও করহাটা বিদ্যমান। কিন্তু তাঁহাদের উচ্ছেদ হয় নাই।

করহাটী তাঁহার জন্মস্থান। পূর্ব্বিমোত্তর প্রদেশের শেষ সীমান্ত-প্রদেশ। করহাটী আধুনিক ভৌগোলিকদিগের 'কাফ্রীর' অবস্থানভূমি।

নহেশ দাসের শৈশবজীবনী, আর দারিদ্র্যকাহিনী—অতিশয় সুখাবহ। এতের বর্ণনায় অভ্যন্তরে অপরূপ নিহিত—লুক্কায়িত। কিন্তু আত্মগোপন বুঝি তাঁহার চিরসহচরী। শৈশবের দুঃখচিত্র, যৌবনের মহান্ সাক্ষী। মহত্ত্বের মূর্ত্তি প্রথম বয়স হইতেই অতি সুন্দর,—নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকাময়ী।

সম্রাট্ অকবরের রাজত্বের প্রথম ভাগেই—সম্রাটের দরবারে ব্রাহ্মণ দাসের আগমন। [২] ঈশ্বর নমস্যের ভিন্নভিন্নই ভিন্নপথাবলম্বীরা তাঁহাকে চিনিয়া লইতেন। তিনি না কি—ঈশ্বরানুগৃহীত ছিলেন। স্থাই, প্রকৃতিগত ভগবৎপ্রেরিত কবিত্বের সম্পর্কে তিনি প্রথমাবধি বিভূষিত হইয়াছিলেন। পরিহাসপটুতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সঙ্গীতের সুন্দর সুরে সুশোভন স্তুতিগীতির আবৃত্তি প্রভৃতি সুকোমল সুকুমার বিবিধ গুণের জন্য তাঁহাকে লোকে আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। সৈন্যগিক নামধেয়ের এমনই মাহাত্ম্য—এতই মহত্ত্ব ও গৌরব! তাহা না হইলে কি অপরিচিত-কুলশীল অজ্ঞাতনামা যুবক এত অল্প দিনেই উচ্চ হইতে উচ্চ—ভাবৎ শ্রেণীর—লোকের প্রশংসাভাজন হইতে পারে? তাঁহার হিন্দী কবিতাও সর্ব্বত্র সুসমাদৃতা। যথার্থ গুণবানের নিকট সদা গুণাবলীর পুরস্কার আছে। মহাসন্তুষ্ট সম্রাট্ এতদিনের পর তাঁহাকে 'কব-রায়' উপনাম উপহার দিলেন। বস্তুতঃ, ধন-রত্ন অপেক্ষা এই উপহারের মূল্য অধিক। 'কবরায়' অর্থে রাজ-কবি। তিনি হিন্দুজাতীয়—সুতরাং বীরবল, রাজকবি হইলেন। [৩]

সম্রাটের এতাদৃশ শ্রেণীর হিন্দু কর্ম্মচারী অনেকে ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প নয়। প্রসঙ্গক্রমে একটি দৃষ্টান্ত দিবার কৌতূহল সম্বরি। অকবরের অনুজ্ঞায় "জ্যোতিক রায়" রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিদ্, এই মহনীয় উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনিও হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি।

(ক) বর্ণাশ্রমী।

[১] এ পর্য্যন্ত অকবরের দুইটি নামকরণ—গ্রন্থাদিতে সমধিক সমর্থিত হইয়াছে,—(ক) ভৌজি; তিনি মুসলমান, অতএব তাঁহাকে মুসলমান "বাজকরি" এবং আখ্যায় আখ্যান করিতে হইবে। "মালিক উছমান" বাবর উপাধি;—অর্থ—"অবীন"।

(খ) অপর রাজকবি হিন্দু বীরবল।

কবি-রাজ, অধ্যাপকের মতই বিদ্বান্ ব্যক্তি। তিনি রাজকবি এবং রাজদূত। উভয়ের কার্য্যই পরম-পূজ্য। বিদ্বান্ না হইলে, অমর উপর উপরিউক্ত শ্রেষ্ঠতর গুরুভার সমর্পণ করা যায় না। তাঁহার বংশগত সম্মানের পরিপুষ্টির আধার। বীরবরের নৈসর্গিক গুণে অকবর চির-আকৃষ্ট। অকবরের নিত্য সঙ্গী, চিরানুচর, সহবাসচর ও একান্ত অনুগত সখা। উদার গাম্ভীর্য্য ও বুদ্ধির সাম্য্য, সম্রাটের সকল কার্য্যেই গ্রাহ্য—শিরোধার্য্য।

বীরবর নগরকোট, আগ্নেয়ীর স্বরূপ, সম্রাটের সকাশ হইতে আসর উহার প্রতি হইয়াছিলেন। বন্দুকী, তুপাকী আদায় বিলুপ্ত করিয়া, গয়াতীর্থে, বীরবরের অনুরোধেই এই অন্যায় কার্য্যের অতিনয়। এই অকবরের মহাত্মা-বীর বিদ্বেষসূচক ঘটনা। ও অতঃপর তিনি "রাজা" এই বাক্যটীর উপাধিতে শোভিত হইলেন। অবধি হইতে তিনি "রাজা" উপনাম-সহ একত্রিত হইয়া আহূত হইবেন।

অকবর কর্তৃক জয়সিংহের অবরোধসংবাদ, নগরকোটে পৌঁছিলে, উহাদের অপর বুন্দীদল প্রভৃতি প্রধান ও প্রবল পুরুষেরা তাঁহা বীরবলকে বলী করিলেন। তাঁহার বিপক্ষতা প্রতিটি করিয়াছিল, তিনি উহার কারাবাসেই সন্তুষ্ট হইতে অবকাশ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাই বিদ্বেষিতার মূলীভূত হেতু। বীর পিতার উপযুক্ত পুত্র—বীরসন্তান বুধসিংহ। অকবরের পুত্রের বীরত্বিত কার্য্যে অহোরাত্র প্রকাশ করিতে না পারুন, মনে মনে বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বিপক্ষতাচরণে উহা প্রমাণিত করিতে পারিতেন কি না, জানি না।

রাজসভাতে ও যুদ্ধক্ষেত্রে বুধসিংহের বীরত্বের বিজয়ভেরী, প্রবলতেজে বাজিয়া উঠিত। সর্ব্বত্র তাঁহার সম্মান ও সমাদরের বৃদ্ধিসাধন পরিলক্ষিত হইল।

---

* অকবরের উহা সপ্তদশ বাসরের ঘটনা। নগরকোট-রাজ কুরুপক্ষে কোন্ ঘটনা উপলক্ষে অকবরকে বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার ক্রোধে একের সর্ব্বনাশ, অপরের মহোল্লাস। অকবরের ক্রোধে সময়ে সময়ে অনেক লোকেই উপকৃত হইয়া থাকেন। জয়সিংহ কারাভোগ সহ করিতে বাধ্য হইলেন এবং সেই কারাবাসে বীরবলের অদৃষ্টে শাস্ত্রীয়-প্রাপ্তি ঘটিল।

† ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটির বর্ণবিন্যাসের বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে। বেণীদাস, বাঁচীর ও বুধসিংহ,—ভিন্ন প্রকারের বানানে নানা লোকে মতদ্বৈধ্য প্রকটিত করিয়াছেন। মূলে যে নামের বানান করিয়াছি, তাহার যথাযথিতায় আপত্তি বা অসন্তোষের কারণ নাই।

বীরবর, মুষ্টাচার্য্যের ভ্রাতৃহন্তে অবরুদ্ধ,—এই সমাচার, রাজধানীতে প্রচারিত হইবামাত্র, অকস্মাৎ প্রধানসেনাপতি হলেন তুলী খাঁর মনে বীরবরের বিজয়-শ্রী পুরস্কারক করিবার আকাঙ্ক্ষা হইল। ইব্রাহিম তুলী খাঁ আকবরের ভোজের তুলী ও অন্যান্য লোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সুতরাং বীরবলকে আবীরের অধিকারে হতাশ হইতে হইল।

পরন্তু ও আহম্মদাবাদ আক্রমণার্থে ৯৮১ হিজরী ১৫ই শাবান (২৪ ডিসেম্বর ১৫৭৩ খৃঃ) তারিখে রাজা বীরবল সম্রাটের সমভিব্যাহারী হইলেন।

রাজা বীরবলের বীরত্বের তেজ নিদর্শন দিবার অভিলাষ হইয়াছে। চারি হাজার গাঁচ শত অশ্বারোহী জেনরাও, যখন উজবেগ ইলগণকে দমন করা অসম্ভব মনে করিয়া, একদা অতিরিক্ত সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন সে বার প্রিয়বন্ধু বীরবর ও হাকিম নূরুদ্দীন বৈদ্যের সঙ্গে কতিপয় সেনা দ্বারা অভিযানারম্ভকুলীর জন্য প্রেরণ করেন। তখনও তাঁহাদের আশাতীত ফললাভ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক তাঁহার প্রধান নিত্যকর্ম্ম। অকবরের একবিংশ রাজ্যাঙ্কের আরম্ভকরণের সঙ্গে তিনি একবার ফতেহপুরে প্রেরিত হইলেন। ঐ আজ্ঞার উদ্দেশ্য—রাজনন্দনকরণের কন্যাকে অকবরের অন্তঃপুরে আনয়ন। ঐ সঙ্গেই বীরবর ও জৈন কোকা, রাজা রামচাঁদকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করেন। কোন্ সময় যে তাঁহাকে সম্রাটের প্রয়োজন হইবে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। এই নিমিত্ত রাজদরবারে বীরবলের নান্দিধ্য প্রায় সর্ব্বদা আবশ্যক হইত। তবে মধ্যে মধ্যে অল্প ব্যতিরেকে তাঁহাকে গতিবিধি না করিতে হইত, এমন নয়। তিনি থানাধিকারী ছিলেন—সর্ব্বত্রই তাঁহার গতিবিধি ছিল।

আর একবার জৈনখাঁ কোকীর সঙ্গে বিদ্রোহ ও সম্রোহের ইসুফজৈনগণের বিপক্ষে অভিযানের প্রয়োজন হয়। আবুলফজল ও বীরবর—এই বীরযুগলের মধ্যে কাহাকে সেনাপতি করিতে হইবে, ইহা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল। অবশেষে বীরবলই নির্দ্ধারিত হউক। কিন্তু দেবের কর্ম্ম বড়ই বিষম। সেনাপতির নামে সুখ্যাতি পড়িল। জগচ্চয় একান্ত অভিলাষসহকারে, নিজের প্রাণপণ হইয়া, সম্রাটকে প্রিয়তম যাহাকে সংসারবিক্রেতার নাম দিতে হইল। কেন না, নিস্তারকর্ত্তার আদিদেব কার্য্য।

ইসুফজৈনগণের সহিত সন্ধির যে সময় হইয়াছিল, সেই সূত্রে অকবর পক্ষে ৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত হয়। বিদ্রোহ-বীরপুরুষ রণে ভঙ্গপ্রদান

করেন। এই ব্রাহ্মণ ইহলোকত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আশীর্ব্বচন-পরায়ণ হইয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহার কিন্তু নিস্তার হয় নাই। অবশেষে, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে শফর খাঁর এই শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। গোঁড়া বিদ্বেষী বদাওনী, গাত্রজ্বালায় লিখিয়াছিলেন,—নারদের শ্রেণীতে বীরবল স্থান পাইয়াছেন। এইরূপ বিভিন্নতীয় কারণ কি, বলা যায় না। তাহাতে বলেন,—বীরবর, জীবৎকালে যে সকল উৎকট উৎকট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এই শোচনীয় ঘটনা তাহারই বিষময় পরিণাম। বীরবর ব্যতিরেকে অপরাপর অনেক উচ্চপদাধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারীও নিধন প্রাপ্ত হন। কিন্তু অকবর, বীরবরের জন্যই বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। সম্রাটের কাতরতার কারণ এই, তাঁহার মৃতদেহ, অনুসন্ধানেও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তিনি পরিশেষে নিজেই এই মনে করিয়া আত্মপ্রবোধ দেন যে, এক্ষণে বীরবর পবনীভূত—বিমুক্তাত্মা। সুতরাং অনলসংযোগে তাঁহার শরীরের আর অপর সংস্কার বা সংকার নাই বা হইলেও বহ্নি-স্পর্শে তাঁহার আর অধিক কি উপকারের আশা। জীবুল্ ফজলের লিখিত "মথুরাপ্রদেশ" পুস্তকেও, কোন পত্রী দ্বারাও, অকবরের শোকের গভীরতা ও মূর্ত্তি অনুমিত হইতে পারে।

বদাওনীর গ্রন্থে বীরবরের উপর সম্রাটের অসাধারণ অনুরক্তি ও আসক্তির বিবরণ এক ঘটনা স্থান পাইয়াছে। মূল ঘটনাটী কিন্তু অমূলক।

একবার জনরব উঠিল, রাজা বীরবল, পার্ব্বত্য প্রদেশে যোগী ও ফকিরের বেশে ঐ দুই সম্প্রদায়ে সম্মিলিত হইয়া পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র সম্রাট ভাবিয়া লইলেন, বুঝি বা কোতুকে, অথবা অন্য কিছু, বীরবর আত্মসংগোপনে তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। অনন্তর প্রেরিত হইল,—কাশিধামে (নিত্য-বাইগীরে) তিনি যামিনীযোগে দৃষ্টমান হইয়া থাকেন। ইহাতে সম্রাটের কৌতূহল দ্বিতীয়বার উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

অকবরের এক কাপেক্টর বলিয়া পাঠান,—এক ফৌরদার বীরবলকে স্বীয় শরীরের আহুতি দানে তৈল মর্দ্দন করিতে সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহাকে রাজদরবারে প্রেরণ করিতে আদেশ হইল। অবশেষে মিহাছিছি — অকবর পথিক বীরবল বলিয়া গৃহীত ও বিনাস্থিত হইলে পর, ঘটনায় সবিস্তার

১। অকবর, বিজিয়া অকের দ্বিতীয় সাহ।

পতন হইল; সর্ব্বশেষে সম্রাট্ হইল,—সর্ব্বৈব অসত্য। পাতের অন্যে কালেক্টরকে কষ্ট ভুগিতে হয়। যে না কি কারাবাসে বাস করিয়া, অশেষ ক্লেশ পাইয়াছিল!

অকবর যে নব ধর্ম্মসম্প্রদায় সংগঠিত করেন, ১৮ আঠার জন সভ্য; তাঁহার অন্তর্নিবিষ্ট। তন্মধ্যে ১৭ সপ্তদশ ব্যক্তি মুসলমান;—একমাত্র রাজা বীরবলই হিন্দু। সকলেই কিন্তু সুশিক্ষিত—সুবিদ্বান্।

ইঁহাদের সংক্ষেপে পরিচয় দিবার অভিলাষ হইতেছে। তাহাতে বিস্তর বৃত্তান্ত জানা যাইবে। ৪, ৫ এবং ৬ সংখ্যক ব্যক্তির বৃত্তান্ত, "আইন-ই-অকবরি" পুস্তকে নিবদ্ধ আছে। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের বিবরণ, ঐতিহাসিক বদাওনী* কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

অকবরের নব-ধর্ম্ম-মতে যে ১৮ আঠার সদস্য অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ বিবৃত হইল।

১। শৈখ মুবারক;—নাগর-নিবাসী। তিনি একজন বিদ্বান্ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি। আবুল ফজল ও ফৈজি তাঁহার দুই উপযুক্ত পুত্র।

২। শৈখ আবুল ফাজল;—শৈখ মুবারকের তনয়। অকবরের প্রধান মন্ত্রী। "অকবরনামা" ও নামক ভাগলয়বিশিষ্ট ঐতিবৃত্তিক পুস্তকরচক। উত্তম যোদ্ধা।

৩। শৈখ ফৈজি;—শৈখ মুবারকের পুত্র। অকবরের রাজকবি।

৪। আকলদেণ ওসেক খাঁ;—কোরাশ্ উইন্ অধিবাসী। কবি, অথচ ইতিহাস-বিৎ।

৫। কোয়াসিমি কাই;—একজন কাব্যকার।

৬। আবদুল-সমদ্;—রাজ-চিত্রকর ও কাব্যকার।

৭। আজেম খাঁ কোকা—মুসলমানের পবিত্র তীর্থ মক্কা। মক্কা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি অকবরের নব-প্রচারিত ধর্ম্মমত-সম্প্রদায়-ভুক্ত হয়েন।

৮। মুল্লা খাঁ মুহম্মদ;—সাহাবাদবাসী। একজন ঐতিহাসিক।

৯। শাহ্ মুহম্মদ;—বৃত্তান্ত অপ্রাপ্ত। তবে নামের অগ্রেই "শুক্তি" দৈখিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

১০। শাদর জহাঁ;—বাল-ব্যবহারাজীব—সম্রাটের উকীল।

১১। পুত্র (নাম অপ্রাপ্ত);—বিবরণ অজ্ঞাত।

১২। পুত্র (নাম অপ্রাপ্ত);—বিবরণ অজ্ঞাত।

* ইহারই তৃতীয় ভাগ, "আইন-ই-অকবরি" সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ।

১৩। পীর শরফ ;—আমুল-নিবাসী অকুবর তাঁহাকে অবলম্বনে ঐ নব-মতাদর্শের ধর্ম্মপ্রচারত্ব পদে, প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৪। সুলতান ওরাজী ;—এক ফকির।

১৫। গীর্জা জানী ;—সর্দ্দার—প্রধান ব্রাহ্মণপুরুষ।

১৬। টকী ;—ষ্টোরবাগী। ক্রিয়া বিশেষণ,—দুই শত বৎসর পূর্ব্বে উপাধিধারী।

১৭। শৈখজাদা গোসাণা ;—ব্যাঘ্রাপদী-নিবাসী।

১৮। বীরবর ;—ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণনের নিমিত্তই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। সুতরাং অপর পরিচয় অনাবশ্যক।

(ক) সম্রাটের ধর্ম্মমতপরিবর্ত্তনেও, বীরবলের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা তিরোধান তাঁহার যে অধিক কার্য্যকারিতা ছিল, ভবিষ্যদ্বিণী ঘটনা-স্রোত সকলেরই আমাদের বর্ণনায় উত্তম প্রতীতি জন্মিবে। বীরবলের সংসর্গে, ও বুদ্ধিপরামর্শে, তাঁহাকে "সৌর" (সূর্য্যোপাসক) হইতে হয়। তিনিই রাজার হৃদয়ে প্রতিফলিত করিয়া দেন, ভাস্কর দেবতাই সকল বস্তুর স্রষ্টা। শ্লানিল সমতল ক্ষেত্রের শস্য-সমূহ, তুচ্ছ বা মহোচ্চ তৃণ-গুচ্ছ, পাদপরাজির ফল-মূল, জীবজন্তুর উদ্ভিজ্জাদির পরিপক্কতার কারণই কিরণমালী দিবাকর। ভূলোক যে আলোক পায়, তাহাও রবির কৃপায়। সর্ব্বপ্রকার জীবের জীবনই, দিনমণির অনুগ্রহসাপেক্ষ। ইত্যাদি কারণপরম্পরায় অন্যেই এই জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতিষ-মণ্ডলীর মধ্যমণি জ্যোতিষান্ ভগবান্ ভাস্কর, প্রত্যহ আকর,—পূজার আস্পদ। সূর্য্য দেব, পূর্ব্ব প্রদেশে প্রসূতি হয়েন, অতএব উহাই পবিত্র দিক্। পূর্ব্বাস্য হইয়া দেবদেবের বন্দন আরাধন করিলে চিত্তপ্রীতি জন্মে। পূর্ব্ব দিকের অপর ঐতিহ্য—উদয়াচল। পশ্চিম দিক্ অস্তাচল-সংজ্ঞায় বিদিত। এই সব অস্তাচল, দেবার্চ্চকের তত পুরুষ নহে। ধর্ম্মকর্ম্মসাধনের পক্ষে পূর্ব্ব দিক্ যেমন প্রশস্ত, তদ্বিপরীত দিক্ তাদৃশ প্রশস্ত বিবেচিত হইবে না। রবির ন্যায় বহ্নি ও বায়ু, পাষাণ ও পাদপ, উদ্ভিজ্জ ও অনিষে পদার্থ প্রভৃতিও আমাদের আরাধ্য। গো ও গোময়, পুরুষ ও অশ্বত্থ অর্থাৎ—তিলক ও উপবীতও, ঐ হেতুই অবজ্ঞেয় নয়।

বীরবলের যুক্তিতর্কমূলক ঐ মতান্তর, এক উপদেষ্টার ন্যায় বলিয়া, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও তার্কিক,—সকল জ্ঞানালোক কর্ত্তৃক একবাক্যে অনুমোদিত হইল।

(৫) সম্রাট্ কোন বর্ষে রাজা বীরবলকে কহে উদ্দেশ্য সমক্ষেই বলিলেন,—"আমি যথার্থই বিশ্বাসিষ্ঠ হই, বুদ্ধিমান্ লোকেও কেমন করিয়া অবাস্তব ঘটনায় বিশ্বাস করে! মুহূর্ত্তমধ্যে শয্যাত্যাগ ও তৎক্ষণাৎ অন্তঃপথে গগনমণ্ডলে গিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে ১০,০০০ বৎসর কথা কহিয়া পুনরায় শয্যায় উপস্থিতি! পরন্তু কিন্তু খাটোত্তাপে পূর্ব্ববৎ ঈষদুষ্ণ রহিয়াছে! এই সব অবাস্তব বিষয়ে জ্ঞানবান্ লোকে কি করিয়া বিশ্বাস করে?"

(৬) একদা ধর্ম্মান্দোলনে সভাস্থ অতিশয় উত্তেজিত হয়েন। তিনি ধর্ম্ম-আলোচনার একাংশ গ্রহণ করিবামাত্র বীরবর উপহাসবচনে তাঁহাকে তিরস্কার করেন। সভাস্থও প্রত্যুত্তরে অপ্রীতিকর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু মহা-সহিষ্ণু বীরবর তাহাতে বাঙ্নিষ্পত্তিমাত্র করিলেন না। সম্রাট্ কিন্তু অসন্তুষ্ট হইয়াই বলিলেন—"বিষ্ঠাপূর্ণ পাদুকা তোমার মুখে কেমন করিয়া প্রবিষ্ট হইল?"

এই সুযোগে বদাওনী মহাশয় বীরবলকে 'নবরত্নের সারমেয়' এই সুমধুর সম্বোধনে আহ্বান করিয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। সমদর্শিতা, ইতিবৃত্ত-লেখকের এক মহাগুণ। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, বদাওনীতে সে মহাগুণের প্রত্যাশা দুরাশামাত্র।

(৭) আর এক ঘটনায় ধর্ম্মালোচনার আভাস পাইতেছি। দৃষ্ট হইবে, বীরবর ধর্ম্মচর্চ্চার মধ্যবিন্দু।

বীরের প্রবেশস্থ শেখ মোবারক, অকবর সমক্ষে বীরবলকে বলেন,—"আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থে যেমন স্থলবিশেষে প্রক্ষিপ্ত অংশ রহিয়াছে, আমাদের 'কোরাণেও' তাহার অভাব নাই। এই কারণনিবন্ধনই কোন জাতীয় ধর্ম্মপুস্তকে নিঃসংশয় প্রত্যয় স্থাপিত করা দুর্ঘট।" সম্রাট্ বা বীরবর, ঐ বাক্যের কোন প্রতিবাদ বা সদুত্তর করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই।

এই প্রণয়ীর প্রতি গাতশার পক্ষপাতিত্ব বড় বেশী। এক দৃষ্টান্তেই তাহা সুব্যক্ত হইবে।

কোন সময়ে সম্রাট্, স্বয়ং কতিপয় কুলটাকে প্রশ্ন করেন, কাহাদের কর্ত্তৃক প্রথমে তাঁহারা অসতীর পথে পদার্পণ করিয়াছে। তাহাদের কথায় জানা গেল,—বহুবিভবশালী ব্যক্তিগণই ঐ কুকার্য্যের মূলে ছিলেন ও আছেন। তাঁহাদের কাহারও পারীরিক শাস্তি হইল,—কেহ কেহ বা তিরস্কৃত হইলেন। অন্যেরা দুর্গে অবরোধদশায় অনেক কাল যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। কাহারও ভাগ্যে অপর গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইল। এই অপরাধীদের

জিলর বীরবরও থাকা চাই। তিনি না কি অকবরের অভিনব ধর্মসম্প্রদায়ের একজন,—বিনেবরং চিনি আবার ধর্ম-মত-চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠানে সিদ্ধ, সুতরাং তাঁহার দোষ, সবিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু তাঁহার গুরু অপরাধের দণ্ডবিধান, বিপরীত মতই হইল।

যখন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর অকবরের আজ্ঞায়, জায়গীর, জায়গীর, রাগ্যাও; অর্থদণ্ড প্রভৃতি প্রদত্ত হয়, তখনকালে কাবলরাজধানীস্থিত জায়গীরে বীরবর অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ আপীল, তাঁহার শ্রবণগোচর হইলে, তিনি যোগী সাজিবার উপক্রম করিতেছিলেন; কিন্তু অভয় পাইয়া সম্রাটের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন।

রাজা বীরবল যদ্রূপ বাক্যবিন্যাস করিতে পারিতেন, সঙ্গীত-নৈপুণ্যেও সেইরূপ কবিত্বপ্রিয়তাও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য, রসাত্মক বড় বড় কবিতা, সরস বচন, হাস্যজনক গল্প, পরিহাসোদ্দীপক কৌতুক ইত্যাদি, অদ্যাবধি হিন্দুস্থানের গৃহে গৃহে বিবৃতিত নিবদ্ধ সমাদৃত। আর তাঁহার গানের কথা বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।

এঁহার বিরোধিগণের মধ্যে ঐতিহাসিক বদাউনী, শভাজ খাঁ ও অপরাপর কতিপয় স্বজন-ধার্মিক নেই—প্রধান। তাঁহাদের বিপক্ষতাচরণের কারণ, নিতান্ত হীন নয়। তাঁহাদের মূল সংস্কার—বীরবলের প্রভাবেই অকবরের ইস্লাম-ধর্ম্মে বিরাগ—অনাসক্তি। তদর্থেই তাঁহারা বিজাতীয় বিদ্বেষপরায়ণ। কখনও, তাঁহারা রাজাকে আদৌ ভালবাসিতেন না—বরং অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন।

"লালা" তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অল্প পুত্রাদির পরিচয় অপরিজ্ঞাত। রাজা, বিস্তর অর্থের অধিনায়কতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অমিতব্যয়িতা দোষে তাঁহার সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হয়। লোকে বলপূর্ব্বক তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলে, তিনি পথের ভিখারী হইলেন। বিস্তবঞ্চিত হইয়া সংসার তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কবির সাজিলেন। কোথায় আমীরী, আর কোথায় ফকিরী! কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! তদবধি সন্ন্যাসি-সজ্জা ও দারিদ্র্যচর্য্যা, তাঁহার অবলম্বনীয় হইল।

পার্থিব বস্তুর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ঘুচিল। অকবরের ৪৩ রাজ্যাঙ্কে সংসার সম্বন্ধে বিরক্তি। এই বৈরাগ্য, অন্যান্য কারণে কি অযোগ্য অবস্থায় সংঘটিত হয় নাই। অধীনতাত্যাগ ও স্বাধীনতালাভের, তাঁহার লক্ষ্য-স্থল হইয়াছিল।

৩, অকবরনামা, তৃতীয় ভাগ।

জলাঞ্জলি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরশঙ্কর পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "হেমচন্দ্র, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমি আমার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র; তোমার উপর সংসারের ভার দিয়া আমি কাশীবাসী হইব, মনস্থ করিয়াছি। বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, সমস্তই রক্ষা করিয়াও, অপরের করিয়া নষ্ট করিতে তোমাকে দেখিয়া কষ্ট পাইতে হইবে—আমি আর কয় দিনই বা আছি, মনে আশা ছিল—তোমাদের জন্য কত কি করিব; কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। তোমাদের মঙ্গল যাহাতে, ভালমতে, তাহাই করিও। আর দেখিও বাবা, তোমার ছোট ভগ্নী হৈমবতীর যেন কোন রকমে কষ্ট না হয়—তাহাকে কোলে-পিঠে করিয়া আমি আর এ বৃদ্ধ বয়সে মানিব না! বধূমাতাকে বলিয়া দিবে, তিনি যেন হৈমবতীকে আপনার মত দেখেন। কুলীনের বিবাহের যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। নিয়ম মত চিঠিপত্র লিখিও—আমি কি বলিব—তোমরা সুখে থাকিলেই—আমার সুখ।"

হৈমবতীকে জন্মদান করিয়াই হরশঙ্করের পত্নী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হরশঙ্কর একাধারে জনক জননী হইয়া কন্যাটিকে বুকে করিয়া মানুষ করেন। কন্যা যতই বড় হইতে লাগিল, তাহার আকৃতি প্রকৃতি ততই তাহার মাতার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যখন বয়স দশ কি এগারো বৎসর, তখন মেয়েটিকে দেখিলে মনে হইত, যেন তাহার মায়ের মুখ আঁকিয়া ভাবে কে তাহার মুখে বসাইয়া দিয়াছে। চলন চালন, বরণ ধারণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কণ্ঠস্বর, হাসি, সকলই তাহার মায়ের মত। হরশঙ্কর অনেক সময়ে অবাক হইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন—কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য! দেখিতে দেখিতে মৃত গৃহধর্ম্মিণীর সহস্র পূর্ব্বস্মৃতি সুখে দুঃখে মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। মাতৃহারা পুত্র বালিকা কি মন্ত্রবলে বৃহৎ সংসার স্নেহ-আকর্ষণে বৃদ্ধের সমস্ত হৃদয় কাড়িয়া লইল, তাহা জানের অগোচর।

হৈমবতী চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহার বিবাহের জন্য হরশঙ্কর

বিবাহ ভাবিলে ইহাই হইত যে বিবাহের পর কন্যা যে পশুগৃহে গিয়া বাস করিবে, ইহা ভাবিলেও বুকের রক্ত জল হইত। মনে মনে স্থির প্রতিজ্ঞা করিলেন, কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে ঘরে রাখিবেন।

অনেক অনুসন্ধানের পর হরশঙ্কর এক ভদ্র ঘরের রূপবান যুবকের সহিত খুব সমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং জামাতাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিলেন। আহার পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে হরশঙ্কর পুত্র হেমচন্দ্রের সহিত জামাতার সমান ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুত্রকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া হাত-খরচা দিতেন—জামাতাকেও তাহাই করিয়া দিলেন।

বিবাহের দুই বৎসর পরে হৈমবতীর এক পুত্রসন্তান জন্ম লাভ করিল। যুবকের আনন্দের সীমা রহিল না। নূতন বিষয় সম্পত্তি পাইলে লোকের মনে যত না সুখ হয়, বৃদ্ধ ততোধিক সুখী হইলেন।

কিছু বড় না হইতেই শিশু মায় বুড়ার কাছ-ছাড়া হইত না। বৃদ্ধ যখন কথা কহিতে শিখিল, তখন তাহাকে কোলে করিয়া বুরিয়া বেড়াইতেন। "এটা দাও, ওটা দাও" করিয়া ছেলেটি বৃদ্ধকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। "দাদা, গরু রাখ" জুমনি গাড়ী তুলিতে বলিয়া বুলোকে (ছেলেটির আদরের নাম ছিল বুলো) লইয়া "বৃদ্ধ রাজায় একটু ঘুরাইয়া আনিতেন। হরশঙ্কর তামাক খাইতে বসিলে বুলো তাঁহার মুখ হইতে নল কাড়িয়া লইত—নিজে হাতে করিয়া দাদার মুখে নল পুরিয়া দিত—সে ধরিয়া থাকিবে আর দাদাকে তামাক খাইতে হইবে। শিশুর কাছে হার মানিয়া বৃদ্ধ একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন।

বিপিন কালেজে চলিয়া গেলে, হৈমবতী বৃদ্ধ পিতার আহারের আয়োজন করিত। কখনও কখনও নিজে করিয়া পিতার জন্য দুইটি পাক করিয়া আনিত। আহারের সময় ছেলেটিকে কোলে করিয়া পিতার নিকট আসিয়া বসিত। দাদা আসনে বসিলেই বুলো পাশে বসিত, "দাদা খাবে, খাও" যেন তাহার আজ্ঞায় অনুজ্ঞায় দাদা এতক্ষণ বসিয়াছিলেন। "দাদা কিছু মুখে তুলিয়া দিলে অমনি সে তাড়াতাড়ি বলিত, "খালো"—অর্থাৎ "খাও"। শিশুর আধ-আধ মিষ্ট কথাতে বৃদ্ধের শীর্ণ প্রাণও যেন আনন্দে নৃত্য করিত।

পুত্রের নিকট হরশঙ্কর যেদিন কাশী যাইবার কথা উত্থাপিত করিলেন, তাহার পরদিন হইতে সমস্ত আয়োজন করিলেন। আত্মীয় স্বজন সকলে

আত্মীয়-কুটুম্ব [illegible] বিদায় করিল। হৈমবতী বিবাহান্তে পতি-সহ পিতৃমাতৃমুখে আসিল—যখন প্রথম প্রসব করিল, তখন বৃদ্ধা দুই চক্ষে সরিষা ফুল দেখিতে লাগিল। হৈমবতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ মনের দুই চাপিয়া কন্যার মস্তকের উপর শীর্ণ হাতখানি রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মা, কাঁদিও না, তুমি চিরসুখী হও, আমার এই একমাত্র প্রার্থনা।" বুড়ো দাদার কোলে বাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "আমি পথ যাব।" হৈমবতী পাছে পিতার মনে কষ্ট হয়—ছেলেটিকে অনেক কষ্টে ভুলাইয়া লইল। বৃদ্ধ অন্ধকার মনে আস্তে আস্তে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। সোনার পুরী অন্ধকার হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের চলিয়া যেমন তাঁহার অভাব হৈমবতী ও তাহার পুত্র সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করিতে লাগিল। হৈমবতী নানা উপায়ে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিত। সে মনকে বুঝাইত—পিতা সুখে থাকিলেই আমার সুখ—পশ্চিমে থাকিলে এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার শরীর ভাল থাকিবে—চিঠি-পত্রে ত তাঁহার সংবাদ পাইব—ইত্যাদি। কিন্তু প্রবোধ মনে ও পিতার অদর্শনজনিত দুঃখ হৈমবতীকে ছাড়িল না। কিন্তু শিশুর কাছে প্রবোধও নাই, সান্ত্বনাও নাই; বিচারও নাই, তর্কও নাই। সে মনে করিল, হঠাৎ এ কি হইল—দাদা কই, কোথায় গেল! সকালে দাদার শ্রীমুখ যখন কি আসিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বেড়াইতে যাইত, তখন সে মনে মনে তার অপমানিত বোধ করিল। দাদা নাই; কাহার মুখে বল পুরিয়া দিবে, কে পাখী দেখাইবে, কে 'গগ' চড়াইবে? তাহার তারি কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া সে দাদামহাশয়ের ঘরে ঢোকে, আর "দাদা গগ গেছে, টলি গেছে" বলিয়া ম্লানমুখে ফিরিয়া আসে। তাহার খেলা বন্ধ হইল, খাওয়া বন্ধ হইল—সে দিন দিন যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। শিশুরা কষ্ট হইলে কখনো প্রকাশ করিতে পারে না; কেবল মনে-মনে কষ্ট পাইতে থাকে; সেই অল্প মনের কষ্টে তাহাদের শরীর একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। হৈমবতী ছেলেকে ভুলাইয়া অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সে কিছুতেই আর দাদাকে ভুলিতে পারিল না।

দুই মাস অতীত হইতে না হইতে হরশঙ্করের অন্তর্ধানে হেমচন্দ্রের সংসার একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্রের স্ত্রী যতদিন শ্বশ্রূ বর্তমানে ছিল—কিছুই করিতে পারিত না; কিন্তু এখন তাহারই হাত কেন্দ্র করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। শ্বশ্রূ থাকিতে হৈমবতীর সম্বন্ধে যতটা আদর যত্ন ছিল, তাহার অপেক্ষা হৈমবতীর সম্বন্ধে অনেক বেশী, সে নিঃসন্তান বলিয়া হৈমবতী পুত্রবতী—হিংসায় জ্বলিয়া এতদিন জ্বলিয়া পুড়িত। এখন সে যেন ক্ষেপিতে লাগিল। প্রত্যেক বিষয়ে হৈমবতীর সহিত খুঁটিনাটি আরম্ভ করিল। এমন কি, নির্দোষ শিশু খোকাও তাহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া দাঁড়াইল। "মাসীমা! মাসীমা!" করিয়া খোকা লাবণ্যের কোলে উঠিতে চাহিত, কিন্তু লাবণ্য তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিত না। পাছে স্বামীর পড়াশুনায় ব্যাঘাত হয়, সেই জন্য হৈমবতী এ সকল কিছুতে তাঁহাকে কিছুই জানিতে দিত না। নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। পাছে হৈমবতীও এ সব বিষয়ে কিছুই লিখিত না। পরের ভিখারিণী হইলেও নিজের কষ্ট গোপনে পিঞ্জরাবদ্ধ কষ্ট দিবে, হৈমবতীর এমন প্রকৃতিই ছিল না।

লাবণ্য হৈমবতীকে পদে পদে বিব্রত করিতে যখন দুঃখের ভাগ কমাইয়া দিতে আরম্ভ করিল, তখন হৈমবতী স্বামীকে এ সকল বিষয়ে আর না জানাইয়া থাকিতে পারিল না। বিপিন শুনিয়া মর্মান্তিক ব্যথিত হইল, কিন্তু সে আর কি করিবে, তাহার কি ক্ষমতা—পুত্রের অন্নপ্রসঙ্গে তাহার জীবনযাপন! সে কিছুই বলিল না, কেবল অদৃষ্টের চিরপ্রচলিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিবে না—ফার্স্ট আর্টস পাশ করিলেই কোন উপায়ে একটা চাকরীর যোগাড় করিয়া সপুত্র লইয়া আলদা হইয়া থাকিবে।

লাবণ্য স্বামীর নিকট হৈমবতীর নামে রাত্রদিন অভিযোগ আরম্ভ করিল। হেমচন্দ্র তাহাতে বড় একটা কান দিত না। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া যদি বৃষ্টির উপর্যুপরি আঘাতে বৃহৎ অট্টালিকাও ভূমিসাৎ হইয়া যায়—তাহাকে ঘোলাইতে ঘোলাইতে ক্রমে হেমচন্দ্রের মন ভগ্নীর বিরুদ্ধে কিরাইয়া তুলিল, এবং শেষে এমনি একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে হেমচন্দ্র রীতিমত ভগ্নীদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন রাত্রে হেমচন্দ্র আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে যাইবে, লাবণ্য

চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া কহিল, "তোমা ওনেছ, পাশের বাড়ীর নাতি হালদার তার স্ত্রীকে বলেছে,—কর্ত্তা দইইলে অর্দ্ধেক বিষয় তুমিনি নামে লিখে দিয়েছেন। এই একটু আগে হালদারের স্ত্রী এসে আমাকে বলে গেল। তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথায় বল?" ঔরিয়া হেমচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—"বল কি, সত্যি নাকি!" মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার অন্তর হইতে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া গেল—হৈমবতী তাহার পরম শত্রু, এবং যে কোন উপায়ে তাহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, ইহাই তাহার মনে জাগিতে লাগিল। মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিল,—এত দিন কেন সে লাবণ্যের কথা শুনে নাই। রাত্রে ঘুম হইল না।

পরদিন ভোর না হইতে হইতে সরকারকে ডাকিয়া হেমচন্দ্র বলিয়া দিল, আমার বিনা অনুমতিতে বিপিন কিংবা হৈমবতীকে এক পয়সাও দিবে না,—যদি দাও, তৎক্ষণাৎ তোমায় দূর করিয়া দিব। তাহার পর হেমচন্দ্র বাঁধিবার সাইকেল ছাড়াইয়া দিল, তাহার পকেট-বহি বন্ধ করিয়া দিল, এবং পিতাকে চিঠি লিখিল—কুসংসর্গে পড়িয়া বিপিন বাটি হইয়া যাইতেছে—পড়া শুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কাহারও কথা শোনে না; মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছে। এই সকল কারণে তাহার পকেট খরচা বন্ধ করিয়া দিয়াছি ইত্যাদি। উত্তরে বৃদ্ধ হরণকর লিখিলেন, "হেমচন্দ্র, স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমি ত এখন বৃদ্ধ বলিলেই হয়,—তোমার উপর সমস্ত ভার দিয়াছি। তুমিই আমার স্থানীয়। বিপিন যে সৎপথে আইসে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। দেখিও, অতি সাবধানে বিবেচনা পূর্ব্বক স্নেহের সহিত সকল কার্য্য করিবে। হৈমবতী কিংবা আমাকে মনে যাহাতে কষ্ট হয়, এমন কার্য্য কখনও করিও না।" হৈমবতী, বিপিন, তাঁহাকেও কিন্তু বৃদ্ধ এ সকল বিষয়ে কিছু লিখিতে না।

হেমচন্দ্র যখন সমস্ত বন্ধ করিয়া দিল, হৈমবতী তখন আপনার গহনা বিক্রয় করিয়া আবশ্যক খরচপত্র চালাইতে লাগিল। ক্রমে সব নিকাশ হইয়া আসিল।

একদিন অপরাহ্নে বিপিনচন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিলে, হৈমবতী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "আমার বুকের মধ্যে যেন আগুনের মত জ্বলিতেছে,—সারাক্ষণ সে কাঁদিয়া খুন হইতেছে, মাথা চালাইতেছে,—তুমি শীঘ্র ছুটিয়া ডাক্তারকে লইয়া আইস। ও কাহার বিপিনের

মুক্ত জল হইয়া গেল। ডাক্তারের ভিজিটের টাকা কোথায় পাইবে,—কাহাকে কি বলিবে, কে তাহার কথা শুনিবে! হৈমবতী তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট কানের ফুল দুইটি খুলিয়া স্বামীর হাতে দিল। বস্ত্রের মধ্যে কাপড়ের বইগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চটি জুতা পায়ে বিপিন পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কানের ফুল দুইটি এক জায়গায় পকেটস্থায় বাঁধিয়া ডাক্তারের গৃহমুখে তীরবেগে চলিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাস্তায় একে একে গ্যাসের আলো জ্বালাইয়া দিল। আকাশে তারার আলো ফুটিয়া উঠিল। সহরের রাস্তা—কোথাও ব্যাণ্ড বাজাইয়া বরযাত্রী খুব সমারোহে বাহির হইয়াছে; কোথাও পাঁচ ইয়ারে মিলিয়া গলা ধরাধরি করিয়া হাস্যকলরবে চলিয়াছে; কোথাও গৃহপ্রকোষ্ঠ হইতে সঙ্গীতধ্বনি মুখরিত হইতেছে; কোথাও আটচালার মধ্যে কেহ ভোজবাজি তামাসা দেখাইতেছে; প্রতি পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব দৃশ্যপট। কিন্তু বিপিনের চক্ষের সম্মুখে সকলই ভাসিয়া গেল; সে দেখিয়াও কিছু দেখিতে পাইল না—তাহার মনে শুধু জাগিতেছে আপনার দারিদ্র্য ও প্রিয়তম পুত্র বুলোর অসুখের কথা। সে একমনে কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে।

দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে বিপিন, ডাক্তারের বাড়ী আসিয়া পঁহুছিল। আসিয়া শুনিল, ডাক্তার বাবু বাড়ী নাই, রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছেন, কখন্ ফিরিবেন তাহার ঠিক নাই। হতাশ্বাস হইয়া বিপিন ডাক্তারের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। এই ডাক্তারের উপর বিপিনের প্রগাঢ় বিশ্বাস; ইনিই তাহাদের বাড়ীর সকলকে দেখিতেন। যত দেরী হইতে লাগিল,—কালো মেঘের ন্যায় একটার পর একটা ভাবনা আসিয়া বিপিনের হৃদয়-আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল,—একেলা হৈমবতী ছেলেটিকে লইয়া না জানি কি করিতেছে, বিনি চিকিৎসায় ছেলেটি বুঝি মারা গেল। বিপিন একবার ওঠে, একবার বসে; গাড়ীর শব্দ শুনিলেই বাহির হইয়া আইসে। রাত্রি নয়টার পর ডাক্তার বাড়ী ফিরিলেন। বিপিন ডাক্তারকে সবিশেষ জানাইল। তিনি কহিলেন, "আমি এইমাত্র আসিয়াছি, আহারাদি করিয়া পনের পরে যাইব।" বিপিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ডাক্তার মহাশয়, আপনার দুটি পায়ে পড়ি দয়া করে একবারটি চলুন—বুলো যায় যায়।" ডাক্তার অগত্যা বিপিনের সঙ্গে চলিলেন।

ডাক্তারকে লইয়া বিপিন যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সকলে আলো নিবাইয়া যে যার ঘরে গিয়া শয়ন করিয়াছে। কেবল হৈমবতী একলা গৃহের শিয়রে বসিয়া আছে। বাড়ীতে ঢুকিয়া বিপিনের গা ছমছম্ করিতে লাগিল।

রোগীকে দেখিয়া ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বিপিনকে কহিলেন, "অবস্থা বড় ভাল দেখিলাম না, এই ঔষধ লিখিয়া দিতেছি—দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। আর মস্তক ও মাথার বরফ বসিয়া দিবে।" এই বলিয়া প্রেসক্রিপসন্ করিয়া পকেটে চারিটি মুদ্রা পুরিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

প্রেসক্রিপসনটি হাতে করিয়া বিপিন অন্ধকারে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া সরকারকে উঠাইয়া কহিল, "সরকার মশায়, বুলো যায় যায়, দুইটি টাকা দিয়া দয়া করে এই ওষুধটি আনাইয়া দাও—আমি যেমন করে পারি, কাল তোমাকে টাকা দিয়াইয়া দিব। তোমায় জোড় হাত করি এইটে কর।" সরকার মশায় দুইটি চক্ষু মুছিতে মুছিতে রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, "আমি টাকা পাব কোথায়? ঘর থেকে কি এনে দেব? বাবু এক পয়সাও দিতে বারণ করেছেন, আমি কিছুই দিতে পারব না। তোমার জন্য আমি কি পেয়ে চাকরি খোয়াব!" শুনিয়া সমস্ত রক্ত বিপিনের মাথায় উঠিয়া গেল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "পাষণ্ড নির্ঘৃণ, তুই কুলুবের অধম।" গোলমাল শুনিয়া হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি নীচে নামিয়া আসিলে সরকার তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া দিল। শুনিয়া হেমচন্দ্র বিপিনকে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া গালি দিল। উত্তরে বিপিনও হেমচন্দ্রকে কড়া-কড়া কথা শুনাইয়া দিল। তখন হেমচন্দ্র বিপিনের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিল, এবং দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, বিপিনকে যেন কখনও বাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া না হয়।

সেই রাত্রির শেষে দুই একবার "বাবা বাবা" বলিয়া ডাকিয়া বুঝো মায়ের কোলে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনাহারে পুত্রশোকে স্বামীর ভাবনায় মৃতপ্রায় হইয়া হৈমবতী দুই মাস কাটাইল।

ইহার মধ্যে একদিনও বিপিন বাড়ীতে আসে নাই। তবে পাড়ের বাড়ীর মতি হালদার একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে তাহাকে হরশঙ্করের বাড়ীর দরজার কাছে

দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। তার পর কণ্ঠা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

হৈমবতী মনে মনে ঠিক করিল, ছয় এক মাস দেখিয়া তবে পিতাকে সংবাদ দিবে।

একদিন সকাল বেলায় কাশীর বাড়ীর ছাদের উপর বসিয়া বৃদ্ধ হরশঙ্কর জামাকে গাইতে গাইতে বাড়ীর কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে পুলিসের সর্বাঙ্গসুন্দর একটি লোককে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কহিল, "মশায় এই লোকটিকে কি চিনিতে পারেন? ইনি বিনা টিকিটে কেমন করিয়া কলিকাতা হইতে বেনারস আসিয়াছেন। ষ্টেশনে ইহার নিকট টিকিট চাহিলে ইনি পকেট হইতে একটি দেশলায়ের বাক্স বাহির করিয়া দেন। পুলিসে ইহাকে ধরে। এজেহারে ভদ্রলোক বলিলেন যে, তিনি হরশঙ্কর বাবুর জামাতা—ভাই ইনস্পেক্টর বাবু আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

তুনিয়া হরশঙ্কর কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুলিস কর্তৃক আনীত লোকটির মুখের কাছে মুখ আনিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে অনেক ক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আঁ, একি! বিপিন! এমন বেশ, এমন চেহারা কেন? কি হইয়াছে? বাড়ীর সব ভাল ত? হৈমবতী বুলো ভাল ত?" আহে লোক না সঙ্গ করিতে পারেন, তাই বুলোর মৃত্যুর কথা তাঁহাকে কেহ বলে নাই। বিপিন বৃদ্ধের মুখের পানে প্রায় পনের মিনিট হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "বুলো, ওষুধ।"

হরশঙ্করের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বিপিনের মাথা একরূপ হইয়া গিয়াছে।

টিকিটের দাম দিয়া হরশঙ্কর পুলিসের লোককে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহার পর বিপিনকে ভাল করিয়া তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া খাওয়াইলেন। বুড়ার আর সে দিন খাওয়া হইল না। সমস্ত ক্ষণ জামাতাকে কাছে লইয়া বসিয়া রহিলেন।

হরশঙ্কর বিপিনকে যাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহারই উত্তরে সে বলে, "বুলো, ওষুধ।" বৃদ্ধ বিপিনের হঠাৎ এরূপ হইবার কারণ কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন, হয় ত সাপ খাইয়া মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; আবার ভাবিলেন, না, তাহা নহে। ঠিক খবর জানিবার জন্য তিনি

বাত হামেশাকে চিঠি লিখিলেন। উত্তরে মাই বড়দার মৃত্যুসংবাদ, হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক বিপিনের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হওয়া, সকলই জানিয়া লিখিল। চিঠি পাইয়া হরপ্রসন্ন অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন, আর উঠিতাম করেন না। তিনি একখানি পত্র কোন একটী নিকট আত্মীয়কে কলিকাতা হইতে আনাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহার উপরে বিপিনের সমস্ত ভার দিয়া, বিপিনকে তাড়াতাড়ি বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণীটিকে মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিলেন। হেমচন্দ্রকে লিখিলেন, "তুমি আমার কেহ নও, তোমার আর মুখ দেখিতে চাহি না। নিজ ক্ষমতা হইতে তুমি বঞ্চিত হইলে। উইলে সমস্তই হৈমবতীকে দিলাম। সত্য সত্যই উইল করিয়া সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হৈমবতীর নামে লিখিয়া দিলেন। সেটা গোপনে পুরিয়া, উইলটী হৈমবতীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

দুঃখের ভার বেশী দিন সংসারবন্ধনী ভোগ করিতে হইল না। এক মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার স্বর্গীপ্রাপ্তি হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিপিন যখন বাড়ী আসিয়া পঁহুছিল, তাহাকে দেখিয়া হৈমবতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পরে যখন সংজ্ঞালাভ হইল, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের ভার যখন কিঞ্চিৎ লঘু হইল, উঠিয়া আসিয়া নিকটে বসিল। তাঁহার সেই মলিন রেখাঙ্কিত মুখ, অত্যন্তস্থার সেই অধরের চাহনি দেখিয়া হৈমবতীর প্রাণ কাঁদিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। কিছুক্ষণ ধরিয়া এক দৃষ্টে হৈমবতীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, কেহ কাহারও মুখে কথা নাই, কি বলিতে চাহে কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া "বুলো, ওঠ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হেমবতী আর আপনাকে রাখিতে পারিল না, স্বামীর পদতলে লুটিয়া পড়িয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল।

দিনের পর দিন যায়। মনের কষ্ট চাপিয়া হৈমবতী স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

একদিন [illegible] পর আপনার ঘরে বসিয়া [illegible] ভাবিতেছে, এমন সময় হেমচন্দ্র [illegible]

দেখিল, হৈমবতী কাঁদিতেছে। অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হেমচন্দ্র বলিল, "হৈম, না বুঝিয়া অনেক দোষ করিয়াছি, মাপ কর। বাবা তোমাকে দিয়া গেছেন—আমাদের দাঁড়াবার স্থান নেই, আমাদের জন্যে কি কিছু সম্বল রেখে গেছেন?" হৈম চক্ষু মুছিয়া কহিল, "দাদা, আমার আর কে আছে! যারা ছিলেন তিনি গেলেন, বুঝে বিনি চিকিৎসার ভার নেন, তাঁরই ত এই অবস্থা করেছি ও জলাঞ্জলি দিয়াছি, বিষয় লইয়া আর কি করিব? তবে যোয়াকে পেশাক চিকিৎসার জন্য প্রেণপতাকারের একটা ভাল বন্দোবস্ত করে যাও। আমি সকলি তোমাকে দিতেছি।" এই বলিয়া পাত্র হইতে উইল বাহির করিয়া হেমচন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল, "এইটুকুর জন্য ছিঁড়িয়া ফেল; তা হলেই ও বিষয়ের সম্পত্তি তোমার হইল।"

তাহার নিঃস্বার্থপরতা দেখিয়া হেমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

হৈমবতী সকলে খুলাঞ্জলি দিয়া শেষে কিছু দিন পরে রোগাক্রান্ত বাপ-মায়েরও জলাঞ্জলি দিল।

মৌর্য্য-সম্রাট অশোক।

প্রথম প্রস্তাব।

জনৈক জর্ম্মান লেখক বলিয়াছেন,—অধিকসংখ্যক লোক যাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং অধিকসংখ্যক লোক সসম্মানে যাঁহার নামোল্লেখ করে, তাঁহাদেরই মধ্যে অধিক মনস্বী বলিতে হয়, তবে অশোক, শার্লেমেন ও ফ্রেডিরিক নীলাবের অপেক্ষাও অধিক যশস্বী। (১) ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গগনে অশোক-চরিত প্রভাকরের সহিত উপমেয়। কিন্তু অজ্ঞানতার অন্ধকারে ও পৌরাণিক কুজ্ঝটিকায়, তাঁহার জ্যোতিঃ ও প্রখরতা, দোষ ও গুণ, সকলই সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই অন্ধকার যথাসম্ভব দূর করিয়া পৌরাণিক অংশ হইতে ঐতিহাসিক অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যখন আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশ আক্রমণ করেন, তখন একজন নীচকুলোদ্ভব মোকা মগধ রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া

(১) Köppen Die Religion des Buddha.

ভারত-সম্রাটের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সে সেলেকস্‌ ও তাঁহার পিতার নিকট সন্ধির প্রার্থনা করে। সেলেকস্‌ তাহাতে সাহায্য দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু কার্যে অগ্রসর হইয়া, তাহাকে বিনষ্ট করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। যাহা হউক, খৃঃপূর্ব ৩২৫ বৎসরে খাল্‌কো-ষ্টিস নিজ রাজ্যে প্রতিনিধি রাখিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। এই সুযোগে চন্দ্রগুপ্ত ক্রমে ক্রমে গ্রীক প্রতিনিধিদিগকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত পঞ্জাব অধিকার করেন। কিছুদিন পরে (খৃঃপূঃ ৩১৬ বৎসরে) সেলেকস্‌ ভারত আক্রমণ করেন। মগধের রাজা (পৌরাণিক মতে নন্দ), তাঁহার পরাজিত ও নিহত হইবেন। সেই যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত (গ্রীক Sandrokottos)। হিন্দু পৌরাণিক মতে তিনি নন্দের এবং মৌরাকুলের হাতীর পুত্র। চাণক্যের সাহায্যে মুদ্রা-বিদ্যা ও নানারূপ বিদ্যা অর্জন করেন। (২) বৌদ্ধ কিম্বদন্তীর মতে, চন্দ্রগুপ্ত মৌরিয় নগরের ক্ষত্রিয় পতি এবং মোরি। নগরের রাজবংশ বুদ্ধের পরবর্তীয় কতকগুলি ক্ষত্রিয় হইতে উদ্ভূত। (৩) যাহাই হউক, চন্দ্রগুপ্ত প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি নর্মদা পর্যন্ত একাতপত্রাধীন করেন। তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপ দর্শনে সিরিয়ার গ্রীক সম্রাট সৈলিউকস্‌ (Seleukos) সেলিউসিডাই-দিগকে তাঁহার নিকট দূতস্বরূপে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এই চন্দ্রগুপ্তই মৌর্য সাম্রাজ্যবংশের কুলপতি।

সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ২৯১ বৎসরে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ পৌরাণিক মতে তাঁহার নাম বিন্দুসার; গ্রীক মতে তাঁহার নাম অমিত্র কেডিস (Amitra Chates = শত্রুকে জীবন্তে কেতু বা শত্রুবিনাশক)। গ্রীক বিবরণে দেখা যায়, সিরিয়ার রাজ দূতস্বরূপে আন্টিওকসকে (Antiochus) ও মিসর রাজ দ্বিতীয় টলেমি (Ptolemy II) দূতস্বরূপে ডায়নিসিয়াস (Dionysius ও রোম হইতে বাসিলিওস্‌ (Basilius) নামক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। (৪) বিন্দুসার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইবার নয়, তাহা সামান্য ও অনিশ্চিত। তিনি যে সাম্রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তখন কোন প্রমাণ পাওয়া

(১) বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকদ্রষ্টব্য।

(২) Beal's Si-Yu-Ki or Buddhist Records of the Western World, pp. XVII and 128 note 23.

(৩) Weber's History of Indian Literature, 291 note.

[illegible] বিন্দুসার বিম্বিসারের [illegible] ইহাঁর মাতার নাম [illegible] ইহাঁর [illegible] হইয়াছিল। [illegible] মতে রাজ্যারোহণের [illegible] বিন্দুসার [illegible] [illegible] সিংহাসনারূঢ় [illegible] [illegible] [illegible]

...করিতে দক্ষ করা ও ...ভূমণ্ডলে চুর্ণ করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। (৬) তিনি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, এবং রাজ্যের ...সর নানা দিগ্বিজয়ে অতিবাহিত করেন। এই দিগ্বিজয়কালীন ...কলিঙ্গসেনা ও অন্তপুরবাসীদিগকে বিনাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

...দেশ গিরিলিপিতে কলিঙ্গ যুদ্ধের বিবরণে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অশোক স্বয়ং কহিয়াছেন,—

"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ অভিষেকের অষ্টম বৎসর পরে কলিঙ্গ জয় করেন। তাহাতে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক [illegible] হয় [illegible] লক্ষ লোক [illegible] নিহত হয়; ও তাহার অনেকগুণ লোক বিনষ্ট হয়।" (৭)

...অশোক অবস্থায় অশোক যে কোনও বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা বোধ হয় না; ও নামমাত্র হিন্দু ছিলেন। বৌদ্ধ-কিম্বদন্তীমতে, প্রথম জীবনে তিনি বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়িত করিতেন; তাঁহারই আদেশে বুদ্ধগয়ার মহাবোধিদ্রুম কর্ত্তিত হয় (৮) এবং তিনিই কপিলবস্তুর সন্নিকটস্থ রাজধানীতে বুদ্ধদেবের স্মরণার্থ সংস্থাপিত আটটি স্তূপের মধ্যে সাতটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ প্রদান করেন। (৯) অশোক বাহিরে যেমন ছিলেন, গৃহেও তেমনই ছিলেন; তাঁহার ওরসজাত বিবাহিতা মহিষী ও অবিবাহিতা প্রণয়িনীতে পূর্ণ ছিল। তিনি মাংসপ্রিয় ছিলেন। ১ নং গিরিলিপিতে প্রকাশ,— "পূর্ব্ব খুপদোর জন্য দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর পাকশালায় বহুদিন হত্ত পশুবধ হইত।" (১০) অশোক অত্যন্ত বিহারপ্রিয় ছিলেন। রাজ্যের নানা স্থানে ভ্রমণকালে তিনি শিকার করিয়া সময় কাটাইতেন। অপর গিরিলিপিতে প্রকাশ,—বহুদিন-পূর্ব্বে দেবপ্রিয়গণ যখন বিহারযাত্রা করিতেন, তখন মৃগয়া ও অন্যান্য তদ্রূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। (১১)

প্রথম বয়সে অশোক কিরূপ লোক ছিলেন, এই বিষয়ে ইহা

---

(৬) Beal's Fa-hian in S-Yu-ki, ch. XXXII and Eitel's Essay, pp. 53-7.

(৭) Dr. Bühler's Epigraphia Indica vol. II. pp. 366-[illegible]

(৮) কনিংহাম সাহেব সারনাথস্থ ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ ভাঙ্গিয়াই ইহা স্থির করিয়াছেন।

(৯) Beal—Si-yu-ki II. p. 117.

(১০) Edicts of XXVII, XXVI.

(১১) Epigraphia Indica Vol. II. pp. 240.

(১২) Epigraphia Indica Vol. II. p. 250.

তাহার কণ্ঠকটা অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি বীর, প্রভুভক্ত পরিশ্রমী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সহিষ্ণু, এবং ন্যায়পরায়ণ রাজার অধীনে এরূপ লোক ঘটনাচক্রে সামান্যাবস্থা হইতে সুপ্রসিদ্ধ মানবের কৃপালাভে পরাইতন্ত্রী সখিও হইতে পারে। প্রথম অবস্থা অপেক্ষা অনেকটা মানবতুল্যই হইয়াছিলেন, এরূপ হইবার কারণ দুই হয়। প্রথমতঃ, তখনি তাঁহার বয়স অল্প (অভিষেক কালে বয়স অধিক নহে, সম্ভবতঃ পঞ্চবিংশতির কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ; কাজেই বাল্য অপরিপক্ব, কিন্তু ভোগাভিলাষ ও কর্ম্মাভিলাষ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান) দ্বিতীয়তঃ, অভিষেকের পূর্ব্বে কিছু দিন তিনি অকর্ণধার শাসনকর্ত্তা ছিলেন; যাঁহারা শ্রীহট্ট প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, বা সহ্যাদ্রেশের খ্রিষ্টিয়ান মিসনরির সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, পর্ব্বতময় প্রদেশে বা তদপেক্ষাও পার্ব্বত্য প্রদেশে সভ্য জীবনের মূলা অতিমাত্রায় বলিয়াই বিবেচিত হয়; সেখানে ইতর বিশেষ, যুক্ত, লাতুবিবাদ প্রভৃতি এমনই সাধারণ যে, কেহ আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিলে প্রতিশোধ দেওয়ার পীড়নকর্ত্তার পক্ষে নিহত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। তৃতীয়তঃ, প্রথমে সহজে রাজ্যলাভ করেন নাই; ভ্রাতৃষ্বয় যুদ্ধে নরবর্ম্মকে বধ করিয়া তবে পিতৃসিংহাসন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় অশোকের ন্যায় দুর্দ্দমনীয়চেতা লোক নমতাপন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পড়িবেন ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ আছে কি? অশোকের জীবনের প্রথমাংশের সহিত খ্রীষ্টিয়ান সাধু সেণ্ট অগষ্টাইনের জীবনের প্রথমাংশের প্রভূত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে অশোকের রাজত্বের দ্বিতীয়াংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এ অংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রধানতঃ গিরিলিপিমালার উপর নির্ভর করিতে হইবে। প্রথম গিরিলিপিখানায় তাঁহার রাজত্বের সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্তের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত অনুশাসনের পূর্ণাংশ বা সকল গিরিলিপি পাওয়া গিয়াছে;

১। কাশ্মীরের পশ্চিমে সোয়াত অধিত্যকায় শাহাবাজগড়ি;

২। পেশোয়ারের নিকট কপূর্দ্দিগিরি;

৩। হজরার পশ্চিম ভাগে শিলবার;

৪। বোম্বাই প্রদেশে টানা জিলায় সুপারা;

গর্ভাঙ্কে লিখিত হইয়াছে। ভৌগড়
ধৌলী ভুবনেশ্বরের নিকটে তিনটি চিহ্নের উপরে অঙ্কিত;
ভাণ্ডার ডেরা ডুন জিলায় কালসি।

এখানে উল্লেখ সাধারণতঃ চতুর্দশ, তবে ভৌগড় ও
। এতদ্ব্যতীত কোন কোন লিপির অর্দ্ধাংশমাত্র পাওয়া
গিয়াছে। বস্তুতঃ অশোকের রাজত্বের চতুর্দশ বৎসরে
এই সকল গুরু অক্ষরে প্রচারিত; ইহাতে অনুমান
নিতে নিতে হইয়া সীমান্তবর্ত্তী অন্ধ্রসমূহে প্রেরিত হইবা
তে অশোকও এ কথা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন।
কলেবর লিপি হইতে গিরিনিপির সহিত অশোকের
যে বুঝা যায়। অশোক লিখিতেছেন যে,
ই (সিংহল) দেবপ্রিয় (প্রিয়দর্শী) মুখ্য বিজয় বলিয়া
বিবেচনা; তাই দেবপ্রিয় পাঠাইয়াছেন (নিজ
অপেক্ষা ৫০৪—ছয় শত যোজন দূরে যেখানে অন্তি-
যোক নামে রাজা, এবং তাহার পরে যেখানে চারি জন
নামে রাজা, মক নাম, আলিকসুদ
চোলপাণ্ডিয় পর্য্যন্ত এবং হিড় রাজ্য ও। (১৩)
নের সত্য (২৫)
দ্বিতীয় আন্তিয়োকস (Antiochus II) সিরিয়ারাজ (২৬১

টলেমেয়স (Ptolemaeus II) মিশর-রাজ (মৃত্যু খৃঃ

—আন্তিগোনস্ গোনাতস্ (Antigonus gonatus) মাসি-
দূর (মৃঃ খৃঃ পূঃ ২৩৯)

(Magas) সিরিনি-রাজ (মৃঃ খৃঃ পূঃ ২৫৮)

আলিকসুন্দরো—আলেকজাণ্ডার। Alexander
খ্রীঃ পূঃ ৩৭২-৩২৩)

দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মলিপি সকল খোদিত করিবার সময় অশোক ও আলিকসুন্দরো জীবিত ছিলেন। অতএব ধর্ম্মলিপি খ্রীঃ পূঃ ৩২৩-২৫৮ ধরা যাইতে পারে।—খ্রীঃ পূঃ সময় নির্দ্ধারণ করা যায় না।

এই সকল ধর্ম্মলিপি হইতে রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে রাজ্যের অবস্থান করা যায়। উত্তরে হিমাচলের পাদদেশ পশ্চিমে ভারতভূমির বর্ত্তমান সীমা ও ভারত মহাসাগর অর্থাৎ রেখা বা গোদাবরীর উত্তরাংশ, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর সাম্রাজ্যমধ্যে নিম্নলিখিত নৃপতি ও স্থানীয় জাতিগুলির নাম পাই।—

পশ্চিমে যবনাধিপতি যেনরাজ আংতিয়োক ও তিন পুত্র (কমণ?) কেরলপুত্র, (মালাবার-উপকূল) চোড়, (সিংহল)। অপরান্ত জাতি সকলের মধ্যে—যবন, কাম্বোজ, রিষ্টনিক, পিত্তনিক, ভোজ, অন্ধ্র ও পুলিন্দ।

যাইতেছে, রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অধীনতায় ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কোন নৃপতি সে রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এমন কোন ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায় না। ইহার মধ্যে কতটা তাঁহার পৈতৃক, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

তিনি যে অভিষেকের আট বৎসর পরে (অর্থাৎ নবম বৎসরে) কলিঙ্গ জয় করেন, সে কথা তিনি স্বয়ং ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য ভাগ ও পশ্চিম সীমান্তের কতকগুলি জনপদ অধিকার করেন। তিনি যে রাজ্যবিস্তারে ধৈর্য্য ও সমরনিপুণ ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। "মহাবিজয়ে হি" নরাধিপে বহুদোষ ক্ষয় করিয়াছি, চতুর্দ্দশ গিরিলিপি এই গর্ব্ব ভিত্তিতে অশোক রাজ্যের শাসনপ্রণালী কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছি বোধ হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান দিবস "মহামাত্র" নামে

(১) ২য়, ৯ম ও ১৩শ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

[illegible] অঙ্কিত। (১৮) সমস্ত সাম্রাজ্য [illegible] এক একটি প্রদেশ এবং প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন "প্রাদেশিক" বাস করিত। প্রাদেশিকগণ কতকটা নোবল সুবাদার বা ফ্রান্স কমিসনরের [illegible] কতকগুলি প্রদেশ একত্রে করিয়া এক একটি প্রান্ত গঠিত হইত; "রাজুকের" অধীনে থাকিত। (১৯) তক্ষশীলার ও সৌবরের বিদ্রোহ [illegible] সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি বৃহৎ প্রান্তে বিভক্ত করা হইয়াছিল। যথা—

১, উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা ও তোসলি। উজ্জয়িনীর, তক্ষশীলার ও তোসলির শাসনভার এক একজন রাজবংশীয় "কুমারের" হস্তে ন্যস্ত থাকিত। (১৮) এতদ্ব্যতীত, সকল সমাচার জ্ঞাত হইবার জন্য সম্রাট "প্রতিবেদক" নামক এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা প্রজা ও অন্যান্যগণের দ্বিতীয় রাজধানী সমাচার জানাইত। (১৯) অভিষেকের [illegible] পাটলিপুত্রে [illegible] অশোক এক নূতন শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর সৃষ্টি করেন। তাহারা "ধর্ম্মমহামাত্র" নামে অভিহিত। তাহাদিগের [illegible] ধর্ম্মপ্রচার ও ন্যায়-সংশোধনকল্পে তাহারা সাম্রাজ্যের [illegible] তির ও সকল সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিত। এই [illegible] নির্ব্বাহের জন্য যথাযথ উপায় অবলম্বনের ক্ষমতাও তাহাদিগের ছিল। [illegible] প্রদেশের, এমন কি, তাঁহাদিগের অন্তঃপুরবর্ত্তিনী মহিলাদিগের উপরেও [illegible] ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ প্রভাবে প্রযুক্ত ছিল।

পণ্ডিতবর [illegible] ক্রমশঃ।

অশোকলেখ—। শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

---

১) [illegible] ২০৭)

[illegible] rson's translation of M. Senart's Article. I. A. 20.

২) [illegible] দ্বিতীয়, ১৮—৭,

৩) [illegible] ২৫১) [illegible] ৩৬৯।

৪) [illegible] Senart. Ind. Ant. 1890. pp. 56, 96.

৫) [illegible] ৩৬৯ [illegible] ভুল নম্বরের নিম্নে [illegible] দিল।

৬) [illegible] ৩৬৯।

৭) [illegible] ৩৬৯।

ভেক।

[illegible] পণ্ডিত [illegible] বিভিন্ন [illegible] ভেকের [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ভেক [illegible] করে। [illegible] জীবের [illegible] পায়। [illegible] ভেক [illegible] হইলে [illegible] ফুলিয়া [illegible] হয়। [illegible] ভেকমাত্রই [illegible] [illegible] ভেক [illegible] বাহির [illegible] [illegible] ভেক [illegible] [illegible] ভেক [illegible] [illegible] ভেক

ভোজনপ্রবৃত্তি বিদিত ছিল; এজন্য সংস্কৃত ভাষায় ইহাদিগের আখ্যা 'মণ্ডূক'।

যে জাতীয় ভেক যেরূপ বর্ণ-বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে বিচরণ করে, তাহাদিগের বর্ণও তদনুরূপ হইয়া থাকে। পীনার আবৃত স্থলে যে ভেক বিচরণ করে, তাহাদের বর্ণ হরিদ্রাভ হরিৎ; কর্দমীদিগত-কীটকুলভোজী ভেক স্বভাবতঃ শৈবাল-সমাচ্ছন্ন প্রাচীরের পার্শ্বে যে ভেক নিরন্তর বিরাজ করে, তাহার বর্ণও প্রাচীরানুরূপ ধূসর। এই বর্ণবৈচিত্র্য জীবনসমরে ভেক-কুলের পরম সহায়। ইহারা বিচরণভূমির বর্ণের সহিত মিশিয়া ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকে। ভেক-ভক্ষক কোনও প্রাণী তখন সহজে ভেককে চিনিতে পারে না; সুতরাং অকস্মাৎ হইতে বাঁচিয়া যায়। পক্ষান্তরে, যে সকল প্রাণী ভেককুলের ভক্ষ্য, তাহারাও ছদ্মবেশী ভেকদিগকে চিনিতে পারে না; সুতরাং ভেকগণ অনায়াসে তাহাদের শিকার করিয়া জীবনধারণ করে। কিন্তু এই অপরূপ বিচিত্রতা কি তাহাদিগের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল? অথবা পুরুষানুক্রমিক বাবাবাহিক প্রয়াসের ফল? এই শেষোক্ত প্রমাণ, ক্রমবিকাশ-প্রণালীর অধ্যাপকগণ যাহাকে 'ন্যাচ্যুরাল্ সিলেক্‌শন্' বলেন—সংঘটিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। জীবজগতে প্রাণীতে প্রাণীতে, প্রাণীতে উদ্ভিদে, এবং উদ্ভিদে উদ্ভিদে যে অবিরাম জীবনসংগ্রাম নীরবে চলিতেছে, তাহার নিষ্পত্তি সকলেই বলপূর্ব্বক প্রস্তুত। এই মহারণে কেহ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া সম্মুখ-সমরে অগ্রসর হয়, কেহ বা বালি-বধের ন্যায় গূঢ় নীতির অনুসরণে তৎপর। আবার কেহ বা রাক্ষসী মায়ার মোহজাল বিস্তার করিয়া বশীকরণে প্রবৃত্ত। রাক্ষসী মায়ার সহিত বর্ণবৈচিত্র্যের তুলনা করা অসঙ্গত নহে। জীবন-সংগ্রাম ব্যাপারে, আমার মনে হয়, দুইটি পৃথক বুদ্ধি কার্য্য করে। ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও জাতিগত বুদ্ধি। মৃগকে ধরিবার নিমিত্ত সিংহ ধাবিত হইলে, মৃগের তৎস্থলে পলায়নচেষ্টা তাহার ব্যক্তিগত বুদ্ধির ফল; এবং তাহার পদচতুষ্টয়ের দ্রুতপলায়নোপযোগিনী গঠনপ্রণালী মৃগজাতির জাতিগত বুদ্ধির ফল। জাতিগত বুদ্ধির সত্তা সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির অজ্ঞাত। কথাটা নূতন হইলেও, সাধারণ্যে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না। আশা করি, সুধীগণ ইহার বিচার করিবেন। যাহা হউক, ভেকগণের বর্ণবৈচিত্র্য যে জীবন-সংগ্রামের জন্য, তদ্বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইবে না। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ভীত বা কোপান্বিত হইলে কোন কোন ভেকের গাত্র হইতে বিষাক্ত ক্ষরণ-পদার্থ নির্গত হয়;—তাহাও জীবন-সংগ্রামের জন্য।

...ওই আড়ালে একটি পৌরুষদীপ্ত উজ্জ্বল মুখ। বরণ করিতে আসিয়াছে নিশ্চয়ই বিপ্লবী যুবক।

সামরিক ভেরীর গোরু মানে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা গোমাংস এবং গাভিন গোরুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যে কথা কোন কারণে একটু গুরুতর গোমাংসশ্রেণীর নিষ্ঠুর শ্রেণীর হইয়াছিল। ওই সী. প্রসাদচন্দ্র গরিবাভাবের ড্রাইভারের অবহেলা করিয়া দেন। ক্রমে উহা এমন—পোষ মানিয়াছিল যে লোকে উহার গায়ে হাত বুলাইলেও পলাইবার চেষ্টা করিত না। পরিবার যখন ভোজনে বসিতেন, তখন তাহাকে টেবিলের ধারেকাছে হাঁটিতে দেখিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিত। যখন সকলে ভোজন আসনে প্রবৃত্ত, তখন তাহার অধিকাংশ সময় টেবিলে কাটিতেছে, এখনও যা ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত দুই-একটি মিষ্টান্ন কণিকা বুঝি বা গৃহদেবের হাতের কাছে পৌঁছাইয়া দিবে। মানবসহবাসে সে অভিশয় বশবর্তী হইয়াছিল। একদিন একটা ছুঁচো তাহার একটি চক্ষু বিদ্ধ না করিয়া দিলে বোধ হয়, সে কটি আরও অধিক দিন বাঁচিতে পারিত। মধ্যাহ্নের পর হইতে তাহার ভোজনে অরুচি হয়; এবং তাহার শরীরে ভবাইয়া ভবাইয়া পচন ধরিতে আরম্ভ হয়।

ডাক্তার ধুরন্ধর বহুক্ষণ ধরিয়া নানা পরীক্ষা করিতেছেন। কাটা কাটিতে কাটিতে শেষে ফেরত আসার অনেক পরে, কাহারও কাহারও কাছে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে রাসায়নিক পরীক্ষায়, এরূপ অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, ভেজাল যে মনুষ্যের সমান বাঁচিতে পারে, তাহার সম্ভব নাই। ডাক্তার এই কথায় ও সামান্য প্রক্রিয়ায় নিখুঁত প্রমাণ নির্ধারিত করিয়া দুনিয়ার একটি দিক উজ্জ্বলতর করিতে পারে। কোনও কোনও পুরুষের ক্ষেত্রে যদি বুড়িকালে হইতে মৃত্যুর ভেতরের সাধারণ ভাব অল্পে অল্পে নির্দিষ্ট করিলে উহাতে জীবনের সকল রঙ্গ নিকট হইয়া উঠে।

ভেজালের মাংস ও পেশীর সহিত চর্ম নিখুঁতভাবে সংলগ্ন থাকে। এই জন্য ভেজাল মাংস ও চর্মের ব্যবধান তুলে নাড়ু গ্রহণ করিয়া দেহ উজ্জ্বলতর করে। চর্মের এই একার সংযোগ-বিয়োগ, প্রত্যহিত হইলে তেমন কোন কষ্ট অনুভব করে না। উহাদিগের অবশ্যই নিম্নে অবয়বগুলি ভেজাল কোন প্রাণীর দেহ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিয়াছে, তেমন প্রাণী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না। এই বিশ্লেষণে, সম্ভবতঃ বিজ্ঞান দয়ালু বৈজ্ঞানিক

কও ইহাদিগের বীর্য খণ্ডিত করিয়া, যখন ইহাদিগের শরীরে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া, নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

আমাদিগের দেশের কোন কোন স্থানে এক প্রকার ছোট ছোট ভেক দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও তাহাদিগের পক্ষ নাই, তথাপি তাহারা আপনাদিগের শরীর বায়ুপূর্ণ করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে এরূপ ভাবে লাফাইয়া পড়ে যে, তাহা অবলোকন করিলে মনে হয়, যেন উড়িয়া যেতেছে। উহাদিগের যথা তথা পদপ্রান্তে সংলগ্ন হংসাদির ন্যায় সংযুক্ত নখর (?) উড্ডয়ন বিষয়ে সহায়তা করে। জীবতত্ত্বের গ্রন্থে যে উড্ডীয়মান ভেকের বিবরণ পাঠ করা যায়, তাহাদিগেরও যথা তথা সংযুক্ত-নখর।

ভেক ডাকে কেন? বিশদরূপে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুকঠিন হইলেও, প্রসন্নচিত্তে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এ ডাকের সহিত প্রেমের কোন না কোন সম্বন্ধ আছে। বর্ষাকালে বৃষ্টির পূর্বে ভেক রব করিতে থাকে বটে, কিন্তু বর্ষাকালেই তাহাদিগের গর্জন-ধ্বনি। ভেকবধূগণকে ডাকিবার জন্যই ভেকবরগণ যে কলরব মুখরিত করেন না, তাহা কে বলিবে? বিদ্যুন্নীলকে সম্ভাষণ করিবার জন্যই যখন বিহগ কাকলী-সুধাধারায় দিগন্ত প্লাবিত করে, তখন ভেকগণের রবের তাৎপর্যও যে তদনুরূপ নহে, তাহা কে বলিবে?

কোন কোন জাতীয় ভেকের জিহ্বা নাই। তাহারা কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির করে। ভেকদিগের স্ত্রীগণ অপেক্ষা পুরুষগণের স্বর অধিক তীব্র। কোন কোন ভেকবধূর আদৌ স্বর নাই। তাহাদিগের স্বামিগণ বোধ হয়, দুঃখে মনঃকল্প করিয়া থাকে; তাহাদিগকে আদৌ গৃহিণীর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না।

সন্তান প্রতিপালনে কোন কোন জাতীয় ভেক-দম্পতির অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখা যায়। সুরিনাম ও বেজিল দেশে একপ্রকার ভেক বাস করে; তাহাদিগের অণ্ড প্রসূত হইলে, পুরুষ ভেক উহা তাহার স্ত্রীর পৃষ্ঠোপরি স্থাপন করে; স্ত্রীভেক তৎক্ষণাৎ তাহা বহিয়া লইয়া জলমধ্যে গমন করে। তথায় ডিম্বগুলি তাহার পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া গিয়া কোটক উৎপন্ন হয়। সেই কোটকের অভ্যন্তরে কিছু দিন থাকিয়া ডিম্বগুলি ফুটিয়া বাহির হয়। তখন ভেকমাতা কোটকের পরিহার করে। ব্রাজিল ও সুইটজারলণ্ড দেশে একপ্রকার ভেক আছে; সেই জাতীয় পুরুষ ভেক স্ত্রীর পশ্চাদ্ভাগের পদে ডিম্ব জড়াইয়া, তাহা বহিয়া থাকে।

শতবর্ষ পূর্ব্বে বদরিকাশ্রম।

৺ বদরীনারায়ণ হিমালয়-ভ্রমণকাহিনীর যে দুই একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই অনুসন্ধান করিতাম। সৌভাগ্যক্রমে Asiatic Researches-এ একদা এই বদরিকাশ্রম-ভ্রমণকাহিনী পাঠ করি। Captain Webb প্রমুখ তিন জন ইংরেজ, এই বৎসর হইতে ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে, হিমালয়-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বদরিকাশ্রমে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা লিখিত পত্রে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। আজ সাহিত্যের পাঠকবর্গের নিকট সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সারভাগ সঙ্কলিত করিলাম।

বদরিনাথ সহর ও দেবমন্দির পুণ্যসলিলা অলকনন্দার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এই নদীর উপত্যকা দীর্ঘে দুই ক্রোশ, এবং উহার বিস্তার কোন স্থানেই অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক নহে। এই উপত্যকার ঠিক কেন্দ্রস্থলে বদরিনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যভাগ দিয়া অলকনন্দা বীরগতিতে বহিয়া যাইতেছে। এই উপত্যকাভূমির দুই পার্শ্বে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায়, নীল-তুষারমণ্ডিত নর ও নারায়ণ পর্ব্বত সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। এই পর্ব্বতদ্বয়ের অধিত্যকা-প্রদেশ তুষারময়।

বদরিনাথ সহরে সর্ব্বসমেত কুড়ি পঁচিশখানি ক্ষুদ্র কুটীর। এই সকল কুটীরের অধিকাংশ—পাণ্ডাগণ এবং নারায়ণের অসংখ্যক সেবায়েত। সহরের দুইটি দোকানশ্রেণী নামিয়া একেবারে অলকনন্দার জলে মগ্ন হইয়াছে। বদরিকাশ্রমের নাম উল্লেখ মাত্রেই সাধারণের মনে যে সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ব্বের দিনের কথা মনে হয়, পুরাকালের মুনিঋষিগণের তপোবনের বদরিকাশ্রম কল্পনা করিয়া জনসাধারণের মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, বদরিনাথের বর্ত্তমান দৃশ্য দেখিলে আর সে বিশ্বাস থাকে না। যে মন্দিরের অভ্যন্তরে অগণিত ঋষিমূর্ত্তি সংস্থাপিত থাকে, সে মন্দির এমন সামান্য ও এত অল্প দিনের নির্ম্মিত যে, দেখিয়া ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মন্দিরটি ৪০।৫০ ফিটের বেশী উচ্চ নহে। তবে যে সুন্দর স্থানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতেই ইহা এই মন্দির সমস্ত উপত্যকাভূমির উপর যেন সর্ব্বদা উন্নতশীর্ষ উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, বদরিনাথের মন্দির যত্নসহকারে নির্ম্মিত নহে, ইহার অধিকাংশ বিষকর্ম্মা এই মন্দিরের নির্ম্মাতা। কিন্তু যে মহত্তের নির্ম্মিত হইয়াছে ও

প্রবেশ করিলাম। সহ্য করিবার ক্ষমতা অধিকতর ছিল না। সুতরাং এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে উপর হইতে নিস্তার পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলাম। আর মাদুরাইর প্রসিদ্ধ মীনাক্ষীদেবীর মন্দির সম্বন্ধে যে ভ্রান্তি ছিল, তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গেল, এই ভাবিয়া আমার প্রাতঃস্নান একপ্রকার হইয়া হইয়াছে।

মন্দিরের সম্মুখে রাস্তার উপর আসিয়া আমরা যখন অন্যান্য যাত্রীর সহিত মিলিত হইলাম, তখনও মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। অনেকক্ষণ দেখিতে দেখিতে একটি বা দুইটি ক্ষুদ্রায়তন ইলিয়েক-ক্যারিয়ার ধীরে ধীরে নীচে নামিতে লাগিল। ক্রমে দূরে নীচে নামিয়াই আমরা একটি বাঁধানো কুণ্ড বা জলাধার দেখিতে পাইলাম। কুণ্ডটি বেশী গভীর নহে, সেজন্য সিঁড়ি দিতে আবশ্যক হইয়াছে। এই কুণ্ডের আকারপ্রকার একটা কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়া দিতে পারিলাম না, কারণ কাহিনীর উপরে ছাদ রহিয়াছে। এই কুণ্ডের জল অত্যন্ত শীতল। এই ভয়ানক শীতে সর্বশরীর ভিজিয়া একটু বেশ কষ্ট হইল, কিন্তু বাহির হইয়াই অনেকটা সেই কষ্ট দূর হইয়া গেল। এই কুণ্ডে প্রবাহিত করিয়াছেন। ইহারই নিকটে আর একটি কুণ্ড আছে। জল অতি শীতল। সে স্বরূপারে এই কুণ্ড প্রবাহিত করা হইয়াছে। [illegible] স্নানার্থী, স্নানান্তে জল [illegible] যাত্রীদের জন্য। তাই ব্রাহ্মণগণ সেই উচ্চ ভূমির উপরে শীতল জল দিতেছিলেন। যাত্রিগণ দীপ জ্বালিয়া দেবে এই কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা [illegible] স্নান করিবার কুণ্ডের কিয়দংশ কাপড় দ্বারা আবৃত করা মন্দিরের অধ্যক্ষগণের কর্তব্য বলে হয় নাই। আমরা সেখান হইতে বহির্গত হইয়া আরও একটু নীচে নামিয়া গেলাম। সেখানে আরও আর একটি কুণ্ড। ইহার নাম সূর্যকুণ্ড। এ কুণ্ডের জলও বরফ, কিন্তু যাত্রিগণ আরও কুণ্ডে স্নান করে না। [illegible] উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে স্নান করিলে শীতের প্রকোপে যখন যাত্রীদের [illegible] অসাড় হয়, তখন তাহাদিগকে এই সূর্যকুণ্ডের উত্তপ্ত জল স্নানার্থীদের গায়ে ছিটাইয়া দেয়। তাহাতে কতটা পুণ্য হয়, বলিতে পারি না, তবে ইহাতে যে একটু আরাম হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। [illegible] ও তদুপরি ঠাণ্ডা বাতাস। [illegible] আমরা কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকটিতে স্নান করিলাম। একটুকুর পর [illegible]

হইয়া থাকে। যাত্রিদলেরা ক্রমে ক্রমে ভাসিয়া যাইতে লাগিল; তাহাদের পুণ্যও ক্রমে অধিক সঞ্চিত হইতে লাগিল। পুরে গিয়া যখন ইহারা যাত্রা করিবে, তখন হইতে যাত্রিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারে যে, এ পথ স্বর্গদ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলেও, অল্পব্যয়ে এ পথে স্বর্গে যাওয়া যায় না। প্রত্যেক স্টেশনেই ব্রাহ্মণগণ পুণ্য বিতরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু সে পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য অধিকপরিমাণে অর্থ দক্ষিণা দিতে হয়; এবং সেই অর্থের পরিমাণ যাহার যত অধিক, স্বর্গদ্বার তাহার তত নিকটবর্ত্তী। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ যখনই মুক্ত যে, তাহাদের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কেও এ সব চাতুরী আদৌ উদিত হয় না।

আমরা সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া নদীর কিনারায় যাইতেছিলাম, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাহুল মহাশয় আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই রাহুল, নারায়ণের মন্দিরের প্রধান সেবায়েত। আমরা তাড়াতাড়ি উপরে উঠিতে লাগিলাম। তপ্ত কুণ্ডের নিকটে একটি অনাবৃত স্থানে আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য একখানি ভদ্রবস্ত্র আস্তীর্ণ হইয়াছিল, এবং তাহারই উপরে, একখণ্ড সুন্দর কার্পেটের আসন বাহির মহাশয়ের বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা সেখানে পঁহুছিয়া দেখিলাম, তিন চারি জন চোপদার রৌপ্যনির্ম্মিত আসা মোটা হস্তে অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে স্বয়ং রাহুল মহাশয়; তাঁহার পশ্চাতে ময়ূরপুচ্ছরচিত-বীজনধারী একজন ভৃত্য; সর্ব্বশেষে নারায়ণের পূজক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ-মহাশয়ের পরিধানে সবুজ সাটিনের বস্ত্র; অঙ্গে ভুজ-কর্ত্তা মুইজ্জরের জামা; কটিদেশে একখণ্ড উৎকৃষ্ট মেঘবর্ণের শাল কোমরবন্ধ-রূপে শোভমান; মস্তকে রক্তবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং পদযুগলে চিত্র বিচিত্র বিনামা; তাঁহার দুই কর্ণে দুইটি ঝকঝকে মণিবীরবৌলি, তাহাতে বহুমূল্য প্রস্তরের কাজ করা মুক্তা গ্রথিত; মণিবন্ধে মুক্তার মালা; হস্তে বহুমূল্য মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণবলয়; দুই হস্তের প্রতি অঙ্গুলিতেই বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক। আমরা মনে করিয়াছিলাম, জটাবল্কলধারী ভস্মাবিভূষিত যোগী সন্ন্যাসী দর্শন করিব; তৎপরিবর্ত্তে বিলাসিতার চরম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তীর্থশ্রেষ্ঠ বদরিকাশ্রমের উপযুক্ত সেবায়েতই বটে।

যথারীতি সম্ভাষণাদির পর প্রথম মিনিট তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আমরা বিদায় হইলাম। কিন্তু তাঁহার মূল্য দর্শকদিগের নিকট অল্প নহে; তাহারা

ইহার কারণের বিষয় পরের অধ্যায়ে খুব ভেবে [illegible] হইবে নাই। তথাপি [illegible] ইহার [illegible] মহাশয়ের [illegible] তাহারা [illegible] ১৩৭ পৃষ্ঠা [illegible] দর্শন দিবেন। [illegible] [illegible] দিবে না, তিনিই জানেন, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হিবেন তাহা [illegible] হয় নাই, ইহা আমরা [illegible] বুঝিতে পারিলাম।

[illegible] তীর্থস্থান ও দেবমন্দির দর্শন করিবার [illegible] আমরা এত দূর [illegible] করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াই [illegible] আমাদের মনে একটি বিশেষ ভয় দিল,—এতক্ষণের [illegible] কিছু [illegible] [illegible] [illegible] দর্শন করিতে পারি নাই; আমরা কোনও প্রকারে [illegible] দেবমন্দিরে [illegible] [illegible] করি, তাহা হইলে বড়ই [illegible] হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের ব্যবহারে বুঝিতে পারিলাম, আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

যেন সবল কাঠিন্য ইহাদিগের শরীর হইতে ক্ষয় করে, এবং মস্তিষ্কমধ্য হইতে স্বর্গ, শ্রেষ্ঠ, মহত্ত্ব প্রভৃতি ধারণার মন হরণ করিয়া পলায়ন করে। প্রথমে আমি ভীত হইলে চুরীর কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল, এবং অনায়াসেই চোরাই দ্রব্য ধৃত হইল। বলা বাহুল্য এপ্রকার ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের জন্য তাহাদের সকলেরই পদচ্যুতি হইয়াছিল।

এখানকার সমস্ত ব্রাহ্মণ দক্ষিণদেশীয়। কোনও বিবাহিত ব্যক্তি এখানে দেবসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন না। সেই জন্য এখানে সকলেই অবিবাহিত থাকে। কিন্তু এই কয় মাস কষ্টে সৃষ্টে এখানে অবস্থান করিয়া যখন তাঁহারা দেশীয়ে ফিরিয়া যান, তখন আর তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সংযমের দিকে দৃষ্টি থাকে না। আমরা যে সময় তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমরা চিকিৎসাবিদ্যাও জানি, এই কথা রাষ্ট্র হওয়ায়, ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই ঔষধের জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ব্যাধির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের স্বভাবেরও পরিচয় পাইয়াছিলাম। পাণ্ডেজি কথা বলুন থাকুক, স্বয়ং রাহুল মহাশয় আমাদিগের নিকট হইতে যে গড়ার জন্য ঔষধ লইয়া গেলেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, কেদারনাথে তাঁহারও উপাস্য দেবতা নহেন, তিনি শিলাময় নারায়ণ অপেক্ষা শরীরিণী দেবীগণের সেবায় অধিকতর অনুরক্ত। বর্ত্তমান রাহুলের নাম শ্রীনারায়ণ রাও, বয়স অনুমান বত্রিশ বৎসর। ইনি নেপাল দরবার কর্ত্তৃক এই মুখ্য তীর্থের সেবায়েৎ নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, ধর্ম্ম বা চরিত্রের বলে এই যুবক এমন পবিত্র কার্য্যের ভার পান নাই, অর্থবলে বা অন্য উপায়ে এই স্থান তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। লোকটি বেশ রাজার মত সুখে আছে!

সমস্ত দিনে এখান হইতে কেদারনাথের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বদরিনাথ ও কেদারনাথের মন্দির একই পর্ব্বতগাত্রে নির্ম্মিত; উভয়ের মধ্যে ১৩।১৪ মাইল, ব্যবধান। কিন্তু এ পথে গমনাগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোনও বর্ষা নাই; প্রায় সমস্ত বৎসর পর্ব্বত তুষারমণ্ডিত থাকে। সুতরাং বদরিনাথ হইতে কেদারনাথে যাইতে হইলে, যাত্রিগণকে নেপালের ঘুরিয়া দশ বারো দিনে তথায় যাইতে হয়। কেদারের পথ অতিভয়াবহ; আজ শুনিলাম, তিন চারি শত যাত্রী এ বৎসর ঐ পথে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

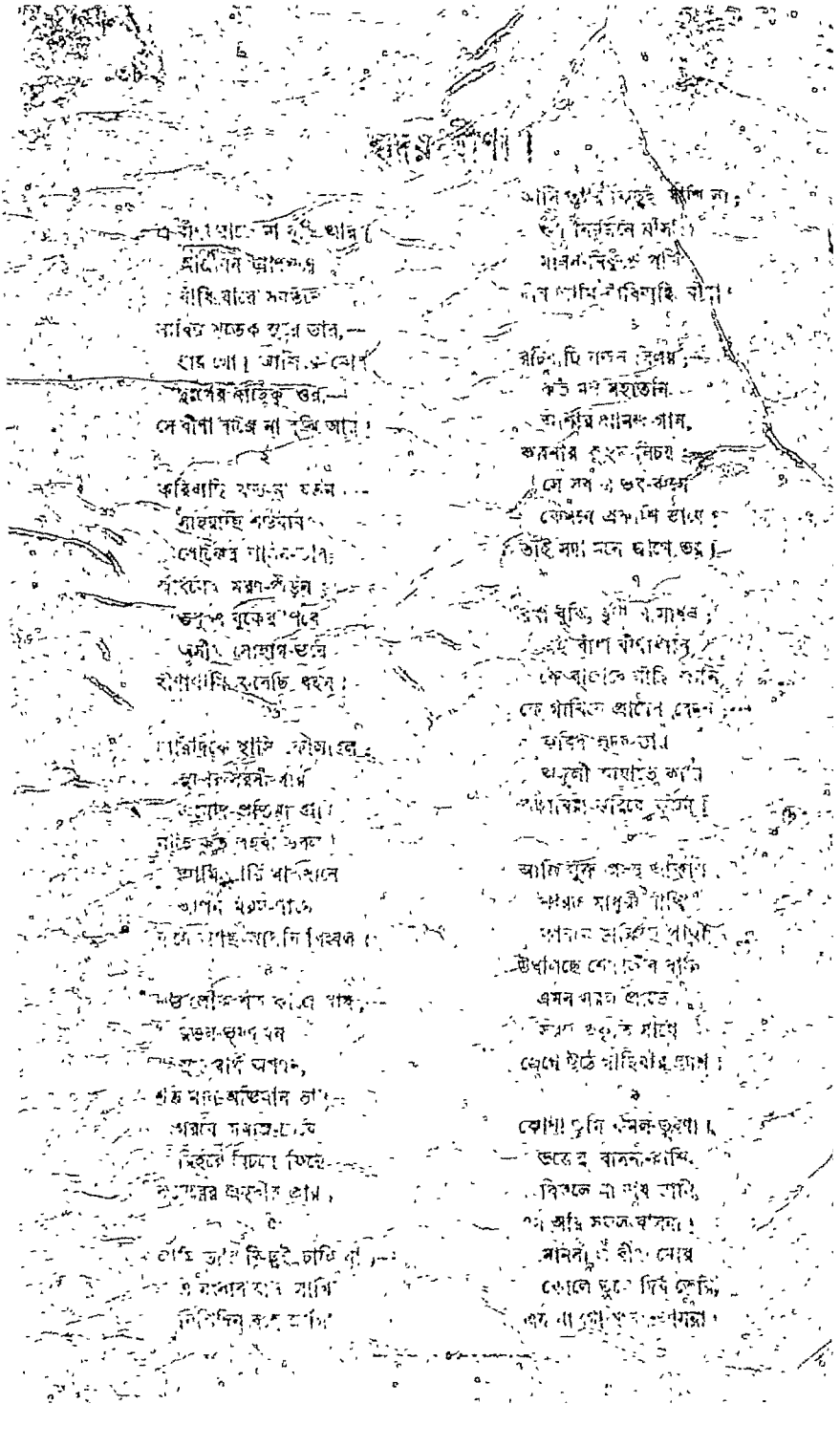

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

চিরস্থায়ী কিছু অবশিষ্ট থাকে। বিধাতার প্রতিকূলতা করিলে সংসারে স্থানের অভাব নাই। মানুষ যাহা ভাবে, নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। অল্প দিন হইল, গিরিজাপ্রসন্ন স্বপ্রতিষ্ঠিত গৃহনীর বিতীয় তালের নির্ম্মাণে ব্রতী হইয়াছিলেন; সমাপ্ত হইয়া তাহা মুক্তিত ও প্রকাশিত হইতে না হইতেই তিনি নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধির বলে ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে কবিবর অতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গিরিজা-বাবুর পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সে অনুষ্ঠান তাঁহার জীবনী না লেখাই ভাল। কিন্তু তাঁহার জীবনে এমনই কিছু বিশেষত্ব ছিল। এই বিশেষত্ব বুঝিলে মানুষ সংসারে আপনার গন্তব্য পথ চিনিয়া লইতে পারে। অনাদিন অনিত্য হইতে থাকিলেও, অক্ষয়কীর্ত্তি আপনার বিশেষত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জীবনী কোন কোন বিষয়ে লোকের শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে।

গিরিজাপ্রসন্নের বেলায় সিংকাজি গ্রামের বৈদ্য রায় চৌধুরী বংশ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ইহারা কুলগৌরবে বৈদ্যদিগের মধ্যে যেরূপ সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত ও সংকুলীন, সেইরূপ সম্ভ্রান্ত। এই প্রসিদ্ধ বংশে সিংকাজির নিকট পাটীতে ১২৬৮ সালের চৈত্র মাসে গিরিজাপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ ৺দুর্গাপতি রায় চৌধুরী জীবিত ছিলেন। পিতা মধুরানাথ রায় চৌধুরীও নিজ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্নের বয়স যখন ৫।৬ বৎসর, তখন তিনি একদা ৩।৪ হাত উচ্চ গৃহের ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া যান। এরূপ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলেও তাঁহার জীবনের ভোগ অধিক ঘটে নাই। বিধাতা বোধ হয় তাঁহার চরিত্রগত বাধ্যতার নিদর্শন দেখাইবার জন্যই তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্ন প্রথমে বাসগ্রামের বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষা করেন। তৎপরে বরিশাল জেলা স্কুলে প্রবিষ্ট হয়েন। সেখানে পাঠকালে ১২৮৪ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পিতামহ দেহত্যাগ করেন। এই বৎসর তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইহার পর তিনি কলিকাতার নিউ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন।

[illegible] হইয়াই এফ্. এ. পরীক্ষা দেন। এই বিদ্যায় [illegible] সিটিকলেজে [illegible] প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্. এ. পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর বি. এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে বরিশালে, পরে কলিকাতায় হাইকোর্টে, ওকালতি আরম্ভ করেন।

গিরিজাপ্রসন্নের গঠনশীল সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। ওকালতিতে তাঁহার মনোবৃত্তি ছিল না। অনুরাগের অভাবপ্রযুক্ত তিনি উহাতে প্রতিপত্তি লাভ করিতেও সমর্থ হন নাই। নিজের বৈষয়িক কর্ম্মেও তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আদৌ পরিদৃষ্ট হয় নাই। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, নিষ্ঠাবান্ খ্রীষ্টী ও নিষ্ঠাবান্ মুসলমান ছিলেন। গতবৎসর আশ্বিন মাসে যখন কলিকাতায় প্লেগের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তখন তিনি সপরিবারে বাড়ীতে গমন করেন। বাড়ীতে থাকিলেই তাঁহাকে আমরা বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত। ঐ সময়ে তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন—"বৈষয়িক কর্ম্মে লিপ্ত রহিলেই অনেক সময়ে সত্যধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিতে হয়। আমাদের এখন মনুষ্যত্বে বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে। ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে তিনি যে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন, এই উক্তিতেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে পরিমাণে ওকালতি করিতেছিলেন, তখন ১৩০০ টাকের বেশী দিন হলে তাঁহার উপার্জ্জন হইত। পিতৃবিয়োগের পর তিনি বৎসরাধিক অধিকতর অর্থ নিবিষ্ট হয়েন।

পঠদ্দশাতেই গিরিজাপ্রসন্ন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। বি. এ. পরীক্ষা দিবার সময়ে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ গৃহলক্ষ্মীর সূত্রপাত হয়। তিনি যখন ঐ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺কালাচাঁদ বক্সী মহাশয় "বঙ্গিমচন্দ্রের আরম্ভ হয়। প্রথমে তাঁহার একজন বন্ধু "গৃহলক্ষ্মী" লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, পরে তিনি সহজে সমুদায় ভার গ্রহণপূর্ব্বক উহা সাঙ্গ করিয়া তুলেন। বি. এল্. পরীক্ষার সময়ে তিনি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের একটী চরিত্রের বিশ্লেষণপূর্ব্বক প্রবন্ধ লিখেন। এইরূপে বঙ্কিম বাবুর প্রধান সমুদয় চরিত্রের বিশ্লেষণে "বঙ্কিমতত্ত্ব" প্রস্তুত হয়। পরে যখন কলিকাতার অবস্থিতিসময়ে গিরিজাপ্রসন্ন তাঁহার একজন বন্ধুর সহিত একটী ছাপাখানা করেন। তখন তিনি স্বয়ং ছাপাখানার যাবতীয় কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, এবং উহার একপ্রকার সত্ত্বাধিকারী হইয়াই এই [illegible]

ধর্ম্মতত্ত্বের ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার ছুটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। একখানির নাম "কৃষ্ণচরিত্র" আর একখানি "বিজ্ঞানরহস্য"। তিনি অন্যান্য গ্রন্থেরও রচনা করেন। কিন্তু পূর্ব্বলিখিত কয়েকখানি পুস্তক এবং একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন তিনি অন্য গ্রন্থ পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধনপূর্ব্বক "ধর্ম্মতত্ত্ব" নাম দিয়া উহা পুনঃপ্রকাশিত করেন।

গীতলঙ্কার যথোচিত আদর হইয়াছে, এবং তাহার সুসংস্কারে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীরই কার্য্যসাধন করিয়াছেন। গিরিজাপ্রসন্নের সমাকুলকে তাঁহার রচনার কোথা কোমলতা, সেইরূপ মৃদুস্বভাব বন্ধুবর্গের দেখা যায়। কিন্তু কেবল রচনাকৌশলেই গৃহলক্ষ্মী সমাদৃত হয় নাই; সমাদরের অন্য কারণ আছে। সেই কারণ—গ্রন্থকারের প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভক্তিবত্তা। নারী-চরিত্রকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাইতে হইলে যে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, তিনি সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তিনি প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ভগবদ্ভক্ত নহেন, তাহা হইলে এই মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। গিরিজাপ্রসন্ন ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইয়া, প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীর গুণাবলী দেখাইয়াছেন। "বঙ্কিমচন্দ্র" এবং "দয়ন্তীর পতিপ্রেম" এইরূপ ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক। চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষে মনুষ্যত্ব কিরূপে পরিস্ফুট হয়, বঙ্কিমচন্দ্রে প্রধানতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি সুনীতি ও ধর্ম্মভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার গ্রন্থাবলী তাঁহার ভগবদ্ভক্তিপরায়ণতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার অদ্বিতীয় নিদর্শনস্বরূপ। এই ভক্তি ও নিষ্ঠাই তাঁহার বিশেষত্ব, এবং এইরূপ বিশেষত্বই তাঁহার চরিত্রের যেরূপ উৎকর্ষের পরিচায়ক, অপরের সম্বন্ধেও সেইরূপ উৎকর্ষের উদ্দীপক।

গিরিজাপ্রসন্নের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া কয়েক মাস পরে মৃতাস্য হয়। দৃষ্টচক্রের এইরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব আবর্ত্তন দেখিয়া, তিনি অদৃষ্টপরীক্ষার জন্য জ্যোতিষের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। ফলিতজ্যোতিষে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি কোষ্ঠী দেখিয়া ফলাফল বলিতে পারিতেন, এবং স্বয়ং কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতেও জানিতেন। তাঁহার গৃহলক্ষ্মীতে তাঁহার জ্যোতিষিক ভক্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মচর্য্যায় যে সকল বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ প্রধান সাধন, গিরিজাপ্রসন্ন তৎসমুদয়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মসম্মত সমস্ত আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিতেন। প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যোপাসনা, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, মাসবিশেষে ও বার্ষিক পর্ব্বে

হইবে, একটা অবাধ্যতা, ইহাই নিত্যনিয়ত তাঁহার একটা উপদ্রব ছিল না। সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি উষালোকে শয্যাত্যাগ ও স্নানাদি করিয়া পূজাগৃহে আহ্নিকে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেন, তৎপরে পূজা ইত্যাদির সমাধান করিয়া বৈষয়িক কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইতেন। মধ্যাহ্নভোজন তাঁহার একটি প্রধান নৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল। বৈশাখ ইত্যাদি মাসে দিবাকালে তিনি স্বপাকভোজন করিতেন। ভ্রাতৃপুত্র বা অন্যান্য সহোদর ও পুত্রের সময়েও তাঁহাকে স্বপাকভোজন করিতে দেখা যাইত। পালকী তিনি গৃহীতে যাইতেন না, কারণ ইহাতেও বাহকের ক্লেশ হইত। নিজ হস্তে পরমেশ-ভোজ্য ও গাত্রমোছা লইয়া, পাদচারে কলিকাতা হইতে বাগবাজার বা বরাহনগরে উপস্থিত হইতেন। পরিশ্রমে তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল। বাড়ীতে থাকিলে গল্পগুজবে যে সময় যাইত তিনি দীর্ঘকাল বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেন না। জীবনের শেষ বয়সেও তিনি এইরূপ আচারপরায়ণ হইয়া কখনো চিত্তস্থৈর্য্য হারান নাই। যে বয়সে মানুষ বিলাসী ও ভোগাভিলাষী হয়, তিনি সেই বয়সেই চিত্তসংযম ও ঈশ্বরনিষ্ঠার একশেষ দেখাইয়াছিলেন। এই সৌখীনতার সময়ে সংসারের এই পাপপঙ্কিল ক্ষেত্রে ভ্রমণ। বৃক্ষ দুর্লভ!

গুরুভক্তি, বন্ধুপ্রীতি ও স্বজনস্নেহ গিরিজাপ্রসন্নের প্রকৃতি বড় সুন্দর ছিল। বঙ্কিম বাবুকে তিনি গুরুজ্ঞানে ভক্তি করিতেন; নিজের পুত্রের নাম বঙ্কিম বাবুর নামে অভিহিত করিয়া, তিনি এই ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্ব্বে তাহার একজন পরম বন্ধুর একটি কন্যা গাড়ীচাপা পড়িয়া দেহত্যাগ করে। বন্ধুর বাসাবাড়ী ভবানীপুরে। গিরিজাপ্রসন্ন প্রায় প্রত্যহ চাঁপাতলা হইতে ভবানীপুরে যাইতেন। তিনি স্বরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বাড়ি দিন বন্ধুর শোকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্ন দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। তিনি যে অতি শীঘ্র অমরপথে লীন হইলেন, ইহা তাঁহার আত্মীয়গণ মনেও ভাবেন নাই। তাঁহার সেই রোগ সবল সেইরূপ স্থির ছিল। তিনি নিয়মিত দেহযাত্রা নির্ব্বাহিতেন। তাঁহার দুর্ঘটনা বড় আকস্মিক—বড় ভয়ানক—বজ্রই স্বরূপ। প্লেগের আতঙ্ক উপস্থিত হইলে, তিনি হয় কলিকাতা হইতে অন্যত্র যাইবেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বাড়ীতে থাকিয়া অসাবধান হন না, অধিকন্তু বৈষয়িক কর্ম্মের আভিজাত্যে ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত হয়, এই

অন্ত তিনি দেশের একটি চাকরকে সঙ্গে লইয়া ভাদ্রের মাসের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। শেষে তাঁহার দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র লেখা পড়ার জন্য বাড়ী হইতে তাঁহার নিকটে আইসেন। ইতঃপূর্ব্বে সীতানাথ নামক একজন আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থী তাঁহার বাসাবাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভিষগ্বর শ্রীযুত দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ পড়িতেন। তিনিও বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, গিরিজাপ্রসন্নের বাসায় থাকেন।

১২ই ভাদ্র (১৩০৫) সীতানাথের জ্বর হয়; ক্রমে নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসক রোগপরীক্ষাপূর্ব্বক উহা নিউমোনিক প্লেগ বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি না কি রোগীকে হাঁসপাতালেও পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, সীতানাথ রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই। ১৫ই ভাদ্র প্রাতঃকালে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। গিরিজাপ্রসন্ন সৎকারের জন্ত নিমতলা শ্মশানঘাটে গমন করেন। তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের বাসায় সজাতির মৃত্যু হইয়াছে, অতএব তাঁহার সৎকারের সময় নিজের উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াই তিনি কর্ম্মচারীর কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

যে দিন সীতানাথের মৃত্যু হয়, সেই দিনই গিরিজাপ্রসন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় ও চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে যাত্রা করেন। কিন্তু কাল তাঁহাকে ছাড়িল না। যে সর্ব্বসংহারক রোগ সীতানাথের জীবন হরণ করিয়াছিল, বাড়ীতে ২০শে ভাদ্র গিরিজাপ্রসন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র সেইরূপ রোগে দেহ ত্যাগ করিল। ঐরূপ রোগে তাঁহার চাকরটিরও মৃত্যু হইল। ভ্রাতুষ্পুত্রের শুশ্রূষার সময়ে তিনিও ঐরূপ রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার কুশতা ছাড়িয়া গেল। তিনি চারি দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। ২৩শে ভাদ্র রাত্রিতে তাঁহার জ্বরের সঙ্গে নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা গেল। তৎপর দিন নিউমোনিয়া সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইল; ক্রমে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল; কিন্তু জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। গিরিজাপ্রসন্ন এই অবস্থায় ২২শে ভাদ্র প্রাতঃকালে তিনটি কন্যা ও একটি শিশু পুত্র রাখিয়া, অনন্তপাদের ধ্যান করিতে করিতে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। দুই দিন পরে ঐ দুরন্ত রোগ তাঁহার মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীরও কর্ম্মদেবময় পতির অনুগমনের সহায় হইল। দেখিতে দেখিতে অল্পদিনগুলি একে একে অনন্ত সাগরের অতলজলধিতে মিলিয়া গেল।

সহচরী সাহিত্য।

সমালোচনা।

সাহিত্যের শাসনতান্ত্রিক।

কাজে-কেরাণীর হিসাব নিকাশের মত সাহিত্যেরও একটা হিসাব নিকাশ করা যাইতে পারে। কোন কোন সংবাদপত্র বা মাসিকপত্র সে চেষ্টা করিয়াও থাকেন; অর্থাৎ, সদ্য প্রকাশিত নানাবিধ পুস্তকের সমালোচনা করিয়া, সমালোচ্য বৎসরের বিশেষত্ব বিচার করেন।

'একাডেমী' পত্রে ১৮৯৭ সালের ইংরাজি সাহিত্যের যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। লেখক বলেন যে, বৎসরের প্রারম্ভে পুস্তকে পাঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, সাধারণ পাঠকের পুস্তকক্রয়স্পৃহা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। তিনি ইহার দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—প্রথমতঃ, লোকে পরমায়ু নীতি লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, মহারাণীর হীরকজুবিলীর আনন্দোন্মাদে তাহাদের অন্য চিন্তা ভুলিয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে হৈমন্তের প্রারম্ভে একেবারে রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

লেখক বলেন যে, সাময়িক সাহিত্যের পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, চলনসই পুস্তক অনেক বাহির হইলেও, ভাল পুস্তক তাহাই প্রকাশিত হয় না। প্রকাশিত পুস্তকের অধিকাংশই অর্থোপার্জ্জন বাসনা মীহারী দর্শন উপকরণমাত্র।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেন, তাহাদের উদ্দেশ্য অধ্যাপকের পদ লাভ। গ্রন্থকারগণ বিক্রয়াবিক্রয়ের দিকে দৃষ্টি রাখেন, অতএব তাঁহাদিগকে সাধারণ পাঠকের রোগ অনুসারেই পুস্তক লিখিতে হয়। সে রোগও বড় বিভিন্ন প্রকৃতির এবং সাই পরিবর্ত্তনশীল। অতএব নানাপ্রকার রুচি লইয়া পুস্তকের বিভিন্ন আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। চিরস্থায়ী হইবার উপযুক্ত পুস্তক আজো প্রকাশিত হওয়া বলিলেও চলে। লেখক বলেন যে, সাধারণ পাঠক যখন পয়সা দিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়িবে, তখন কোনও বুদ্ধিমান লোক যদি তাহাদের মনের মত লিখিয়া সহজেই দুই পয়সা রোজগার করিতে পারেন, তাহাতে আপত্তি কি? এইরূপ বুদ্ধিমান লেখকগণ যে আমাদিগকে আদৌ সন্তুষ্ট করিতে পারেন না, তাহাও নহে; তবে গ্রন্থরচনা ব্যবসায়মাত্র নহে; পক্ষান্তরে, কল্পনার প্রকৃত লক্ষ্য—জ্ঞানবিস্তার। বাস্তবিক, সাহিত্যসেবকগণ সকলে কষ্ট গ্রহ করিয়াও সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতিসাধনে পরাঙ্মুখ নহেন। দু দশ বৎসরে একখানি পুস্তকের প্রকৃত সুরবত্তা প্রতিপন্ন হয় না। তবে কয়খানি পুস্তক সেই দু দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে? লেখক বলেন, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে খান বারও যদি টিকিয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট।

এ বৎসর প্রতীচ্য সাহিত্যের কবিতাকুঞ্জে পুষ্পের সংখ্যা বড়ই বিরল। তুলিনী মাধ্য সম্বন্ধে এ্যাথেনীয়ম এই সমালোচক বিশেষ কিছু বলিতে অনিচ্ছুক; কারণ, সেগুলি সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র। ইহাদের মধ্যে সিষ্টার ফ্রান্সিস টেনিসনের কবিতাটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সিষ্টার টেনিসনের আর একখানি কবিতা-কাব্য। পুস্তক Wind Flowers কবিতার রাজ্যে উচ্চস্থানলাভের যোগ্য। এই খণ্ডকাব্য সমালোচনা বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। এই সুন্দর কবিতা রচনা

এখনও স্থানে স্থানে কৃত্রিমতা, [illegible] ও [illegible] তাহা কবিদের উচ্ছৃঙ্খল, অস্থিরচিত্ততা ও [illegible] পাঠকের পক্ষে [illegible] লক্ষণের [illegible] "আমরও" [illegible] তাঁহার [illegible] গাড়ী [illegible] হইয়াছে। মিষ্টার [illegible] "আলোচিন ডিস্ট্রিক্ট" [illegible] ভাবে ব্যক্ত হইলেও [illegible] অজ্ঞাতনামা A. E. প্রণীত কাব্য The Earth Breath নামক পুস্তকে কবিতার সাধারণ ধর্ম্মের বিশেষত্ব বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে [illegible] আকাঙ্ক্ষার সঙ্গীতের তরঙ্গের [illegible] পাঠকের স্বপ্নের রাজ্যে উপনীত করে। মিষ্টার থিয়োডোর ওয়াট্স্ ডাণ্টনের "Coming of Love" [illegible] হইয়াছেন। মিষ্টার ওয়াট্স ডাণ্টন কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং তাঁহার কবিতা লেখা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার কবিতায় তাঁহার নিজের প্রভাব [illegible] প্রভাব দৃষ্ট হয় না। মিষ্টার সুমালিয়ার [illegible] কবিতার অনুবাদ, মিষ্টার আল্‌ফ্রেড অষ্টিনের "Conversion of Winkelstalks" [illegible] একটি [illegible] কবিতা এবং নবীন কবি মিষ্টার [illegible] নিউবোল্টের "A Ballad of [illegible]" নামক কবিতাও উল্লেখযোগ্য। অন্ধ ভাব কবিতার অভাবে, "একাডেমী" [illegible] পাঠককে মেরেডিথ, মিসেস্ ব্রাউনিং ও মিষ্টার অষ্টিন ডবসনের পুনরালোচনায় [illegible] করিতে পরামর্শ দিয়া

এ বৎসর উৎকৃষ্ট [illegible] বিষয়, উচ্চ [illegible] সমালোচনাও তদনুরূপ [illegible] লেখক বলেন, মিষ্টার হেনলী [illegible] সমালোচনা সত্যই গবেষণাপূর্ণ। মিষ্টার হেনলীর [illegible] সহিত [illegible] তুলনায় নহে। [illegible] দুইবার সভাপতি, তাঁহার [illegible] নিকটেও [illegible] সমালোচনা। [illegible] পদে প্রশংসিত হইবে। হেনলীর সমালোচনা [illegible] বলী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। হেনলী, সমালোচনা [illegible] মধ্যে [illegible] আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং সাহিত্যের রাজ্যে তাঁহাদের একটী স্থান [illegible] দিয়াছেন। যত দিন হেনলীর মত প্রতিভাশালী আর একজন সমালোচক [illegible] না পারিবেন, তত দিন বার্ণসকে হেনলীর [illegible] বার্ণস্ বুঝিবার অনেকে বুঝিবেন। মিষ্টার র‍্যালে "Stylo" সম্বন্ধে যে সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি যাঁর বক্তব্য বিষয় উপমায় অলঙ্কৃত করিয়া সুভাষে ও বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। মিষ্টার র‍্যালের উপর মেরিডিথের অত্যন্ত প্রভাব।

উপন্যাস।

উপন্যাস-আলোচনার প্রারম্ভে লেখক বলেন, এলিজাবেথের সময় নাটক যেমন তদানীন্তন সাহিত্যের বিশেষত্ব ছিল, তেমনই আধুনিক সাহিত্যের বিশেষত্ব—উপন্যাস। কাব্যের মত মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী না হইলেও, উপন্যাসে উদারতা ও সার্ব্বজনীনতার অভাব নাই। এ বৎসর উপন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ নাই। মিষ্টার মেরিডিথের কোনও নূতন উপন্যাস প্রকাশিত না হওয়ায় লেখক বড় দুঃখিত হইয়াছেন। মিষ্টার টমাস্ হার্ডির "The well Beloved" নামক নবপ্রকাশিত উপন্যাস তাঁহার অশ্লীলতাপূর্ণ "Jude" নামক পুস্তকের ন্যায় অশ্লীল নয়। কিন্তু বক্তব্যমাত্র পুস্তকখানি উচ্চদরের উপন্যাস নহে। "St. Ives" মিষ্টার ষ্টিভেন্সনের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট Romance হইতে পারিত; কিন্তু ষ্টিভেন্সন যথানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এবং তাঁহার "Romance" লিখিবার বিশেষ উদ্যোগও ছিল না। [illegible] কিপলিংএর "Captains Courageous" উল্লেখযোগ্য। মিষ্টার হেনরী জেমসের [illegible] তাঁহার "The Spoils of

Poynten" এবং "What Maisie Knew" পুস্তকদ্বয় বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি জগতের কল্পনাপ্রিয় কবিসমাজকে ধন্যবাদে দূরে নিক্ষেপ করিয়া "Unopened Soul"কে অর্থের উচ্চতম সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মিষ্টার হিনিস-লিখিত জেম্‌সের মত নিখুঁতরূপ না হইলেও, "The Whirlpool" তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। তাঁহার উচ্চ নৈতিক আদর্শ এবং উৎকৃষ্ট আখ্যানবস্তু-নির্বাচন প্রশংসার যোগ্য। ইহাতে জীবনের বহুবিধ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মিষ্টার হিনিস যে নিপুণ চিত্রকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চিত্র আশ্চর্য্যরূপ। অতঃপর লেখক অনেক গুলি উপন্যাসের কেবল নামোল্লেখ করিয়াছেন। উপন্যাস-সমালোচনার উপসংহারে লেখক বলেন যে, উপন্যাস উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হইতেছে। আধুনিক সমাজের সমৃদ্ধি হইতেছে "উপন্যাস", এবং প্রহেলিকা হইতেছে "অবসাদ"।

লেখকের মতে, উপরি-উক্ত কয়েকটি বিষয় ব্যতীত সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় অবধানযোগ্য পুস্তক অত্যন্ত বিরল। জীবনচরিত-প্রকাশের বেগও আজকাল কমে নাই। বিলাতে মুদ্রাযন্ত্র, আমাদের অল্পসংখ্যক পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণালয়ের লক্ষ্মণ হয়। বলিতে গেলে, একরূপ অকারণে অত্যন্ত সাধারণ লোকের বড় বড় জীবনচরিত অকাতরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এগুলি সাধারণতঃ আত্মীয় স্বজনের গর্ব্ব-পরিতৃপ্তির উপাদান। আমার যাঁহাদের জীবনচরিত এই শ্রেণিভুক্ত হইবার উপযুক্ত, তাঁহাদের জীবনের ও কার্য্যের এমন সব তুচ্ছ ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় যে, তাহাতে জনিষ্ট বই ইষ্টের আশা অতি অল্প।

ম্যাডাম ডামেস্‌টেটারের "ব্রোনি-চরিত" ও "লেম্‌সনের জীবনী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুত্র-লিখিত "টেনিসনের জীবনী" অংশে অত্যন্তদুষ্ট ও অত্যাবশ্যক। লেখকের মতে, লর্ড রবার্টসের "Forty-one Years in India" বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

অবশেষে লেখক বিবিধপ্রকার পুস্তকের এক তালিকা করিয়াছেন। এ স্থলে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। ভাদ্র। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "বিদেশী বাঙ্গালী—পাণ্ডাচার্য্য" কৌতূহলের উদ্দীপক সুপাঠ্য রচনা। শ্রীযুক্ত কীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "সাহিত্য-সংবাদ" প্রবন্ধ সকলেরই পাঠ করা উচিত। এই নিবন্ধে, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্ম্ম, মানবতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের নবাবিষ্কৃত তথ্য ও অভিনব মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিষয়বিবেচনায় নামটি কিন্তু সার্থক হয় নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "পঞ্চদশ বর্ষ গত" ইতিশীর্ষক কবিতাটি পরিবর্ত্তমান সংসারচক্রের অখিল ছবি। সম্পাদক মহাশয়ের রচিত "প্রাচীনমাসের দুই রত্ন—বীর দ্বারকানাথ ও ঋষি রামতনু" পড়িয়া আমরা বিচিত্র রস উপভোগ করিয়াছি। প্রবন্ধের বিষয়ীভূত বীর ও ঋষির বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতে না পারি, সম্পাদক মহাশয়ের সাধুতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। কথায় বলে, "প্রদীপের নীচেই অন্ধকার।" কথাটি নিতান্ত মিথ্যা নহে। "নব্যভারতের" সম্পাদক তাহার উত্তম উদাহরণ। তিনি যে প্রবন্ধে বীর দ্বারকানাথের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দিয়ে হইয়া রবিতে উপাধ্যায়ী বেচারী কি করিতে পারে? স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যাহার প্রতি বোধ করিয়া নষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, দেবেন্দ্রবাবুর তাহা এত দূর পৌঁছে না, তাহার আক্রমণের নমুনা নূতন করিয়া না দিলেও চলে। আমরা কবি-বরের এই চাপাতে তাহার পাণ্ডিত্য বস্তুতঃ অনন্য।

হাফেজের অনুবাদ।

প্রেমিকা।

স্বর্ণপাত্রা কুন্দ-দন্তিনী
তুলে হাতে চাহে ঊর্দ্ধ পানে,
তার পানে চেয়ে আছে চাঁদ
প্রেমমাখা বহ্নি পরাণে।
ভাবে ভয়ে নতমুখী বালা,
চেয়ে দেখে সেই নীল জলে
স্নানজ্যোতি প্রতিমা তাহার
আছে পড়ে তার পদতলে।

আশঙ্কা।

সুখ বুঝি সরে যায় ধীরে,
পরাণে যে ঝড় বহে যায়,
বিধুমা সে বালিকা আমার
না জানি সে রয়েছে কোথায়।
বিলম্ব স্বপনজাল লয়ে
গেছে তার একেলা বসিয়া,
চাহিছে সে আকুল আঁধারে
অশ্রুময় নয়ন মেলিয়া।

নাগিনী।

দেখ গান মোর গরলেতে ভরা,
বিষহীন হবে তা কেমনে!
নিশিদিন করেছ যে তুমি,
ওগো যাহা কিছু আছে এ জীবনে।
দেখ গান মোর গরলেতে ভরা,
কেমনে তা হবে বিষহীন?
হৃদে মোর রয়েছে নাগিনী,
আছ তুমিও সেথায় নিশিদিন।

পুষ্প।

তোমারি ও দুটি ব্যাকুল নয়ন
মোর পানে আর নাহি ত চেয়ে,
চারি দিক মোর রয়েছে কেবল
নিশীথ-শীতল আঁধার ছেয়ে।
সকলি গিয়েছ, গিয়েছে স্বর্গ,
নিশিথা-প্রেমের মধুর রাতি,
শুনা হেরি চারিদিকে মোর
আবার আঁধারে আঁধার রাতি।

মধুমাসে।

কুসুম-মুকুল হরষে আকুল
নবীন মধুমাস,
বহিছে তখন মরমে কেমন
অতি মৃদু মৃদু বাস।
বিহগেরা সব ঢালে নবরব
মধুময় মধুমাসে,
আকুল আমায় বলেছিনু তবি
আমার প্রাণের আশ।

প্রলোভন।

যেখানে মরিয়া পড়ে মোর আঁখিজল,
সেখানে বিকশি উঠে ফুল শত শত,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ভরে ভেদি হৃদিতল,
কোকিলের ন্যায় বাহিরিতে হয় পরিণত।
আমারে বাসিলে ভাল হবে লো তোমার,
অবর মধুরতম ফুটে ফলফুল,
বাতায়নপথে তব পাবে অনিবার
সুমধুর কলকণ্ঠ কোকিলের কুল।